শ্রীঅরবিন্দ

যোগসমন্বয়

প্রথম ভাগ

(অবতরণিকা ও দিব্যকর্ম্মযোগ)

অনুবাদকের নিবেদন

শ্রীঅরবিন্দের মহাগ্রন্থ The Synthesis of Yoga (যোগসমন্বয়) ১৯১৪ সালের আগষ্ট হইতে ১৯২১ সালের জানুয়ারি পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে "আর্য্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর দিব্য কর্ম্ম-যোগ (The Yoga of Divine Works) নামক ইহার প্রথম ভাগ কতকটা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগের সর্ব্বাঙ্গীণ জ্ঞানযোগের (The Yoga of Integral Knowledge)—অধিকাংশ দেখিয়া সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করাও হয়। তাহার পর সমগ্র গ্রন্থখানি যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন দ্বাদশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত দিব্য কর্ম্মযোগ নামক অংশের সহিত অতিমানস ও কর্ম্মযোগ নামক শ্রীঅরবিন্দের একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায়রূপে সংযুক্ত করা হয়।

যোগসমন্বয় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের (Integral Yoga) কথা বিশেষ ও বিশদভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহারা ইংরাজি ভাষা জানেন না অথবা যতটুকু জানেন তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের ভাষা বুঝিতে পারেন না তাহাদিগকে এই গ্রন্থের অমৃতময় এবং বহুল পরিমাণে অভিনব ভাবধারার কথঞ্চিৎ আস্বাদন দিবার জন্য আমি এ-গ্রন্থ অনুবাদ করিবার অনুমতি শ্রীমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলাম। আর শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকগণ পরে যাহাতে ইহার সাহায্যে মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা বুঝিতে পারেন প্রধানতঃ তজ্জন্য ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি ; তবে তাহা করিতে গিয়া ভাষার সাবলীলতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে আমি সাধ্যমত দৃষ্টি রাখিয়াছি। এই দুরূহ কার্য্যে কতটা সফলতা লাভ করিয়াছি তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

যোগের কথা বলিতে গেলে মানসাতীত অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয় কিন্তু মনের ভাষায় সে সমস্ত ব্যক্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার, এজন্য যোগতত্ত্ব সাধারণের পক্ষে দুরূহ। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ পূর্ব্বপ্রচলিত যোগগুলির সমন্বয় বলিয়া বিভিন্ন যোগপন্থার প্রায় সকল দুরূহতা এখানে একত্রিত হইয়াছে। তদুপরি সমন্বয় করিবার জন্য সে সমস্ত যোগপন্থাবলিতে যাহা নাই এমন অনেক অভিনব ভাবধারা, অভিনব তত্ত্ব তাঁহাকে যোগ করিতে হইয়াছে। তাহাতেও দুরূহতা বাড়িয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের রচনায় বাক্যের বক্তব্যবিষয় স্ফুটতর করিবার জন্য তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের অবতারণা তিনি একই বাক্যের মধ্যে

বিশেষণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া বহুস্থানে বাক্যগুলি বেশ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যবস্থায় তাঁহার বক্তব্যবিষয় খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ইহাতে তাঁহার লেখা সাধারণ পাঠকের নিকট অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে যাহারা ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন এরূপ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার রচনা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাই ধৈর্য্যসহকারে বিশেষ মনোযোগ দিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া, বলিতে গেলে এক প্রকার ধ্যানস্থ ও তদ্‌গত হইয়া শ্রদ্ধাব সহিত শ্রীঅরবিন্দের রচনা পড়িতে হয়, নৈলে অনেক সময় অর্থবোধ হয় না। আমি নিজে যথাসাধ্য এই ব্যবস্থানুসারে চলিযা তাঁহাব গ্রন্থগুলি বুঝিতে চেষ্টা কবিয়াছি। পাঠকগণেব নিকট আমাব অনুরোধ তাহারাও যেন এইভাবেই পড়িতে চেষ্টা করেন।

অনুবাদের ভাষা সহজবোধ্য করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি; বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছি; যেখানে সেরূপ শব্দ খুঁজিয়া পাই নাই তথায় প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত বা গঠিত অপর মনীষীগণের ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। তবে বইএর মধ্যে যেখানে এরূপ শব্দ ব্যবহাব করিতে বাধ্য হইযাছি সেখানে—অন্ততঃপক্ষে যেখানে সে শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে—পাশে বন্ধনীব মধ্যে মূল ইংরাজি শব্দটি দিয়াছি।

সমগ্র গ্রন্থখানি একসঙ্গে প্রকাশ না কবিয়া সম্প্রতি ইহাব অবতবণিকা ও দিব্য কর্ম্মযোগ নামক প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এ সম্বন্ধে আমি সানন্দ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে জানাইতেছি যে এ-গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রণ কার্য্যে আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়েব নিকট নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। পরমপণ্ডিত ও সাধক শ্রীমৎ স্বামী অনির্বাণ ইহার অবতরণিকা এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঋষভচাঁদ সামসুখা এ খণ্ডের প্রায় সমস্ত দেখিয়া দিয়াছেন; সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় ইহার সমগ্র পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন আর এ কার্য্য তিনি এত আন্তরিকতার সহিত এত প্রভূত পরিশ্রম সহকারে করিয়াছেন যে তিনি আমার শুধু সাহায্যকাবী নয় পরন্তু সহযোগী ও সহকর্মী হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

সূচীপত্র

অবতরণিকা

(সমন্বয়ের সর্ত্ত)

প্রথম ভাগ

(দিব্য কর্ম্মযোগ)

অবতরণিকা

সমন্বয়ের সর্ত্ত

১

জীবন ও যোগ

মানুষের কর্ম্মের সকল বৃহত্তর রূপের মধ্যে, যাহা আমাদের সাধারণ গতি-বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত অথবা আমাদের নিকট উচচ ও দিব্য বলিয়া বোধ হয় এরূপ অসাধারণ ক্ষেত্রে ও পবিপূর্ণতার পথে যাহা আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিতে চায় এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা অনুস্যূত প্রকৃতির ক্রিয়াধারাতে দুইটি প্রয়োজন সাধিত হয বলিয়া মনে হয়। এরূপ প্রত্যেক ক্রিয়ার ধারা সুসমঞ্জস জটিলতা বা বহুভঙ্গিমা ও সমগ্রতার দিকে চলিতে চায়, কিন্তু আবার তাহা ভাঙ্গিয়া পৃথক হইয়া পড়িয়া বিশেষ চেষ্টা ও প্রবণতার নানা প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হয়—শুধু একটা বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিশালী সমন্বয়ের মধ্যে আসিয়া পুনরায় মিলিত হইবার জন্য। দ্বিতীয়তঃ কোন কিছু কার্য্যকরীভাবে প্রকাশের জন্য তাহার রূপরাজির গঠন ও পরিণতিসাধন একটা অলঙ্ঘ্য বিধান, অথচ যদি কঠোরভাবে প্রণালীবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়, তবে সকল সত্য ও সাধনা পুরাতন হইয়া পড়ে এবং তাহাদের গুণ বা শক্তির সমগ্র না হইলেও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়; যদি তাহাকে নূতন জীবনলাভ করিতে হয় তবে বিশ্বপুরুষের নূতন প্রবাহের দ্বারা মৃত বা মরণোন্মুখ রূপ বা বাহনকে পুনরুজ্জীবিত এবং রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা নবায়িত করিতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে পুনঃপুনঃ জাত হওয়াই জড়ের ক্ষেত্রে অমরত্বের বিধান। আমরা যে যুগের মধ্যে রহিয়াছি তাহা যেন নিদারুণ প্রসব-বেদনাতে পূর্ণ, এযুগে চিন্তা ও ক্রিয়ার যে সকল রূপের মধ্যে নিজস্ব ভাবে উপযোগী হওয়ার কোন প্রবলশক্তি অথবা স্থায়ী হওয়ার মত কোন প্রচ্ছন্ন গুণ আছে তাহাদিগকে মহাপরীক্ষার অধীন করা এবং পুনর্জ্জন্মলাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান জগৎ মায়াবিনী মিডিয়ার (Media) এক প্রকাণ্ড কটাহের আকার ধারণ করিয়াছে, সর্ব্ববস্তু তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া

খণ্ড খণ্ড করিয়াফেলা হইতেছে, তাহাদের পরীক্ষা চলিতেছে, একভাবে মিলিত করিয়া আবার ভাঙ্গিয়া অন্যভাবে পুনর্মিলিত করা হইতেছে, এ সমস্তের ফলে হয় সে বস্তুটি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদান অন্যরূপ গঠনের কার্য্যে লাগিতেছে অথবা রূপান্তর এবং নবযৌবনলাভ করতঃ তাহা পুনরায় জীবনের নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ করিতেছে। ভারতীয় যোগ মূলতঃ প্রকৃতির কতকগুলি মহাশক্তির বিশেষ ক্রিয়া বা রূপায়ণ , ইহা নিজস্ব বিশেষ ভাবে গঠিত, বহুধাবিভক্ত এবং নানারূপে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে ; নিজের প্রচ্ছন্নশক্তিতে ইহা মানবজাতির ভবিষ্য জীবনের এইসব বীর্য্যবন্ত ও সক্রিয় মূল উপাদানের অন্যতম। স্মরণাতীত কালে জাত এ সন্তান নিজের প্রাণশক্তি ও সত্যের বলে আজ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং যেখানে সে আশ্রয় লইয়াছিল সেই গোপন সম্প্রদায় ও তপস্বীগণের নির্জন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে আর মানুষের জীবন্ত শক্তি ও উপযোগিতা সকলের ভবিষ্য সমষ্টির মধ্যে নিজের স্থান খুঁজিতেছে। কিন্তু প্রথমে তাহার নিজেকে পুনরাবিষ্কৃত করিতে হইবে এবং সে নিজে যাহার চিহ্ন বা নিদর্শন সেই সাধারণ সত্য ও প্রকৃতির বিরামবিহীন উদ্দেশ্য সাধন প্রচেষ্টার মধ্যে তাহার নিজসত্তাব গভীরতম হেতু বা কারণ পুরোভাগে আনিয়া স্থাপিত করিতে এবং নূতন আত্মজ্ঞান ও আত্মমূল্যাবধারণের দ্বারা নিজের বৃহত্তর সমন্বয়ের আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। নিজেকে সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া ইহা মানবজাতির পুনর্গঠিত জীবনের মধ্যে আরও সহজ ও শক্তিশালীভাবে প্রবেশ করিবে, ইহার প্রণালীসমূহের দাবী এই যে তাহারা সে জীবনকে ভিতরের দিকে তাহার সত্তা এবং ব্যক্তিত্বের গর্ভগৃহে বা অন্তরতম গোপনকক্ষে লইয়া যাইবে এবং উপরের দিকে তাহার উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিবে।

জীবন ও যোগ এ উভয়কে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে সমগ্র জীবনই এক যোগ—সচেতন বা অবচেতনভাবে। কারণ যোগ শব্দ দ্বারা আমরা আমাদের সত্তার মধ্যে যাহা কিছু প্রচ্ছন্ন ও অব্যক্তভাবে রহিয়াছে তাহাদিগকে বিকশিত ও প্রকাশিত করিয়া আত্মসম্পূর্ণতা লাভের এবং মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে যাহার আংশিক প্রকাশ দেখিতে পাই বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত সেই সত্তার সঙ্গে ব্যষ্টি মানবসত্তার মিলনসাধনের এক সুপ্রণালীবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝি। বাহ্যজীবনের পশ্চাতের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সমগ্রজীবন প্রকৃতির এক বিশাল যোগ, যাহা তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং অব্যক্ত আছে তাহা ক্রমশঃ অধিকতরভাবে প্রকাশ করিয়া প্রকৃতি তাহার নিজের

পূর্ণতালাভের এবং তাহার নিজের দিব্য সত্তা বা সত্যের সহিত নিজেকে মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার চিন্তাশীল-অঙ্গ মানুষের মধ্যে মনের বিকাশ করিয়া প্রকৃতি এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে আত্মসচেতন উপায়সকল আবিষ্কার এবং স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের সংবিধান রচনা করিয়াছে, যাহা দ্বারা এই মহদুদ্দেশ্য আরও দ্রুত এবং আরও শক্তিশালীভাবে সফল করিয়া তোলা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলিয়াছেন যে মানুষের শারীরিক জীবনের এক জন্মের, অথবা কয়েক বৎসরের এমন কি কয়েক মাসের মধ্যে তাহার সমগ্র পরিণতি ধারাকে ঘনীভূত করিয়া আনিবার এক উপায়কে যোগ বলা যাইতে পারে। মহাজননী প্রকৃতি তাঁহার বিশাল উদ্ধ্বর্মুখী সাধনার পথে শিথিলভাবে, বৃহদাকারে, ধীরে সুস্থে, মন্থরগতিতে, বাহ্যদৃষ্টিতে উপাদান ও শক্তিসমূহের বৃহৎভাবে অপচয় ও অপব্যয় সহকারে কিন্তু পূর্ণতর সম্মিলনের মধ্য দিয়া কতকগুলি সাধারণ পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার করিতেছেন; কোন নির্দ্দিষ্ট যোগমার্গ সেই সমস্ত পদ্ধতির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত এবং ঘনীভূত করিয়া তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণতর পরিধির মধ্যে কিন্তু অধিকতর শক্তিশালীভাবে রূপায়িত করে। যোগকে কেবলমাত্র এই দৃষ্টিতে দেখিলে যোগের পদ্ধতিসকল সমন্বয়ের একটা প্রকৃত এবং যুক্তিযুক্ত ভিত্তি পাওয়া যাইতে পারে। কেননা তাহা হইলে তখন যোগকে এমন কোন রহস্যাবৃত অনৈসর্গিক বস্তু বলিয়া আর বোধ হইবে না যাহার সহিত জগৎশক্তির সাধারণ পদ্ধতি সকলের কোন সম্পর্ক নাই অথবা যাহা বিষয় বা বস্তুরূপে এবং আত্মকেন্দ্রিক চেতনারূপে তাহার আত্মসম্পূর্ত্তির (objective and subjective self-fulfilment) দুই বৃহৎ গতিবৃত্তির মধ্যে যে উদ্দেশ্য প্রকৃতি দৃষ্টিপথে রক্ষা করে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য; বরং তখন দেখা যায় যে প্রকৃতি যে সকল শক্তি ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছে অথবা তাহার স্বল্পোন্নত কিন্তু অধিকতর সাধারণ ক্রিয়াধারায় যাহাদিগকে সে ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে ব্যবস্থিত ও সুগঠিত করিতেছে যোগ সেই সমস্তশক্তিরই বীর্য্যবন্ত এবং অসাধারণ ব্যবহার মাত্র বলিয়া নিজের আত্মপ্রকাশ করে।

বাষ্প বা বিদ্যুতের সাধারণ ক্রিয়াধারার সহিত বাষ্প বা বিদ্যুতের স্বাভাবিক শক্তিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহার করিবার যে সম্পর্ক, মানুষের মনস্তত্ত্বের সাধারণ গতানুগতিক ক্রিয়ার সহিত যোগপদ্ধতি সকলের কতকটা তদনুরূপ সম্বন্ধ আছে। যোগপন্থাগুলিও রীতিমত পরীক্ষা, ব্যবহারিক বিশ্লেষণ এবং সর্ব্বকালে একই ফললাভের দ্বারা সমর্থিত ও গঠিত সুদৃঢ় জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সমগ্র

রাজযোগ এই ধারণা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যে আমাদের অন্তরের উপাদানরাজি তাহাদের সমবায়, ক্রিয়াধারা ও শক্তিসকলকে নির্দ্দিষ্ট আন্তর-পদ্ধতির দ্বারা পৃথক বা বিশ্লিষ্ট করা, নূতনরূপে আবার সমবেত করা এবং নবীন ও পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব ছিল এরূপ কর্ম্মধারায় নিয়োগ করা অথবা তাহা-দিগকে রূপান্তরিত এবং একটা নূতন সাধারণ সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তদ্রূপ হঠযোগ এই ধারণা ও অনুভূতির উপর নির্ভর করে যে সাধারণতঃ আমা-দের জীবন যে সমস্ত প্রাণশক্তি ও ক্রিয়াধারার অধীন এবং যাহাদের সাধারণ ক্রিয়াপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ও অপরিহার্য্য বোধ হয়, তাহাদের উপরও প্রভুত্ব স্থাপন করা যায়, সে সমস্ত ক্রিয়াপদ্ধতিকে পরিবর্ত্তিত করা বা স্থগিত রাখা যায় এবং তাহার ফল এমনও হইতে পারে যাহা অন্য কোন উপায়ে অসম্ভব এবং যাহারা এই ক্রিয়া পদ্ধতির যুক্তিবিবৃতি ধরিতে পারে নাই তাহাদের কাছে অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

যোগের অন্য কোন কোন রূপে তাহার এই প্রকৃতি যদি ন্যূনতরভাবে পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ এই যে সে সমস্ত অধিকতরভাবে বোধি-ভাবিত এবং অল্পতররূপে যান্ত্রিক এবং সত্তার কোন ঊর্দ্ধস্থিত বিভাবের —যেমন ভক্তি যোগে এক দিব্য আনন্দের অথবা জ্ঞানযোগে এক দিব্য অনন্ত চেতনা ও সত্তার—আরও নিকটে অবস্থিত, তথাপি তাহারাও আমাদের মধ্যস্থিত কোন প্রধান চিত্তবৃত্তিকে ব্যবহার করিয়াই যাত্রারম্ভ করে; কিন্তু তাহা এরূপ উপায়ে এবং এরূপ উদ্দেশ্যে করা হয়, যাহাদের স্থান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাধারণ ক্রিয়াধারার মধ্যে দেওয়া হয় নাই। যোগ এই সাধারণ নামের মধ্যে সন্নিবিষ্ট সমস্ত সাধনপন্থার প্রত্যেকটি প্রকৃতির একটি নির্দ্দিষ্ট সত্যকে ভিত্তি করিয়া মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার এক বিশেষ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা, শক্তি এবং ফলের মধ্য হইতে, যাহা পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল কিন্তু প্রকৃতির সাধারণ গতিবৃত্তিতে যাহা সহজে বা সর্ব্বদা প্রকাশিত হয় না তাহা বিকশিত করিয়া তোলা হয়।

কিন্তু বাহ্যপ্রাকৃতিক জ্ঞানে যান্ত্রিক পদ্ধতির বহুলীকরণের সঙ্গে অনেক অসুবিধা আসিয়া পড়ে, কেননা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে তাহা এমন এক বিজয়দৃপ্ত কৃত্রিমতা গড়িয়া তুলিতে চায় যাহা যন্ত্রপাতির গুরুভারের চাপে মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে জড়ীভূত করিয়া দেয় এবং বর্দ্ধিত দাসত্বের মূল্য দিয়া তাহা কোন কোন প্রকার স্বাধীনতা এবং প্রভুত্বকে ক্রয় করিতে চেষ্টা করে; যোগের পদ্ধতিসকলে এবং তাহাদের অসাধারণ ফলে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলে

তদ্রূপ কোন প্রকার অসুবিধা এবং ক্ষতি আসিয়া পড়িতে পারে। ঐরূপ ক্ষেত্রে যোগীর সাধারণ জীবন হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার এবং সে জীবনের উপর প্রভাব হারাইয়া বসিবার দিকে একটা ঝোঁক হয়, তাহার মানবীয় কর্ম্মাবলীকে ক্ষুণ্ণ ও দরিদ্র করিয়া আত্মার ঐশ্বর্য্য, তাহার বাহিরের ক্ষেত্রে মৃত্যুর দ্বারা আন্তর স্বাধীনতা ক্রয় করিতে তিনি উন্মুখ হইয়া পড়েন। যদি তিনি ঈশ্বরকে লাভ করেন তবে তিনি জীবনকে হারাইয়া ফেলেন অথবা জীবনকে জয় করিবার জন্য যদি তিনি তাঁহার সাধনাকে বহির্ম্মুখী করেন তবে তাঁহার পক্ষে ভগবানকে হারাইয়া ফেলিবার বিপদ আসে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে ভারতে জাগতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক পরিণতি ও পূর্ণতার মধ্যে একটা প্রবল অসঙ্গতি বা বিরোধ সৃষ্ট হইয়াছে এবং যদিও তথায় অন্তরের আকর্ষণ ও বাহিরের দাবীর মধ্যে বিজয়ী এক সামঞ্জস্যের ঐতিহ্য এবং আদর্শ রহিয়াছে তবু তাহার উদাহরণ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ যখন অন্তরের দৃষ্টি এবং শক্তির দিকে কেহ ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং যোগের পথে প্রবেশ করে তখন অবশ্যম্ভাবী-রূপে ইহা ধরিয়া নেওয়া হয় যে সে ব্যক্তি আমাদের সমষ্টিগত জীবনের বিশাল প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং মানবজাতির লৌকিক বিষয়ের জন্য চেষ্টা ও সাধনার ক্ষেত্র হইতে হারাইয়া গেল। এই ধারণা এত প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, প্রচলিত দর্শন ও ধর্ম্মমত সমূহও এ-বিষয়ে এত জোর দিয়াছে যে জীবন হইতে পলায়ন করা বা সরিয়া দাঁড়ানো আজকাল যোগের পক্ষে আবশ্যকীয় বিধান বলিয়া শুধু যে মনে করা হয় তাহা নহে, ইহাকে যোগের সাধারণ উদ্দেশ্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়। যাহা মুক্ত ও পূর্ণ মানবজীবনে ভগবান ও প্রকৃতির পুনর্ম্মিলনের উদ্দেশ্য পোষণ না করে অথবা যাহা তাহার প্রণালীর ভিতরে আমাদের অন্তরের এবং বাহিরের ক্রিয়া-ধারা ও অনুভূতিতে, তাহাদের উভয়ের দিব্য চরমোৎকর্ষের মধ্যে পরস্পরের সহিত এক সামঞ্জস্য সাধনের কেবল অনুমোদক নয় পরন্তু সহায়ক না হয় তেমন কোন যোগসমন্বয় সন্তোষজনক হইতে পারে না। কারণ মানুষ জড়জগতের মধ্যে অবতীর্ণ এক উচ্চতর সত্তার ঠিক সেই প্রকাশ ও প্রতীক, যাহার মধ্যে নিম্নতরের পক্ষে নিজে রূপান্তরিত হইবার এবং উচ্চতরের প্রকৃতি গ্রহণ করিবার এবং উচ্চতরের পক্ষে নিম্নতরের রূপাবলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে সম্ভাবনা সিদ্ধির জন্য মানুষকে যে জীবন দেওয়া হইয়াছে তাহার পক্ষে তাহা পরিহার করা তাহার চরম সাধনার অপরিহার্য্য বিধান অথবা তাহার সমগ্র এবং শেষ লক্ষ্য অথবা তাহার আত্মসম্পূর্ত্তির বীর্য্যবত্তম উপায় কখনই হইতে পারে না। কেবল কোন কোন অবস্থায় ইহার একটা সাময়িক

প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে অথবা মানবজাতির একটা বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের উপর আরোপিত একটা বিশেষ ভাবের প্রবল সাধনারূপে শুধু গৃহীত হইতে পারে। যোগের খাঁটি ও পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা কেবল তখনই সংসাধিত হইতে পারে যখন মানুষের ভিতর-কার সচেতনযোগ, প্রকৃতির মধ্যস্থিত অবচেতন যোগের মত, বাহিরের ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে সতত বিদ্যমান থাকে এবং পন্থা ও সিদ্ধি এই উভয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অধিকতর পূর্ণ এবং প্রোজ্জ্বল অর্থে আমরা আবার বলিতে পারি যে —"সমগ্র জীবনই হইল যোগ।"

প্রকৃতির সোপানত্রয়

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে যোগের প্রাচীন সাধনমার্গগুলির মধ্যে পৃথক হইয়া পড়িয়া এক বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিবার দিকে প্রবণতা ছিল, অবশ্য প্রকৃতির মধ্যস্থিত সকল বস্তুর মতই তাহার সমর্থনযোগ্য এমন কি অলঙ্ঘ্য একটা উপযোগও ছিল; আর এই প্রবণতার ফলে যে সমস্ত বিশিষ্ট উদ্দেশ্য এবং প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছে আমরা তাহাদের সমন্বয় করিতে চাই। কিন্তু আমরা যাহাতে সুবিবেচনার সহিত এই উদ্যমে অগ্রসর হইতে পারি তজ্জন্য প্রথমেই পৃথক হইয়া পড়িবার তত্ত্ব এই আবেগের অন্তর্নিহিত সাধারণ উদ্দেশ্য জানা চাই এবং তাহার পরে যোগের প্রত্যেক মার্গ যে বিশেষ উপযোগিতার ভিত্তিতে তাহার সাধন প্রণালী গড়িয়া তুলিযাছে তাহা বুঝিবারও বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সাধারণ তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রকৃতির নিজস্ব সর্ব্বজনীন কর্ম্মধারা গুলিকেই প্রশ্ন করিতে হইবে; প্রকৃতির মধ্যে বিকৃতি-কারক মায়ার আপাতযুক্তিপূর্ণ কিন্তু বস্তুতঃ মিথ্যা ক্রিয়াধারাই শুধু রহিয়াছে, ইহা স্বীকার না করিয়া তাহাকে নিজের সর্ব্বব্যাপী সত্তাতে অবস্থিত ঈশ্বরের নিজস্ব বিশ্বশক্তি ও ক্রিয়াধারা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে যে বিশাল ও অনন্ত এবং তথাপি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাচনশীল এক প্রজ্ঞার প্রেরণায় সে ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত হইতেছে—যে প্রজ্ঞার কথা গীতায় 'প্রজ্ঞাপ্রসৃতা পুরাণী' 'আদিতে শাশ্বত সত্তা হইতে প্রসৃতা বা প্রেরিতা' বলা

হইয়াছে। বিশিষ্ট উপযোগিতাসকল বুঝিবার জন্য বিভিন্ন যোগ পন্থার মধ্যে আমাদিগকে মর্ম্মাবগাহী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহার বিস্তৃত আয়তনের বিশাল স্তুপের মধ্য হইতে বিভিন্ন অঙ্গের পরিচালক ভাবধারাকে এবং যে মৌলিক শক্তি বিভিন্ন সাধন প্রণালীর জন্ম দিয়াছে এবং তাহাদিগকে বীর্য্যবন্ত করিয়া রাখিয়াছে সেই শক্তিকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। তাহার পর সেই এক সাধারণ তত্ত্ব এবং সেই এক সাধারণ শক্তি যাহা হইতে সকলের সত্তা ও প্রবৃত্তি জাত হইয়াছে এবং অবচেতনভাবে সব কিছু যাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং যাহার মধ্যে সকলের আসিয়া সচেতনভাবে মিলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা আরও সহজে আমরা আবিষ্কার করিতে পারিব।

যাহাকে আধুনিক ভাষায় তাহার ক্রমপরিণতি বলা হয় মানুষের মধ্যে প্রকৃতির সেই ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশ, পরম্পরা ক্রমে স্থাপিত তাহার তিনটি তত্ত্বের উপরে অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্ভর করে,—(১) যাহা ইতিপূর্ব্বে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, (২) যাহা দৃঢ়ভাবে সচেতন পরিণতির স্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং (৩) যাহা উন্মিষিত ও বিকশিত হইবে এবং যাহা হয়ত ইতিমধ্যেই প্রাথমিক রূপায়ণরূপে কাহারও কাহারও মধ্যে সর্ব্বদা না হইলেও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে অথবা কতকটা নিয়মিতভাবে প্রকাশের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে; অথবা অন্য কাহারও মধ্যে সে প্রকাশ হয়ত আরও পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এমন কি হয়ত বিরল হইলেও এমন দু-একজন আছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান মানবজাতির পক্ষে যতদূর সম্ভব, সিদ্ধির তেমন সর্ব্বোচ্চ স্তরের সন্নিকটে পৌঁছিয়াছেন। কেননা প্রকৃতির অভিযান নিয়মিত ও যান্ত্রিকভাবে পদক্ষেপ করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় না। শোচনীয়ভাবে পরবর্ত্তীকালে পশ্চাৎ অপসরণের মূল্য দিয়াও প্রকৃতি অনেক-সময় নিজেকে অতিক্রম করিয়াই সর্ব্বদা অগ্রসর হয়। তাহার মধ্যে আছে অতি দ্রুতগতি, মহান ও প্রবল উচ্ছ্বাস ও বিশাল সিদ্ধি। সময় সময় প্রচণ্ড বলপ্রয়োগদ্বারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবার আশায় প্রবল আবেগভরে ঝটিকার বেগে সম্মুখের দিকে সে ছুটিয়া চলে। এই সমস্ত আত্ম-অতিক্রমণ তাহার মধ্যে যাহা পরম দিব্য অথবা যাহা অতি আসুরিক তাহাকেই প্রকাশ করে, কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই তাহা তাহাকে লক্ষ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিবার পক্ষে পরম শক্তিশালী।

প্রকৃতি আমাদের জন্য যাহা বিকশিত করিয়া দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা হইল আমাদের শারীরিক জীবন। পৃথিবীতে আমাদের ক্রিয়া এবং

উন্নতির জন্য যাহা মূলতঃ একেবারে অপরিহার্য্য প্রকৃতি আমাদের সেই নিম্নতর দুইটি উপাদানের, জড় এবং প্রাণশক্তির, এক প্রকারে মিলন সাধন এবং তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে; অতিরিক্ত পরিমাণে অতিসূক্ষ্ম-বাদী আধ্যাত্মিকতা যতই ঘৃণা করুক না কেন, জড়ই আমাদের ভিত্তি এবং আমাদের সকল শক্তির ও উপলব্ধির প্রাথমিক নিমিত্ত বা বিধান, আর প্রাণশক্তি জড়দেহে আমাদের অস্তিত্বের হেতু বা উপায়, এবং তাহারি উপরে আমাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়াধারাসমূহ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। তাহার সদা বর্ত্তমান জড়ীয় গতিবৃত্তিতে প্রকৃতি সফলতার সহিত এক প্রকার স্থিতি ও সাম্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে, মানবজাতির মধ্যে ক্রমপ্রকাশশীল দেবতার উপযুক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ এবং আবাসস্থান গঠনের পক্ষে সে স্থিতি যেমন যথেষ্ট পরিমাণে স্থির ও স্থায়ী তেমনি সেই সঙ্গেই যথাযথভাবে নমনীয় ও পরিবর্ত্তনশীল। ইহাই ঐতরেয় উপনিষদে বর্ণিত সেই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য যেখানে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে দিব্যপুরুষ পশুদেহসকল গঠন করিয়া পর্যায়-ক্রমে দেবতাগণকে দিতে থাকিলে তাহা তাহারা প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে যখন মনুষ্যদেহ গঠিত হইল তখন তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন যে "ইহা সুন্দর ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে" এবং সে দেহে প্রবেশ করিতে তাঁহারা সম্মত হইলেন। প্রকৃতি জড়ের অসাড়তা এবং প্রাণের সক্রিয়তার মধ্যে একটা কাজ চালানো গোছের আপস রফা করিয়াছে—এই প্রাণশক্তি জড়ের মধ্যে বাস করে এবং তাহার দ্বারা পুষ্ট হইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং প্রাণময় জীবনকে সে যে কেবল ধারণ করিয়া থাকে তাহা নয়, মনের পূর্ণতম পরিণতিও সম্ভব করিয়া তোলে। এই সাম্যই মানুষের মধ্যে প্রকৃতির এক মৌলিক স্থায়ী অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, যোগের ভাষায় ইহাকে স্থূল দেহ বলা হয়, ইহা অন্নময় কোষের উপাদান এবং প্রাণের বাহন স্নায়ু-মণ্ডলী দ্বারা গঠিত। *

তাহা হইলে যে উচ্চতর গতিবৃত্তি বিশ্ব-শক্তির অভিপ্রেত এই নিম্নতর সাম্য যদি তাহার ভিত্তি এবং প্রাথমিক উপায় হয়, ইহা যদি সেই বাহন গড়িয়া তোলে যাহার মধ্য দিয়া এ-জগতে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, ভারতের এই বাণী যদি সত্য হয় যে আমাদের প্রকৃতির স্ব-ধর্ম্ম সার্থক করিবার যন্ত্ররূপেই দেহ আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে জড়জীবন হইতে কোন প্রকার চরম পরাবর্ত্তনের অর্থ হইবে দিব্য জ্ঞানের পূর্ণতা হইতে পশ্চাদ-পসরণ এবং পার্থিব প্রকাশের মধ্যে ইহার যে উদ্দেশ্য আছে তাহার বর্জন।

* অন্নকোষ এবং প্রাণকোষ

জীবনকে এরূপ অস্বীকার, তাহাদের পরিণতির কোন গোপন বিধানের জন্য কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ মনোভাব হইতে পারে, কিন্তু মানব-জাতির অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কখনই হইতে পারে না। সুতরাং যাহা দেহকে উপেক্ষা করে অথবা তাহার লোপ বা বর্জন পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার পক্ষে অপরিহার্য্য মনে করে, তাহা কখনই পূর্ণযোগ হইতে পারে না। বরং দেহের পূর্ণতা সাধন করিয়া তোলাও চিৎ সত্তার চরম বিজয় বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত, দৈহিক জীবনকে দিব্যভাবে বিভাবিত করা ভগবানের বিশ্বলীলার চরমোৎকর্ষ। আধ্যাত্মিকতার পথে জড় বাধা সৃষ্টি করে একথা তাহাকে বর্জন করিবার যুক্তি-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না; কেননা অদৃশ্য ভগবদ্ বিধানে আমাদের প্রবলতম বাধাই আমাদের সর্ব্বোত্তম সুযোগ। প্রবল বাধা আমাদের নিকট প্রকৃতির নির্দ্দেশ যে আমাদিগকে এক পরম বিজয় অর্জন এবং এক চরম সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, জড় ভাবকে অমোচনীয় পাশ বলিয়া তাহাকে পরিহার অথবা আমাদের পক্ষে অজেয় প্রবল শত্রু বলিয়া তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেই হইবে, প্রকৃতির ইহা নির্দ্দেশ নয়।

প্রাণ এবং স্নায়ুর শক্তিরাজিও আমাদের মধ্যে অনুরূপ বৃহৎ উপযোগিতা সাধনের জন্যই রহিয়াছে; আমাদের চরম পরিপূর্ণতার মধ্যে তাহারাও তাহাদের সম্ভাবনাসমূহের দিব্য উপলব্ধি দাবী করে। বিশ্ব পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের এই অঙ্গের উপর যে মহৎ কার্য্যভার অর্পন করা হইয়াছে উপনিষদের উদার জ্ঞান তাহা বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিয়াছে। "রথচক্রের নাভিতে শলাকাসমূহের ন্যায় এই প্রাণেই তিন বেদ বা ত্রিবিদ্যা, যজ্ঞ, সবলের শক্তি, জ্ঞানীর পবিত্রতা প্রভৃতি সবকিছু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ত্রিদিবে যাহা কিছু অবস্থিত আছে তাহা সমস্তই প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।"* সুতরাং যাহা এই সমস্ত স্নায়ুর শক্তিকে ধ্বংস করে, তাহাদিগকে নিশ্চলতায় পরিণত হইতে বাধ্য করে, অথবা অনিষ্টকর ক্রিয়াবলীর উৎপত্তিস্থান মনে করিয়া তাহাদিগের মূলোৎপাটন করে তাহা পূর্ণযোগ নয়; তাহাদের ধ্বংস নয়—শুদ্ধি, তাহাদিগের নিয়ন্ত্রণ, রূপান্তর এবং ব্যবহারই উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বিবর্ত্তনের ধারায় প্রকৃতি তাহার ভিত্তিভূমি এবং প্রথম সাধনযন্ত্ররূপে আমাদের জন্য শারীরিক জীবন যদি দৃঢ়ভাবে গঠিত করিয়া থাকে তবে তাহার পরবর্ত্তী সাক্ষাৎ লক্ষ্য এবং উচ্চতর যন্ত্ররূপে আমাদের মনোময় জীবনকে

* প্রশ্ন উপনিষদ (২/৬, ১৩)

বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার সাধারণ সমুন্নতির সময় ইহাই তাহার উচ্চ অভিনিবেশকর ভাবনা ; যখন সে অবসন্ন হইয়া পড়ে, বিশ্রাম লাভ করিবার এবং পুনরায় সতেজ ও সবল হইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত হয় সেই সমস্ত সময় ছাড়া যখনই সে প্রাণ ও দেহের প্রাথমিক সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্ত হয় তখন ইহাই তাহার সর্ব্বদা অনুসরণের বিষয় হইয়া উঠে। কেননা এখানে মানুষের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য আছে যাহা পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। তাহার মধ্যে যে শুধু একপ্রকার মননশীলতা আছে তাহা নয়, তাহার দুইটি এমনকি তিনটি মন আছে, প্রথম আছে জড়ময় স্নায়বিক মন, দ্বিতীয়টি হইল শুদ্ধবুদ্ধিময় মন যাহা দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রান্তি সকল হইতে নিজেকে মুক্ত করে, তৃতীয় তাহার বুদ্ধির উপরে এক দিব্য মন আছে যাহা আবার বিশেষত্বজ্ঞাপক এক কল্পনাপ্রবণ বিচারবুদ্ধির সকল অপূর্ণ বিভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখে। মানুষের মন প্রথমত দৈহিক জীবনের জালে বিজড়িত থাকে, উদ্ভিদ-জীবনে মন পূর্ণ সংবৃত এবং পশুর মন সর্ব্বদা অবরুদ্ধ। মন এই প্রাণকে তাহার ক্রিয়াবলির প্রাথমিক দশা বলিয়া যে শুধু গ্রহণ করে তাহা নহে, তাহার সমগ্র অবস্থা বা গতির সহিত ইহা জড়ীভূত হইয়া থাকে এবং এমনভাবে নিজের প্রয়োজন সাধনের চেষ্টা করে যেন তাহাই তাহার সত্তার পরিপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু মানুষের দৈহিক জীবন তাহার এক ভিত্তি, তাহার লক্ষ্যবস্তু নহে, ইহা তাহার প্রাথমিক অবস্থা, তাহার শেষ গতি-পথনির্দ্ধারক নহে। প্রাচীনগণের যথাযথ ধারণায় মানুষ মূলতঃ ভাবুক, মনু, মনোময় সত্তা, সে প্রাণ ও দেহের নেতা,* তাহাদের দ্বারা চালিত পশু নয়। সুতরাং প্রকৃত মানব জীবন কেবল তখনই আরম্ভ হয় যখন বুদ্ধিপ্রধান মননশীলতা জড়ভাব হইতে বাহির হইয়া আসে এবং আমরা স্নায়বিক ও দৈহিক আবেশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মনে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে বাস করিতে থাকি এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিমাণ অনুসারে দৈহিক জীবন যথাযথভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে পারি। কেননা কর্ম্মকুশল অধীনতা স্বীকার নয়, স্বাধীনতাই প্রভুত্ব লাভের উপায়। বাধ্য হইয়া নয় বরং স্বাধীনভাবে দৈহিক সত্তার প্রসারিত এবং উর্দ্ধায়িত অবস্থাবলি গ্রহণ করাই মানুষের উচ্চ আদর্শ।

এইভাবে মানুষের মধ্যে যে মনোময় জীবন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে বস্তুতঃ সকল মানুষ তাহার উপর সমান অধিকার পায় নাই। বাস্তবিক পরি-দৃশ্যমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে ইহা পূর্ণতমরূপে যেন কেবল কতিপয়

* "মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা"- -মুণ্ডকোপনিষদ (২।২।৭)

ব্যক্তির মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং মানবজাতির বহুসংখ্যকের এমন কি অধিকাংশের পক্ষে যেন এখনও মনোময় জীবন তাহাদের সাধারণ প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র ঈষদ্‌গঠিত অংশমাত্র অথবা তাহা একেবারেই অভিব্যক্ত হয় নাই অথবা গুপ্ত ও সুপ্তভাবে আছে যাহাকে সহজে সক্রিয় করিয়া তোলা যায় না। ইহা নিশ্চিত যে প্রকৃতির মধ্যে মনোময় জীবনের পরিণতি সমাপ্ত হইয়া যায় নাই; মানবরূপী পশুর মধ্যে ইহা এখনও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার নিদর্শন এই যে প্রাণশক্তি এবং জড়ের মধ্যে সুন্দর ও পূর্ণ সাম্য এবং প্রকৃতিস্থ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী মনুষ্যদেহ সাধারণতঃ কেবল সেই সমস্ত জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যাহারা চিন্তার চেষ্টা এবং তজ্জনিত উদ্বেগ ও উত্তেজনা বর্জন করিয়া চলিতে অথবা শুধু স্থূল মনদ্বারা ভাবিতে অভ্যস্ত। সভ্যমানুষের পক্ষে তাহার পূর্ণক্রিয়াশীল মন ও দেহের মধ্যে সাম্য স্থাপনের প্রয়োজন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, সাধারণ অবস্থায় এখনও সে তাহা লাভ করে নাই। বস্তুতঃ তীব্রতর ভাবে মনোময় জীবন যাপনের অধিকতর চেষ্টার ফলে অনেকসময় যেন মানুষের দৈহিক উপাদান সকলের মধ্যে অধিকতর ভাবে এমন অসাম্য সৃষ্টি হয় যাহাতে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে একথা বলা সম্ভব হইয়াছে যে প্রতিভা উন্মত্ততারই এক প্রকারভেদ, শারীরিক ক্ষয় বা বিকৃতির ফল, নিদানের ভাষায় প্রকৃতির এক রুগ্নাবস্থা। এই অতিরঞ্জনকে সমর্থন করিবার জন্য যে সমস্ত ঘটনা বা ব্যাপার ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে পৃথকভাবে না লইয়া অন্য সকল প্রাসঙ্গিক তথ্যের সহিত একত্রে বিচার করিলে তাহারা অন্য এক পৃথক সত্যের দিকেই নির্দ্দেশ করে। যাহারা অতিমানস বা দিব্যমনের খেলার উপাদান, অধিকতর বীর্য্যশালী, সাক্ষাৎভাবে ও দ্রুততররূপে ক্রিয়াশীল সেই বৃত্তিসকলের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি যাহাতে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য বুদ্ধির বীর্য্যরাজিকে প্রদীপ্ত ও প্রগাঢ় করিবার জন্য বিশ্বশক্তির যে প্রচেষ্টা আছে তাহার নাম প্রতিভা। তাহা হইলে যাহা ব্যাখ্যা করা যায় না ইহা প্রকৃতির তেমন এক খেয়াল নহে, কিন্তু প্রকৃতি-পরিণামের যথার্থ পথের পূর্ণরূপে স্বাভাবিক পরবর্ত্তী পদক্ষেপ। প্রকৃতি দৈহিক জীবন এবং স্থূল মনের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে, সে এখন সেই জীবন ও বুদ্ধিময় মননের সামঞ্জস্য বিধানে রত আছে, সে জন্য পূর্ণ প্রাণশক্তি ও সজীবতা কতকটা মন্দীভূত করিবার দিকে একটা প্রবণতা দেখা দিলেও, সক্রিয় কোন বিপর্য্যয় সৃষ্টি হয় না বা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনও হয় না। আরও উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছিবার চেষ্টায় প্রকৃতি ইহাকেও অতিক্রম করিয়া দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ক্রিয়া-পদ্ধতিতে যে পরিমাণে বিপর্য্যয়সকল সৃষ্টি হয় বলিয়া

প্রায়ই বর্ণিত হয় বাস্তবিকপক্ষে তাহার পরিমাণ তত বেশী নহে। তাহাদের কতকগুলি নূতন প্রকাশের অপরিণত প্রারম্ভ; অপর কতকগুলি সহজ সংশোধনযোগ্য ভাঙ্গনের ক্রিয়া যাহার ফলে প্রায়ই নব নব ক্রিয়াধারা দেখা দেয় এবং প্রকৃতির দৃষ্টিপথে যে সুদূর লক্ষ্য রহিয়াছে তাহার জন্য যে স্বল্পমূল্য অবশ্য-দেয় ইহা তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা হয়ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিব যে মানুষের মধ্যে মনোময় জীবনের আবির্ভাব আধুনিক ঘটনা নহে, মানুষ পূর্ব্বেই তাহা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মানবজাতির মধ্যস্থিত বিশ্বশক্তি শোচনীয়ভাবে যতবার স্খলিত হইয়া পড়িযাছে তাহার অন্যতম হইল মনোময় জীবনেব অধঃপতন, বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে আবার সে-জীবনের দ্রুত পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। বর্ব্বর মানুষ হয়ত সভ্য মানুষেব প্রথম পূর্ব্বপুরুষ ততটা নয় যতটা সে পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতাব অধঃপতিত বংশধব। কেননা মননেব ক্ষেত্রে মানবজাতি বস্তুতঃ যাহা লাভ করিযাছে তাহা মানুষের মধ্যে অসমানভাবে ছড়ানো রহিয়াছে বটে কিন্তু মনোময় জীবন লাভের সামর্থ্য সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে মানবের যে জাতি সভ্যতাব নিম্নতম স্তরে অবস্থিত—যেমন মধ্য আফ্রিকার চিরন্তন বর্ব্বরতার মধ্যস্থ নিগ্রোজাতি—বলিয়া আমাদের দ্বারা বিবেচিত হইযাছে, তাহার মধ্য হইতে নবাগত কোন ব্যক্তির মধ্যে সভ্য-জাতির সহিত রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটা সত্ত্বেও বুদ্ধিগত সংস্কৃতি লাভ করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে, এবং এজন্য তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎ পুরুষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই; যদিও সে-সংস্কৃতি প্রভাবশালী ইউরোপীয় বুদ্ধির উৎকর্ষের সমতুল্য হয় নাই। এমন কি এই জাতীয় সাধারণ লোকও অনুকূল পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হইলে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এতটা অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, যাহার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর লাগিতে পারিত। তাহা হইলে হয় মনোময় সত্তা হওয়ার বিশেষ অধিকারের জন্য পরিণাম ধারার বিলম্বকর বিধানসকলের পূর্ণ ভার হইতে মানুষকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, নতুবা বলিতে হইবে যে বাস্তব জীবনের ক্রিয়াসকলের জন্য অত্যাবশ্যক সামর্থ্যের এক উচচ ভূমিতে মানুষ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত আছে এবং অনুকূল অবস্থা ও যথাযথ উত্তেজক পরিবেশের মধ্যে পড়িলে তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইতে পারে। মানসিক অসামর্থ্য নয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী সুযোগের বর্জন বা তাহা হইতে দূরে অবস্থান এবং উদ্বোধক অভিঘাত বা আবেগের অপসরণই বর্ব্বরতা সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ব্বরতা মধ্যবর্ত্তী কালের নিদ্রা, আদিম অন্ধকার নহে।

তাহা ছাড়া পর্য্যবেক্ষকের চক্ষুতে ধরা পড়ে যে মানুষের মধ্যে প্রকৃতিরই

এক বৃহৎ সচেতন সাধনা তাহার সমগ্র বর্ত্তমান চিন্তাধারায় এবং বর্ত্তমান চেষ্টার মধ্যে এমন এক উন্মুখতা বা গতি আনিয়াছে যাহা তাহার সাধারণ বুদ্ধির সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া তাহার সামর্থ্য বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ফুটাইয়া দিয়া সকল মানুষকে মননশীলতার উৎকর্ষের একটা সাধারণ ভূমিতে লইয়া যাইতে চাহিতেছে ; বর্ত্তমান সভ্যতা মনোময় জীবন গঠনের স্থযোগ ও স্থবিধা সর্ব্বজনীন করিয়া দিয়াই ইহার উপায় বিধান করিয়াছে। এমন কি এই গতি বা প্রবণতার প্রধান নায়ক ইউরোপীয বুদ্ধির পক্ষে জড়প্রকৃতি এবং জীবনের বহির্ম্মুখী ব্যাপারসমূহের উপর অভিনিবেশও এই সাধনার আবশ্যক অংশ। এই সাধনা মানুষের জড়ময় সত্তায়, তাহার প্রাণশক্তিসমূহের এবং জড়ীয় গতিবৃত্তিতে তাহার পরিপূর্ণ মনোময় সম্ভাবনাসকলের একটা উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তুত করিতে চাহিতেছে। শিক্ষাবিস্তার, অনুন্নত জাতি ও শ্রেণীসকলের উন্নয়ন, শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রসমূহের বহুল ব্যবহার, আদর্শ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে অগ্রগতি, সভ্যজাতির মধ্যে সমুন্নত স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন এবং স্থগঠিত দেহ লাভের জন্য জড় বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা—এই সমস্ত দ্বারা এই বৃহৎ গতির তাৎপর্য্য এবং উদ্দেশ্য সহজবোধ্য নিদর্শনের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইতেছে। যথাযথ বা অন্ততঃ পক্ষে চরম উপায় সব সময় হয়ত প্রয়োগ করা হইতেছে না, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য প্রাথমিক হিসাবে যথার্থই বলিতে হইবে—সে উদ্দেশ্য ব্যষ্টি ও সমাজের সুস্থ নিরাময় দেহগঠন, স্থূল মনের বিধি সঙ্গত প্রয়োজন এবং দাবির পরিতৃপ্তিসাধন, সকলকে যথেষ্ট পরিমাণে আরাম ও বিশ্রাম, সমান স্থযোগ ও স্থবিধা দান, যাহার ফলে আর বিশেষ অনুগৃহীত জাতি, শ্রেণী বা ব্যক্তি শুধু নহে কিন্তু সমগ্র মানবজাতি স্বাধীনভাবে তাহাদের অন্তঃকরণ ও বুদ্ধিকে তাহাদের পূর্ণ সামর্থ্য পর্য্যন্ত পরিণত করিয়া তুলিতে পারিবে। বর্ত্তমান সময়ে জড়গত এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু উচ্চতর ও বৃহত্তর ভাবাবেগ সর্ব্বদা তাহার পশ্চাতে ক্রিয়া করিতেছে অথবা সংরক্ষিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

যখন প্রাথমিক সর্ত্তসকলের পরিপূরণ হইবে, যখন এই বৃহৎ প্রচেষ্টা তাহার ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করিবে তখন বুদ্ধিময় জীবনের ক্রিয়াধারাসকলকে যাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে সেই পরবর্ত্তী সম্ভাবনার প্রকৃতি কি হইবে ? বস্তুতঃ মনই যদি প্রকৃতির উচ্চতম বস্তু হয়, তাহা হইলে বিচারশীল ও কল্পনাপরায়ণ বুদ্ধির পূর্ণ পরিণতি এবং আবেগ ও সূক্ষ্মবোধবৃত্তির স্থসমঞ্জস পরিতৃপ্তিকেই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু

পক্ষান্তরে মানুষ যদি বিচারশীল ও আবেগময় পশু হইতে অধিক কিছু হয়, যাহা উন্মিষিত এবং পরিণত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন কিছুকে যদি উন্মিষিত করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে মনোময় জীবনের পূর্ণতা, বুদ্ধির নমনীয়তা, সাবলীলতা এবং বিশাল সামর্থ্য, হৃদয়াবেগ ও রস-বোধের সুসংযত সমৃদ্ধি হয়তো উচ্চতর এক জীবন এবং অধিকতর শক্তিশালী বৃত্তিসকল গঠনের দিকে চলিবার পথে এক অবস্থানমাত্র : সে জীবন সে বৃত্তিকে এখনও প্রকাশিত হইয়া উঠিতে এবং নিম্নতর যন্ত্রসকলকে অধিকার করিয়া লইতে হইবে—ঠিক যেমন মন নিজেও দেহকে এমনভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছে যে দৈহিক সত্তা এখন আর কেবল নিজের তৃপ্তিসাধনের জন্য জীবন ধারণ করে না কিন্তু এক উচ্চতর ক্রিয়াধারার ভিত্তির জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সকল সরবরাহ করে।

ভারতীয় দর্শনের সমগ্র ভিত্তিরূপে মনোময় হইতে বৃহত্তর এক জীবনের কথা দৃঢ়রূপে বলা হইয়াছে, এবং সে জীবনকে অর্জন ও সুনিয়ন্ত্রণ করাই যোগ-পন্থা সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মন পরিণামধারার শেষ কথা বা তাহার চরম লক্ষ্য নহে, কিন্তু দেহের মত মনও একটা সাধন যন্ত্র। এমন কি যোগের ভাষায় মনকে অন্তরের করণ বা সাধন-যন্ত্র এই অর্থে "অন্তঃকরণ" শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। আবার ভারতীয় ঐতিহ্য বলে যে এই যাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে মানুষের অভিজ্ঞতায় তাহা নূতন বস্তু নহে, ইহা পূর্ব্বেই উন্মিষিত এবং গঠিত হইয়াছে এমন কি পরিণতিধারার মধ্যে ইহাই কোন না কোন সময়ে মানবজাতিকে পরিচালিত করিয়াছে। সে যাহা হউক না কেন, যখন প্রাচীনেরা ইহার কথা বলিয়াছেন তখন একসময় ইহার অন্ততঃ আংশিক প্রকাশ অবশ্যই ঘটিয়াছিল। সেই যে উচ্চ অবস্থা লাভ হইয়াছিল তাহা হইতে প্রকৃতি যদি নামিয়া পড়িয়া থাকে তাহার কারণ খুঁজিলে দেখা যাইবে যে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয় নাই, তখন জড়ময় ও বুদ্ধি-ময় ভিত্তি অপ্রচুর ছিল, নিম্নতর জীবনের ক্ষতিসাধন করিয়া উচ্চতর জীবনের বৈশিষ্ট্য মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল, এখন আবার প্রকৃতি সেই ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহা হইলে যে উচ্চতর বা উচ্চতম জীবনের দিকে পরিণামধারার উন্মুখতা রহিয়াছে তাহা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে এমন এক শ্রেণীর পরম অনুভূতির কথা বলিতে হইবে, এমন এক প্রকার অপ্রচলিত ধারণাসকল লইয়া আলোচনা করিতে হইবে যাহা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নির্ভুলরূপে বর্ণনা করা অত্যন্ত দুরূহ, কেবল

সংস্কৃত ভাষাতেই এ সমস্ত বস্তু কতকটা প্রণালীবদ্ধ করা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় যে সমস্ত শব্দ এ সমস্তের কাছাকাছি যায় তাহাদের সহিত অন্যভাব সকলের এরূপ সাহচর্য্য আছে যে তাহাদের ব্যবহারে অনেক ভুল—এমন কি গুরুতর ভুল—দেখা দিতে পারে। যোগের পরিভাষায় বলে যে আমাদের জড় ও প্রাণময় সত্তার এক স্থিতি বা অবস্থা আছে যাহাকে স্থূল দেহ বলা হয় যাহা শুধু অন্নকোষ এবং প্রাণকোষের উপাদানে গঠিত, দ্বিতীয়তঃ মনোময় সত্তার এক স্থিতি আছে যাহার নাম সূক্ষ্মদেহ, যাহা একমাত্র মনোময় কোষের উপাদানে গঠিত ; তাহা ছাড়া তৃতীয় অতিমানসসত্তার দিব্য ও পরম এক স্থিতি আছে যাহাকে কারণ-দেহ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞান ও আনন্দনামে বর্ণিত চতুর্থ ও পঞ্চম কোষের উপাদান দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই বিজ্ঞান, মনের জিজ্ঞাসা ও যুক্তিবিচারের প্রণালীবদ্ধ পরিণামে বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত ও মতামত সকলকে উচ্চতম সম্ভাবনাগুলির ভাষায় সাময়িকভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া তুলিবার ফলে যে লাভ হইয়াছে তাহা নহে, বরং ইহা স্বয়ম্ভূ বা আপনাতে আপনি বর্ত্তমান ও আত্ম-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক সত্য। আর এই আনন্দ হৃদয়ের ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির তেমন এক পরম সুখকর অবস্থা নহে যাহার পশ্চাতে পটভূমিকারূপে দুঃখ যন্ত্রণার অনভূতি বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু ইহাও স্বয়ম্ভূ এক আনন্দ যাহা কোন বস্তু বা কোন বিশেষ অনুভূতির উপরে নির্ভর করে না, সুতরাং তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র, তাহা আত্মার এক আনন্দ যাহা সর্ব্বাতীত ও অনন্ত এক সত্তারই যেন নিজস্ব প্রকৃতি, নিজস্ব উপাদান।

এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ধারণাসকলের অনুরূপ কোন সত্য এবং সম্ভবপর বস্তু আছে কি ? সমস্ত যোগই জোরের সহিত তাহার চরম অনুভূতি এবং পরম লক্ষ্যরূপে তাহাদের কথা উল্লেখ করে। তাহাদের দ্বারাই আমাদের চেতনার সম্ভবপর উচ্চতম অবস্থার এবং আমাদের সত্তার উদারতম বিস্তারের পরিচালক তত্ত্বসকল গঠিত। মনের মধ্যে তিনটি উচ্চতর বৃত্তির স্ফুরণ হয় :—অলৌকিক উপায়ে সত্যের স্বতঃপ্রকাশ (revelation), অনুপ্রেরণা (inspiration) এবং বোধি (intuition) ; মোটামুটি ভাবে এই সকল বৃত্তির অনুরূপ পরাবৃত্তিসকল আছে এবং আমরা বলি তাহাদের সামঞ্জস্যও আছে, কিন্তু ইহারা বোধিময় বিচারবুদ্ধি বা দিব্য মনে ক্রিয়া করে না, পরন্তু তাহাদের ক্রিয়া চলে আরও এক উচ্চতর ভূমিতে ; এই পরমাবৃত্তিগুলি সাক্ষাৎভাবে সত্যকে দেখে অথবা বরং বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত এই উভয় সত্যের মধ্যে বাস করে, তাহারা সেই সত্যেরই রূপায়ণ এবং জ্যোতির্ম্ময় ক্রিয়াধারা। এই বৃত্তিগুলি এক চৈতন্যময় সত্তার আলোক, যে সত্তা অহংগত সত্তাকে অতিক্রম করিয়া

বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীতরূপে বর্ত্তমান আছে, আনন্দ তাহার প্রকৃতি। এ সমস্ত স্পষ্টতঃ দিব্য এবং বর্ত্তমানে মানুষ পরিদৃশ্যমান ভাবে যে রূপে গঠিত এ সকল তাহার পক্ষে চেতনা ও ক্রিয়াধারার অতিমানুষী অবস্থা। এক বিশ্বাতীত সত্তা, আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দ এই ত্রৈকতত্ত্ব বা সচ্চিদানন্দই বস্তুতঃ পরমাত্মার দার্শনিক বিবরণ, যিনি অজ্ঞেয় তাঁহাকে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা অথবা বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্বগত পরমপুরুষ যে রূপেই ধারণা করি না কেন সচ্চিদানন্দ আমাদের জাগ্রত প্রজ্ঞার নিকট তাঁহারই আত্মরূপায়ণ। কিন্তু যোগে এই ত্রয়ীকে আন্তর চেতনার বিভাব সকলের মধ্যে অন্তর্মুখী চৈতন্যময় বা আত্মকেন্দ্রিক সত্তার (subjective existence) বিভাব বা অবস্থা রূপেও দেখা হয়, এই অবস্থা সকল আমাদের বর্ত্তমান জাগ্রতচেতনার পক্ষে বিজাতীয় কিন্তু তাহারা আমাদের মধ্যেই এক অতিচেতন ভূমিতে বাস করে সুতরাং তাহাতে আমরা সর্ব্বদা উঠিতে পারি।

পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য তুলনা করিলে যেমন স্থূল বা সূক্ষ্মদেহকে করণ বা যন্ত্র বলিতে পারা যায় তেমনি কারণ-দেহ নাম দ্বারা উপলক্ষিত এই চূড়ান্ত অভিব্যক্তিই, বাস্তব পরিণামধারার মধ্যে যাহা কিছু তাহার পূর্ব্বে উন্মিষিত বা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উৎপত্তিস্থান এবং কার্য্যকরী শক্তি। বস্তুতঃ আমাদের মানসিক ক্রিয়াধারা সকল অন্য বস্তু হইতে উদ্ভূত ও নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের গোপন মূল উৎসস্বরূপ এই সত্য বস্তু হইতে পৃথক্ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা দিব্য জ্ঞানের এক বিকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ভাবাবেগের সহিত আনন্দের, আমাদের স্নায়বিক শক্তি ও ক্রিয়ার সহিত ইচ্ছাশক্তির বা দিব্য চেতনা যে শক্তি-রূপ ধারণ করিয়াছে সেই বিভাবের, আমাদের ভৌতিক সত্তার সহিত সেই আনন্দ ও চেতনার মূলীভূত শুদ্ধ সদ্বস্তুর ঠিক তেমনি একই (মনের সহিত তাহার মূল যে সত্য তাহার মত একই প্রকার) সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে পরিণাম ধারা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি এবং পার্থিব প্রকৃতিতে মানুষ যাহার শার্ষ স্থানীয়, তাহাকে এক অর্থে এক বিলোম বা বিপরীত প্রকাশ মনে করা যাইতে পারে, এ প্রকাশের সাহায্যে এই সমস্ত শক্তি তাহাদের একত্ব এবং বৈচিত্র্য দ্বারা মিলিত হইয়া বা পৃথক থাকিয়া জড়, প্রাণ ও মনের অপূর্ণ মূল উপাদান ও ক্রিয়াধারা সকলকে এমনভাবে ব্যবহার করে, এমনভাবে তাহাদিগকে পরিণত, পরিস্ফুট ও পূর্ণ করিয়া তোলে যাহাতে তাহারা যাহা হইতে জাত হইয়াছে সেই দিব্য এবং শাশ্বত অবস্থা সকলের সামঞ্জস্য, পরিবর্ত্তনশীল আপেক্ষিকতার মধ্য দিয়া, ক্রমশঃ অধিকতররূপে প্রকাশিত করিতে পারে।

ইহাই যদি বিশ্বের সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্বের যাহা কারণ বা উৎপত্তিস্থান তাহাই পরিণামধারার চরম লক্ষ্য, ইহা সেই সদ্‌বস্তু যাহা বিশ্বের সকল উপাদানের মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতেই মুক্ত হইতেছে। কিন্তু মুক্তি নিশ্চয়ই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে যদি মুক্তির অর্থ শুধু পলায়ন হয় এবং যে সকল বস্তু ও ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহা অন্তর্নিহিত ছিল তাহাদের উপর ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে যদি উন্নীত ও রূপান্তরিত না করে। যদি পরিণামে এই রূপান্তরসাধন না হয় তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত থাকিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের মন যদি দিব্য আলোকের জয়শ্রীধারণে সমর্থ হয়, তাহার ভাবাবেগ এবং রস-চেতনা যদি পরমানন্দের ছাঁচে রূপান্তরিত হয় এবং তাহার পরিমাণ ও গতি পরিগ্রহ করে, মানুষের ক্রিয়া যদি এক নিরহঙ্কার দিব্য শক্তিকে ব্যক্ত করে এবং নিজেকে তাহারই এক গতি বলিয়া অনুভব করে, যদি আমাদের সত্তার জড় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে উর্দ্ধস্থ সদ্বস্তুর বিশুদ্ধির অংশ গ্রহণ করে এবং তাহা এই সমস্ত উচচতম অনুভূতি এবং কার্য্যসাধিকা শক্তিকে ধারণ ও প্রবর্দ্ধন করিবার জন্য যদি নমনীয়তার সহিত স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয়তার যথাযথভাবে মিলনসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃতির সুদীর্ঘ সাধনা বিজয়ী এক সার্থকতার মধ্যে শেষ হইবে এবং তাহার পরিণামধারা তাহাদের গভীর তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিবে।

এই পরম জীবনের একটা আভাস বা ঈষৎ স্ফুরণও এরূপ অপরূপ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সম্পদে বিভূষিত, তাহার আকর্ষণ এমন দুর্বার ও মনপ্রাণবিমোহন যে একবার এ অনুভূতি লাভ করিলে আমরা বোধ করি ইহাকে অনুসরণ করিতে গিয়া অন্য সব কিছুকে সহজেই উপেক্ষা করিতে পারি। এমন কি যাহা সব কিছু মনের মধ্যে দেখিতে অভ্যস্ত এবং মনোময় জীবনে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট থাকাই যাহার আদর্শ তাহার বিপরীত এক অবস্থায় অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়া মানুষ মনকে এক অযোগ্য বিকৃতি এবং পরম বাধা বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করে, মনে করে মনই মায়াময় বিশ্বের উৎপত্তিস্থান, মনই সত্যের নিষেধ বা অস্বীকৃতি এবং আমরা যদি চরম মুক্তি চাই তবে মনকে অস্বীকার করিতে, তাহার সকল কর্ম্ম ও ফলকে লয় করিতে হইবে। কিন্তু ইহা একটি অর্দ্ধসত্য, মনের বর্ত্তমান সীমাসমূহে অভিনিবিষ্ট হইবার এবং তাহার দিব্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিবার ফলেই ইহার মধ্যে ভ্রম দেখা দেয়। তাহাই চরম জ্ঞান যাহা ঈশ্বরকে যেমন জগতের মধ্যে তেমনি জগদতীত অবস্থায় অনুভব ও স্বীকার করে, তদ্রূপ তাহাই পূর্ণযোগ যাহা জগদতীত সত্তাকে

উপলব্ধি করিয়া বিশ্বে ফিরিয়া আসিতে এবং তাহাকে অধিকার করিতে পারে এবং সত্তার সুবৃহৎ সোপানাবলী দিয়া স্বাধীনভাবে আরোহণ এবং অবরোহণ এই উভয়ের শক্তি ধারণ করে। কেননা শাশ্বত প্রজ্ঞা যদি আদৌ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে মননরূপী বৃত্তির নিশ্চয়ই কোন মহৎ ব্যবহার এবং উচচ নিয়তি আছে। মনের সে ব্যবহার, আরোহণ এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে তাহার যে স্থান আছে তাহার উপর নির্ভর করিবে এবং সে নিয়তি হইবে তাহাকে পরিপূর্ণ ও রূপান্তরিত করা, তাহার বিলোপ সাধন বা মূলোৎপাটন করা নহে।

তাহা হইলে প্রকৃতির এই তিনটি সোপান দেখিতেছি: প্রথম, এক দৈহিক জীবন যাহা এখানে এই জড়জগতে আমাদের সত্তার ভিত্তি; দ্বিতীয় এক মনোময় জীবন, যাহার মধ্যে আমরা উন্মিষিত হইয়াছি, যাহার দ্বারা দৈহিক জীবনকে আমরা উচচতর ব্যবহারে উন্নীত এবং তাহাকে এক বৃহত্তর পূর্ণতার মধ্যে প্রসারিত করিতে পারি; তৃতীয় এক দিব্যজীবন যাহা যেমন অন্য দুই জীবনের লক্ষ্য তেমনি সেই দুই জীবনকে তাহাদের উচচতম সম্ভাবনার মধ্যে মুক্তি দিবার জন্য তাহাদের উপর ফিরিয়া আসে। ইহাদের কোনটিকেই আমাদের সাধ্যের বাহিরে বা আমাদের প্রকৃতির নিম্নে অবস্থিত মনে না করিয়া এবং চরম সিদ্ধিতে ইহার কোনটির ধ্বংস অবশ্যকরণীয় এ চিন্তা পোষণ না করিয়া আমরা এই মুক্তি এবং সার্থকতা যোগের লক্ষ্যের একটা অংশ এবং অন্ততঃ একটি বৃহৎ ও অতি প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া স্বীকার করি।

৩

ত্রিবিধ জীবন

তাহা হইলে প্রকৃতি এক শাশ্বত এবং গোপন সত্তার ক্রমাভিব্যক্তি বা ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশ, তাহার উর্দ্ধারোহণের তিনটি সোপানরূপে পরম্পরা-ক্রমে অবস্থিত তিনটি রূপ আছে, আমাদের সকল কর্ম্মের দশা বা অবস্থারূপে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এই তিনটি সম্ভাবনা রহিয়াছে; প্রথম দৈহিক সত্তা, দ্বিতীয় মনোময় সত্তা এবং তৃতীয় গোপন অধ্যাত্মসত্তা সংবৃতিতে যাহা অপর দুইটির কারণ এবং বিবৃতি বা পরিণতিতে যাহা তাহাদের পরিণাম। দৈহিক সত্তার রক্ষণ এবং পূর্ণতাসাধন করিয়া মনোময় সত্তাকে পরিপূর্ণ ও সার্থক

করিয়া তুলিয়া প্রকৃতির লক্ষ্য রহিয়াছে—এবং আমাদেরও সেই লক্ষ্য হওয়া উচিত—পরিপূর্ণ দেহ ও মনের মধ্যে চিৎপুরুষের বিশ্বাতীত ক্রিয়াধারা সকলকে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করা। মনোময় জীবন দৈহিক জীবনের বিলোপ করে নাই, কিন্তু তাহাকে উন্নীত এবং আরও উত্তম রূপে ব্যবহার করিবার জন্য ক্রিয়ারত আছে, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জীবন মনোময় জীবনের বিলোপসাধন করিবে না কিন্তু আমাদের মনের, ভাবাবেগের, রসচেতনার এবং প্রাণের ক্রিয়াবলিকে রূপান্তরিত করিবে।

কারণ, যে পার্থিব প্রকৃতির শীর্ষ স্থানীয়, একমাত্র যাহার জাগতিক দেহের মধ্যে প্রকৃতির পরিপূর্ণ পরিণতি সম্ভবপর সেই মানুষের জন্ম তিনটি। তাহাকে একটা জীবন্ত কাঠামো দেওয়া হইয়াছে, যাহার মধ্যস্থ দেহ এক দিব্য প্রকাশের আধার এবং প্রাণ তাহার সক্রিয় সাধন। তাহার ক্রিয়াধারা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এক ক্রমোন্নতিশীল মনে, সে মনের লক্ষ্য নিজের এবং যে গৃহে সে বাস করে তাহার এবং যাহাকে উপায় স্বরূপ সে ব্যবহার করে সেই প্রাণের পূর্ণতা সাধন, আবার যে মন আত্মোপলব্ধির দ্বারা ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে নিজের স্বরূপে, চিৎপুরুষের এক রূপে উদ্‌বুদ্ধ হইতে সমর্থ। মানুষ তাহার পরিণতির পরাকাষ্ঠা যখন লাভ করে তখন সে সর্ব্বদা যে প্রোজ্জ্বল পরমানন্দময় চিৎসত্তা ছিল তাহাই হইয়া যায়; এই চিদাত্মাই অবশেষে তাহার বর্ত্তমানে-গোপন গৌরবশ্রীদ্বারা জীবন এবং মনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন ইহাই দিব্য অভিপ্রায়।

মানুষের মধ্যে ইহাই দিব্যশক্তির পরিকল্পনা বলিয়া আমাদের জীবনের সমগ্র পদ্ধতি এবং লক্ষ্যকে আমাদের সত্তার এই তিন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়। প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের পৃথক রূপায়ণের ফলে মানুষ সাধারণ জড়ময় জীবন, মনোময় ক্রিয়া ও প্রবৃত্তির জীবন এবং অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দঘন আধ্যাত্মিক জীবন এই তিন প্রকার জীবনের কোন একটিকে বাছিয়া লইতে পারে। কিন্তু যেমন সে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে সে এই তিন জীবনের মিলন সাধন করিতে, তাহাদের বিরোধ দূর করিয়া তাহাদিগকে সামঞ্জস্যের এক ছন্দে বাঁধিতে এবং নিজের মধ্যে সমগ্র দেবতা, পূর্ণ মানবকে সৃষ্টি করিতে পারে।

সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে এ তিন জীবনের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক এবং পরিচালক আবেগ বা প্রবৃত্তি আছে।

দৈহিক জীবনের বিশিষ্ট শক্তি যতটা স্থিতিশীল ততটা প্রগতিশীল নহে; ব্যষ্টিজীবনে তাহা যতটা আত্মপুনরাবৃত্তি চায়, আত্মপ্রসারণ ততটা চায় না।

বস্তুতঃ কিন্তু জড় প্রকৃতির মধ্যে এক জাতীয় প্রাণী হইতে অন্য জাতীয় প্রাণীতে, উদ্ভিদ হইতে পশুতে, পশু হইতে মানুষে একটা অগ্রগতি আছে ; কেননা অচেতন জড়ের মধ্যেও মনের ক্রিয়া আছে। কিন্তু বাস্তবে একবার এক ধরণের প্রকৃতিবিশিষ্ট জাতি অন্য সকল হইতে পৃথক হইয়া নির্দ্ধারিত রূপে দেখা দিলে পৃথ্বী জননী যেন সাক্ষাৎভাবে প্রধানতঃ অভিনিবিষ্ট হইয়া অবিরত পুনঃপুনঃ উৎপাদন দ্বারা সেই জাতিকে বজায় রাখিতে চাহেন। কারণ প্রাণ সর্ব্বদা অমরত্ব খোঁজে ; কিন্তু যে চেতনা বিশ্বসৃষ্টি করে তাহার মধ্যে, যেহেতু ব্যষ্টিরূপ অস্থায়ী এবং রূপের ধারণা বা প্রত্যয় স্থায়ী—কেননা সেখানে ইহার লোপ ঘটে না—অবিরামভাবে এইরূপ পুনঃপুনঃ উৎপাদনই কেবল একমাত্র সম্ভবপর জড়াত্মক অমরত্ব। তাই আত্মরক্ষা, আত্মপুনরাবৃত্তি, আত্মবহুলীকরণ অবশ্যম্ভাবীরূপে সকল জড়ময় সত্তার প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

পরিবর্ত্তন শুদ্ধ মনঃশক্তির বৈশিষ্ট্যসূচক ক্রিয়া, এবং যতই ইহা সুগঠিত এবং সমুন্নত হইতে থাকে ততই মনের এই বিধান, যাহা সে লাভ করে তাহাকে ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত বিস্তৃত সমুন্নত ও অধিকতরভাবে সুবিন্যস্ত করিবার দিকে লইয়া যায়, এবং এইভাবে সে ক্ষুদ্র ও সরল হইতে বৃহত্তর এবং জটিলতর পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। কেননা মন তাহার ক্ষেত্রে অনন্ত, প্রসারতায় সাবলীল বা নমনীয়, রূপায়ণে সহজেই বৈচিত্র্যপরায়ণ, এ বিষয়ে তাহার প্রকৃতি দৈহিক জীবন হইতে অন্যবিধ। তাই পরিবর্ত্তন আত্মপ্রসারণ এবং আত্মোন্নতির দিকে তাহার যথার্থ সহজ প্রবৃত্তি আছে। সে সীমাহীন আত্মোৎকর্ষে শ্রদ্ধাবান, প্রগতিই তাহার মূলমন্ত্র।

স্বয়ম্ভূ পূর্ণতা ও অপরিবর্ত্তনীয় আনন্ত্য চিদাত্মার স্বাভাবিক বিধান। নিজ স্বত্ব বা অধিকার বলেই তাহা সর্ব্বদা প্রাণের যাহা লক্ষ্য সেই অমরত্বের এবং মনের যাহা চরম উদ্দেশ্য সেই পূর্ণতার অধিকারী। আধ্যাত্মিক জীবনের পরমৈশ্বর্য্য হইল শাশ্বত বস্তুকে লাভ, এবং যাহা সর্ব্ববস্তুতে এবং সর্ব্ববস্তুর অতীত অবস্থায় একই থাকে, জগতে বা তাহার বাহিরে সর্ব্বত্র যাহা পরমানন্দময়, যাহার মধ্যে তাহা বাস করে তাহার রূপ ও ক্রিয়াধারা সকলের অপূর্ণতা ও সীমাবন্ধনের দ্বারা যাহা অপরামৃষ্ট, তাহার উপলব্ধি।

জীবনের এই তিনরূপের প্রত্যেকের মধ্যে প্রকৃতি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এই উভয়ভাবে ক্রিয়া করে ; কেননা শাশ্বত বস্তু ব্যষ্টি রূপায়ণে এবং সমষ্টি সত্তার মধ্যে তুল্যভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন—যে সমষ্টিসত্তা পরিবার সম্প্রদায় বা জাতি অথবা যাহা ততটা ভৌতিকবস্তু নহে এমন কোন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সংঘ অথবা সকল সমষ্টির যাহা চরম বস্তু সেই সমগ্র মানবজাতি হইতে পারে।

মানুষ এই কর্মক্ষেত্রগুলির সমস্ত বা প্রত্যেকটির মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল খুঁজিতেও পারে, অথবা তাহাদের মধ্যে থাকিয়া নিজেকে সমষ্টির সহিত একীভূত করিয়া দেখিতে এবং সমষ্টির জন্য জীবন ধারণ করিতে পারে, অথবা এই জটিল জগৎ সম্বন্ধে সত্যতর জ্ঞানে উন্নীত হইয়া তাহার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং সমষ্টির লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে। কেননা যতক্ষণ জগতে আমরা আছি ততক্ষণ আমাদের অন্তরাত্মার সহিত পরাৎপর তত্ত্বের যথাযথ সম্বন্ধ এরূপ যে একদিকে তাহা যেমন নিজের বিবিক্ত সত্তা অহংগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে না, তেমনি অন্যদিকে নিজের ব্যষ্টিসত্তা অনির্দ্দেশ্য তত্ত্বের মধ্যে একেবারে মুছিয়া ফেলিবে না, কিন্তু ঈশ্বর এবং জগতের সহিত তাহার একত্ব উপলব্ধি করিবে এবং নিজের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তাহাদিগকে মিলিত করিবে; ঠিক তেমনি ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির যথাযথ সম্বন্ধ এরূপ যে একদিকে ব্যষ্টি যেমন সঙ্গী-দিগের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অহংগত ভাবে তাহার নিজের ভৌতিক বা মানসিক উন্নতির অথবা নিজের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ অনুসরণ করিবে না, অন্যদিকে সমষ্টির স্বার্থের জন্য নিজের যথার্থ উন্নতিকে দমিত বা ব্যাহত করিবে না কিন্তু নিজের মধ্যে সর্ব্বোত্তম এবং পূর্ণতম সম্ভাবনা সকলকে সংগ্রহ করিয়া চিন্তা কর্ম্ম এবং অন্যসকল উপায়ে তাহাদিগকে তাহার চারিপাশের সকলের মধ্যে ঢালিয়া দিবে যাহাতে সমগ্র জাতি তাহার মধ্যস্থ পরম ব্যষ্টিসত্তা সকলের পূর্ণ বিকাশের নিকটে পৌঁছিতে পারে।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভৌতিক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকৃতির প্রাণগত লক্ষ্য পরিপূর্ণ করা। জড়াসক্ত মানুষের সমগ্র উদ্দেশ্য বাঁচিয়া থাকা, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার চলিবার পথে যতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোগ পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করা কিন্তু প্রধানতঃ যে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকা। সে অবশ্য এই উদ্দেশ্যকে গৌণ করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু তাহা কেবল জড় প্রকৃতির অন্য কোন সহজাত প্রবৃত্তির কাছে, যেমন ব্যষ্টিসত্তার প্রজনন, পরিবার শ্রেণী বা সংঘের বৈশিষ্ট্য রক্ষণ। ব্যক্তিত্ব, গার্হস্থ্যজীবন, সমাজ ও জাতির প্রচলিত ব্যবস্থা এই সমস্ত মানুষের ভৌতিক জীবনের উপাদান। প্রকৃতির বিধান ও ব্যবস্থায় ইহার বিশাল প্রয়োজনীয়তা স্বতঃস্পষ্ট ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যে ধরনের মানুষ এ ভাবের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও সমপরিমাণেই বিদ্যমান আছে। সেই মানুষই প্রকৃতি যে কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে, তাহাকে সুব্যবস্থিতভাবে বজায় রাখে এবং অতীতে যাহা লাভ হইয়াছে তাহাকে ধরিয়া রাখে।

কিন্তু সেই উপযোগিতার জন্যই এরূপ ব্যক্তিবর্গ এবং তাহারা যে জীবন যাপন করে তাহা অপরিহার্য্যভাবে সীমিত, অযৌক্তিকভাবে রক্ষণশীল এবং পার্থিব পরিবেশে বদ্ধ হইয়া পড়ে। চিরাচরিত বাঁধাধরা নিয়মাবলি, চির-প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসকল, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারা সকল— এই সমস্ত তাহাদের মজ্জাগত। অতীতে প্রগতিশীল মন যে সমস্ত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে তাহা তাহারা স্বীকার করে এবং আগ্রহভরে তাহাদিগকে সমর্থন ও রক্ষা করে. কিন্তু সেই প্রগতিশীল মন বর্ত্তমানকালে যে সকল পরিবর্ত্তন আনিতে চায় তাহারা ঠিক তেমনি উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কেননা জড়াসক্ত মানুষ প্রগতিশীল জীবন্ত ভাবুককে কেবল একজন কল্পনাপ্রিয় স্বপ্নবিলাসী বা উন্মাদ বলিয়াই মনে করে। প্রাচীন সেমেটিক জাতীয় যে সমস্ত ব্যক্তি জীবন্ত ভগবদ্বাণী প্রচারক গণকে শিলাঘর্ষণে নিহত করিত এবং মৃত্যুর পর তাহাদের স্মৃতি পূজা করিত তাহারা প্রকৃতির মধ্যস্থিত সহজাত বৃত্তিযুক্ত বুদ্ধিহীন এই তত্ত্বেরই মূর্ত্তিমান অবতার। প্রাচীন ভারতে একবার জাত এবং দুইবার জাত ব্যক্তির (দ্বিজ) মধ্যে বিভেদ করা হইত, এই সমস্ত জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে একবার জাত বলা যাইতে পারে। এরূপ ব্যক্তি প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়াসাধন এবং উচ্চতর ক্রিয়ার ভিত্তি রক্ষা করে কিন্তু তাহার নিকট দ্বিজত্বের গৌরব সহজে উন্মুক্ত হয় না।

তথাপি অতীতে ধর্ম্মের মহৎ উচ্ছ্বাস তাহার চিরপ্রচলিত ধারাসকলের উপর যতটা আধ্যাত্মিকতা বাধ্য করিয়া আরোপ করিয়াছে এরূপ ব্যক্তি ততটা স্বীকার করে এবং যাহাদিগকে নিরাপদ এবং সাধারণ আধ্যাত্মিক খাদ্য সরবরাহ করিতে সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় এমন পুরোহিত ও শিক্ষিত ধর্ম্মতত্ত্ববিদের একটা পূজ্য অথচ অধিকাংশক্ষেত্রে নির্বীর্য্য স্থান তাহার সমাজ-জীবনের মধ্যে রাখিয়া দেয়। কিন্তু যিনি নিজের জন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহাকে যদিই বা সে স্বীকার করে, তখন তাহাকে পুরোহিতের নামাবলিতে সজ্জিত করে না, সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র পরাইয়া দেয়; তাহার বিপজ্জনক স্বাধীনতা অনুসারে সে যদি কাজ করিতে চায় তবে তাহার স্থান সমাজের বাহিরে। এমন কি সে ব্যক্তি এই ভাবে মানবরূপী বিদ্যুৎ-পরিচালক-দণ্ড * হইয়া চিৎসত্তার বিদ্যুৎগ্রহণকরতঃ

* গৃহকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবহৃত লৌহ বা তাম্র শলাকা।
—অনুবাদক

সমাজসৌধ হইতে দূরে পরিচালিত করিয়া দিয়া সমাজ সেবাও করিতে পারে।

তৎসত্বেও প্রগতির ধারা ও সচেতনভাবে পরিবর্ত্তনের অভ্যাস এবং জীবনের বিধানরূপে উন্নতির দৃঢ় ধারণার ছাপ জড়ময় মনের উপরে গভীররূপে অঙ্কিত করিয়া জড়াসক্ত মানুষ এবং তাহার জীবনকে পরিমিতভাবে প্রগতিশীল করা সম্ভব। এই উপায়ে ইউরোপে প্রগতিশীল সমাজসকলের সৃষ্টি, জড়ের উপর মনের বৃহত্তম বিজয় সকলের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু জড়প্রকৃতি এ ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়। কেননা সে ধরণের উন্নতি স্থূলতর এবং অধিকতর বহির্ম্মুখী হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং উচ্চতর ও দ্রুততর গতির চেষ্টা দারুণ ক্লান্তি দ্রুত অবসাদ এবং চমকপ্রদ প্রতিক্ষেপ বা পরাবর্ত্তন লইয়া আসে।

জীবনের সকল প্রতিষ্ঠান এবং চিরাচরিত সকল ক্রিয়াধারাকে ধর্ম্মভাবযুক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত করিয়া জড়াসক্ত মানুষ এবং তাহার জীবনকেও পরিমিত ভাবে আধ্যাত্মিক করিয়া তোলা সম্ভব। প্রাচ্যে এই ভাবের সঙ্ঘ বা সমাজসৃষ্টি জড়ের উপর চিৎসত্তার আর এক মহত্তম বিজয়। কিন্তু এখানেও এক গলদ রহিয়া গিয়াছে; কেননা ইহাতে প্রায়শঃ যাহা আধ্যাত্মিকতার বাহ্যতম রূপ এমন এক ধর্ম্মময় প্রকৃতি শুধু গড়িবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। ইহার উচ্চতর অভিব্যক্তি এমন কি তাহা যখন অতি গৌরবময় এবং শক্তিশালী হইয়াছে তখনও হয় তাহা সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, যাহার ফলে সমাজ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, না হয় তাহা অল্পকাল স্থায়ী উন্নতি আনয়ন করিয়া কিছুকালের জন্য সমাজের মধ্যে একটা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। সত্য এই যে, মানসিক প্রচেষ্টা এবং আধ্যাত্মিক আবেগ যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে তখন তাহাদের কোনটিই জড়প্রকৃতির বিপুল বাধা জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। মানবজাতির মধ্যে তাহার নিজের এই কষ্টসাধ্য পরিবর্ত্তন পূর্ণরূপে সাধন করিতে দেওয়ার পূর্ব্বে জড় প্রকৃতির দাবি এই যে এক সম্পূর্ণ প্রচেষ্টার মধ্যে তাহারা উভয়ে আসিয়া পূর্ণরূপে মিলিত হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ এই দুই কার্য্যকরী প্রবল প্রতিপক্ষের কেহই অপরের সহিত প্রয়োজনীয় আপস করিতে ইচ্ছুক নহে।

মনোময় জীবন, রসবোধ বা সৌন্দর্যতত্ব, নীতি এবং বুদ্ধির কার্য্যে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে। মন স্বরূপতঃ ভাববাদী এবং পূর্ণতার অন্বেষু। যিনি সূক্ষ্ম আত্মা, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তিনি* চিরকাল স্বপ্নবিলাসী। শাশ্বত সত্তার

* যিনি স্বপ্নলোকবাসী অন্তঃপ্রজ্ঞ প্রবিবিক্তভুক্ (যিনি অমূর্ত্ত বা বস্তুনিরপেক্ষ ভাব বা চিন্তা ভোগ করেন), তিনি তৈজস (জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ)। মাণ্ডুক্যোপনিষদ—৪

নূতন রূপরাজির অন্বেষণের জন্যই হউক বা তাহার পুরাতন রূপ সকলকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সময়েই হউক শুদ্ধ মননের স্বধর্ম্ম হইল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের, পরিপূর্ণ আচরণের, পরিপূর্ণ সত্যের স্বপ্ন দেখা। কিন্তু জড়ের বাধাকে কিরূপে প্রতিহত করিতে হয় তাহা সে জানে না। তথায় সে ঝঞ্ঝাটে পড়ে, তাহার কার্য্যকুশলতা লোপ পায়, আনাড়ির মত অপটুভাবে পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয় এবং তাহাকে সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অথবা ধূসর বা অস্পষ্ট বাস্তবতার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। অথবা জড় জীবনকে বিশেষভাবে পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া এবং প্রতিযোগিতার সর্ত্তগুলি মানিয়া লইয়া সে সাময়িকভাবে কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা কেবল চাপাইয়া দিতে সমর্থ হইতে পারে কিন্তু অনন্ত প্রকৃতি তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে অথবা এমনভাবে বিকৃত করে যে আর তাহাকে চেনা যায় না, অথবা তাহার মধ্য হইতে নিজ সম্মতি অপসারিত করিয়া আদর্শের এক মৃতদেহ রূপে ফেলিয়া চলিয়া যায়। মানুষের মধ্যস্থ এই স্বপ্নবিলাসী কদাচিৎ এমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছে জগৎ যাহা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে, মমতামাখা স্মৃতি লইয়া দেখিয়াছে বা তাহার নিজ উপাদানের মধ্যে পোষণ করিতে চাহিয়াছে।

বাস্তব জীবন এবং ভাবুকের প্রকৃতির মধ্যস্থ ব্যবধান অত্যন্ত বেশী হইলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার ফলে নিজের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করিবার জন্য মন জীবন হইতে এক রকম সরিয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্তী যুগে যখন কবি তাহার উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে বাস করিতেন, শিল্পী যখন তাহার শিল্পে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দার্শনিক যখন তাহার নির্জন কক্ষে বসিয়া বুদ্ধির সমস্যা সকলের সমাধানে মগ্ন এবং বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বান যখন তাহাদেব পরীক্ষা ও পাঠের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন তখন তাহাদিগকে বুদ্ধির ক্ষেত্রের সন্ন্যাসী বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং আজিও অনেক সময় তাঁহারা মনোভূমির সেই সন্ন্যাসীই রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহাবা মানবজাতির জন্য যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন সমস্ত অতীত তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ ভাবের ঐকান্তিক নিভৃততা কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্যই শুধু সমর্থন করা যায়। মন যখন নিজেকে জীবনের মধ্যে আনিয়া ফেলে এবং এক বৃহত্তর আত্মসম্পূর্ত্তির উপায়রূপে তাহার সম্ভাবনা এবং বাধাসকলকে সমভাবে স্বীকার করিয়া লয় তখনই শুধু সে তাহার নিজের পূর্ণশক্তি এবং ক্রিয়াধারার বিকাশ সাধন করিতে পারে। জড়জগতের বাধাবিপত্তি সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়াই ব্যষ্টিজীবনের নৈতিক পরিণতি দৃঢ়ভাবে

রূপগ্রহণ করে এবং আচরণের বৃহৎ ধারাসকল গঠিত হয় ; জীবনের তথ্য ও ঘটনার সংস্পর্শে আসিয়াই শিল্প জীবনীশক্তি লাভ করে, ভাবনা তাহার বস্তুনিরপেক্ষ সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞানে কৃতনিশ্চয় এবং দর্শনের সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

জড়জীবনের অন্য রূপসকলের বা জাতির উন্নয়নের দিকে একেবারে উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র ব্যষ্টিমনের জন্য জীবনের সহিত মিশিতে পাবা যায়। এপিকিউরিয়ান নামক দার্শনিকগণের সাধনায় এ উদাসীনতার উচ্চতম অবস্থা দেখা যায় কিন্তু স্তোয়িক দার্শনিকগণেব সাধনায়ও ইহা একেবারে বর্জিত হয নাই ; এমন কি পবার্থপরতা ও জগতেব সাহায্যের জন্য যে করুণাব কর্ম্ম কবা হইযা থাকে তাহাও অনেক সময় জগৎ অপেক্ষা অধিকতবভাবে নিজের জন্যই কৃত হয়। কিন্তু এইভাবে ব্যষ্টিসত্তাব পুষ্টিসাধনেব চেষ্টাও একটা সীমিত পূর্ণতা। প্রগতিশীল মনের মহত্তম অবস্থা তখনই দেখা যায় যখন তাহা সমগ্র জাতিকে নিজের সহিত সমাবস্থায় তুলিতে চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য নিজেব ভাবনা ও পবিপূর্ণতার প্রতিরূপ দেশময় ছড়াইযা দেয় অথবা সে-লোকের নিজের আত্মা যাহার দ্বারা আলোকিত হইয়াছে, সত্য সৌন্দর্য্য ন্যায়পরতা ধর্ম্মপ্রাণতাব সেই আদর্শ যাহাতে অধিকতরভাবে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা যায় তজ্জন্য জাতির ভৌতিক জীবনকে ধর্ম্ম, বিচাববুদ্ধি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নব নব রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়। সেরূপ ক্ষেত্রে বিফলতায় বিশেষ কিছু যায় আসে না, কেননা কেবলমাত্র চেষ্টাই সক্রিয় শক্তি-শালী এবং সৃষ্টিশীল। প্রাণকে উন্নীত করিবার জন্য মনের সংগ্রামের মধ্যেই মন অপেক্ষাও উচ্চতর বস্তুদ্বাবা জীবনকে জয় করা যে সম্ভব হইবে তাহার প্রতিশ্রুতি ও বিধান রহিয়াছে।

যাহা উচ্চতম বস্তু সেই আধ্যাত্মিক জীবন শাশ্বতের প্রতি অনুবাগী এবং তাহাকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকে বটে কিন্তু সেজন্য সে অনিত্য বস্তু হইতে যে সম্পূর্ণ দূরে থাকে তাহা নহে। যাহা কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না এবং পরিদৃশ্যমান সমস্ত বিষয়ের পশ্চাতে সমভাবে বর্ত্তমান আছে সেই শাশ্বত প্রেম সৌন্দর্য্য এবং আনন্দের মধ্যেই আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত মানব-মনেব পূর্ণ সৌন্দর্য্যেব স্বপ্ন বাস্তব রূপে সার্থক ও সফল হয় ; তাহার মধ্যে পূর্ণ সত্যেব যে স্বপ্ন আছে তাহার সিদ্ধি ঘটে পরাৎপর স্বয়ম্ভূ স্বয়ংপ্রজ্ঞ এবং শাশ্বত এক সত্য বস্তুর মধ্যে, যাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই কিন্তু যাহা সকল পরিবর্ত্তনের গোপন রহস্য এবং সমস্ত প্রগতির চরম লক্ষ্য ; আবার তাহার মধ্যে পূর্ণ ক্রিয়ার যে স্বপ্ন আছে তাহাও এমন এক সর্ব্বশক্তিমান ও আত্মপরিচালক বিধানের মধ্যে সফল

হয় যাহা সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত আছে এবং যাহা জগৎ সকলের মধ্যস্থিত ছন্দের মধ্য দিয়া নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে। তৈজস পুরুষের মধ্যস্থ স্থষ্টির যাহা অচিরস্থায়ী দৃষ্টি বা সতত বিদ্যমান প্রচেষ্টা তাহাও সেই নিত্য-বর্ত্তমান আত্মার সত্য, যে আত্মা সবকিছু জানেন এবং সকলের প্রভু।*

কিন্তু যদি সনির্ব্বন্ধ বাধা দিতে অভ্যস্ত জড়ের ক্রিয়াধারার উপযোগী হইয়া চলা মনোময় জীবনের পক্ষেই অনেক সময় দুরূহ হয়, তাহা হইলে মনে হয়, সে জগৎ সত্যে নয় কিন্তু সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা এবং ভ্রান্তিতে পূর্ণ, প্রেম ও সৌন্দর্য্যে নয় কিন্তু অসামঞ্জস্য ও কদর্য্যতায় আবৃত, সত্যের বিধানে নয় কিন্তু বিজয়ী স্বার্থপরতা ও পাপে পরিপূর্ণ, আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তেমন জগতে বাস করা আরও কত কঠিন, কত বেশী কষ্টকর? এই জন্যই সাধু ও সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক জীবনে জড়জীবন হইতে সরিয়া যাইবার এবং তাহাকে পূর্ণরূপে স্থূলভাবে অথবা অন্তর হইতে বর্জন করিবার দিকে ঝোঁক সহজেই আসিয়াই পড়ে। সে-জীবন এই জগৎকে অশিব বা অজ্ঞানের রাজ্য বলিয়া দেখে এবং শাশ্বত দিব্যভাব সুদূর এক স্বর্গে অথবা জগৎ ও জীবনের পরপারেই অবস্থিত মনে করে। সে-জীবন এই অপবিত্রতা হইতে নিজেকে পৃথক রাখে; শুধু নিষ্কলঙ্ক এক নির্জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্য লব্ধ হইতে পারে ইহা প্রচার করে। এই অপসরণ জড়জীবনের ক্ষুদ্র আদর্শ, হীন ভাবনা এবং অহংগত আত্মতুষ্টির যাহা সাক্ষাৎ অস্বীকৃতি তেমন কিছুকে দেখিতে এমন কি তাহার কাছে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া সেই জড়জীবনেরই মহদুপকার সাধন করে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মত পরম শক্তির কার্য্য জগতে এইভাবে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবন জড়জীবনের উপর ফিরিয়া আসিতে এবং তাহাকে নিজের বৃহত্তর পূর্ণতার উপায়রূপে ব্যবহার করিতেও পারে। জগতের দ্বন্দ্ব এবং বাহ্যরূপ সকলের দ্বারা অন্ধ হইতে অস্বীকৃত হইয়া ইহা সকল বাহ্যরূপের মধ্যে সেই, একই প্রভুকে সেই একই নিত্যসত্য, সৌন্দর্য্য, প্রেম এবং আনন্দকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। আত্মা সর্ব্বভূতে আছেন, সর্ব্বভূত আত্মাতে আছে, সর্ব্ববস্তু আত্মারই সম্ভূতি, বেদান্তের এই সূত্র সমৃদ্ধতর এবং সর্ব্বগ্রাহী এই যোগের চাবিকাঠি।

কিন্তু মনোময় জীবনের ন্যায় আধ্যাত্মিক জীবনও, যে জগৎ কেবল

* যিনি একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় ও আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞ......। যিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী। মাণ্ডুক্যোপনিষদ (৫, ৬

সে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে সমষ্টিগতভাবে তাহার উন্নতির দিকে পরিপূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ব্যষ্টির হিতের জন্য বাহ্য জীবনকে এই ভাবে ব্যবহার করিতে পারে। যেহেতু শাশ্বত সত্যবস্তু সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বদা একইরূপে বর্ত্তমান, আবার শাশ্বতের মধ্যেও সর্ব্ববস্তু একই রূপে অবস্থিত এবং যেহেতু নিজের মধ্যে একমাত্র কাম্য মহাসিদ্ধিকে লাভ করিবার তুলনায় কর্ম্মের যথার্থ রীতি এবং ফলের কোন মূল্য নাই, তাহার নিজের চরম সিদ্ধি লাভ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে সদা প্রস্তুত এই আধ্যাত্মিক উদাসীনতা যে কোন পরিবেশ আসুক না কেন, যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হউক না কেন তাহাকে অনাসক্তভাবে স্বীকার করে। গীতার আদর্শ অনেকে এই ভাবেই বুঝিয়াছে। অথবা সৎকার্য্য সেবা ও করুণার মধ্য দিয়া অন্তরস্থ প্রেম ও আনন্দ, এবং জ্ঞান দানের মধ্য দিয়া অন্তরের সত্য নিজেদিগকে জগতের উপর ঢালিয়া দিতে পারে ; কিন্তু তাহাব ফলে জগৎকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে পাবে, সুতরাং জগৎ তাহার অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতি অনুসারে পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের চির যুদ্ধক্ষেত্র থাকিয়াই যায়।

কিন্তু প্রগতিও যদি জগৎজীবনের এক প্রধান বস্তু হয়, ঈশ্বরের ক্রম-বর্দ্ধমান অভিব্যক্তিই যদি প্রকৃতির যথার্থ্য তাৎপর্য হয় তাহা হইলে এই সীমা-নির্দ্দেশও ঠিক নহে। জগতে আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে জড়জীবনকে তাহার নিজের প্রতিচ্ছবি অথবা ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি রূপে রূপান্তরিত করা সম্ভব, শুধু সম্ভব নয় তাহাই প্রকৃতির প্রকৃত জীবন-ব্রত। তাই দেখিতে পাই, যাঁহারা নির্জনে নিজের একক মুক্তির জন্য সাধনা করিয়াছেন এবং তাহা লাভ করিয়াছেন সেই সমস্ত মহাসাধক ছাড়া আরও অনেক আধ্যাত্মিক পথের মহা-গুরু আসিয়াছেন যাঁহারা অপরকেও মুক্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি দেখিতে পাই সেই সমস্ত মহাবলশালী আত্মাকে যাঁহারা চিৎপুরুষের পরম শক্তিতে নিজদিগকে জড়জীবনের একত্র সংঘবদ্ধ সকল শক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বোধ করিয়া জগতের উপর আত্মবিস্তার করিয়াছেন, পরম প্রেমভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহার রূপান্তরে তাহার নিজ সম্মতি জোর করিয়া আদায় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ মানবজাতির মানসিক এবং নৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে সে চেষ্টা কেন্দ্রীভূত থাকে, কিন্তু এ চেষ্টাকে প্রসারিত করিয়া আমাদের জীবনের রূপ ও প্রতিষ্ঠান সকলেরও এরূপ পরিবর্ত্তন সাধনে প্রযোগ করা যাইতে পারে যে তাহারাও যাহার মধ্যে চিৎপুরুষ নিজেকে ঢালিয়া দিতে পারেন তদ্রূপ উৎ-

কৃষ্টতর আধারে পরিণত হইতে পারে। মানুষের আদর্শের ক্রমপরিণতিতে জাতিকে দিব্যভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য এই সকল প্রচেষ্টা পরম নিদর্শন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাহার বাহ্যফল যাহাই হউক এই সমস্ত প্রচেষ্টার প্রত্যেকটি পৃথিবী যাহাতে স্বর্গকে আরও গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য তাহাকে অধিকতর সমর্থ এবং প্রকৃতি পরিণামের মধ্যে যে যোগ অতি মন্থর গতিতে চলিতেছে তাহাকে দ্রুতগামী করিয়াছে।

ভারতবর্ষে গত সহস্রাধিক বৎসর হইতে আধ্যাত্মিক এবং জড়জীবন পাশাপাশি ভাবে রহিয়াছে কিন্তু প্রগতিশীল মনকে বর্জন করা হইয়াছে। সকলকে লইয়া প্রগতির পথে চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিকতা নিজের জন্য জড়ের সহিত একটা সন্ধি করিয়াছে। সেই সন্ধি অনুসারে সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্রের মত যাহারা কোন বিশেষ প্রতীক বা চিহ্ন গ্রহণ করে তাহারা সমাজের নিকট হইতে স্বাধীনভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক পরিণতির অধিকার পাইয়াছে; সেই জীবনকে মানুষের চরম লক্ষ্য এবং যাহারা সে জীবন যাপন করে তাহারা পরম শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী বলিয়া সমাজ স্বীকার করিয়াছে; আর সমাজকে এমন এক ধর্ম্মের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে যাহাতে মানুষের চির-প্রচলিত কর্ম্মাবলীর অধিকাংশের সঙ্গে জীবনের সন্ন্যাসমূলক আধ্যাত্মিক প্রতীক এবং তাহার শেষ গম্যস্থান আনুষ্ঠানিক ভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সমাজকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে সে তাহার জড়তা এবং নিশ্চল রক্ষণশীলতাকে বজায় রাখিতে পারিবে। এই অধিকার দেওয়ার ফলে সন্ধির মূল্য অনেকটা নষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মের ছাঁচ দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট বলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া একটা অভ্যাসমূলক নিত্যক্রিয়াতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার কার্য্যকরী জীবন্ত তাৎপর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত নূতন সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম এই ছাঁচ পরি-বর্ত্তন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে তাহারাও শেষ পর্য্যন্ত আর এক নূতন ভাবের গতানুগতিকতা সৃষ্টি করিয়াছে বা পুরাতনকে সামান্য একটুমাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছে; কেননা স্বাধীন ও ক্রিয়াশীল যে মন এই গতানুগতিকতা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। অজ্ঞানের এবং উদ্দেশ্যশূন্য অসংখ্য দ্বন্দ্বের হস্তে সমর্পিত জড় জীবন কষ্টদায়ক গুরুভার বন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাহার নিকট হইতে পলায়নই ছিল অব্যাহতির একমাত্র উপায়।

ভারতীয় যোগপন্থাগুলিও নিজেরা এই আপস রফা মানিয়া লইয়াছিল; যোগের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ব্যক্তিগত পূর্ণতা বা মুক্তি, যোগের বিধান

হইয়াছিল সাধারণ ক্রিয়াধারা হইতে কোন প্রকারে দূরে অবস্থান, যোগের চরম অবস্থা বা পরিসমাপ্তি হইল জীবনের বর্জন। গুরু কেবল তাঁহার শিষ্যগণের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তাঁহার জ্ঞান বিতরণ করিতে লাগিলেন। যখন ব্যাপকতরভাবে কোন ক্রিয়াধারা বা গতিবৃত্তি আরম্ভ হইত তখনও ব্যষ্টিব্যক্তির মুক্তিই লক্ষ্য থাকিত। নিশ্চল সমাজের সহিত এই চুক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিপালিত হইত।

তখনকার জগতের বাস্তব অবস্থার পক্ষে এই আপসের উপযোগিতাকে সন্দেহ করা চলে না। ইহার ফলে ভারতে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল যাহা আধ্যাত্মিকতার রক্ষা ও পূজাতে ব্যাপৃত ছিল, ভারত স্বতন্ত্রভাবে এমন এক দেশ হইয়া দাঁড়াইল যেখানে যেন এক দুর্গ মধ্যে অবস্থিত হইয়া উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ নিজের অবিমিশ্র পরম পবিত্রতার মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে বিরোধী শক্তির অবরোধের মধ্যেও অপরাজিত রহিল। কিন্তু ইহা একটা আপস রফা, চরম বিজয় নহে। জড়জীবন, তাহার বিবৃদ্ধি ও পরিণতির দিব্য প্রেরণা হারাইল, স্বতন্ত্র থাকিয়া আধ্যাত্মিক জীবন তাহার উচ্চতা এবং পবিত্রতা রক্ষা করিল বটে কিন্তু তাহার পূর্ণ শক্তি এবং জগতের পক্ষে তাহার কার্য্যকারিতা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। তাই দিব্যবিধাতৃশক্তি বশেই যোগী এবং সন্ন্যাসীদের এই দেশ, যে উপাদান সে বর্জন করিয়াছিল সেই প্রগতিশীল মনের সহিত দৃঢ় এবং অলঙ্ঘ্য সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হইয়াছে, যাহাতে যাহা বর্ত্তমানে তাহার অভাব হইয়া পড়িয়াছে তাহা সে পুনরায় লাভ করিতে পারে।

আমাদিগকে আর একবার স্বীকার করিতে হইবে যে ব্যষ্টি ব্যক্তি শুধু নিজের মধ্যে বাস করে না, সে বাস করে সমষ্টির মধ্যে এবং জগতে কেবল ব্যষ্টির পূর্ণতা ও মুক্তি ভগবানের অভিপ্রায়ের পূর্ণ তাৎপর্য্য নয়। অপরের এবং মানবজাতির মুক্তি ভিন্ন স্বাধীনভাবে আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তির অবাধ উপযোগ ও ব্যবহার অসম্ভব, আমাদের পরিপূর্ণতার পূর্ণ উপযোগিতা হইবে, এই দিব্য প্রতীক আমাদের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তাহা অপরের ভিতর ফুটাইয়া তোলা, বহুগুণিত করা এবং অবশেষে সকলের মধ্যে সর্ব্বজনীন করা।

সুতরাং প্রকৃতির সাধারণ কর্ম্মধারা এবং তাহার ক্রমপরিণতির তিনটি সোপান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম বাস্তব দৃষ্টিতে মানব জীবনের ত্রিধারাত্মক সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা আবার সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম এবং আমরা আমাদের যোগসমন্বয়ের পূর্ণ উদ্দেশ্য অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম।

চিৎপুরুষ বিশ্বজীবনের মুকুটমণি, জড় তাহার ভিত্তি, আর মন এ দুয়ের

যোগসূত্র। চিৎসত্তাই শাশ্বত বস্তু, মন ও জড় তাহার ক্রিয়াধারা। চিদ্বস্তু গোপনে অব্যক্তভাবে অবস্থিত আছেন তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে; মন ও জড়দেহ হইল উপায় যাহার সাহায্যে চিৎপুরুষ নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন। এই চিৎপুরুষ যোগেশ্বরের বিগ্রহ; প্রত্যক্ষগোচর প্রাতিভাসিক জগতে সেই বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায়রূপে তিনি মন ও দেহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমগ্র প্রকৃতি গোপন সত্যের ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশের একটা সাধনা, ক্রমশঃ অধিকতর সফলতার সহিত দিব্য বিগ্রহকে প্রকাশের একটা প্রচেষ্টা।

কিন্তু মন্থর এক পরিণামধারার মধ্য দিয়া প্রকৃতি জনসাধারণের মধ্যে যাহা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে, যোগ ব্যষ্টির জন্য দ্রুত এক আমূল পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাহা সাধিত করে। প্রকৃতির সকল শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়া তাহার সকল বৃত্তিকে উর্দ্ধে উন্নীত করিয়া যোগ তাহার কার্য্য সাধন করে। প্রকৃতি অতি কষ্টে আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তোলে এবং নিম্নতর সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সেই উচ্চ অবস্থা হইতে তাহাকে নিম্নে নামিয়া আসিতে হয় কিন্তু তাহার উর্দ্ধায়িত ও বিশোধিত শক্তি এবং ঘনীভূত পদ্ধতির ফলে যোগ সে আধ্যাত্মিক জীবন সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করিতে আর সেই সঙ্গে মনকে এবং ইচ্ছা হইলে দেহকেও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। প্রকৃতি তাহার নিজের প্রতীক সকলের মধ্যে ভগবানকে খোঁজে, যোগ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির প্রভুর কাছে, বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বাতীত পুরুষের নিকট চলিয়া যায় এবং তথা হইতে সর্ব্বশক্তিমানের আদেশ লইয়া বিশ্বাতীত জ্যোতি ও শক্তিকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে।

কিন্তু পরিণামে উভয়ের উদ্দেশ্য এক। প্রকৃতি নিজের মন্থর ও প্রচ্ছন্ন বিবর্ত্তন ধারার উপর পরম বিজয় লাভ করিবে যখন যোগপদ্ধতি মানবজাতির মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হইবে। এখন যেমন প্রকৃতি জড়বিজ্ঞানে প্রগতিশীল মনের সাহায্যে মনোময় জীবনের পূর্ণ পরিণতির জন্য সমগ্র মানবজাতিকে প্রস্তুত করিয়া লইতে চাহিতেছে, তেমনি যোগের সাহায্যে সমস্ত মানবজাতিকে বিবর্ত্তনের ধারায় উর্দ্ধতন পরিণতির, দ্বিতীয় জন্ম বা আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা তাহাকে অপরিহার্য্যরূপে করিতেই হইবে। যেমন মনোময় জীবন জড় জীবনকে ব্যবহার করিতেছে ও তাহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তেমনি আধ্যাত্মিক জীবন মনোময় জীবন ও জড় জীবনকে ব্যবহার করিবে এবং এক দিব্য আত্মপ্রকাশের যন্ত্ররূপে তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। যে সমস্ত কালে ইহা সম্পন্ন হয় তাহাই পৌরাণিক সত্য বা কৃতযুগ,

প্রতীকের মধ্যে 'সত্যের' প্রকাশের যুগ, যে সমস্ত যুগে প্রদীপ্ত পরিতৃপ্ত এবং আনন্দোদ্ভাসিত মানবজাতির মধ্যে প্রকৃতির বৃহৎ কর্ম্ম 'কৃত', সম্পাদিত ও পূর্ণ হয় এবং প্রকৃতি তাহার সাধনার চরমোৎকর্ষে পৌঁছে।

বিশ্বজননীকে আর ভুল না বুঝিয়া তাহাকে অপবাদ না দিয়া অথবা তাহার প্রতি অযথা ব্যবহার না করিয়া তাহার ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায় মানুষকে জানিতে ও বুঝিতে হইবে, এবং বীর্য্যবত্তম উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার উচচতম আদর্শে পৌঁছিবার জন্য সর্ব্বদা আস্পৃহা জাগরূক রাখিতে হইবে।

যোগপন্থাবলী

মানুষের মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাধনার এ সমস্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতার মধ্যে এই যে সকল সম্বন্ধ আমাদের প্রাকৃতিক পরিণামধারার সংক্ষিপ্ত পরিবীক্ষণের মধ্যে দেখা গিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইব যে বিভিন্ন যোগপন্থার মূল তত্ত্ব এবং পদ্ধতির মধ্যে সেই সমস্তই রহিয়াছে। আমরা যদি তাহাদের সাধনার কেন্দ্রগত অঙ্গগুলির এবং প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসকলের একত্র মিলন ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাই তবে দেখা যাইবে যে এ-কার্য্যে প্রকৃতিদত্ত ভিত্তির মধ্যেই আমাদের সমন্বয়ের স্বাভাবিক ভিত্তি এবং তাহার বিধান রহিয়াছে।

অবশ্য এক হিসাবে যোগ বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা অতিক্রম করিয়া তাহার উপরে উঠিয়া যায়। কেননা বিশ্বজননীর উদ্দেশ্য তাহার নিজের খেলার এবং সৃষ্টির মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন করা এবং তথায় তাহাকে সত্য করিয়া তোলা। কিন্তু যোগের উর্দ্ধতম উন্নয়নে প্রকৃতি নিজেকে ও জগৎকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি বিশ্বপ্রপঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়া দিব্য-পুরুষকে তাহার স্বরূপে উপলব্ধি করে। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাই যোগের উচচতম লক্ষ্য শুধু নহে, ইহাই একমাত্র সত্য এবং একান্তভাবে বরণীয় লক্ষ্য।

তথাপি তাহার বিবর্ত্তনের ধারার মধ্যে যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে এমন

কিছুর মধ্য দিয়াই প্রকৃতি সর্ব্বদা নিজের বিকাশধারাকে অতিক্রম করিয়া যায়। ব্যষ্টিব্যক্তির হৃদয় তাহার উচ্চতম এবং বিশুদ্ধতম আবেগ উন্নীত ও বিশোধিত করিয়া বিশ্বাতীত আনন্দে অথবা অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বাণে পৌঁছিতে পারে; ব্যষ্টি মন তাহার সাধারণ ক্রিয়াধারা সকলকে মননের অতীত প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত করিয়া অনির্ব্বচনীয়ের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করে এবং বিশ্বাতীত অখণ্ড একত্বের মধ্যে নিজের পৃথক সত্ত্বা মিলাইয়া দিতে পারে। আর কেবল ব্যষ্টি ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত আত্মাই প্রকৃতির রূপায়ণসকলের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিয়া যে আত্মা নির্ব্বিশেষ, নিত্যমুক্ত এবং বিশ্বাতীত তাহাতে পৌঁছে।

কার্য্যক্ষেত্রে যোগসাধনার কোন সম্ভাবনার পূর্ব্বে তিনটি বস্তুর ধারণা একান্ত প্রয়োজন; এ তিনটি যেন তিনটি পক্ষ, কোনপ্রকার চেষ্টার পূর্ব্বে এ তিনের একত্রে সম্মতি চাই—এ তিনটি ঈশ্বর প্রকৃতি এবং মানবাত্মা অথবা আরও দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, বিশ্বাতীত বিশ্বগত এবং ব্যষ্টিগত সত্তা। ব্যষ্টিসত্তা এবং প্রকৃতি যদি নিজেদের লইয়া শুধু থাকে তবে এক অপরের নিকট বদ্ধ হইবে এবং প্রকৃতির অতি মন্থর গতিকে কিছুতেই অনুভবযোগ্যভাবে অতিক্রম করিতে পারিবে না। এ দুইয়ের অতীত কোনও তত্ত্বের প্রয়োজন, যাহাকে প্রকৃতি হইতে মুক্ত এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর হইতে হইবে, আমাদের এবং প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিবে, আমাদিগকে উপরে নিজের কাছে টানিয়া লইবে এবং ব্যষ্টির উর্দ্ধারোহণে প্রকৃতির সম্মতি তাহার স্বেচ্ছায় অথবা তাহার উপর জোর করিয়া আদায় করিবে।

যোগের প্রত্যেক দর্শনে এই সত্যই এ-ধারণা স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা আনিয়া দিয়াছে যে, একজন ঈশ্বর, প্রভু, পরমপুরুষ বা পরাৎপর আত্মা আছেন, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই সাধনা এবং তিনিই সিদ্ধির জন্য আলোক-স্রাবী স্পর্শ ও শক্তিদান করেন। ইহার অনুপূরক এ ধারণাও সমভাবেই সত্য যে যেমন ব্যষ্টির পক্ষে বিশ্বাতীত বস্তুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং সে তাঁহাকে চায় তদ্রূপ এক অর্থে বিশ্বাতীত পুরুষের পক্ষেও ব্যষ্টি প্রয়োজনীয় এবং তিনিও তাহাকে চাহেন; ভক্তিযোগে একথা দৃঢ়তার সহিত বহুবার বলা হইয়াছে। ভক্তের যেমন ভগবানের দিকে আকর্ষণ, তাঁহাকে পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা আছে ঠিক তেমনিভাবে ভগবানও ভক্তকে চান এবং তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন।* জ্ঞানযোগের অস্তিত্ব থাকেনা যদি মানবরূপে জ্ঞানের অন্বেষু ও

* ভক্ত বা ভগবৎ প্রেমিক ভগবান বা ঈশ্বর—প্রেম ও আনন্দের প্রভু; ত্রয়ীর তৃতীয় তত্ত্ব ভাগবত প্রেমের দিব্য অনুভূতি।

সাধক, জ্ঞানের বিষয়ীভূত পরমবস্তু, এবং ব্যক্তিব্যষ্টি দ্বারা জ্ঞানের সার্ব্বভৌম বৃত্তি সকলের দিব্য ব্যবহার, এ তিনটি না থাকে ; মানুষরূপী ভগবদ্ প্রেমিক, প্রেম ও আনন্দের পরম বিষয়বস্তু, এবং ব্যষ্টিদ্বারা আধ্যাত্মিকতা, ভাবাবেশ এবং সৌন্দর্য্য ও রসের অনুভূতিপ্রদ ও পরিতৃপ্তিদায়ক সর্ব্বজনীন বৃত্তিসকলের দিব্য ব্যবহার, এ তিন না থাকিলে ভক্তিযোগ থাকেনা ; তদ্রূপ কর্ম্মযোগ লোপ পায়, যদি মানব কর্ম্মী, সকল কর্ম্ম ও যজ্ঞের প্রভুরূপী পরম সঙ্কল্পময় পুরুষ, এবং শক্তি ও কর্ম্মের সর্ব্বজনীন বৃত্তি এবং ব্যষ্টিদ্বারা সে-বৃত্তির দিব্য ব্যবহার, এ তিন না থাকে। উচচতম সত্য সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা যতই অদ্বৈতবাদী হউক না কেন, সাধনার ক্ষেত্রে এই সর্ব্বব্যাপী ত্রিতত্ত্বকে স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য।

কেননা যোগের মূল কথাই হইল ব্যষ্টিগত মানবচেতনার সহিত ভগবানের সংস্পর্শ। জাগতিক খেলায় যাহা হইতে আমরা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি আমাদের সেই প্রকৃত আত্মা, মূল উৎস এবং সার্ব্বভৌম সত্তার সহিত পুনর্ম্মিলনই যোগ। যাহাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি সেই দুর্ব্বোধ্য এবং জটিলভাবে গঠিত চেতনার যে কোন বিন্দুতে তাঁহার সংস্পর্শ হইতে পারে। দেহের মাধ্যমে জড়ে ইহা সাধিত হইতে পারে ; আমাদের স্নায়বিক সত্তার অবস্থা ও অনুভূতি যাহা নির্দ্ধারিত করে সেই সমস্ত ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া প্রাণে ইহা ঘটিতে পারে ; আবার আবেগময় হৃদয়, সক্রিয় সংকল্প অথবা বোধময় মনন, মনের এই সমস্ত ক্রিয়ার যে কোনটির মধ্য দিয়া অথবা আরও ব্যাপকভাবে তাহার নিজের সকল ক্রিয়ার মধ্যে মনন-চেতনার সাধারণ এক রূপান্তর দ্বারা ইহা সংসাধিত হইতে পারে। মনোমধ্যস্থিত কেন্দ্রগত অহংএর রূপান্তর এবং ধর্ম্মান্তরের ফলে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত সত্য ও আনন্দে সাক্ষাৎভাবে জাগরণের মধ্য দিয়াও ইহা সমানভাবে সাধিত হইতে পারে। যে বিন্দুতে বা কেন্দ্রে সংস্পর্শলাভ করা আমরা নির্ব্বাচন করি তদনুসারেই আমাদের যোগপন্থা নির্ণীত হয়।

কারণ ভারতে আজিও যে সকল প্রধান যোগপন্থা বর্ত্তমান আছে তাহাদের বিশিষ্ট পদ্ধতির জটিলতা সকলকে বাদ দিয়া তাহাদের কেন্দ্রগত তত্ত্বের দিকে যদি লক্ষ্য করি, তবে দেখিতে পাই যে দেহরূপ নিম্নতম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া যে সিঁড়ির সোপানাবলি ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ব্যষ্টি আত্মার সহিত বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত আত্মার সাক্ষাৎ সংস্পর্শরূপ শেষ সোপানে পৌঁছিয়াছে, যোগপন্থা-গুলি সেই সিঁড়িতে ক্রমোর্দ্ধ্বভাবে সাজানো হইয়া আছে। হঠযোগ পূর্ণতা এবং সিদ্ধির যন্ত্ররূপে দেহকে ও প্রাণের ক্রিয়াধারাসকলকে বাছিয়া লইয়াছে, স্থূল দেহ লইয়াই তাহার কারবার। রাজযোগ তাহার ঊর্দ্ধ্বারোহণের মূলশক্তি-

রূপে বিভিন্ন অংশ সমেত মনোময় সত্তাকে বাছিয়া লইয়াছে ; ইহা সূক্ষ্মদেহের উপর কেন্দ্রীভূত ও অভিনিবিষ্ট হয়। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের ত্রিমার্গ মনোময় সত্তার কোন অংশ—সংকল্প হৃদয় বা বুদ্ধিকে ব্যবহার এবং তথা হইতে যাত্রারম্ভ করে এবং তাহার রূপান্তর সাধনের দ্বারা যাহা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃতিগত সেই মুক্তিপ্রদ সত্য আনন্দ এবং আনন্ত্যে পৌঁছিতে চায়। ব্যষ্টি দেহগত মানবপুরুষ এবং যিনি প্রতিদেহে বাস করিতেছেন অথচ সকল নামরূপ অতিক্রম করিয়া আছেন সেই দিব্যপুরুষের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে আদানপ্রদান ও যোগস্থাপন করা ইহার সাধনপদ্ধতি।

আমরা দেখিয়াছি যে অন্নকোষের এবং প্রাণকোষের মধ্যে দেহ ও প্রাণ মিলিত হইয়া স্থূলদেহ গঠিত করিয়াছে এবং মানবসত্তার মধ্যে এই দুএর সাম্য প্রকৃতির সকলক্রিয়াধারার ভিত্তি, আর হঠযোগের লক্ষ্য, দেহ ও প্রাণ এ উভয়কেই জয় করা। এক্ষেত্রে প্রকৃতি যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা অহংগত সাধারণ জীবনের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু হঠযোগের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কেননা, মানবজীবনের সাধারণ আয়ুষ্কালের মধ্যে তাহার জড়যন্ত্রটাকে চালাইবার জন্য এই দেহগত ব্যষ্টিজীবনের, এবং যাহা তাহাকে সীমিত ও বিশেষিত করে সেই জাগতিক পরিবেশের দাবিতে, অল্পবিস্তর পর্য্যাপ্তরূপে বিভিন্ন ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করিবার জন্য যে পরিমাণে প্রয়োজন, সেই পরিমাণে প্রাণশক্তি বা সক্রিয় জড়শক্তি লইয়া এই সাম্য স্থাপিত হইয়াছে। তাই হঠযোগ প্রকৃতিকে সংশোধন করিতে এবং অন্য এক এমন সাম্য স্থাপিত করতে চায় যাহাতে জড়দেহ, প্রাণের ও প্রাণিক বা জড়ীয় সক্রিয়-শক্তির—যাহা অনিরূপিত এবং পরিমাণে ও প্রগাঢ়তায় প্রায় অনন্ত—ক্রমবর্দ্ধমান অন্তঃপ্রবাহ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। বিশ্বপ্রাণের সীমিত পরিমাণ ও শক্তির ব্যষ্টিকরণের উপর প্রাকৃতিক সাম্য নির্ভর করে ; ব্যষ্টি তাহার ব্যক্তিগত এবং বংশগত অভ্যাসবশে এতদপেক্ষা বেশী ধারণ, ব্যবহার বা সংযমন করিতে পারে না। যাহা আরও অল্পপরিমাণে সীমিত ও নির্দ্ধারিত, বিশ্বশক্তির সেরূপ ক্রিয়াধারা দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া তাহা ধারণ, ব্যবহার ও সংযমন করিয়া হঠযোগ যে সাম্য স্থাপন করে তাহা ব্যষ্টিগত প্রাণশক্তিকে বিশ্বপ্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

আসন এবং প্রাণায়াম হঠযোগের প্রধান প্রক্রিয়া। প্রাণশক্তির যে সমস্ত ধারা বিশ্বপ্রাণসমুদ্র হইতে দেহের মধ্যে প্রবাহিত হয়, গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়া না দিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিবার শক্তির অভাবের নিদর্শনরূপে দেহের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়, বহুসংখ্যক আসন বা নানা নির্দ্দিষ্টভাবে অঙ্গবিন্যাসদ্বারা হঠযোগ প্রথমতঃ সেই চাঞ্চল্য বিদূরিত করে,

এবং দেহে অসাধারণ স্বাস্থ্য, শক্তি ও নমনীয়তা আনয়ন করে ; এবং যে সমস্ত অভ্যাস দেহকে সাধারণ জড় প্রকৃতির অধীন ও সাধারণ ক্রিয়াধারার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহাদের কবল হইতে দেহকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। হঠযোগের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে এই ধারণা রহিয়াছে যে এই বিজয়কে এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায় যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে জয় করা সম্ভব হয়। তাহার পর বহু সহায়ক ও আনুষঙ্গিক কিন্তু বিপুল আয়াসসাধ্য ও বিস্তারিত প্রণালীসকলের দ্বারা যাহা তাহার সর্ব্বপ্রধান সাধনযন্ত্র, শ্বাস প্রশ্বাসের সেই সমস্ত প্রক্রিয়া সাধনের জন্য হঠযোগী তাহার দেহকে সকলপ্রকার মলিনতা হইতে এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে সর্ব্বপ্রকার প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্ত করে। এ সমস্ত প্রক্রিযাকে প্রাণায়াম, শ্বাস বা প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণ বলা হয় ; কেননা শ্বাসপ্রশ্বাসই প্রাণশক্তি সকলের প্রধান দৈহিক ক্রিয়াধারা। প্রাণায়াম দ্বারা হঠযোগীর দুই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহা দৈহিক উৎকর্ষকে পূর্ণ করিয়া তোলে ; জড়প্রকৃতির সাধারণ বহু প্রয়োজনীয়তা হইতে প্রাণশক্তি মুক্তি পায ; সতেজ স্বাস্থ্য, দীর্ঘকাল-স্থায়ী যৌবন এবং অনেকসময় অসাধারণ আয়ুলাভ হয। অন্যপক্ষে প্রাণায়াম প্রাণকোষে অবস্থিত বীর্য্যবতী কুণ্ডলিতা সর্পশক্তিকে জাগ্রত এবং যাহা সাধারণ মানবজীবনে লাভ হয় না চেতনার সেরূপ বহুভূমি, অনুভূতির বহুক্ষেত্র এবং অসাধারণ চিত্তবৃত্তিসমূহ যোগীর নিকট উন্মুক্ত করে, সেই সঙ্গে যে সমস্ত সাধারণ শক্তি ও চিত্তবৃত্তি তাহাতে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল তাহারাও বীর্য্য-বন্তভাবে প্রগাঢ়তা লাভ করে। আরও অনেক আনুষঙ্গিক প্রণালীর দ্বারা হঠযোগীর কাছে এই সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা আরও সুস্পষ্ট ও অধিকতরভাবে অধিগত হয়।

তাই হঠযোগের ফল লোকচক্ষুতে বিস্ময়কর এবং সাধারণ বা জড়ভাবাপন্ন মনকে সহজেই অভিভূত করে। তবু পরিশেষে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই অতিবিশাল পরিশ্রমদ্বারা আমরা কি লাভ করিলাম ? ইহার ফলে জড় প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জড়জীবনের রক্ষণ ও উচ্চতম পূর্ণতাবিধানের শক্তি, এমন কি এক অর্থে জড়জীবনের বৃহত্তরভাবে ভোগ করিবার সামর্থ্য অসাধারণ পরিমাণে লাভ হয়। কিন্তু হঠযোগের ত্রুটি এই যে বহুশ্রমসাধ্য এবং দুরূহ প্রক্রিয়াগুলি আমাদের সময় ও শক্তি এত অধিক পরিমাণে দাবী ও গ্রহণ করে, মানুষের সাধারণ জীবন হইতে যোগীকে এরূপ পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে যে, যে-সমস্ত ফল এ সাধনায় পাওয়া যায় তাহা জাগতিক জীবনের পক্ষে কাজে লাগানো, হয় অসম্ভব অথবা অতিপ্রবলভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

এই ক্ষতির প্রতিদানস্বরূপ হয়তো আমরা অন্তরস্থ অন্য কোনো জগতে মন বা প্রাণলোকে অন্য এক জীবন লাভ করিতে পারি কিন্তু অন্যপন্থায়, রাজযোগে বা তান্ত্রিক সাধনার মধ্য দিয়া, অনেক অল্প পরিশ্রমসাধ্য উপায়ে, সাধনার সেরূপ অতি কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে না গিয়াও এই সমস্ত ফললাভ করিতে পারি। পক্ষান্তরে জড় জাগতিক ফল সকল, যেমন পরিবর্দ্ধিত প্রাণশক্তি, দীর্ঘকালস্থায়ী যৌবন, স্বাস্থ্য এবং আয়ু যদি অন্য কাজে না লাগাইয়া শুধু তাহাদের জন্যই অর্জন করি, আমরা সে সমস্ত শুধু নিজেদেব জন্য কৃপণের মত ব্যবহার করি, সাধারণ জীবন হইতে যদি বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখি, জাগতিক ও কর্ম্মাবলীর সাধারণ সমষ্টিগত ভাণ্ডারে দান যদি না করিতে পারি, তবে বিশেষ কি লাভ হইল? হঠযোগ বৃহৎ ফললাভ করে কিন্তু তজ্জন্য মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় এবং তাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য অল্প পরিমাণে সিদ্ধ হয়।

রাজযোগ আরও উচচতর ক্ষেত্রে বিচরণ করে। ইহাব উদ্দেশ্য মনোময় সত্তার মুক্তি ও পূর্ণতাসাধন, অন্নময় সত্তার নহে; ইহা আবেগ এবং সংবেদনময় জীবনকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভাবনা ও চেতনার সমগ্র যন্ত্রটির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চায়। যাহা হইতে এই সমস্ত ক্রিয়াধারা উৎপন্ন হয় মনোময় চেতনার সেই উপাদানের অর্থাৎ চিত্তের উপর ইহা নিজদৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং হঠযোগ তাহার জড়ীয় উপাদান লইয়া যেরূপ করে তেমনিভাবে দেহকে বিশুদ্ধ ও শান্ত করিতে চায়। মানুষের সাধারণ জীবন দুঃখকষ্ট ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ; ইহা এমন এক রাজ্য যাহা হয় নিজের সহিত সংগ্রামে রত অথবা কুশাসিত; কেননা এখানকার প্রভু পুরুষ নিজেই তাহার মন্ত্রীবর্গের, তাহার চিত্তবৃত্তিসকলের অধীন, এমন কি যাহারা তাহার প্রজা, যথা আবেগ সংবেদন ক্রিয়া এবং ভোগের যন্ত্র তাহাদেরও দাস। এই পরাধীনতার স্থানে স্বারাজ্য বা আত্মশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাই প্রথম করণীয় হইল বিশৃঙ্খলতার শক্তিসকলকে জয় করিবার জন্য সুশৃঙ্খলতার শক্তিসকলকে সাহায্য করা। রাজযোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়া এমন এক সতর্ক আত্মসংযম, যাহা দ্বারা যে সমস্ত অনিয়মিত গতিবৃত্তি নিম্নতর স্নায়বিক সত্তাকে প্রশ্রয় দেয় তাহাদের স্থানে মনের সু-অভ্যাস সকল স্থাপিত হয়। সত্যকথনের অভ্যাস, অহংগত সকল প্রকার কামনা বাসনার বর্জন, অপরের ক্ষতি সাধন বা হিংসা হইতে বিরতি, পবিত্রতা, যিনি মনোময় রাজ্যের প্রকৃত প্রভু সেই দিব্য পুরুষের প্রতি অনুরাগ, সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যান—এই সমস্ত দ্বারা হৃদয় ও মনের বিশুদ্ধ আনন্দময় এবং স্বচ্ছ এক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ইহা রাজযোগের শুধু প্রথম সোপান। ইহার পরে যাহাতে অন্তরাত্মা চেতনার উচ্চতর অবস্থা সকলে আরূঢ় হইবার জন্য মুক্ত হইতে পারে এবং যাহাতে পূর্ণস্বাধীনতা এবং আত্মপ্রভুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয় তজ্জন্য মনের এবং ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ক্রিয়াবলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু রাজযোগ একথা ভুলিয়া যায় না যে, সাধারণ মনের অসামর্থ্য প্রধানতঃ স্নায়ু-মণ্ডলীর এবং দেহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সকলের অধীনতা হইতে উদ্ভূত হয়। এইজন্য সে হঠযোগের মধ্য হইতে তাহার আসন এবং প্রাণায়ামের কৌশল গ্রহণ করে, তাহাদের বহুশ্রমসাধ্য বহুবিস্তৃত রূপরাজি কমাইয়া আনিয়া এই উভয়ের প্রতিক্ষেত্রে যাহা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উদ্দেশ্যের পক্ষে প্রচুর অথচ সবলতম এবং সাক্ষাৎভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী এমন একটি-মাত্র প্রক্রিয়া রাখিয়া দেয়। এইভাবে রাজযোগ হঠযোগের ঝঞ্ঝাট ও জটিলতা হইতে নিজেকে মুক্ত করে কিন্তু সেই সঙ্গে দেহ ও প্রাণ ক্রিয়াকে শাসিত ও পরিচালিত করিবার জন্য এবং ভিতরে অব্যক্ত যে এক অতিপ্রাকৃত বৃত্তি আছে যোগের ভাষায় যাহাকে কুণ্ডলিনী বা কুণ্ডলিত এবং নিদ্রিত সর্পশক্তি বলে অন্তরের সেই বিশাল শক্তিকে জাগাইবার জন্য হঠযোগের দ্রুত ও বীর্য্যবন্ত-ভাবে কার্য্যকরী প্রণালীকে ব্যবহার করে। এই কার্য্যের পর রাজযোগ পর-ম্পরা ক্রমে স্থাপিত ধ্যান ধারণা প্রভৃতি নানা স্তরের মধ্য দিয়া যাহা সমাধিতে লইয়া যায় মননশক্তির সেই একাগ্রতা সাধনার সাহায্যে চঞ্চল মনকে পূর্ণরূপে নিশ্চল করিতে এবং এক উচ্চতর ভূমিতে উত্তীর্ণ করিতে অগ্রসর হয়।

যাহাতে মন তাহার সীমাবদ্ধ জাগ্রত চেতনা হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া চেতনার উচ্চতর এবং মুক্ততর ভূমি সকলে পৌঁছিবার ক্ষমতা লাভ করে সেই সমাধি দ্বারা রাজযোগ দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। ইহা দ্বারা সাধক বাহ্যচেতনার বিশৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত হইয়া মনের শুদ্ধ ক্রিয়া উপলব্ধি করে, এবং তথা হইতে উচ্চতর অতিমানস ভূমি সকলে প্রবেশ করে যেখানে ব্যষ্টি আত্মা তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাহা ছাড়া ইহার সাহায্যে যোগী বিষয় বা বস্তুর উপর চেতনাকে স্বাধীন ও ঘনীভূতভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার সেই সামর্থ্য বা তপঃশক্তি লাভ করে যাহাকে আমাদের দর্শনশাস্ত্র প্রাথমিক বিশ্বশক্তি বা জগতের উপরে দিব্য ক্রিয়ার ধারা বা ব্যবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। যে যোগী পূর্ব্বেই সমাধির অবস্থায় উচ্চতম জগদতীত জ্ঞান এবং অনুভূতিলাভ করিয়াছেন তিনি এই শক্তির বলে স্থূল বস্তুগত জগতে ক্রিয়াবলীর জন্য যে জ্ঞান, যে প্রয়োগবিধি, যে প্রভুত্ব প্রয়োজন বা উপযোগী, জাগ্রত অবস্থায় তাহা সাক্ষাৎভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন।

কেননা প্রাচীন রাজযোগের উদ্দেশ্য শুধু স্বরাজ্য, আত্মশাসন বা অন্তররাজ্য প্রতিষ্ঠা অথবা প্রত্যক্ বা অন্তর্মুখীন চেতনার (Subjective Consciousness) দ্বারা তাহার নিজরাজ্যের সকল অবস্থা এবং ক্রিয়াধারার উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন মাত্র ছিলনা ; বাহ্য সাম্রাজ্যলাভ, অন্তর্মুখীন চেতনার দ্বারা বাহ্য কর্ম্মাবলী এবং পরিবেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপনও তাহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যেমন হঠযোগ দৈহিক জীবন এবং তাহার সামর্থ্যসকলকে অতিপ্রাকৃত পূর্ণতা দিবাব লক্ষ্য লইয়া দেহ ও প্রাণকে ব্যবহার করে আবার তাহাকে অতিক্রম করিয়া মনোময় রাজ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ রাজযোগ মনোময় জীবনের সামর্থ্যসকলকে অতিপ্রাকৃতভাবে পূর্ণ ও প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে মনকে লইয়া কার্য্য করে আবার তাহাকে অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই পদ্ধতির ত্রুটি এই যে ইহা সমাধিব বিভিন্ন অস্বাভাবিক অবস্থার উপর অতিরিক্ত পবিমাণে নির্ভর করে। এই সীমাবন্ধন প্রথমতঃ আমাদিগকে জড়জীবন হইতে কতকটা দূরে লইয়া যায় অথচ এই জড়জীবন আমাদের ভিত্তি এবং কার্য্যক্ষেত্র, যাহার মধ্যে মনোময় এবং অধ্যাত্মজগতের অজন সকল লইয়া আসিতে হইবে। বিশেষতঃ এই পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক জীবন সমাধির অবস্থার সহিত বড় বেশী বিজড়িত। জাগ্রত অবস্থায় এমনকি ক্রিয়াসকলের স্বাভাবিক ব্যবহার ও পরিচালনার মধ্যেও আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও তাহার অনুভূতিসকলকে পূর্ণরূপে সক্রিয় ও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজযোগ জড়জীবনে অবতরণ এবং আমাদের সমগ্রসত্তাকে অধিকার করিবার পরিবর্ত্তে আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতিসকলের পশ্চাতে অবস্থিত দ্বিতীয় স্থানীয় এক ভূমিতে প্রত্যাহৃত হইয়া যাইতে চায়।

রাজযোগ যাহা অধিকার না করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যায়, ভক্তি জ্ঞান এবং কর্ম্মের ত্রিমার্গ সেই প্রদেশ জয় করিতে সচেষ্ট হয়। রাজযোগ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, পূর্ণতালাভের সর্ত্ত ও বিধানরূপে সমগ্র মনোময় প্রকৃতিকে বহুশ্রমসাধ্য বিস্তৃত শিক্ষা দিবার জন্য, ইহা নিজেকে পূর্ণরূপে ব্যাপৃত রাখে না, কিন্তু কেন্দ্রস্থানীয় কোনও প্রধান তত্ত্বকে অর্থাৎ বুদ্ধি হৃদয় বা ইচ্ছা শক্তিকে জোর করিয়া ধরে এবং তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা যে সমস্ত সাধারণ এবং বাহ্য বিষয়ে ও ক্রিয়ায় অভিনিবিষ্ট থাকে তথা হইতে তাহাদের গতিমুখ-অন্যদিকে ফিরাইয়া আনে এবং ভগবানের উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মান্তর বা রূপান্তর সাধন করে। আরও এক পার্থক্য এই যে—এবং এখানে

পূর্ণযোগের দিক হইতে দেখিলে ইহা একটা ত্রুটি বলিয়াই মনে হয়—ত্রিমার্গ মন ও দেহের পূর্ণতা সাধনের প্রতি উদাসীন, দিব্য উপলব্ধির সর্ত্ত বা বিধানরূপে আমাদের অন্তঃশুদ্ধিসাধন করাই শুধু তাহার লক্ষ্য। দ্বিতীয় আর একটি ত্রুটি এই, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বুদ্ধি হৃদয় ও সংকল্পশক্তিকে এক পূর্ণাঙ্গ দিব্য উপলব্ধির মধ্যে সমন্বিত ও সুসমঞ্জস করিয়া তুলিবার পরিবর্ত্তে ইহা সমান্তরাল তিনটি পথের একটিকে একান্তভাবে এবং প্রায়ই অপর দুইটির বিরোধী রূপে নির্ব্বাচিত করে।

জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপলব্ধি। ইহা মনোময় ভাবনা বা বিচারের পদ্ধতি ধরিয়া যথাযথ বিবেচনা বা বিবেকে পৌঁছে। ইহা আমাদের পরিদৃশ্যমান বা প্রাতিভাসিক সত্তার বিভিন্ন উপাদান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য বাহির করে, এবং তাহাদের কোনটার সহিত আত্মাকে একীভূত না করিয়া প্রাতিভাসিক প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গ, প্রাতিভাসিক চেতনার বা মায়ার বিভিন্ন বিসৃষ্টি বলিয়া প্রত্যেককে পৃথক ও বর্জন করে। এইভাবে ইহা, যাহার কোন পরিবর্ত্তন বা বিনাশ নাই, কোনও প্রতিভাস বা জগদ্ব্যাপার অথবা জগদ্ব্যাপারসমূহের কোনও সমাবেশ যাহাকে নির্ণয় বা নির্দ্দেশ করিতে পারে না সেই শুদ্ধ অদ্বিতীয় আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত যথার্থ তাদাত্ম্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। যেভাবে সাধারণতঃ এ পথ অনুসরণ করা হয় তাহাতে এ স্থান হইতে, ইহা প্রাতিভাসিক জগৎ সমূহকে মায়া বা ভ্রম বলিয়া চেতনা হইতে বর্জন করে এবং প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও উপায় না রাখিয়া ব্যষ্টিচেতনাকে পরব্রহ্মের মধ্যে লয় করিয়া দিবার দিকে অগ্রসর হয়।

কিন্তু এই ঐকান্তিক পরিণতি জ্ঞানমার্গের একমাত্র বা অপরিহার্য্য ফল নহে, কেননা ব্যক্তিগত লক্ষ্যের উপর ততটা জোর না দিয়া বৃহত্তরভাবে এ পথ অনুসরণ করিলে, যেরূপ ইহা বিশ্বাতীত স্থিতির দিকে তদ্রূপ ভগবানের জন্য সক্রিয়ভাবে বিশ্বসত্তাকে জয় করিবার দিকেও লইয়া যাইতে পারে। এই নূতন কার্য্যপ্রণালী আরম্ভ হয় যখন সাধক পরমাত্মাকে শুধু নিজ সত্তায় নহে কিন্তু তৎসঙ্গে সর্ব্বসত্তার মধ্যে অনুভব করে এবং অবশেষে জগতের প্রাতিভাসিক দিকটাকেও প্রকৃত ভগবৎপ্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিজাতীয় কিছু মনে না করিয়া তাহাকেও দিব্যচেতনার এক খেলা বলিয়া উপলব্ধি করে। আবার এই উপলব্ধির ভিত্তিতে আরও অধিক আত্ম-সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়া উঠিতে, যতই জাগতিক হউক না কেন সকলপ্রকার জ্ঞান রূপান্তরিত হইয়া দিব্যচেতনার ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে, যাহা ব্রহ্মের নিজসত্তায় হউক বা তাহার রূপ ও প্রতীক সকলের মধ্য দিয়া হউক সর্ব্বত্রই জ্ঞানের এক অদ্বয় বা অদ্বিতীয় বিষয়ের

ধারণা বা প্রত্যয় জাগাইতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরূপ এক পন্থা মানুষের বুদ্ধি ও অনুভবের সমগ্র বিস্তারকে দিব্যস্তরে লইয়া যাইতে, চিন্ময় করিয়া তুলিতে পারে এবং মানবজাতির মধ্যে দিব্যজ্ঞানকে জন্ম দিবার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির যে প্রসবযন্ত্রণা রহিয়াছে তাহার সমর্থন ও সার্থকতা সাধন করে।

ভক্তিমার্গের লক্ষ্য পরম প্রেম এবং আনন্দের উপভোগ : পরমপ্রভু ব্যক্ত পুরুষরূপে দিব্য প্রেমিক এবং জগতের ভোক্তা এই ধারণাই সাধনার পথে স্বাভাবিকভাবে ইহা কাজে লাগায়। জগৎ তখন প্রভুর এমন এক লীলাখেলা এবং মানুষের জীবন সে খেলার শেষ স্তর বলিয়া উপলব্ধি হয়, যে খেলা আত্মগোপন এবং আত্মপ্রকাশের নানা অবস্থা বা ক্রম অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। যাহার মধ্যে ভাবাবেগ অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে মানব-জীবনের তেমন সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধকে কাজে লাগানো, তাহাদিগকে ক্ষণস্থায়ী জাগতিক সম্বন্ধে আর প্রযোগ না করিয়া যিনি পরমপ্রেমিক, পরম সুন্দর এবং পরম আনন্দময় তাহার আনন্দের জন্য প্রয়োগ করা—ইহাই ভক্তিযোগের তত্ত্ব। পূজা ও ধ্যানের একমাত্র উদ্দেশ্য দিব্য সম্বন্ধের জন্য সাধককে প্রস্তুত করা এবং সে সম্বন্ধের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করা। এই যোগ ভাবাবেগময় সকলপ্রকার সম্বন্ধকে উদারভাবে ব্যবহার করে, তাই দেখা যায় ভগবানের প্রতি শত্রুতা এবং বিরোধিতা প্রেমেরই এক তীব্র অধীর এবং প্রতীপ বা বিপরীতমুখী রূপ এবং তাহাও মুক্তি ও সিদ্ধির এক সম্ভবপর উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই মার্গে সাধারণতঃ যেভাবে সাধনা করা হয় তাহাতে জগৎজীবন হইতে সাধককে দূরে এক সর্ব্বাতিগ বিশ্বাতীত বস্তুতে তদ্‌গত করে, অবশ্য তাহা জ্ঞানমার্গের অদ্বৈতবাদীর কাম্য অবস্থা হইতে ভিন্নপ্রকারের।

কিন্তু এখানেও এই ঐকান্তিক পরিণতি অপরিহার্য্য নহে। কিন্তু এ যোগের মধ্যে এই ঐকান্তিকতার সংশোধক এক প্রাথমিক ব্যবস্থা আছে, কেননা ইহা পরমাত্মা এবং ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধজনিত দিব্য প্রেমের খেলা শুধু এ-দুয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নাই, যাহারা এই একই পরমপ্রেম এবং আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য মিলিত হন সেই সমস্ত ভক্তের সাধারণ অনুভূতি ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের মধ্যেও তাহা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। সংশোধনের আরও এক সাধারণ ব্যবস্থা এই যে ইহা তাহার দিব্য প্রেমাস্পদকে সর্ব্বসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে, মানুষে সীমাবদ্ধ না করিয়া পশুর মধ্যেও সে দিব্যবস্তুকে দেখিতে চাহিয়াছে এবং এই অনুভূতি সহজেই জগতের সমস্ত মূর্ত্ত বস্তুতে প্রসারিত হইয়া পড়িতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে ভক্তি-যোগের এই বৃহত্তর প্রয়োগ এমনভাবে করা যাইতে পারে যে মানুষের ভাবাবেগ

সংবেদন এবং রসবোধের সমগ্র ক্ষেত্রকে উন্নীত করিয়া দিব্যস্তরে পৌঁছানো এবং চিন্ময় করিয়া তোলা যায়, এবং তাহাতে মানবজাতির মধ্যে প্রেম ও আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশ্বপ্রকৃতি যে কঠোর সাধনা করিতেছে তাহার সমর্থন মিলে।

কর্ম্মযোগের লক্ষ্য মানুষের প্রত্যেক ক্রিয়া পরমপুরুষের ইচ্ছার নিকট সমর্পণ। আমাদের কর্ম্মের সকল অহংগত উদ্দেশ্যের, স্বার্থ-সাধনের সকল লক্ষ্যের অথবা জাগতিক ফললাভের জন্য কর্ম্মের সমস্ত প্রচেষ্টা বর্জন করিয়াই এ যোগ আরম্ভ করিতে হয়। এই ত্যাগের দ্বারা আমাদের মন ও সংকল্প এরূপ বিশোধিত ও পবিত্র হয় যে আমরা সহজেই সচেতন হই যে মহতী বিশ্বশক্তিই আমাদের সকল কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্রী এবং সেই শক্তির প্রভুই তাহাদের শাস্তা ও নিয়ন্তা, ব্যষ্টিচেতনা তাহার মুখোশ, এক অজুহাত বা ছুতা, এক যন্ত্র অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে ক্রিয়া এবং ব্যবহারিক সম্বন্ধের এক সচেতন কেন্দ্রমাত্র। এমার্গে কর্ম্মের নির্ব্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ অধিকতর সচেতনভাবে এই পরম ইচ্ছা ও এই বিশ্বশক্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশেষে আমাদের সকল কর্ম্ম এবং সকল কর্ম্মফল তাহাতেই অর্পিত হয়। পরিদৃশ্যমান সব কিছুর বন্ধন এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াবলির প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মার মুক্তিই ইহার উদ্দেশ্য। অন্যান্য যোগপন্থার মত সাধারণতঃ কর্ম্মযোগকেও ব্যবহারিক জীবন হইতে মুক্ত করিয়া পরমবস্তুর মধ্যে প্রস্থানের পথে লইয়া যাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখানেও এই ঐকান্তিক পরিণাম অপরিহার্য্য নহে। সমভাবেই এ পথে অবশেষে সর্ব্বশক্তি সর্ব্বঘটনা সকল ক্রিয়ার মধ্যে ভগবদ-নুভূতি লাভ হইতে এবং অন্তরাত্মা বিশ্বক্রিয়ার মধ্যে স্বাধীন ও নিরহঙ্কারভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এইভাবে এ পন্থা অনুসরণ করিলে সমগ্র মানুষী ইচ্ছা এবং ক্রিয়া দিব্যস্তরে উন্নীত করিতে এবং তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক করিয়া তুলিতে পারা যায় এবং মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা, শক্তি এবং পূর্ণতা বিকশিত করিয়া তুলিবার দিকে বিশ্বপ্রকৃতিতে যে সাধনা চলিতেছে তাহারও সমর্থন মিলে।

পূর্ণাঙ্গভাবে দৃষ্টি করিলে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে এই তিনটি মার্গই এক। বস্তুতঃ এক ভগবৎপ্রেম স্বভাবতই প্রেমাস্পদের সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়া পূর্ণজ্ঞানে লইয়া যায় ও তাহার সেবায় প্রবৃত্ত করায়, এইভাবে ভক্তিযোগও জ্ঞান ও কর্ম্মযোগে পরিণত হয়। তদ্রূপ যে পূর্ণজ্ঞানে তাঁহাকে জানা হইয়াছে তাহা তাঁহার পূর্ণ প্রেম ও আনন্দে লইয়া যাইবার এবং তাহার কর্ম্মসকলকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার দিকেও লইয়া যায়;

আবার ঠিক তেমনিভাবে ভগবৎ-চরণে উৎসর্গীকৃত কর্ম্ম যজ্ঞেশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেমে এবং তাহার সত্তা ও কর্ম্মপন্থার গভীরতম জ্ঞানে পৌঁছাইয়া দেয়। সকল সত্তা এবং সকল অভিব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত অদ্বয় বস্তুর পরমজ্ঞান, পরাভক্তি এবং পরমসেবাতে আমরা এই ত্রিমার্গের মধ্য দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজভাবে পৌঁছিতে পারি।

৫

সমন্বয়

তাহাদের প্রকৃতি অনুসারেই প্রধান প্রধান যোগপন্থাগুলির প্রত্যেকটি তাহার নিজ ক্রিয়াধারায় মানুষরূপী জটিল অখণ্ড বস্তুটির একটি অংশকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যস্থিত উচ্চতম সম্ভাবনা সকলকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে ; অতএব ইহা বোধ হইতে পারে যে বৃহৎভাবে তাহাদের সকলগুলির এক সমন্বয়ের ধারণা করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে তাহার ফলে আমরা পূর্ণযোগে পৌছাইতে পারি। কিন্তু তাহাদের প্রবৃত্তিতে তাহারা এরূপ বিসদৃশ, তাহাদের প্রত্যেকে বহুশ্রমসাধ্য বিস্তৃত এবং অনন্য-সাধারণ বিশিষ্ট প্রণালীতে এরূপভাবে গঠিত, তাহাদের ভাব ও ক্রিয়াধারায় তাহারা পরস্পরের সহিত বিরোধে দীর্ঘকাল ধরিয়া এরূপ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত যে, কি করিয়া আমরা তাহাদের যথাযথ মিলন ও সমন্বয় করিব তাহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায়না।

সূক্ষ্মপ্রভেদ না দেখিয়া অবিবেচকের মত যোগপন্থাগুলির প্রত্যেকে যে ভাবে রহিয়াছে তাহা বজায় রাখিয়া তাহাদের একত্র সমাবেশ করিলে সমন্বয় দেখা দিবেনা, দেখা দিবে এক বিশৃঙ্খলা। মানুষের স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে সে যে শক্তির সীমিত ভাণ্ডার লইয়া কার্য্য করে তাহার পক্ষে একের পর অন্যকে লইয়া প্রত্যেককে পৃথকভাবে সাধনা করাও সহজ নহে ; ক্লেশকর এরূপ বিদ্‌ঘুটে প্রণালীতে চলিলে যে বিপুল পরিশ্রমের বৃথা ক্ষয় হইবে তাহার কথা নাই বা ধরিলাম। এইরূপভাবে কোন কোন সময়ে বস্তুতঃ হঠযোগ এবং

রাজযোগ পর পর সাধনা করা হয়। অবশ্য আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরম হংসের জীবনে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে এক বিরাট আধ্যাত্মিক সামর্থ্য প্রথমে ভগবদুপলব্ধির জন্য সোজাসুজি ছুটিয়া চলিয়াছে, নিজের প্রাবল্য দ্বারা যেন জোর করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতেছে এবং তাহার পর যোগপন্থাগুলিকে একের পর অন্যাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অত্যাশ্চর্য্য দ্রুতবেগে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য হইতে তাহাব সারমর্ম্ম টানিযা বাহির কবিতেছে, আবার সর্ব্বদাই সমস্ত ব্যাপারেব মূলে ফিরিযা আসিতেছে, প্রেমের শক্তির দ্বারা বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে নিজেব সহজাত আধ্যাত্মিকতাব সম্প্রসারণ দ্বারা এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত এক বোধিচেতনাব খেলার সহাযতায ভগবানকে লাভ কবিতেছে, তাঁহাব অনুভূতি পাইতেছে। কিন্তু এরূপ উদাহবণ সর্ব্বসাধাবণেব পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারেনা। আর তাহাব উদ্দেশ্যও ছিল বিশিষ্ট এবং সাময়িক, আজ মানবজাতির পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহার দিকে দীর্ঘকালব্যাপী পরস্পর সংঘর্ষশীল নানা সম্প্রদায ও মতবাদে বিভক্ত জগৎ অতিকষ্টে বহুবাধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, এক শ্রেষ্ঠ আত্মার মহৎ এবং স্থিরনিশ্চিত অনুভূতির মধ্য দিয়া সেই সত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনই ছিল সে উদ্দেশ্য, সে সত্য এই যে সকল সম্প্রদাযই একমাত্র এক পূর্ণাঙ্গ সত্যের বিভিন্ন রূপায়ণ এবং অংশ; সকল সাধন-পদ্ধতিই বিভিন্নপথে বহুশ্রমে একই পরম ও চরম অনুভূতির দিকে চলিয়াছে। একমাত্র প্রয়োজন হইল ভগবানকে জানা, তাঁহাব সহিত এক হওয়া, তাঁহাকে পাওয়া; বাকী সব-কিছু তাহার অন্তর্ভুক্ত আছে অথবা তদ্দ্বারা লাভ হয়; এই একমাত্র পরমকল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহা লাভ হইলে ভগবদিচ্ছা আমাদের জন্য যাহা নির্ব্বাচিত করে তেমন বাকী সব-কিছু, সকল আবশ্যকীয় রূপ এবং অভিব্যক্তি আমরা প্রাপ্ত হইব।

তাহা হইলে যোগপদ্ধতি সকলের যে সমন্বয় আমরা চাই, প্রত্যেকের স্ব স্বরূপ বজায় রাখিয়া তাহাদের একত্র সমাবেশ দ্বারা অথবা একের পর অন্যের পদ্ধতি অনুসারে সাধন করিয়া তাহা লাভ হইতে পারেনা। সুতরাং এ কার্য্যে সফল হইতে হইলে আমাদিগকে বিভিন্ন যোগপন্থার বাহ্যরূপ ও ক্রিয়াকলাপ উপেক্ষা করিয়া বরং তাহাদের সকলের মধ্যে যাহা সাধারণ এমন কোন কেন্দ্র-স্থানীয় তত্ত্বকে ধরিতে হইবে, যে তত্ত্বের মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষ তত্ত্বগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তাহাদিগকে যথাস্থানে এবং যথাপরিমাণে কাজে লাগানো যাইবে, আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন দিকগামী পন্থাগুলির মধ্যে সাধারণ গোপন রহস্যরূপে স্থিত কোন কেন্দ্রস্থানীয় সক্রিয়শক্তিকে ধরিতে

হইবে ; সে শক্তি কেন্দ্রস্থানীয় সাধারণ শক্তি বলিয়া, তাহাদের বিচিত্র বীর্য্য এবং বিভিন্ন উপযোগিতা সকলকে স্বাভাবিকভাবে নির্ব্বাচন ও সমাবেশ করিতে এবং একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিবে। যখন আমরা প্রকৃতির কর্ম্মধারা-গুলি এবং যোগের পদ্ধতি সকলকে লইয়া তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন প্রথমেই এই উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমানে আমরা এক বিশেষ সমাধান সাহস করিয়া উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা লইয়া সেই বিষয়ে ফিরিয়া আসিতেছি।

আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে ভারতে আজিও এক বিখ্যাত যোগপদ্ধতি রহিয়াছে যাহার প্রকৃতি স্বভাবতঃই সমন্বয়শীল, এবং যাহা প্রকৃতির এক মহান্ কেন্দ্রস্থানীয় তত্ত্ব, এক মহান্ সক্রিয় শক্তি হইতে জাত হইয়াছে ; কিন্তু এ যোগও অপর হইতে পৃথক, অন্যান্য মতের ইহা সমন্বয় নহে। এ মতের নাম তান্ত্রিক সাধনা। তাহার কোন কোন পরিণতির জন্য যাহারা তান্ত্রিক নহে তাহাদের নিকট তন্ত্র নিন্দার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, এই নিন্দা বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে তাহাদের বামমার্গের পরিণতিতে, যে পরিণতি পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া সন্তুষ্ট থাকে নাই, পাপ ও পুণ্যের স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত যথার্থ ক্রিয়াকে না বসাইয়া ইন্দ্রিয়-সেবা এবং অসংযত সামাজিক দুর্নীতির এক পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তৎসত্ত্বেও এ কথা বলিতে হইবে যে আদিতে তন্ত্র এক মহান ও শক্তিশালী পদ্ধতি ছিল, যে সমস্ত ধারণার উপর তাহার প্রতিষ্ঠা অন্ততঃ পক্ষে তাহারা আংশিকভাবে সত্য। এমন কি এক গভীর অনুভূতির ভিত্তি হইতেই তন্ত্রের দুইটি বিভাগ, দক্ষিণ ও বাম মার্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীন প্রতীকময় অর্থে দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গ এই দুই শব্দের দ্বারা জ্ঞানের পথ এবং আনন্দের পথের পার্থক্য বুঝাইত—মানুষের মধ্যস্থিত প্রকৃতি দক্ষিণমার্গে তাহার নিজ বীর্য্য, মূল-উপাদান এবং সম্ভাবনা সকলের শক্তি ও আচরণের মধ্যে যথার্থ সম্যক্ বিবেক বা জ্ঞানের দ্বারা এবং বামমার্গে সেই বীর্য্য, মূল-উপাদান ও সম্ভাবনা সকলের শক্তি ও আচরণের মধ্যে আনন্দময় স্বীকৃতির দ্বারা নিজেকে মুক্ত করে। কিন্তু পরিশেষে উভয়-মার্গের তত্ত্বসকল আচ্ছাদিত, প্রতীকসকল বিকৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে পতন ঘটিয়াছিল।

এখানেও যদি আমরা বাস্তব পদ্ধতি এবং আচরণ সকল পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া কেন্দ্রস্থানীয় তত্ত্বকে খুঁজি, তবে প্রথমে দেখিতে পাই যে তন্ত্র স্পষ্টতঃ যোগের বৈদিক পদ্ধতি সকল হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইয়াছে। আমরা এযাবৎ যে সমস্ত পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তত্ত্বের দিক দিয়া তাহারা এক

অর্থে সকলেই বৈদান্তিক ; জ্ঞানেই তাহাদের শক্তি নিহিত ; তাহাদের পদ্ধতি জ্ঞানচর্চ্চা, যদিও তাহা সর্ব্বদা বুদ্ধির বিবেক নহে, তৎপরিবর্ত্তে তাহা প্রেম ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হৃদ্‌গত জ্ঞান অথবা কর্ম্মের ভিতর প্রকাশিত সংকল্পগত জ্ঞান হইতে পারে। সে সকলের মধ্যে যিনি পুরুষ, চিন্ময় আত্মা, যিনি জানেন, পর্য্যবেক্ষণ আকর্ষণ ও পরিচালন করেন তিনিই যোগের অধীশ্বর। কিন্তু পক্ষান্তরে তন্ত্রে প্রকৃতি, প্রকৃতিগত আত্মা, (nature-soul) বীর্য্য বা সংকল্পশক্তিই জগতের কর্ত্রী। এই সংকল্পশক্তির, তাহার কর্ম্মপদ্ধতির, তাহার তন্ত্রের অন্তরঙ্গ গূঢ়রহস্য অবগত হইয়া তাহার প্রয়োগদ্বারা তান্ত্রিক যোগী তাহার সাধনার লক্ষ্য সকলের অর্থাৎ প্রভুত্ব, পূর্ণতা, মুক্তি ও পরমানন্দের অনুসরণ করিতেন ; অভিব্যক্ত প্রকৃতি এবং তাহার বাধা হইতে সরিয়া না গিয়া তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইতেন, তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে আক্রমণ ও জয় করিতেন। কিন্তু অবশেষে প্রকৃতিতে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে তান্ত্রিক যোগ তাহার আচার পদ্ধতির মধ্যে তাহার মূল তত্ত্ব বহুলপরিমাণে হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্টপদ্ধতি ও রহস্যপূর্ণ গোপন ক্রিয়ার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল ; তখনও যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইলে পদ্ধতিসকল বেশ শক্তিশালী হইত কিন্তু তখন তাহাদের আদি উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা হইতে তাহারা স্খলিত হইয়া পড়িল।

তন্ত্রের এই কেন্দ্রস্থানীয় ধারণার মধ্যে সত্যের একটা দিক আছে— শক্তির উপাসনাই সকল সিদ্ধিলাভের পক্ষে একমাত্র কার্য্যকরী শক্তি। ইহার অন্য সীমায় বেদান্তের এক চরম পন্থা শক্তিকে শুধু ভ্রমের শক্তি বলিয়া ধারণা করিয়াছে এবং সক্রিয় শক্তি যে সমস্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাহা হইতে মুক্তির জন্য নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষকেই খুঁজিয়াছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ধারণা এই যে চিন্ময় আত্মাই প্রভু এবং প্রকৃতিগত আত্মা তাহার কার্য্যসাধিকা শক্তি। নিজ প্রকৃতিতে পুরুষ সৎস্বরূপ, তিনি চিন্ময় স্বয়ম্ভূ সত্তা, শুদ্ধ এবং অনন্ত ; শক্তি বা প্রকৃতি চিৎস্বরূপা—ইহা পুরুষের আত্ম-সচেতন সত্তার শক্তি, ইহাও শুদ্ধ এবং অনন্ত। বিশ্রাম ও কর্ম্ম, নিশ্চলতা ও সক্রিয়তা এই দুই মেরুর মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন শক্তি চিন্ময় আত্মসত্তার পরমানন্দে মগ্ন রহিয়াছে তখন বিশ্রাম ; যখন পুরুষ নিজশক্তির ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দেন তখন কর্ম্ম, সৃষ্টি এবং সম্ভোগ বা সম্ভূতির আনন্দ দেখা দেয়। কিন্তু আনন্দ যদি স্রষ্টা, সকল সম্ভূতির জন্মদাতা হয় তবে তাহার ক্রিয়াধারা এই যে তপস্ বা পুরুষের চেতনার শক্তি নিজ সত্তার মধ্যে যে অনন্ত প্রচ্ছন্নাবস্থা বা সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার উপর কেন্দ্রীভূত হয় ; তথা হইতে

ধারণার সত্যসকল, সত্য ভাবনাবলি বা বিজ্ঞানময় সত্যরাজি উৎপন্ন হয়; এই সকল সত্য সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আত্মসত্তা হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের আত্মসার্থকতা ও আত্মপরিপূর্ণতার নিশ্চয়তা আছে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে মন প্রাণ ও দেহরূপে নিজ সম্ভূতির সকল প্রকৃতি ও বিধান বর্ত্তমান আছে। তপঃশক্তির চরম সর্ব্বশক্তিমত্তা ও বিজ্ঞানময় ভাবনার অমোঘ সার্থকতাই সকল যোগের ভিত্তি। এইগুলি মানুষের মধ্যে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প ও বিশ্বাসরূপে প্রকাশ পায়—এ সঙ্কল্প শেষে কার্য্যকরী হয় কারণ ইহা জ্ঞানের মূল উপাদান; আর বিশ্বাস হইল যাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই নিম্নতর চেতনায় সেই সত্যের বা বিজ্ঞানময় ভাবনার প্রতিবিম্ব। গীতা যখন বলিয়াছে ''যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'' 'যাহাতে মানুষের শ্রদ্ধা বা তাহার মধ্যের নিশ্চিত ভাবনা সে তাহাই হইয়া যায়,' তখন বিজ্ঞানময় ভাবনার এই আত্ম-নিশ্চয়তাই বুঝাইতে চাহিয়াছে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি মনস্তত্ত্বের দিক হইতে সেই প্রকৃতির ধারণা কি যাহা হইতে আমাদিগকে সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে; আর যোগ, মনো-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা নিজশক্তির মধ্য দিয়া পুরুষের আত্ম-সার্থকতা বা আত্ম-সম্পূর্ণতালাভ। কিন্তু প্রকৃতির গতিবিধি দ্বিবিধ, উচ্চতর এবং নিম্নতর অথবা আমরা তাহা দিব্য বা অদিব্য এই দুই শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতে পারি। বস্তুতঃ কিন্তু এ পার্থক্য কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য; কেননাএমন কিছুই নাই যাহা দিব্য নহে; শব্দগত ভাবে প্রাকৃতিক এবং অতিপ্রাকৃতিক এই দুই-এর পার্থক্য বৃহত্তর দৃষ্টিতে যেমন অর্থশূন্য,—কেননা যাহা কিছু আছে তাহা সবই প্রাকৃতিক—তেমনি দিব্য এবং অদিব্যের পার্থক্যও অর্থশূন্য। সব কিছুই প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, আবার সব কিছু ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটা প্রকৃত পার্থক্য আছে। নিম্নতর প্রকৃতিকেই আমরা জানি, আমরা তাহারই অন্তর্ভুক্ত আছি; এবং ততদিন পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত থাকিব, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের অন্তরস্থ শ্রদ্ধা পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত না হইবে; এই নিম্নতর প্রকৃতি সীমা ও ভেদের মধ্য দিয়াই ক্রিয়া করে, অবিদ্যাই তাহার ধর্ম্ম বা স্বভাব, অহংগত জীবনেই ইহার পরাকাষ্ঠা; কিন্তু উচ্চতর প্রকৃতি, যাহাতে পৌঁছিবার আস্পৃহা বা অভিলাষ আমরা পোষণ করি, মিলন ও একত্ব সাধনের মধ্য দিয়া সীমাকে অতিক্রম করিয়া ক্রিয়া করে, জ্ঞানই তাহার স্বভাব, শেষ সীমায় তাহা দিব্য জীবনে পরিণত হয়। নিম্নপ্রকৃতি হইতে উচ্চতর প্রকৃতিতে উত্তরণই যোগের উদ্দেশ্য; নিম্নতর প্রকৃতিকে বর্জন করিয়া উচ্চ-

তরের মধ্যে পলায়ন দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাই সাধারণ মতবাদ ; অথবা নিম্নতরকে রূপান্তরিত করিয়া এবং উচ্চতর প্রকৃতির মধ্যে উঠাইয়া দিয়া ইহা সাধিত হইতে পারে। এই পরবর্ত্তী পদ্ধতিই পূর্ণযোগের লক্ষ্য।

কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রে হউক না কেন, নিম্নতর প্রকৃতির অন্তর্গত কিছুর মধ্য দিয়াই আমাদিগকে উচ্চতর সত্তায় উঠিতে হইবে, এবং যোগের প্রত্যেক পন্থাই তাহার নিজস্ব স্থান হইতে যাত্রার অথবা তাহর পলায়নেব দ্বার বাছিয়া নেয় ; তাহার নিম্নতর প্রকৃতির কোন কোন ক্রিয়াধারাকে বিশেষভাবে কার্য্য-সাধনোপযোগী করিয়া তোলে এবং তাহাদিগকে ভগবানের দিকে ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃতির নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ক্রিয়ার একটা সর্ব্বাঙ্গীণ গতি আছে যাহাতে আমাদের সত্তার জটিল উপাদানগুলি আমাদের সকল পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের সমগ্র জীবনই প্রকৃতির যোগ। যে যোগ আমরা চাই তাহাকে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণ ক্রিয়া হইতে হইবে, প্রাকৃত মানুষ এবং যোগীর মধ্যে এই মাত্র পাথক্য থাকিবে যে যোগী ভেদের মধ্যস্থিত অহং ও ভেদ দ্বারা পরি-চালিত নিম্নতর প্রকৃতির সকল কর্ম্মধারার স্থানে পরাপ্রকৃতির পূণ কর্ম্মধারা প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তাহার সক্রিয়তাব উৎস ও পরিচালক হইবে ভগবান ও তাঁহার একত্ব। কিন্তু বস্তুতঃ যদি জগৎ হইতে ভগবানের নিকট পলায়নই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সমন্বয়ের কোন প্রয়োজন নাই, তাহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা কাল ক্ষয় মাত্র ; কেননা তখন আমাদের কার্য্যকরী উদ্দেশ্য হইবে হাজার পথের মধ্যে সোজাপথগুলির হ্রস্বতমটিকে বাছিয়া নেওয়া এবং অন্য যে সমস্ত পথ সেই একই চরমলক্ষ্যে লইয়া যায় তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সময়ক্ষেপ না করা। কিন্তু আমাদের সমগ্র সত্তার রূপান্তর সাধন করিয়া ভগবৎ-সত্ত্বায় পরিণত করা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে।

তাহা হইলে যে পদ্ধতি আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে তাহা এই যে আমাদের সমগ্র চেতন সত্তাকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে এবং তাঁহার সংস্পর্শে স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিব্য সত্তাতে রূপান্তরিত করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকেই আমাদের অন্তরে আবাহন করিতে হইবে, যাহাতে স্বয়ং ভগবান, আমাদের অন্তরস্থ প্রকৃত দিব্য পুরুষ, যেন নিজেই সাধনার সাধক এবং যোগের অধীশ্বর এ উভয়ই হইতে পারেন, যাহাতে তিনি নিজেই আমাদের নিম্নতর ব্যক্তিত্বকে এক দিব্য রূপান্তরের কেন্দ্র এবং তাহার নিজের সিদ্ধির বা পূর্ণতার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন।

বস্তুতঃ দিব্য প্রকৃতির, সম্ভূত বিজ্ঞানের (**Real Idea**) বা ঋতম্ভরা ভাবনার মধ্যে নিহিত আমাদের অন্তরস্থ তপোবীর্য্য বা চেতনার শক্তি আমাদের অখণ্ড সত্তার উপর কেন্দ্রীভূত প্রভাবের দ্বারা তাহার নিজের সিদ্ধি আনয়ন করে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান, যিনি ভগবান তিনিই সীমা ও অন্ধকারের উপর নামিয়া আসেন, সমগ্র নিম্নপ্রকৃতিকে ক্রমশঃ আলোকিত ও বীর্য্যবন্ত করিয়া তোলেন এবং নিম্নতর মানুষী আলোকের ও মর্ত্ত্যক্রিয়ার সকল অবস্থার স্থানে তাহার নিজ ক্রিয়াধারা প্রতিষ্ঠিত করেন।

মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের দিক হইতে এই পদ্ধতি হইতেছে অহংকারের পর-পারস্থিত এক সদ্বস্তু ও তাহার বিশাল ও অপ্রমেয় কিন্তু সর্ব্বদা অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মধারার নিকট ক্ষুদ্র বিবিক্ত অহং ও তাহার সকল ক্ষেত্র ও যন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মসমর্পন। নিশ্চয়ই ইহা সোজা রাস্তা নহে, ইহার সাধনাও সহজ নহে। ইহার জন্য অসীম বিশ্বাস, পরম সাহস এবং সর্ব্বোপরি অবিচলিত ধৈর্য্যের প্রয়োজন। কেননা ইহাতে তিনটি সোপান উপলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে শুধু শেষটি পূর্ণরূপে আনন্দময় এবং দ্রুত হইতে পাবে, সোপান তিনটির প্রথমটি হইল ভগবানের সংস্পর্শে আসিবার জন্য অহংএর প্রযত্ন, দ্বিতীয়টি উচ্চতর প্রকৃতিকে গ্রহণ করিবার এবং তাহা হইয়া উঠিবার জন্য দিব্য কর্ম্ম-ধারা দ্বারা সমগ্র নিম্নতর প্রকৃতিকে উদারভাবে ও পূর্ণরূপে সুতরাং শ্রমসাধ্য উপায়ে প্রস্তুতি, তৃতীয়টি অন্তিম রূপান্তর। বস্তুতঃ কিন্তু দিব্যশক্তি অনেক সময় অলক্ষিত এবং আবরণের পশ্চাতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের দুর্ব্বলতার স্থান অধিকার করে এবং আমাদের বিশ্বাস সাহস এবং ধৈর্য্যের সর্ব্বপ্রকার বিচ্যুতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে। ইহা "অন্ধকে দর্শনের এবং পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের শক্তি" দান করে। বুদ্ধি তখন এক পরমবিধানের কথা জ্ঞাত হয়, যাহা হিতৈষীর মত প্রণোদিত করে, এক সহায়তা দেখিতে পায় যাহা তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে; এবং হৃদয়, যিনি সর্ব্ববস্তুর প্রভু ও মানুষের বন্ধু এমন একজনের অথবা এক জগন্মাতার সন্ধান দেয়, যিনি সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও পদস্খলনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ধরিয়া রাখেন, সুতরাং এই পথ যত দুরূহ কল্পনা করা যায় তত দুরূহ, তথাপি ইহার বিপুল প্রয়াস ও উদ্দেশ্যের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুনিশ্চিত।

উচ্চতর প্রকৃতি যখন নিম্নতরের উপর পূর্ণভাবে ক্রিয়া করে তখন এই ক্রিয়ার তিনটি প্রধান সুপ্রকাশিত বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথম বিশেষত্ব এই যে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যান্য যোগপন্থার মত নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বা ক্রম-অনুসারে এ যোগশক্তি ক্রিয়া করে না; কিন্তু যাহার মধ্যে ইহা ক্রিয়া করে তাহার

যে ব্যক্তিগত স্বভাব আছে, তাহার প্রকৃতি যে সহায়কর উপাদান উপস্থিত করে এবং তাহার শুদ্ধি ও পূর্ণতার পথে যে বাধাসকল আনিয়া হাজির করে তদনুসারে নির্ণীত হইয়া ইহা একপ্রকার স্বাধীনভাবে যেন ইতস্ততঃ ছড়াইয়া থাকিয়া তথাপি ক্রমশঃ অধিকতর প্রগাঢ় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্রিয়া করে। এইজন্য এক অর্থে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক নিজস্ব যোগপদ্ধতি আছে। তথাপি কতকগুলি প্রধান ক্রিয়াধারা আছে যাহা সাধারণভাবে সকলের পক্ষে প্রযোজ্য, এইগুলির সাহায্যে আমরা বস্তুতঃ একটা বিধিবদ্ধ গতানুগতিক ধারা গঠন করিতে পারি না বটে কিন্তু তথাপি সংশ্লেষণ বা সমন্বয়মূলক যোগের একপ্রকার শাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের অতীত পরিণামের ফলে গঠিত হইয়া আমাদের প্রকৃতি বর্ত্তমানে যেরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ পদ্ধতি নিজে পূর্ণাঙ্গ বলিয়া, তাহাকে গ্রহণ করে এবং তাহার মধ্যস্থিত মৌলিক কোন কিছুকে বর্জন না করিয়া সকলকেই এক দিব্য রূপান্তর গ্রহণে বাধ্য করে। এক মহাশিল্পীর হস্ত আমাদের মধ্যস্থিত প্রতি বস্তুকে অধিকার করে এবং বর্ত্তমানে সে বস্তু বিশৃঙ্খল রূপে যে তত্ত্বের ব্যঞ্জনা দেয় সেই তত্ত্বেরই সুস্পষ্ট প্রতিরূপে তাহাকে রূপান্তরিত করে। সেই সদা বর্দ্ধমান অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা এই নিম্নতর অভিব্যক্তি কি ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করি; এবং দেখিতে পাই যে ইহার মধ্যস্থ প্রতিবস্তু দৃশ্যতঃ যতই বিরূপ ক্ষুদ্র বা নীচ হউক না কেন তবুও তাহা দিব্যপ্রকৃতির পরম সামঞ্জস্যের মধ্যস্থ কোন উপাদান বা ক্রিয়ার অল্পবিস্তর বিকৃত অথবা অপূর্ণ রূপ মাত্র। কামারশালায় কর্ম্মকার যেমন অশোধিত উপাদানগুলিকে পোড়াইয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটাইয়া কোন কিছু গড়িয়া তোলে তেমনিভাবে মানুষের পূর্ব্বপিতৃগণ দেবতাগণকে রূপ দিয়াছেন— বৈদিক ঋষিগণের এ-উক্তির প্রকৃত অর্থ তখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি।

তৃতীয়তঃ আমাদের অন্তরস্থ দিব্যশক্তি সমগ্র জীবনকে পূর্ণযোগের উপায়রূপে ব্যবহার করে। এই যোগের পথে আমাদের জাগতিক পরিবেশের প্রতি অনুভূতি এবং তাহার সহিত প্রতিটি বাহ্য সংস্পর্শ যতই তুচ্ছ বা বিপদজনক হউক না কেন, এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং প্রতিটি আন্তর অনুভূতি এমন কি তাহা অতি দারুণ যন্ত্রণা অথবা অতি অপমানজনক পতন হইলেও পূর্ণতার পথে একটি সোপান হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে আমাদের নিজের মধ্যে অনাবৃত চক্ষুতে জগতের মধ্যস্থিত ঈশ্বরের কার্য্যধারা দেখি ও স্বীকার করি এবং অন্ধকারের মধ্যে আলোকে, দুর্ব্বল ও পতিতের মধ্যে শক্তিতে, দুঃখ ও দুর্দ্দশাগ্রস্তের মধ্যে আনন্দে তাঁহার কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে পারি।

আমরা দেখিতে পাই যে নিম্নতর ও উচ্চতর ক্রিয়াধারার মধ্যে একই দিব্য পদ্ধতি রহিয়াছে ; কেবল একটিতে প্রকৃতির অবচেতনার মধ্য দিয়া অন্ধকারে অতি মন্থর গতিতে সে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, অন্যটিতে ইহা দ্রুত আত্মসচেতন হইয়া উঠে এবং সাধকরূপী যন্ত্র তাহার প্রভুর হস্ত সে পদ্ধতির মধ্যে দেখিতে পায় এবং স্বীকার করে। সকল জীবনই প্রকৃতির এক যোগ যাহাতে প্রকৃতি তাহার অন্তরস্থ ভগবানকে অভিব্যক্ত করিতে চাহিতেছে। যোগ সেই স্তর নির্দ্দেশ করে—যাহাতে প্রকৃতির এই সাধনা আত্মসচেতন হইতে সমর্থ হয় এবং সেইজন্য ব্যষ্টির মধ্যে যথার্থভাবে পূর্ণতালাভের সামর্থ্য লাভ করে। পরিণামধারার নিম্নতর স্তরে যে সমস্ত গতিবৃত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং শিথিলভাবে যুক্ত আছে যোগ তাহাদিগকে একত্রিত এবং সংহত করিয়া তোলে।

এক সর্ব্বাঙ্গীন সাধনাধারা তাহার এক সর্ব্বাঙ্গীণ ফল আনয়ন করে। প্রথমে চাই দিব্যসত্তার পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি ; অলক্ষ্যণীয় একত্বে সেই একের উপলব্ধিই কেবল নয় কিন্তু অসংখ্য বিভিন্ন বিভাবের মধ্য দিয়াও সেই একেরই উপলব্ধি চাই, সান্ত চেতনার পক্ষে দিব্যসত্তার পূর্ণজ্ঞানের জন্যও যাহা প্রয়োজন ; কেবল আত্মাতে একত্বের উপলব্ধি নহে, কিন্তু ক্রিয়া জগৎ এবং প্রাণীসকলের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

সুতরাং যোগ এক সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তিও বটে। যাহাতে ব্যষ্টি সত্তা ভেদের মধ্যে, দ্বৈতের মধ্যেও মুক্ত হয়, তাহার সকল অঙ্গে ভগবানের সহিত নিরবচ্ছিন্ন তেমন সংস্পর্শ বা সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইলে শুধু চলিবে না ; যাহাতে সমগ্র চেতন সত্তা ভগবানের সহিত, সচ্চিদানন্দের সহিত একই দিব্য স্থিতিতে বাস করে সেই সালোক্য মুক্তিও যথেষ্ট নহে, কিন্তু এই নিম্নতর সত্তাকে দিব্যভাবের মানুষী প্রতিরূপে রূপান্তরিত করিয়া দিব্যপ্রকৃতি লাভ বা সাধর্ম্ম্য মুক্তিও লাভ করিতে হইবে ; এবং চরম ও পরিপূর্ণ মুক্তি হইবে ক্ষণস্থায়ী অহংএর ছাঁচ হইতে চেতনাকে মুক্ত করিয়া সেই এক পরমপুরুষের সহিত একত্ব লাভ করা যিনি জগৎ এবং ব্যষ্টি এ উভয়ের মধ্যে সার্ব্বভৌমরূপে বিরাজিত আবার জগতের মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্বের অতীত এ উভয় অবস্থায় সর্ব্বাতীতভাবে অখণ্ড একত্ব রূপে বিরাজিত।

এই পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি এবং মুক্তির ফলে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের সকল পরিণতির মধ্যে এক পরিপূর্ণ সুসামঞ্জস্য দেখা দেয়। কেননা ইহাতে অহংএর কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে এবং যিনি সর্ব্বের মধ্যে এক অদ্বয় বস্তু এবং যিনি সর্ব্বাতীত তাহার সহিত সত্তার তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উপলব্ধিশীল

চেতনা তাহার উপলব্ধির দ্বারা সীমিত হয় না বলিয়া আমরা আনন্দঘন অবস্থার মধ্যে একত্বের এবং প্রেমের মধ্যে সুসমঞ্জস বৈচিত্র্যের অনুভূতি লাভ করি, যাহাতে আমাদের পক্ষে আমাদের সত্তার সুউচ্চ শিখরে পরম প্রেমাস্পদের সঙ্গে শাশ্বত একত্ব রক্ষা করিয়া তাহার লীলা বা খেলার মধ্যেও সকল সম্বন্ধ বজায় রাখা সম্ভব হয়; অনুরূপভাবে বিস্তার লাভের ফলে যাহা জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে এবং জগৎ হইতে পলায়নের উপর নির্ভর করে না, অন্তরাত্মার তেমন এক স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমিত্ব, বন্ধন এবং প্রতিক্রিয়াশূন্য হইয়া আমাদের মনে এবং দেহে মুক্তভাবে জগতের উপর প্রবাহিত দিব্যক্রিয়ার প্রণালী হইতে পারি।

দিব্যজীবনের প্রকৃতিতে যে শুধু স্বাধীনতা আছে তাহা নহে কিন্তু শুচিতা পরমানন্দ এবং পূর্ণতাও আছে। পূর্ণাঙ্গ মুক্তির অবস্থা হইল এমন এক সর্ব্বাঙ্গীণ পবিত্রতা যাহা এক দিকে দিব্যপুরুষকে আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ, অন্যদিকে আমাদের বাহ্য সত্তায় আমরা যে জটিল যন্ত্র তাহার যথাযথ ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া তাঁহার দিব্য সত্য ও বিধানকে জীবনের সকল অঙ্গে পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত করাইয়া দিতে সক্ষম। ইহার ফলে লাভ হইবে এক পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা, যাহাতে জগতে যাহা কিছু আছে তাহার সকলকে দিব্যপুরুষের প্রতীকরূপে দেখিবার আনন্দ এবং যাহা কিছু জাগতিক নয় তাহারও সকল আনন্দ যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মানুষী প্রকাশের সকল অবস্থার মধ্যে দিব্যভাবের প্রতিরূপ বা আদর্শে আমাদের মানবজাতিকে সর্ব্বাঙ্গীণ পূণতার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে, যে পূণতা হইবে সত্তা প্রেম আনন্দ ও জ্ঞানের খেলার এবং শক্তির ও নিরহঙ্কার ক্রিয়ার মধ্যে সংকল্পের খেলার একপ্রকার মুক্ত সর্ব্বজনীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণযোগের দ্বারা এই সর্ব্বাঙ্গীণতাও লাভ হইতে পারে।

মন ও দেহের পূর্ণতাও এ-পূণতার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং মানবজাতিকে সমন্বয়ের যে উদারতম সূত্র অবশেষে লাভ করিতে হইবে, রাজযোগ এবং হঠযোগের উচ্চতম সিদ্ধিও তাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যোগের মধ্য দিয়া মানুষের পক্ষে মন ও দেহের সাধারণ বৃত্তি এবং অনুভূতি সকলের পূর্ণপরিণতি যতটা সম্ভব অন্ততঃ ততটা পূর্ণযোগের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ মানসিক এবং দৈহিক জীবনে যদি তাহারা ব্যবহৃত না হয়, তবে তাহাদের অস্তিত্বের কোন কারণই থাকে না। তাহার প্রকৃতিতে এরূপ পূর্ণাঙ্গ মানসিক এবং দৈহিক জীবন হইবে, তাহার যথার্থ মনোময় এবং দৈহিক তত্ত্বে আধ্যাত্মিক জীবনের এক অনুবাদ, এক পরিবর্ত্তিত রূপ। এইরূপে আমরা

প্রকৃতির তিনটি অবস্থা এবং মানবজীবনের যে তিনটি রূপায়ণ প্রকৃতি বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিয়াছে বা করিতেছে তাহাদের এক সমন্বয়ে পৌঁছি। আমরা চাই যে আমাদের মুক্ত সত্তা এবং সিদ্ধ ক্রিয়াধারার মধ্যে যাহা আমাদের ভিত্তি সেই জড়জীবন এবং যাহা আমাদের মধ্যবর্ত্তী সাধনযন্ত্র সেই মনোময় জীবন, এ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

আবার এই যে পূর্ণাঙ্গতা লাভের আস্পৃহা আমরা বহন করি তাহা প্রকৃত এমন কি সম্ভবও হইবে না যদি তাহা কেবল ব্যষ্টি ব্যক্তিতে নিবদ্ধ থাকে। ভাগবত সিদ্ধির মধ্যে যেমন নিজেদের মধ্যে তেমনি অপরের মধ্য দিয়া সত্তাতে জীবনে এবং প্রেমে আত্মোপলব্ধি রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মুক্তি ও সিদ্ধির অপরিহার্য্য পরিণাম এবং ব্যাপকতম উপযোগিতা হইবে আমাদের মুক্তি এবং তাহার সকল ফলকে অপরের মধ্যে বিস্তার করা। এরূপ বিস্তারের সদা বর্ত্তমান ও স্বাভাবিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য হইবে ক্রমবর্দ্ধমানরূপে ও পরিশেষে সর্ব্বজনীন ভাবে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও পূর্ণতা সাধন।

উদার ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের এই সর্ব্বাঙ্গীণতা-সাধন-ক্রিয়ার ফলে মানুষের সাধারণ জড় জীবনে এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে তাহার ব্যবহারিক জীবনে, মানসিক ও নৈতিক আত্মোৎকর্ষের যে মহান প্রয়াস রহিয়াছে তাহা সমস্তই দিব্যভাবে বিভাবিত হইবে এবং তাহা যেমন আমাদের ব্যক্তিগত সাধনার তেমনি আমাদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মুকুটমণি হইয়া দাঁড়াইবে। এরূপ এক চরমোৎকর্ষ বাহিরের রাজ্যে অন্তরের স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয় বলিয়া, জগতের ধর্ম্মসকল বিভিন্ন ভাবে যে মহান স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে তাহাও খাঁটি সার্থকতা লাভ করিবে।

যাহাদের দৃষ্টি ভগবানে অর্পিত হইয়া দেখিয়াছে যে সেই দিব্যপুরুষ মানবজাতির মধ্যে গোপনে বাস করিতেছেন, তাহাদের পূর্ণ সাধনার একমাত্র উপযুক্ত বস্তু হইল, ভাবনায় যতটা পৌঁছা যায় ততটা পূর্ণতার এই উদারতম সমন্বয়।

প্রথম ভাগ

দিব্যকর্মযোগ

প্রথম অধ্যায়

সহায় চতুষ্টয়

যোগসিদ্ধি, যোগসাধনজনিত পূর্ণতা সর্ব্বোত্তমভাবে লাভ হয় চারিটি মহৎ সাধন যন্ত্র বা করণের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে। প্রথমটি 'শাস্ত্র'—যে সমস্ত সত্য, তত্ত্ব, শক্তি ও প্রণালীর উপর পরম উপলব্ধি নির্ভর করে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান। তাহার পর আসে 'উৎসাহ'—জ্ঞান দ্বারা নিরূপিত ধারাসকল অবলম্বন করিয়া ধীর ও অধ্যবসায়শীল ভাবে কর্ম্মের সাধনা, আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার শক্তি। তৃতীয় সহায় 'গুরু'—তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশ, উদাহরণ ও প্রভাব, যাহা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও প্রচেষ্টাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নীত করে। সর্ব্বশেষ সহায় 'কাল',—কারণ সকল বিষয়ে ক্রিয়ার এক কালচক্র, দিব্যক্রিয়া ও গতির একটা সময় আছে।

যাহা প্রত্যেক মননশীল প্রাণীর হৃদয়ে গোপনে নিহিত রহিয়াছে সেই সনাতন বেদই পূর্ণযোগের পরম শাস্ত্র। শাশ্বত জ্ঞান ও পূর্ণতার পদ্ম আমাদের অন্তরে মুদিত অপ্রস্ফুটিত কলিকারূপে বিদ্যমান আছে। যখন একবার মানুষের মন শাশ্বতের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করে, যখন একবার তাহার হৃদয় সসীমের প্রতি আসক্তির বন্ধন ও তাহার পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া যতটুকুই হউক না কেন অনন্তের প্রেমে আকৃষ্ট হয় তখন পরম্পরাগত উপলব্ধিসকলের মধ্য দিয়া সেই কলিকা দ্রুত বা ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে, তাহার দলগুলি একে একে উন্মীলিত হয়। তখন হইতে সকল জীবন, সকল ভাবনা, বৃত্তিসমূহের সকল উদ্দীপনা, সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সকল অনুভূতি এমন এক এক অভিঘাত হইয়া দাঁড়ায় যাহা আত্মার আবরণ বিদীর্ণ করে এবং তাহার অনিবার্য্য বিকাশের পথবর্তী অন্তরায় গুলি দূর করে। যে অনন্তকে বরণ করে, অনন্ত তাহাকে পূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন। সে পাইয়াছে সেই দিব্য সংস্পর্শ যাহা না পাইলে জাগরণ হয় না, অন্তরাত্মার উন্মীলন ঘটে না, কিন্তু একবার এই সংস্পর্শ লাভ হইলে সিদ্ধি

সুনিশ্চিত, হয় সে সিদ্ধি আসে মানুষের এক জন্মেই দ্রুতভাবে, নয়তো আসে এই ব্যক্ত বিশ্বে বহু জন্মচক্র ধরিয়া ধৈর্য্য সহকারে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার ফলে।

মনকে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া যায় না যাহা তাহার স্ফুটনোন্মুখ অন্তরাত্মার মধ্যে প্রচ্ছন্ন জ্ঞানরূপে পূর্ব্ব হইতেই নিহিত নাই। তেমনি বহিশ্চর মানুষ যে-সব পূর্ণতা লাভে সমর্থ তাহা তাহার অন্তরে স্থিত পুরুষের শাশ্বত পূর্ণতার উপলব্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ঈশ্বরকে জানি, ঈশ্বর হইয়া উঠি এই কারণে যে আমাদের নিগূঢ় প্রকৃতিতে আমরা চিরদিন তাহাই আছি। সকল শিক্ষাই যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহার প্রকাশ, সকল সম্ভূতি অন্তরে যাহা আবৃত আছে তাহার আবরণ উন্মোচন। আত্মোপলব্ধিই পরম রহস্য, আত্মজ্ঞান এবং চেতনার ক্রমিক বিকাশ তাহার উপায় ও প্রণালী।

সাধারণতঃ শব্দ বা শ্রুত বস্তুই এই নিগূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করে। এই শব্দ যেমন আমাদের অন্তর হইতে তেমনি বাহির হইতে আসিতে পারে। কিন্তু যেভাবেই আসুক না কেন ইহার ফল হইল প্রচ্ছন্ন জ্ঞানকে সক্রিয় করা। এ শব্দ হইতে পারে আমাদের অন্তরতম যে আত্মা সর্ব্বদা ভগবানের দিকে উন্মুক্ত তাহার বাণী অথবা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট গোপন জগদ্‌গুরুর উক্তি। ক্বচিৎ কোন সাধকের আর অন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, কেন না সেই নিরবচ্ছিন্ন সংস্পর্শ ও পরিচালনার ফলে তাহার যোগ-সাধনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্ম-উন্মীলনে পর্য্যবসিত হয়; যিনি হৃদ্‌পদ্মে নিত্য অধিষ্ঠিত তাহার প্রদীপ্ত জ্যোতিবিচ্ছুরণের প্রভাবে ভিতর হইতে জ্ঞানের শতদল আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। সেরূপ মহান পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প যাঁহাদের পক্ষে ভিতর হইতে আগত এই আত্মজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত এবং কোন লিখিত গ্রন্থ বা জীবন্ত গুরুর প্রবল প্রভাবের অধীন হইয়া চলিবার প্রয়োজন আর যাঁহাদের থাকে না।

সাধারণতঃ সাধকের আত্ম-উন্মীলন কার্য্যে সহায়তার জন্য ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন বহিরাগত শব্দের প্রয়োজন হয়; এই শব্দ অতীত কালের কোন মহাবাক্য অথবা জীবন্ত গুরুর মুখনিঃসৃত আরও অধিক শক্তিশালী কোন উক্তি হইতে পারে। কখন কখন প্রতিভূস্বরূপ এই বাক্য আন্তর শক্তির জাগরণ ও অভিব্যক্তির উপলক্ষ মাত্র হয়, যেন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ভগবানও যে সর্ব্বজনীন বিধান প্রকৃতিকে শাসিত করে, স্বেচ্ছায় তাহাকে মানিয়া চলেন। তাই উপনিষদে বলা হইয়াছে যে

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি ঘোরের নিকট হইতে একটি শব্দ প্রাপ্ত হইয়াই পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সাধনার দ্বারা অন্তরে কেন্দ্রগত দিব্য আলোক লাভ করিয়া নানা প্রকার যোগমার্গের সাধনায় কয়েকজন গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যত সহজে এবং যে প্রকার দ্রুতভাবে সেই সব পন্থায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় যে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করিবে এই যে সাধারণ বিধি ছিল, তাহার গুরুকরণ ছিল সেই বিধির স্বীকৃতি মাত্র।

কিন্তু সাধারণতঃ সাধকের জীবনে প্রতিনিধিস্থানীয় গুরুর প্রভাবের আরও সুবৃহৎ এক স্থান রহিয়াছে। যোগ যদি পরম্পরাগত কোন লিখিত শাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—যাহার মধ্যে অতীত যোগীগণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিহিত আছে তাহাই শাস্ত্র—তাহা হইলে সে যোগ শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা অথবা সদ্‌গুরুর সাহায্যে অভ্যাস করা যাইতে পারে। তারপর উপদিষ্ট সত্যরাজির ধ্যানধারণার দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়, আর ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সেই সত্যের উপলব্ধি দ্বারা সে জ্ঞানকে জীবন্ত ও সচেতন করিয়া তোলা হয়; শাস্ত্রোপদিষ্ট পদ্ধতি অথবা ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া সাধনা অগ্রসর হয়, গুরুর উপদেশ তাহাকে আরও শক্তিমান ও দীপ্তিমান করিয়া তোলে। এ প্রণালী অবশ্য সঙ্কীর্ণ কিন্তু নিরাপদ এবং আপন সীমার মধ্যে ফলপ্রসূ; কেননা ইহাতে প্রশস্ত বাঁধা রাস্তায় দীর্ঘকাল হইতে পরিচিত লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়।

পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, লিখিত শাস্ত্র যতই বৃহৎ রূপে প্রামাণিক বা তাহার দৃষ্টি যতই উদার হউক না কেন তাহা শাশ্বত জ্ঞানের আংশিক প্রকাশের বেশী কিছু হইতে পারে না। সাধক তাহা ব্যবহার করিবেন বটে কিন্তু সর্ব্বোত্তম শাস্ত্রের মধ্যেও নিজেকে কখন নিবদ্ধ রাখিবেন না। শাস্ত্রগ্রন্থ গভীর, বিস্তৃত ও উদার হইলে তাহা উচ্চতম মঙ্গল লাভের জন্যই সাধকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত প্রয়োজনীয় হইতে পারে। সাধকের অনুভূতিতে তেমন গ্রন্থ তাহার পরম সত্যের মধ্যে জাগরণের ও উচ্চতম উপলব্ধি সকলের সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার যোগসাধনা এক বা পর পর বহু ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বারা অনুশাসিত হইতে পারে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে হিন্দুজাতির বৃহৎ ঐতিহ্যের অনু-যায়ীভাবে চলিলে গীতা উপনিষদ ও বেদ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। অথবা হয়ত সাধকের পরিণতির একটা প্রধান অঙ্গ এই হইবে যে তিনি তাঁহার সাধনার মধ্যে বহু শাস্ত্র গ্রন্থের নানা বিচিত্র সত্যানুভূতির সমৃদ্ধ উপাদানরাজির সমাবেশ

করিবেন, অতীতের মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহা দ্বারা ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন। কিন্তু অবেশষে—অথবা অবশেষে কেন যদি সম্ভব হয় তবে প্রথম হইতেই লিখিত শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া—'শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে'—সাধককে তাহার নিজের আত্মার মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিতে হইবে; তিনি যাহা শুনিয়াছেন বা ভবিষ্যতে শুনিবেন সে-সবকে—শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ—ছাড়াইয়া গিয়া উর্দ্ধে দাঁড়াইতে হইবে কেননা তিনি বিশিষ্ট গ্রন্থ বা গ্রন্থরাজির সাধক নহেন, সাধক তিনি অনন্তের।

আর এক প্রকারের শাস্ত্র আছে যাহা ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ নহে কিন্তু সাধক যে যোগমার্গ অনুসরণ করিতে চায় সে শাস্ত্রে তাহার বিজ্ঞান পদ্ধতি মুখ্যতত্ত্ব ও ক্রিয়াধারার বর্ণনা আছে। প্রত্যেক যোগপন্থাতে এরূপ শাস্ত্র আছে যাহা হয় লিখিত অথবা পরম্পরাগত অর্থাৎ গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের লোকে সাধারণতঃ এই লিখিত শাস্ত্র অথবা ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষাকে প্রামাণিক মনে করে তাহাকে উচ্চ সম্মান দেয় ও গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ধরিয়া নেওয়া হয় যে যোগের সকল সাধন-ধারা নির্দ্দিষ্ট বা নির্দ্ধারিত, আর যে গুরু ঐতিহ্য অনুসারে শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং নিজ সাধনার আলোকে তন্মধ্যস্থিত সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই শিষ্যকে চিরন্তন পথে পরিচালিত করিতে পারেন। তাই নূতন সাধনপ্রণালী, যোগের নূতন শিক্ষা বা উপদেশ, যোগের নূতন সূত্র প্রচলনের বিরুদ্ধে এই আপত্তি প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় যে "ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে।" কিন্তু যোগীগণের সাধন পথে বস্তুতঃ কিম্বা কার্য্যতঃ নূতন সত্য, নবীন অভিব্যক্তি কিম্বা বিশালতর অনুভূতিকে ভিতরে আসিতে না দেওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রবেশদ্বার দৃঢ়ভাবে অর্গলবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। লিখিত শাস্ত্র বা ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষা বহু শতাব্দীর সঞ্চিত সুগঠিত ও সুব্যবস্থিত, নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজলভ্য করিয়া রচিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাই ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু প্রয়োজন মত ইহার কিছু অদলবদল কিম্বা সম্প্রসারণ করিবার পক্ষে কার্য্যতঃ বেশ স্বাধীনতা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। এমন কি রাজযোগের মত এত উচ্চ বৈজ্ঞানিক যোগপদ্ধতিও পতঞ্জলির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার স্থানে অন্য ধারাতে অভ্যাস করা যায়। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিমার্গের প্রত্যেকে বহু উপপথে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা সকলে আসিয়া পুনরায় এক শেষ গম্য স্থানে মিলিত হইয়াছে। যে সাধারণ জ্ঞানের উপর যোগ নির্ভর করে তাহা নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত কিন্তু তাহার ব্যবস্থা, অনুক্রম, প্রণালী ও রূপের কতকটা

অদলবদল করিয়া নিতেই হয়; কেননা মূল সত্যসকলকে দৃঢ় ও অচল রাখিয়াও ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রয়োজন এবং বিশেষ প্রবৃত্তিরাজির পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইবে।

সমন্বয়মূলক পূর্ণযোগের পক্ষে লিখিত বা পরম্পরাগত কোন শাস্ত্রের গণ্ডির মধ্যে বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই; কেননা এ যোগ অতীতের জ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করিলেও তাহাকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। ইহার আত্মরূপায়ণের বিধান হইবে আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভ এবং লব্ধ জ্ঞানকে নূতন ভাষায় এবং নূতন যোজনায় পুনর্বর্ণন করিবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। সমগ্র জীবনকে আলিঙ্গন ও নিজের মধ্যে গ্রহণ করা এ যোগের লক্ষ্য বলিয়া ইহার সাধক তীর্থযাত্রীর মত রাজপথ ধরিয়া যে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে একথা বলা চলে না বরং বলিতে হয় দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটিয়া তাহাকে নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করিয়া লইয়া চলিতে হইবে। কারণ বহুকাল হইতে যোগ বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে; আমাদের বৈদিক পিতৃপুরুষগণ দ্বারা আচরিত সাধনপন্থার মত যে সমস্ত যোগপ্রণালী একদিন আমাদের জীবনকে অধিকার করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছি, সে সমস্ত যে ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এখন আর আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না, যেরূপে তাহাদের প্রয়োগ হইত বর্তমানে তাহা আর চলে না। শাশ্বত কালের স্রোতে মানুষ অনেক অগ্রসর হইয়াছে এবং পূর্ব্বের সেই এক সমস্যাই সমাধানের চেষ্টা নূতন দিক হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

এই যোগদ্বারা আমরা যে কেবল অনন্তকে খুঁজিতেছি তাহা নয় পরন্তু আমরা মানবজীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে আবাহনও করিতেছি। তাই আমাদের যোগের শাস্ত্র এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে তাহাতে নব নব আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণক্ষম মানবাত্মাকে অব্যাহত স্বাধীনতা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত পুরুষকে নিজস্ব ধরণে ও নিজস্ব ধারায় আপনার মধ্যে গ্রহণ করিবার কর্ম্মে প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে, ইহাই মানুষের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের যথার্থ বিধান। এই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে ক্রমবর্দ্ধমান নানা বৈভব ও রূপবৈচিত্র্যের দ্বারাই সকল ধর্ম্মের অখণ্ড একত্ব অপরিহার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, আর ধর্ম্মের মূলগত একত্বের পরিপূর্ণ অবস্থা তখনই দেখা দিবে যখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এক ধর্ম্ম থাকিবে, যখন মানুষ ধর্ম্মের সম্প্রদায় কিম্বা পরম্পরাগত রূপের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার আপন প্রকৃতির স্বাধীন

নির্দ্দেশ অনুসারে পরমপুরুষের সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। তদ্রূপ ইহা বলা যায়, যে পূর্ণযোগের পূর্ণতা ও সিদ্ধি তখনই আসিবে যখন প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজস্ব যোগপন্থা অনুসরণ করিতে পারিবে, যখন অপরা-প্রকৃতির উর্দ্ধে যে পরতত্ত্ব আছে তাহার দিকে তাহার স্বভাবের উৎক্রান্তির অনুসরণ করিয়া পরিণতির পথে সে অগ্রসর হইবে। কারণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতাই চরম বিধান ও শেষ পরিণতি।

তবু ইতিমধ্যে কয়েকটি সাধারণ ধারা গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহা সাধকের ভাবনা ও সাধনার পথ দেখাইতে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু বাঁধাধরা কার্য্যক্রমের তালিকার মত যাহাকে অনুসরণ করিতে হইবে এমন নির্দ্দিষ্ট কোন রীতি বা প্রণালী না হইয়া যতদূর সম্ভব সে ধারাগুলি হইবে সর্ব্ব-জনীন সত্যরাজির রূপ ও মূল তত্ত্বের সাধারণ বিবৃতি এবং সাধকের প্রচেষ্টা ও পরিণতির জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও উদার ব্যবস্থা। সকল শাস্ত্রই অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে জাত এবং ভবিষ্যৎ অনুভূতির সহায় ও আংশিক পথপ্রদর্শক। শাস্ত্র পথনির্দ্দেশক স্তম্ভের কাজ করে, যে স্তম্ভে প্রধান রাস্তাগুলির নামোল্লেখ থাকে, আর থাকে যেপথ ইতিপূর্ব্বেই পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে তাহার দিগ্‌দর্শন, যাহাতে পর্য্যটক কোন্ দিকে এবং কোন্ পথে চলিতেছে তাহা জানিতে পারে।

আর বাকিটা নির্ভর করে সাধকের প্রযত্ন ও অনুভূতি এবং গুরু-শক্তির উপর।

যোগ সাধনার প্রারম্ভে এবং তাহার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত অনুভূতির ক্রমবিকাশ কত দ্রুত হইবে তাহার পরিমাণ গভীরতা ও শক্তি কিরূপ হইবে, তাহা প্রধানতঃ সাধকের আস্পৃহা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিবে। যোগসাধনার অর্থ বস্তুর বাহ্যরূপে ও আকর্ষণে অভিনিবিষ্ট অহংগত চেতনা হইতে মানবাত্মার এক উচ্চতর অবস্থার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ানো, যে অবস্থার মধ্যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত সত্তা ব্যক্তিগত আধারে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া তাহার রূপান্তর সাধন করিতে পারেন। প্রথম দিকে সিদ্ধি নির্ভর করে এই ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ানোর তীব্রতার উপর আর যাহা আত্মাকে অন্তর্মুখী করিয়া দিবে সেই শক্তির উপর। এই তীব্রতার পরিমাপ হইবে সাধকের হৃদয়ের আস্পৃহা কতটা শক্তিমান হইয়াছে, তাহার সংকল্পের কতটা সামর্থ্য জন্মিয়াছে, মনে কতটা একাগ্রতা জাগিয়াছে, কতটা ধৈর্য্য ও কতটা দৃঢ়তা লইয়া সাধক

তাহার শক্তিপ্রয়োগ করিতেছে এই সমস্ত দিয়া। আদর্শ সাধক বাইবেলের ভাষায় বলিতে সমর্থ হইবে "প্রভুর জন্য আকুলতাই আমাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।" প্রভুর জন্য এই উৎসাহ ও আকুলতা, দিব্য পরিণতির জন্য সমগ্র সত্তার ব্যাকুলতা, ভগবানকে পাওয়ার জন্য হৃদয়ের তীব্র ব্যগ্রতা, ইহাই অহংবোধকে গ্রাস করিয়া এবং ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ আধারের সকল গণ্ডি ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই পরম বাঞ্ছিতকে বৃহৎরূপে ও পূর্ণভাবে আবাহন ও গ্রহণের জন্য সাধককে প্রস্তুত করে, যে বাঞ্ছিত নিজে বিশ্বাত্মা বলিয়া, বৃহত্তম ও উচ্চতম ব্যক্তিগত সত্তা ও প্রকৃতির উপরে এবং বিশ্বাতীত বলিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

কিন্তু যে শক্তি পূর্ণ পরিণতির জন্য ক্রিয়া করিতেছে ইহা হইল শুধু তাহার একটা দিক। পূর্ণযোগ পদ্ধতির তিনটি স্তর আছে, যাহা পূর্ণরূপে পৃথক ও বিভিন্ন না হইলেও অনেক পরিমাণে পরম্পরারূপে অবস্থিত। প্রথম স্তর হইবে অন্ততপক্ষে প্রারম্ভিক শক্তিপ্রদ আত্মোৎক্রান্তির এবং দিব্যপুরুষের সংস্পর্শের জন্য একটা প্রয়াস; দ্বিতীয় স্তর যিনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এবং যাঁহার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে, আমাদের সমগ্র চেতন সত্তার রূপান্তরসাধনের জন্য তাঁহাকে নিজের মধ্যে আবাহন ও প্রতিষ্ঠা; শেষস্তরে জগতে দিব্যকেন্দ্ররূপে সেই রূপান্তরিত মানবতার নিয়োগ। যতক্ষণ পরমদেবতার সহিত সংস্পর্শ যথেষ্ট পরিমাণে স্থাপিত না হইতেছে যতক্ষণ কতকটা পরিমাণে একত্বকে ধরিয়া থাকিতে বা সাজুয্য লাভ করিতে না পারা যাইতেছে ততক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা মুখ্যস্থান অধিকার করিবে। কিন্তু যে পরিমাণে এই সংস্পর্শ স্থাপিত হইবে সাধক সেই পরিমাণে সচেতন হইবে যে যাহা তাহার নিজ শক্তি নহে এবং যাহা তাহার অহংগত প্রচেষ্টা শক্তি ও সামর্থ্যকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে তেমন এক বৃহৎ শক্তি তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে এবং তখন এই শক্তির কাছে ক্রমশঃ যে বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং তাহারই হাতে তাহার যোগের সমস্ত ভার তুলিয়া দিতে শিখিবে। অবশেষে তাহার নিজের শক্তি ও সংকল্প এই উর্দ্ধ্বতর শক্তির সহিত এক হইয়া যাইবে; সে ভাগবত সংকল্প এবং বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত ভাগবত শক্তির মধ্যে তাহাদের ডুবাইয়া দিবে। তখন হইতে সাধক দেখিতে পাইবে যে সেই দিব্য সংকল্প ও শক্তি এরূপ নিরপেক্ষ জ্ঞান ও পরিণামদর্শী নিপুণতার সহিত তাহার মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় সত্তার প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তরসাধন ক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করিতেছে, যাহা অধীর ও স্বার্থপর অহংএর পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই তদ্রূপতা

বা তাদাত্ম্য লাভ এবং এই আত্মবিলোপ পূর্ণ হইলে বুঝিতে হইবে জগতে এক দিব্য কেন্দ্র প্রস্তুত হইল। শুদ্ধ মুক্ত নমনীয় ও আলোকিত হইয়া সেই কেন্দ্র সমগ্র মানবজাতির বা অতিমানবের বৃহত্তর যোগের, পৃথিবীর আধ্যাত্মিক প্রগতির, জগতের দিব্যরূপান্তরের জন্য পরমাশক্তির সাক্ষাৎ ক্রিয়ার উপায় ও বাহনরূপে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবে।

বস্তুতঃ এই উচ্চতর শক্তি সর্ব্বদাই কাজ করে। আমাদের অহংগত মন দিব্যশক্তির ক্রিয়াধারা সকলের সহিত নিজেকে ভ্রান্তভাবে ও অপূর্ণরূপে যে এক করিয়া দেখে তাহা হইতেই আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও আস্পৃহার বোধ আসে। এই অহংগত মন তাহার যে সাধারণ বৃত্তি প্রয়োগ করিয়া জগতের প্রাকৃত অনুভূতিসকল গ্রহণ করে, অতিপ্রাকৃত ভূমির অনুভূতিতেও সেই বৃত্তি সেই ভাবেই প্রয়োগ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হয়। জগতে আমরা অহংবোধ লইয়াই ক্রিয়া করি ; যে বিশ্বশক্তিরাজি আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে তাহাদিগকে আমরা নিজের শক্তি বলিয়াই দাবি করি ; আমাদের মন প্রাণ ও দেহের মধ্য দিয়া বিশ্বাতীত পুরুষের যে নির্ব্বাচন রূপায়ণ ও প্রগতির ক্রিয়া সকল চলিতেছে, আমরা দাবি করি যে তাহারা আমাদের ব্যক্তিগত সংকল্প জ্ঞান শক্তি ও গুণেরই পরিণাম। আমরা যখন জ্ঞানালোক পাই তখন বুঝি যে আমাদের অহমিকা একটি যন্ত্রমাত্র ; তখন আমরা বুঝিতে ও অনুভব করিতে আরম্ভ করি এই সমস্ত বস্তুও আমাদের নিজের বটে, তবে তাহা এই অর্থে যে তাহারা আমাদের পরম আত্মা বা সমগ্র সত্তার নিজস্ব, যে সত্তা বিশ্বাতীত সদ্বস্তু হইতে অভিন্ন, তাহারা আমাদের যান্ত্রিক অহমিকার নিজস্ব নয়। কাজের মধ্যে যথার্থ শক্তি হইতেছে ভগবানের, সে ক্রিয়াধারার মধ্যে আমাদের দান শুধু সীমার বন্ধন ও বিকৃতি। মানুষের অহমিকা যখন উপলব্ধি করে যে তাহার ইচ্ছা একটা যন্ত্রমাত্র, তাহার জ্ঞান শুধু বালসুলভ চাপল্য ও অজ্ঞানতা, তাহার শক্তি শুধু শিশুর মত হাতড়ানো ছাড়া অন্য কিছু নয়, তাহার সাধুতা শুধু আড়ম্বরপূর্ণ এক অশুদ্ধি, এবং সে যখন যাহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, তাহাকে বিশ্বাস ও তাহার উপর নির্ভর করিতে শিখে তখনই আসে তাহার যথার্থ মুক্তি। যাহার প্রতি আমরা অতি গভীররূপে আসক্ত আমাদের সেই আপাত প্রতীয়মান স্বাধীনতা ও ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরে লুক্কায়িত আছে বিজাতীয় সহস্র প্রকার আবেগ শক্তি ও ব্যঞ্জনার নিকট আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের অতি শোচনীয় এক দাসত্ব। আমাদের যে অহং তাহার স্বাধীনতার এত গর্ব্ব করে বস্তুত সে প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বপ্রকৃতির অগণিত সত্তা শক্তি সামর্থ্য ও প্রভাবের আজ্ঞাবহ ভৃত্য, খেলার বস্তু বা ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। দিব্য পুরুষের মধ্যে এই অহমিকার

আত্মবিসর্জনই তাহার আত্মসার্থকতা ; যাহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া আছে তাহার নিকট আত্মসমর্পণই তাহার সীমা ও বন্ধন হইতে মুক্তি ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।

তবু কার্য্যতঃ ক্রমবিকাশের পথে এই তিন স্তরের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে, এবং প্রত্যেকটিকেই তাহার উপযুক্ত সময় ও স্থান দিতে হইবে। একেবারে চরম ও উচ্চতম স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করা চলিবে না, তাহা নিরাপদ বা কার্য্যকরী হইতে পারে না। তেমনই অকালে বা অপরিপক্ক অবস্থায় এক স্তর হইতে অন্য স্তরে লম্ফ প্রদান করাও উচিত হইবে না। কেননা, যদিও আমরা প্রথম হইতেই মনে ও হৃদয়ে পরমপুরুষকে স্বীকার করি, তবু প্রকৃতির মধ্যে এমন সকল উপাদান আছে যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত এই স্বীকারকে উপলব্ধিতে পরিণত হইতে দেয় না। কিন্তু উপলব্ধি ব্যতীত আমাদের মনোময় বিশ্বাস সক্রিয় সত্য হইয়া উঠিতে পারে না, ইহা জ্ঞানের এক বাহ্যমূর্ত্তি মাত্র থাকিয়া যায়, জীবন্ত সত্য হয় না, একটা ভাব বা ধারণা রূপে রহিয়া যায়, তখনও শক্তিরূপে প্রকাশ পায় না। এমন কি যখন উপলব্ধি আসিতে আরম্ভ হইয়াছে তখনও অতি দ্রুত ইহা কল্পনা করা বা ধরিয়া নেওয়া বিপজ্জনক যে আমরা পূর্ণরূপে পরমপুরুষের চালনাধীন হইয়া গিয়াছি, অথবা তাহার যন্ত্ররূপে কাজ করিতেছি। এরূপভাবে ধরিয়া লইলে বিপজ্জনক মিথ্যা আসিয়া সাধনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে ; ইহাতে সাধক অসহায়ভাবে জড়তার মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে অথবা দিব্যক্রিয়ার নামে অহমিকার গতি-বৃত্তিকে স্ফীত করিয়া তুলিয়া ইহা সমস্ত সাধন ধারাকে দুর্দ্দশাজনক বিকৃতি ও ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারে। যোগসাধনায় আন্তর প্রযত্ন ও সংগ্রামের দীর্ঘ বা নাতিদীর্ঘ একটা সময় আসে, যখন ব্যক্তিগত সংকল্পকে, নিম্নতর প্রকৃতির অন্ধকার ও বিকৃতিকে বর্জন এবং সবলে ও দৃঢ়ভাবে দিব্য আলোককে ধরিয়া রাখিতে হয়। মনের শক্তি, হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের বাসনা এমন কি জড়সত্তাকে পর্য্যন্ত তাহাদের যথার্থ প্রবৃত্তির দিকে জোর করিয়া ফিরাইতে হয় অথবা তাহাদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হয় যে তাহারা যথাযথ প্রভাব গ্রহণ করিতে ও তাহাতে সাড়া দিতে পারে। এই কাজ যখন খাঁটিভাবে করা হইয়াছে তখন এবং কেবল তখনই উর্দ্ধ্বতরের নিকট নিম্নতরের আত্মসমর্পণ সম্ভবপর হইতে পারে, কেননা উৎসর্গ তখন গ্রহণযোগ্য হইয়াছে।

প্রথমে সাধককে তাহার ব্যক্তিগত সংকল্প দ্বারা অহমিকার শক্তি সকলকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া তাহাদিগকে সত্য ও আলোকের দিকে ফিরাইতে হইবে ; একবার ফিরাইবার পর শক্তিসকল সর্ব্বদা যাহাতে সত্য ও আলোককে চিনিতে পারে, সর্ব্বদা যাহাতে তাহাদিগকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে এমনভাবে তাহাদিগকে

বারবার শিক্ষা দিতে হইবে। কতকটা অগ্রসর হইবার পর তখনও ব্যক্তিগত সংকল্প, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্য ব্যবহার করিয়া উচচতর প্রভাবের নির্দ্দেশ সচেতনভাবে মানিয়া লইয়া সাধক তাহাদিগকে উচচতর শক্তির প্রতিনিধিরূপে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিবে। আরও অগ্রসর হইলে, তাহার সংকল্প প্রচেষ্টা ও শক্তি আর পৃথক বা ব্যক্তিগত বস্তু থাকবে না, কিন্তু ব্যষ্টিব্যক্তির মধ্যে যে উচচতর শক্তি ও প্রভাব সক্রিয় রহিয়াছে তাহারই ক্রিয়াধারাতে পরিণত হইবে। কিন্তু তখনও দিব্য মূল উৎস এবং সেই উৎস হইতে নিঃসৃত মানব প্রকৃতির প্রবাহের মধ্যে একপ্রকার একটা দুস্তর ব্যবধান থাকিয়া যায়, এই ব্যবধান পার হইবার জন্য অন্ধকারাবৃত পথে চলিতে হয়, সব সময় স্পষ্টভাবে সে পথ দেখা যায় না এমন কি কখনও কখনও অতি বিকৃতির মধ্য দিয়াও চলিতে হয়। প্রগতির শেষ পর্ব্বে যখন অহমিকা অশুদ্ধি ও অজ্ঞান ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে থাকে তখন এই শেষ ব্যবধানও অন্তর্হিত হয়; তখন ব্যষ্টির মধ্যে যাহা-কিছু থাকে তাহা সমস্তই দিব্য ক্রিয়ায় পরিণত হয়।

প্রত্যেকের হৃদয়ে গোপনে নিহিত শ্বাশত বেদ যেমন পূর্ণ যোগের পরম শাস্ত্র, তেমনি তাহার পরম গুরু ও শিক্ষক হইতেছেন অন্তরের সেই পরিচালক ও পথ-প্রদর্শক যিনি জগদ্ গুরু এবং যিনি আমাদের মধ্যে প্রচছন্ন হইয়া আছেন। তিনিই তাঁহার জ্ঞানের মহা উজ্জ্বল আলোকে আমাদের তমোনাশ করেন, সেই আলোকই আমাদের মধ্যে তাহার নিজের আত্মাভিব্যক্তির বর্দ্ধমান প্রদীপ্ত মহিমায় পরিণত হয়। তিনি ক্রমশঃ আমাদের মধ্যে প্রকট করেন তাঁহার আত্মপ্রকৃতির স্বাধীনতা আনন্দ প্রেম শক্তি ও অমৃতময় সত্তা। আমাদের আদর্শ-রূপে তিনি তাঁহার দিব্য দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন এবং আমাদের নিম্নতর সত্তাকে তাহার ধ্যেয় বস্তুর প্রতিরূপে রূপান্তরিত করেন। তাঁহার নিজ সত্তা ও প্রভাব আমাদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া তিনি ব্যষ্টি সত্তাকে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত পুরুষের সহিত তাদাত্ম্য লাভে সমর্থ করেন।

তাঁহার প্রণালী ও পদ্ধতি কি? তাঁহার কোন প্রণালী নাই, আবার সব প্রণালীই তাঁহার প্রণালী। উচচতম ধারা ও গতিবৃত্তিরাজিকে তাহাদের প্রকৃতিতে যতটা সম্ভব তত পরিমাণে স্বাভাবিক ভাবে সুব্যস্থিত করাই তাঁহার পদ্ধতি। ক্ষুদ্রতম খুঁটি নাটি ব্যাপার অথবা যে সমস্ত কাজ অতি নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেগুলিকে পর্য্যন্ত বৃহত্তম ব্যাপারের মতই সযত্নে ও সম্যক্‌ভাবে

সম্পন্ন করিয়া এই পদ্ধতি পরিশেষে সব কিছুকে আলোকের মধ্যে তুলিয়া লইবে এবং তাহাদের রূপান্তর সাধন করিবে। কারণ তাহার যোগে এরূপ ক্ষুদ্র কিছু থাকিবে না যাহার ব্যবহার অবহেলা করা যায়, তেমনি এরূপ বৃহৎও কিছু থাকিবে না যাহা সাধনা বা প্রচেষ্টার অতীত বলিয়া মনে হইবে। জগদ্-গুরুর সে ভৃত্য ও শিষ্য, দম্ভ ও অহংকারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না, কেননা তাহার জন্য সব কিছুই উর্দ্ধ্বভূমি হইতে কৃত হয় ; আবার তেমনিই নিজের ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতি বা অসম্পূর্ণতা অথবা তাহার প্রকৃতির পদস্খলনের জন্য হতাশ বা হতোদ্যম হওয়ার কোন অধিকারও তাহার নাই। কারণ যে শক্তি তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে তাহা অপৌরুষেয় বা অতি পৌরুষেয় এবং অসীম।

অন্তরস্থিত এই দিশারীকে, এই অন্তর্য্যামী গুরুকে, যোগেশ্বর প্রভু পরম-জ্যোতি সকল যজ্ঞ ও সাধনার ভোক্তা ও লক্ষ্য বলিয়া পূর্ণরূপে জানা ও স্বীকার করা পূর্ণযোগ-সিদ্ধির পথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু। সর্ব্ব বস্তুর পশ্চাতে অধিষ্টিত নৈর্ব্ব্যক্তিক জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিরূপে অথবা সর্ব্ব সম্বন্ধ রহিত হইয়াও যিনি আপেক্ষিকের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্ম বলিয়াই হউক, কিংবা আপনার ও সকলের পরম আত্মারূপে অথবা আমাদের ও জগতের মধ্যে অনুস্যূত দিব্য পুরুষের বা পরমা প্রকৃতির নানা নাম ও রূপের অন্যতম রূপে কিংবা আমাদের মনঃ কল্পিত আদর্শরূপেই হউক—যেমন করিয়া প্রথমে দেখা হউক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমরা অবশেষে অনুভব করি, এ সমস্তই তিনি এবং এ সমস্ত বস্তুর সমাহার অপেক্ষা অধিক কিছুও তিনি। তাঁহার সম্বন্ধে ধারণার মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বিভিন্ন লোকের মনের দ্বার তাহাদের অতীত অভিব্যক্তি ও বর্ত্তমান প্রকৃতি অনুসারে অবশ্যম্ভাবীরূপে পৃথক হইবে।

প্রথম দিকে অনেক সময় এই অন্তর্য্যামী গুরু আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তীব্রতার এবং অহমিকার নিজের এবং নিজের লক্ষ্যের উপর অভিনিবেশের দ্বারা ঢাকা পড়িয়া থাকেন। যতই আমরা নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা লাভ করিতে থাকি এবং শান্ততর আত্মজ্ঞান অহমিকার প্রচেষ্টাজনিত বিক্ষোভের স্থান যতই অধিকার করিতে থাকে ততই আমরা আমাদের অন্তরের বর্ত্তমান আলোকের উৎসকে চিনিতে থাকি। তখনই তাহাকে আমরা আমাদের অতীতের মধ্যেও দেখিতে ও চিনিতে পারি, যখন আমরা উপলব্ধি করি, কিরূপে আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পরস্পর বিবদমান গতিবৃত্তিসকল এক লক্ষ্যের দিকে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে লক্ষ্য আমরা এখন শুধু অনুভব

করিতে আরম্ভ করিয়াছি, যখন দেখিতে পাই কেমন করিয়া যোগমার্গে প্রবেশের পূর্ব্বেও আমাদের জীবনের পরিণতিধারা তাহার গতিপথের মোড় ফিরিবার দিকে ভগবদ্ নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াছে। কেননা তখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি আমাদের সকল উদ্যম ও প্রচেষ্টা, জয় ও পরাজয়ের মর্ম্ম কি; অবশেষে আমরা হৃদয়ঙ্গম করি আমাদের সকল পরীক্ষার ও জ্বালা যন্ত্রণার অর্থ কি, যাহা আমাদিগকে আঘাত করিয়াছে ও বাধা দিয়াছে তাহাও আমাদিগের কতটা সাহায্য করিয়াছে: বুঝিতে পারি, আমাদের পতন ও পদস্খলনের উপযোগিতা কি। পরে আমরা এই দিব্য পরিচালনাকে চিনিতে পারি শুধু অতীতে নয় বর্তমানেরও মধ্যে, চিনিতে পারি এক পরম দ্রষ্টার দ্বারা আমাদের মনের ভাবনার গঠনে, এক সর্ব্বাবগাহী শক্তির দ্বারা আমাদের সংকল্প ও কর্ম্মের রূপায়ণে, এক সর্ব্ববিমোহন ও সর্ব্বভুক্ প্রেম ও আনন্দের দ্বারা আমাদের ভাবাবেগময় জীবনের স্ফুরণে। তাহা ছাড়া নিবিড়তর এক ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যে দিয়া তখন তাঁহাকেও চিনি, যিনি প্রথম হইতেই আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন এবং অবশেষে আমাদিগকে অধিকার করিয়া নিতেছেন: অনুভব করি এক পরম প্রভু বন্ধু প্রেমিক গুরুর চিরন্তন সান্নিধ্য। আমরা ইহাকে আমাদের সত্তার স্বরূপে চিনিতে পারি যখন সে সত্তা এক মহত্তর ও বিশালতর সত্তার সহিত সাদৃশ্য ও একত্বের মধ্যে উন্মিষিত ও পরিণত হইয়া উঠিতে থাকে; কেননা আমরা বুঝিতে পারি এই অত্যাশ্চর্য্য পরিণতি আমাদের আপন প্রচেষ্টার ফল নহে; এক নিত্য পূর্ণ সত্তা আমাদিগকে তাহার নিজ প্রতিরূপে গড়িয়া তুলিতেছেন। যোগদর্শনে যাহাকে প্রভু বা ঈশ্বর বলিয়াছে, যিনি চেতন সত্তাতে পরিচালক চৈত্যগুরু বা অন্তর্য্যামী, যিনি মনীষীর কেবল-ব্রহ্ম, যিনি অজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞেয়তত্ত্ব, যিনি জড়বাদীর বিশ্বশক্তি, যিনি পরম আত্মা ও পরমাপ্রকৃতি, যিনি অদ্বিতীয় এক, যাঁহাকে নানা ধর্ম্ম নানা নাম নানা মূর্ত্তি দিয়াছে তিনিই আমাদের যোগেশ্বর।

আমাদের অন্তরাত্মায় এবং আমাদের সকল বাহ্য প্রকৃতিতে এই অদ্বয় সত্তাকে দেখা জানা তাহার স্বরূপতা লাভ করা, তাহাকে পূর্ণ করিয়া তোলা—ইহাই চিরদিন আমাদের নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল, বর্ত্তমানে আমাদের দেহধারী সত্তার পক্ষে তাহাই প্রকট লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন আমাদের সত্তার সকল অঙ্গের মধ্যে ঠিক তেমনি সমভাবে ভেদবুদ্ধিজনক মন যাহা সর্ব্বদাই আমাদের সত্তার বাহিরে দেখে তাহার সব-কিছুর মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই আমাদের ব্যক্তিচেতনার চরম উৎকর্ষ। আমাদের নিজেদের ও সর্ব্ববস্তুর মধ্যে তাঁহার দ্বারা অধিকৃত হওয়া এবং তাঁহাকে অধিকার করাই সকল প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্য

লাভের পরম অবস্থা। বিশ্বে প্রকট জীব বা ব্যষ্টি-আত্মা সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা, শান্তি ও শক্তি, একত্ব ও বহুত্বের সকল অনুভূতিতে তাঁহাকে ভোগ করিবার আনন্দকেই অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই পূর্ণ যোগের লক্ষ্যের পূর্ণ বিবরণ—বিশ্বপ্রকৃতি যে সত্যকে নিজের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছে আবার যাহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য এত শ্রম বেদনা স্বীকার করিতেছে সেই সত্যকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আনয়ন করাই সে লক্ষ্য; সে লক্ষ্য মানবাত্মাকে দিব্য-আত্মাতে এবং প্রাকৃত জীবনকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করা।

* * *

এই সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধিতে পৌঁছিবার সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পন্থা হইল যিনি আমাদের অন্তরের অধিবাসী ও সকল রহস্যের অধীশ্বর তাঁহার অনুসন্ধান করা, যিনি দিব্যজ্ঞান ও দিব্যপ্রেমস্বরূপ সেই ভাগবত শক্তির কাছে সর্ব্বদা আপনাকে খুলিয়া ধরা এবং আমাদের রূপান্তর সাধনের জন্য তাঁহারই উপর নির্ভর করা। কিন্তু আমাদের অহংগত চেতনার পক্ষে প্রারম্ভে ইহা করা সুকঠিন। আর যদি বা সম্ভব হয় তবু পুর্ণভাবে এবং আমাদের প্রকৃতির প্রত্যেক তন্ত্রীতে তাহা সাধনকরা আরো কঠিন। ইহা কঠিন এজন্য যে প্রথমতঃ আমাদের ভাবনা ইন্দ্রিয়সংবেদন এবং হৃদয়াবেগের অহংগত অভ্যাসগুলি প্রয়োজনীয় অনুভূতিতে পৌঁছিবার পথ বন্ধ করিয়া রাখে। পরেও ইহা কঠিন, কেননা এই পথে চলিতে যে-শ্রদ্ধা যে-সমর্পণ ও যে-নির্ভীকতা প্রয়োজন অহংকারের মেঘে আচ্ছন্ন আমাদের অন্তরাত্মার পক্ষে তাহা সহজ সাধ্য নহে। অহংগত মন দিব্যকর্ম্মধারা চায় না, তাহাকে অনুমোদন করে না, কেননা সে মন সত্যে পৌঁছিবার জন্য ভ্রমকে, আনন্দে পৌঁছিবার জন্য দুঃখকে, পূর্ণতায় পৌঁছিবার জন্য অপূর্ণতাকে ব্যবহার করে। কোথায় সে পরিচালিত হইতেছে অহমিকা তাহা দেখিতে পায় না; পরিচালনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, বিশ্বাস ও সাহস হারায়। কিন্তু আমাদের এ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছু আসে যায় না, কেননা অন্তর্য্যামী দিব্যগুরু আমাদের বিদ্রোহে বিরক্ত, আমাদের বিশ্বাস-হীনতায় হতাশ বা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের প্রতি বিমুখ হন না; তাঁহার মধ্যে আছে মাতার পরিপূর্ণ স্নেহ ও শিক্ষকের অসীম ধৈর্য্য। কিন্তু সে পরি-চালনা হইতে আমাদের সম্মতি যদি অপসারিত করিয়া লই তাহা হইলে তাহার অনুগ্রহ ও উপকারের চেতনা আমরা হারাইয়া বসি, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা হইতে যাহা লাভ করিতেছি তাহার সবটাই, অন্ততপক্ষে তাহার শেষ পরিণতি আমাদের পক্ষে নষ্ট হয় না। আমরা আমাদের সম্মতি অপসারিত করিয়া লই

তাহার কারণ এই যে আমাদের উচ্চতর সত্তাকে আমাদের নিম্নতর সত্তা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে শিখি নাই, বুঝি না যে অধস্তনের মধ্য দিয়াই উৰ্দ্ধতনের আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতি চলিতেছে। যেমন জগতে তেমনি আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই না, কেননা তিনি তাঁহার নিজের কর্ম্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, আর বিশেষতঃ দেখিতে পাই না এইজন্য যে তিনি আমাদের প্রকৃতির মধ্য দিয়াই আমাদের ভিতরে কাজ করেন—যথেচ্ছভাবে, অলৌকিক ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া নহে। অতিপ্রাকৃত ঘটনা না দেখিলে মানুষের বিশ্বাস জন্মে না, কোন বস্তু হইতে চোখ-ঝলসানো আলোক না পাইলে সে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতে চায় না। এই অধৈর্য্য এই অজ্ঞান বিপুল বিপত্তি ও মহা অনর্থ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, যদি আমরা দিব্য পরিচালনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া আমাদের আবেগ ও বাসনাসকলের পক্ষে তৃপ্তিকর, বিকৃতির জনক অন্য কোন শক্তিকে ডাকিয়া আনি এবং যদি দিব্য শক্তি নাম দিয়া তাহাকেই আমাদের পরিচালকের পদে অভিষিক্ত করি।

মানুষের পক্ষে তাহার নিজের মধ্যস্থিত অদৃশ্য কোন কিছুকে মানিয়া নেওয়া কঠিন কিন্তু নিজের বাহিরে যাহা দৃশ্যমান তেমন কিছুকে বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। অধিকাংশ মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য বাহ্য অবলম্বনের কোন বস্তু, আমাদের বাহিরে অবস্থিত ভক্তি ও বিশ্বাসের কোন পাত্রের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের কোন বাহ্য প্রতিরূপ কিম্বা তাহার কোন মানব প্রতিভূ, কোন অবতার, কোন মহাপুরুষ বা গুরু, তাহার পক্ষে প্রয়োজন, অথবা সে প্রতিরূপ ও প্রতিভূ উভয়কেই চায় এবং উভয়কেই পায়। কেননা মানবাত্মার প্রয়োজন অনুসারে ভগবান কখনও দেবতারূপে কখন দিব্য মানবরূপে কখনও বা সাধারণ মানুষরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তাহার পরিচালন শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য এমন এক নিবিড় ছদ্মবেশ ধারণ করেন যাহা ভগবত্তাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া রাখে।

অন্তরাত্মার এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনায় ইষ্টদেবতা, অবতার ও গুরুর স্থান দেওয়া হইয়াছে। মনোনীত দেবতা বা ইষ্টদেবতা অর্থ কোন নিম্নতর শক্তি নহে তাহা বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত ঈশ্বরের কোন নাম ও রূপ। প্রায় সকল ধর্ম্মই ভগবানের এইভাবের নাম ও রূপ ব্যবহার করে অথবা তাহাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। মানবাত্মার পক্ষে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন সুস্পষ্ট। ঈশ্বর সর্ব্ব এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিছু। কিন্তু যাহা সর্ব্বের অপেক্ষা অধিক মানুষ তাহার ধারণা কিরূপে করিবে? এমন কি প্রারম্ভে সর্ব্বের ধারণা করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য ; কেননা তাহার সক্রিয়

চেতনায় সে নিজে এক সসীম ও বিবিক্ত রূপায়ণ এবং যাহা তাহার সীমিত প্রকৃতির সহিত সমঞ্জস শুধু তাহার কাছেই সে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারে। সর্ব্বের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা তাহার বুদ্ধির পক্ষে অতি দুরধিগম্য অথবা তাহার স্পর্শকাতর ভাবাবেগ ও সন্ত্রস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিকট অতি ভয়াবহ মনে হয়। অথবা যাহা তাহার অজ্ঞানাচ্ছন্ন বা আংশিক ধারণাশক্তির গণ্ডির বাহিরে অবস্থিত তেমন কিছুকে সে দিব্য বস্তু বলিয়া একেবারেই ভাবিতে পারে না, তাহার কাছে যাইতে পারে না কিম্বা তাহা চিনিতেও পারে না। তাহার নিজের প্রতিরূপেই তাহাকে ঈশ্বরের ধারণা করিতে হয় অথবা এমন কোন রূপে দেখিতে হয় যাহা তাহার অতীত বস্তু হইলেও তাহার উচ্চতম ভাব ও ভাবনাব সহিত সমঞ্জস এবং তাহার অনুভূতি বা বুদ্ধি ধরিতে পারে, নচেৎ পরম দেবতার সহিত তাহার সংস্পর্শ বা মিলন তাহার পক্ষে অতি দুরূহ হইয়া পড়ে।

তথাপি তাহার প্রকৃতি চায় মধ্যস্থ রূপে কোন মানুষকে যাহাতে সে ভগবানকে তাহার নিজের মানবতার অতি নিকট কোন বস্তুরূপে, মানবের প্রভাব ও আদর্শের পক্ষে অধিগম্য কোন তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে পারে। মানুষের অন্তরের এই প্রয়োজন মিটে, এই ডাকে সে সাড়া দিতে পারে যখন নারায়ণ নররূপে অবতীর্ণ হন, অবতার পুরুষ—কৃষ্ণ খৃষ্ট বা বুদ্ধরূপে দেখা দেন। অথবা যদি ইহাও ধারণা করা তাহার পক্ষে দুরূহ হয় তবে ভগবান তদপেক্ষাও সাধারণ ভাবে, মহাপুরুষ বা গুরুরূপে নিজেকে প্রকট করেন। কারণ, যাহারা দিব্য মানুষের বা নররূপী নারায়ণের ধারণা করিতে অপারগ অথবা তাহাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তেমন অনেকেই মহাপুরুষের কাছে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে প্রস্তুত; তাহাকে অবশ্য তাহারা অবতার বলে না, বলে জগদ্‌গুরু বা দিব্য প্রতিভূ।

কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত নহে; এক জীবন্ত প্রভাব, এক জীবন্ত আদর্শ এখানেই বর্তমান এক উপদেশ তাহার প্রয়োজন। কেননা অতি অল্প লোকেই অতীত কালের শিক্ষক ও তাহার শিক্ষাকে, অতীত কালের অবতার ও তাহার উদাহরণ এবং প্রভাবকে, তাহাদের নিজের জীবনে এক প্রাণবন্ত শক্তি করিয়া তুলিতে পারে। এই প্রয়োজন সাধন করিবার জন্যও হিন্দু সাধন-পদ্ধতিতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কখন কখন এই গুরু অবতার বা জগদ্‌গুরু হইতে পারেন; কিন্তু যেটুকু প্রয়োজন তাহা এই যে, গুরু হইবেন শিষ্যের নিকট দিব্যজ্ঞানের প্রতীক, দিব্য আদর্শের কিছুটা তাহাকে জ্ঞাত করাইবেন এবং মানবাত্মার সহিত শাশ্বত সত্তার

যে সম্বন্ধ তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়াছেন শিষ্যের হৃদয়ে তাহার একটা অনুভূতি জাগাইয়া দিবেন।

পূর্ণযোগের সাধক তাহার প্রকৃতি অনুসারে এ সকল সহায়তাই গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তাহা তিনি বর্জন করিবেন আর অহংগত মনের যে ব্যতিরেকী (exclusive) মনোভাব, "আমার ভগবান, আমার অবতার, আমার মহাপুরুষ, আমার গুরু" বলিয়া নিজ-মতের প্রাধান্য ঘোষণা এবং সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামির বশীভূত হইয়া অন্য সকল উপলব্ধির বিরুদ্ধাচরণ করে সেই মনোভাবকে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। সকল সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামী ত্যাগ করিতেই হইবে কেননা দিব্য উপলব্ধির সর্ব্বজনীনতার সঙ্গে তাহারা খাপ খায় না।

পক্ষান্তরে পূর্ণযোগের সাধক ততদিন সন্তুষ্ট হইতে পারেন না যতদিন ভগবানের অন্য সকল নাম ও রূপ নিজের ধারণার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে না পারিবেন, যতদিন তিনি অপর সকল দেবতার মধ্যে নিজের ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে না পাইবেন, যিনি অবতারের মধ্যে অবতীর্ণ হন সেই পরম অবতারী পুরুষের সহিত সকল অবতারের একত্বসাধন করিতে যতদিন সমর্থ না হইবেন, যতদিন সকল শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যস্থ সত্যকে শাশ্বত জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সুসঙ্গতিতে স্থাপিত করিতে না পারিবেন।

সে-সাধককে একথাও ভুলিলে চলিবে না যে এই সমস্ত বাহিরের সাহায্য লওয়ার উদ্দেশ্য তাহার অন্তরাত্মাকে অন্তরস্থ ভগবানের দিকে জাগ্রত করা। এই জাগরণ যদি না আসে তবে বুঝিতে হইবে প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই হয় নাই। আমাদের অন্তরে কৃষ্ণ, খৃষ্ট কিম্বা বুদ্ধের প্রকাশ যদি না হয় তথায় যদি তাঁহারা রূপ গ্রহণ না করেন তবে বাহিরে তাঁহাদের পূজা করিলে তেমন কিছু করা হইল না। অন্য সকল সহায়তা সম্বন্ধে এই একই কথা প্রযোজ্য, তাহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; ইহাদের প্রত্যেকটি মানুষের অরূপান্তরিত সাধারণ অবস্থা এবং তাহার অন্তরস্থ দিব্য পুরুষের বিকাশ এই উভয়ের মধ্যে একটি সেতুস্বরূপ।

পূর্ণযোগের শিক্ষক যতদূর সম্ভব আন্তর গুরুর শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিবেন। তিনি শিষ্যকে তাহার নিজ প্রকৃতির মধ্য দিয়া পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইবেন। শিক্ষা, উদাহরণ ও প্রভাব এ তিনটি যন্ত্রের মধ্য দিয়া গুরু-শক্তি শিষ্যের উপর ক্রিয়া করে। কিন্তু জ্ঞানী গুরু শিষ্যের গ্রহণশীল

মনের উপর নিষ্ক্রিয়ভাবে স্বীকার করিবার জন্য নিজেকে অথবা নিজের মতামতকে চাপাইয়া দিবেন না ; যাহা নিশ্চিতরূপে ফলোৎপাদক তেমন বীজ শুধু তিনি শিষ্য-হৃদয়ে বপন করিবেন, আর শিষ্যের অন্তরস্থ দিব্যপুরুষের পরি-পোষণের ফলে তাহা বাড়িয়া উঠিবে। তিনি শিষ্যকে যতটা উপদেশ দিবেন তদপেক্ষা অধিকতরভাবে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে চাহিবেন ; তাহার উদ্দেশ্য হইবে স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া শিষ্যের বৃত্তিসকল ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশ। তিনি সহায়ক ও ব্যবহারোপযোগী উপায়রূপে প্রণালী বা পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন বটে কিন্তু অলঙ্ঘনীয় সূত্র বা দৃঢ়বদ্ধ কার্য্যতালিকা হিসাবে নহে। কিন্তু সাধনোপায় সীমা ও বন্ধনে, সাধন পদ্ধতি যান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত না হয় সে বিষয়ে তাহাকে সর্ব্বদা সাবধান হইতে হইবে। তিনি নিজে যে পরম শক্তির করণ ও সহায়, আধার ও প্রণালী মাত্র, সেই দিব্য জ্যোতিকে জাগাইয়া তোলা, সেই দিব্য-শক্তিকে কাজে লাগানোই হইবে তাহার সমগ্র কর্ম্ম।

উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণের শক্তি বেশী ; কিন্তু বাহ্যক্রিয়া বা ব্যক্তিগত চরিত্রের উদাহরণই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা নহে। অবশ্য সেরূপ উদাহরণেরও স্থান ও উপযোগিতা আছে ; কিন্তু যাহা অপরের মধ্যে আস্পৃহার বহ্নি সর্ব্বাধিক পরিমাণে জাগাইয়া তুলিবে তাহা হইল গুরুর মধ্যে সেই ভাগবত উপলব্ধি যাহা তাহার সত্তার মুখ্য তথ্য হইয়া উঠিয়া তাহার সমগ্র জীবন আন্তর সত্তা এবং তাহার সকল কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহাই সার্ব্বভৌম মূল বস্তু ; বাকি সব কিছু ব্যষ্টি-ব্যক্তি ও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। সাধককে এই জাগ্রত সক্রিয় উপলব্ধি পাইতে এবং নিজ প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইবে ; বাহির হইতে অনুকরণের চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা যথাযথভাবে স্বাভাবিক ফল না ফলাইয়া বরং অফলপ্রসূ হইয়া পড়িতে পারে।

উদাহরণ অপেক্ষা প্রভাব আরও অধিক প্রয়োজনীয়। প্রভাব অর্থ শিষ্যের উপর গুরুর বাহ্য শাসন নয়, যথার্থ প্রভাব হইল গুরুর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শের এবং তাহার আত্মার সান্নিধ্যের শক্তি, যাহার ফলে নীরবতার মধ্য দিয়া হইলেও গুরু নিজে যাহা এবং যাহা কিছু তাহার আছে তাহা শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। ইহাই গুরুর চরম চিহ্ন। কেননা শ্রেষ্ঠ গুরু যতটা শিক্ষক তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে এমন একটা সদ্ভাব বা সান্নিধ্য যাহা তাঁহার চারিদিকে অবস্থিত গ্রহণক্ষম সকল ব্যক্তির মধ্যে দিব্য চেতনা এবং তাহার উপাদানীভূত আলোক, শক্তি, শুদ্ধি ও আনন্দ ঢালিয়া দেয়।

পূর্ণযোগের শিক্ষকের আরও এক লক্ষণ এই হইবে যে তিনি সাধারণ মানুষের মত বৃথা গর্বের বা আত্মম্ভরিতার বশে গুরুগিরি দাবি করিবেন না। তাঁহার কর্ম্ম হইবে—যদিই তাঁহার কোন কর্ম্ম থাকে—উর্দ্ধ হইতে তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বগ্রহণ ; তিনি নিজে হইবেন সে কার্য্যের এক প্রণালী এক আধার অথবা এক প্রতিনিধি। তিনি তাঁহার মানব ভ্রাতৃগণের সাহায্যকারী এক মানুষ, শিশুদের অগ্রণী এক শিশু, অন্য আলোকরাজি প্রজ্বলনকারী এক আলোক ; অন্তরাত্মারাজির উদ্বোধক এক সম্বুদ্ধ আত্মা ; সর্ব্বোপরি নিজের নিকট ভগবানের অপর শক্তিরাজি আবাহনকারী দিব্য শক্তি ও সত্তার এক প্রতিমূর্ত্তি।

* * *

যে সাধকের এই সকল সহায় আছে, তাহার সিদ্ধি নিশ্চিত। এমন কি তাহার পক্ষে পতনও উত্থানের উপায় মাত্র, মৃত্যুও সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইবার পথ। কেননা একবার প্রকৃত পথে চলিতে আরম্ভ করিলে জন্ম ও মৃত্যু তাহার সত্তার ক্রমপরিণতির নানা পর্য্যায়, তাহার সিদ্ধির পথের বিভিন্ন সোপান হইয়া দাঁড়ায়।

সাধনধারার সাফল্যের জন্য বাকি রহিল শুধু কালের সহায়তা। মানুষের সাধন-পথে কাল শত্রু অথবা মিত্র, বাধা মাধ্যম বা সাধন-যন্ত্ররূপে আসিয়া পড়ে। কিন্তু কাল প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদাই অন্তরাত্মার সাধন-যন্ত্রস্বরূপ।

ঘটনাবলি ও শক্তিরাজি একত্র হইবার এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিবার ফলে যে প্রগতি সৃষ্টি করে কাল হইল তাহার ক্ষেত্র ও তাহার গতিধারার পরিমাপক। অহং‌এর নিকট ইহা এক অত্যাচারী অথবা এক বাধা কিন্তু ভগবানের হাতে উহা এক যন্ত্র। এইজন্য যতক্ষণ আমাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত থাকে কাল অন্তরায় হইয়া দেখা দেয় কেননা আমাদের প্রতিকূল শক্তিরাজির সকল বাধা কালই আমাদের নিকট উপস্থিত করে। আমাদের চেতনাতে যখন ব্যক্তিগত ক্রিয়া ও দিব্য ক্রিয়ার মিলন হয় তখন কাল মাধ্যম ও বিধান হইয়া দাঁড়ায়। যখন এই দুই কার্য্যধারা এক ও অভিন্ন হইয়া যায় তখন কাল আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও যন্ত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কালের প্রতি সাধকের আদর্শ মনোভাব এই যে তাহার ধৈর্য্য হইবে অসীম, যেন তাহার সিদ্ধির জন্য তাহার সম্মুখে রহিয়াছে অনন্তকাল ; তথাপি তাহাকে এমন বীর্য্যধারা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে যাহা এখনই উপলব্ধি আনিয়া দিতে সক্ষম, এবং নিজের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভুত্ব ও প্রবল বেগের প্রভাবে পরিশেষে অলৌকিক বিদ্যুদ্‌গতিতে পরম দিব্য রূপান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্ম-নিবেদন

স্বরূপ প্রকৃতিতে সকল যোগই এক নবজন্ম। ইহা মানুষের সাধারণ মনোময় জীবন হইতে এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনায় এক বৃহত্তর ও দিব্যতর সত্তার মধ্যে জন্ম। সেই বৃহত্তর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রবলরূপে জাগরণ না হইলে কোন যোগই সফলভাবে আরম্ভ অথবা অনুসরণ করা যাইতে পারে না। এই বিরাট ও গভীর পরিবর্ত্তনের ডাক আসিয়া পৌঁছিলে অন্তরাত্মা নানাপন্থায় যাত্রারম্ভ করিতে পারে। যাহা তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে জাগরণের দিকে পরিচালিত করিতেছে তাহার সেই নিজস্ব স্বাভাবিক পরিণামের ফলে এ অবস্থা লাভ হইতে পারে; কোন ধর্ম্মের প্রভাবে বা কোন দর্শনের আকর্ষণে ইহা ঘটিতে পারে; জ্ঞানালোক পাইয়া ধীর গতিতে অথবা আকস্মিক সংস্পর্শ বা অভিঘাতের ফলে দ্রুতগতিতে ইহা উপস্থিত হইতে পারে; বাহ্য ঘটনার চাপ বা অন্তরের প্রয়োজন ও দাবী, মনের আবরণ উন্মোচনকারী একটিমাত্র শব্দ, দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা, এই পথের পূর্ব্বগামী পথিকের সংস্পর্শ এবং নিত্যপ্রভাব অথবা তাহার দূরাগত উদাহরণ—এই সমস্তই সাধককে পরিচালিত বা অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। সাধকের প্রকৃতি ও পরিবেশের অনুরূপভাবেই ডাক আসিবে।

কিন্তু যে ভাবেই আসুক না কেন, তৎসঙ্গে মন ও সংকল্পশক্তির একটা সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং তাহার ফলে একটা পরিপূর্ণ ও কার্য্যকরী আত্মোৎসর্গ আসা চাই। নূতন আধ্যাত্মিক এক ভাবনা-শক্তির (idea-force) স্বীকৃতি, সত্তার উর্দ্ধদৃষ্টি, আলোকের আবির্ভাব, সংকল্প ও হৃদয়ের অভীপ্সায় বিধৃত জীবনের এক আমূল পরিবর্ত্তন বা তাহার রূপান্তর—এই সমস্ত হইল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যাহাদের মধ্যে বীজের মত যোগের সমস্ত ফলই অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে। উর্দ্ধতন জীবন সম্বন্ধে শুধু মনের ভাবনা অথবা মনোময় অন্বেষণ, যতই প্রবলভাবে গৃহীত হউক না কেন, ততদিন তাহা ফলপ্রসূ হয় না, যতদিন হৃদয় তাহাকে একমাত্র কাম্য এবং সংকল্প একমাত্র করণীয় বলিয়া না গ্রহণ করে।

কেননা আত্মার সত্য শুধু ভাবনার বিষয় হইলে চলিবে না, সেই সত্যে বাস করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রয়োজন সমগ্র সত্তাকে সংহত ও একমুখী করা ; যোগসিদ্ধি এরূপ একটা বিরাট রূপান্তর যে তাহা কখন খণ্ডিত ইচ্ছা বা শক্তির এক ক্ষুদ্রাংশ অথবা সন্দেহদোলায় দোলায়মান মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। যে পরম দেবতাকে খুঁজিতেছে তাহাকে তাঁহার কাছে এবং শুধু তাঁহারই কাছে আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

যদি কোন প্রবল দুর্ব্বার প্রভাব বশে অকস্মাৎ এক নিশ্চিত রূপান্তর আসিয়া পড়ে তাহা হইলে কোন মূলগত বা স্থায়ী বাধা আর থাকে না। তখন ভাবনার অব্যবহিত পরে অথবা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সাধক পথ বরণ করিয়া লইতে এবং বরণের পরই আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হয়। যদিও প্রথমে মনে হইতে পারে যে সাধক অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক চলিতেছে, এবং যদিও তখন পথ শুধু অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, গম্য স্থানের পূর্ণ জ্ঞানও লাভ হয় নাই তবু তখন তাহার গন্তব্য পথেই পদক্ষেপ আরম্ভ হইয়াছে। গোপন শিক্ষক, অন্তর্যামী গুরু তাঁহার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, যদিও তিনি নিজেকে এখনও প্রকট করেন নাই, তাঁহার মানব-প্রতিভূরূপে দেখা দেন নাই। যে বাধা ও যে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন তাহা, যে অনুভূতি জীবন-প্রবাহের গতির মুখ ফিরাইয়া দিয়াছে পরিণামে তাহার শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না। যে ডাক একবার নিশ্চিতরূপে আসিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না, যে বস্তু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার কণ্ঠরোধ করা আর সম্ভব হইবে না। এমন কি ঘটনাবলির শক্তি যদি প্রথম হইতেই নিয়মিতভাবে যোগপন্থা অনুসরণ অথবা বাস্তব পক্ষে পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিতে না দেয় তথাপি মন যখন নূতন পথে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে তাহার মুখ্য লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে। অন্তঃ-পুরুষের এক অনিবার্য্য অধ্যবসায় আছে, প্রতিকূল পরিবেশ যাহার বিরুদ্ধে অবশেষে শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং প্রকৃতির কোন দুর্ব্বলতা দীর্ঘকাল বাধা দিতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু আরম্ভ সর্ব্বদা এইভাবে হয় না। প্রায়শঃ সাধককে অতি ধীরে পরিচালিত করা হয় এবং মনের প্রথম ফিরিবার সময় হইতে যে বস্তুর দিকে সে ফিরিয়াছে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লওয়ার মধ্যে এক দীর্ঘ ব্যবধান থাকে। প্রথমদিকে শুধু বুদ্ধির একটা উদ্দীপ্ত কৌতূহল, ভাব বা আদর্শের দিকে একটা শক্তিশালী আকর্ষণ এবং সাধনার অপরিণত কোন রূপ হয়ত থাকিতে পারে। অথবা হয়ত সাধকের সমগ্র প্রকৃতি তাহার সাধনার

অনুকূল হয় নাই, হয়ত সাধক যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে বা যেটুকু ফিরিয়াছে তাহা শুধু বুদ্ধির একটা প্রভাব দ্বারাই সাধিত হইয়াছে অথবা পরম দেবতার নিকট যে আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইয়াছে এমন কোন ভক্তের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ভালবাসাবশতঃ সে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সাধককে প্রস্তুত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল কাটাইবার প্রয়োজন হয়, তাহার পর অপরিবর্ত্তনীয় আত্মনিবেদনের সময় ও সামর্থ্য আসে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা একেবারে নাও আসিতে পারে। হয়ত কতকটা উন্নতি হইতে পারে, হয়ত বা এক প্রবল প্রচেষ্টা আসে, এমন কি অনেকটা শুদ্ধি ও নানা অনুভূতি লাভও হইতে পারে, তবু কিন্তু মৌলিক বা পরম উপলব্ধির সন্ধান নাও মিলিতে পারে; ইহাও হইতে পারে যে প্রস্তুতিতেই জীবন কাটিয়া যাইবে অথবা প্রণোদনার শক্তি অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে তাহার প্রচেষ্টার পক্ষে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব সেখানে পৌঁছিয়া মন তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে সাধক নিম্নতর জীবনের মধ্যে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, যোগের সাধারণ ভাষায় যাহাকে পতন বা পথভ্রষ্ট হওয়া বলে। জীবনের বা সাধনার মূল কেন্দ্রে কোন গলদ থাকিলে এরূপ পতন ঘটে। বুদ্ধি কুতূহলী ও হৃদয় আকৃষ্ট এবং সংকল্প প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে কিন্তু হয়ত তৎসত্বেও সমগ্র সত্তা ভগবানের কাছে বাঁধা পড়ে নাই; কৌতূহল, আকর্ষণ ও প্রচেষ্টাতে শুধু সায় দিয়াছে। একটা পরীক্ষা করা হইয়াছে হয়ত সে পরীক্ষাতে আগ্রহ ও আবেগেরও অভাব নাই, কিন্তু আত্মার অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনের অথবা একটা অপরিত্যাজ্য আদর্শের কাছে পরিপূর্ণ আত্মদান করা হয় নাই। এরূপ অপূর্ণ যোগসাধনার ফলও নষ্ট হয় না, কেননা উর্দ্ধাভিমুখী কোন প্রচেষ্টাই বৃথা যায় না। এমন কি বর্ত্তমানে ইহা বৃথা হইল মনে হইলেও অথবা শুধু কতকটা প্রস্তুতি বা কতকটা প্রাথমিক উপলব্ধি ছাড়া আর কিছু লাভ হইল না বলিয়া দেখা গেলেও ইহা যে অন্তরাত্মার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই জীবন আমাদিগকে যে সুযোগ দিতেছে তাহার সদ্ব্যবহার যদি পূর্ণরূপে করিতে চাই, যে ডাক আমরা শুনিয়াছি তাহাতে যদি যথার্থভাবে সাড়া দিতে, যে লক্ষ্যের ক্ষণিক দৃষ্টি আমরা লাভ করিয়াছি তথায় যদি পৌঁছিতে চাই তাহা হইলে নিজেকে নিঃশেষে দান করা অপরিহার্য্য। যোগসিদ্ধির রহস্যই এই যে ইহাকে জীবনের বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে শুধু একটা উদ্দেশ্য করিলে চলিবে না—সমগ্র জীবনকেই যোগসাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলতঃ যোগ হইল অধিকাংশ মানুষ যে জড় এবং পাশব জীবন যাপন করে অথবা তদপেক্ষা অনেক অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে অধিকতর মনোময় জীবন অনুসরণ করে তাহা হইতে বৃহত্তর এক অধ্যাত্ম-জীবনে, এক দিব্যপথে ঘুরিয়া দাঁড়ানো ; এই কারণে আমাদের যে শক্তিরাজি এই অধস্তন জীবনে এই জীবনেরই স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ীভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পথে অন্তরায়, প্রত্যেকটি আমাদের আত্মনিবেদনের প্রতিকূল। পক্ষান্তরে নিম্নতর জীবনের আনুগত্য হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদের শক্তি বা ক্রিয়া যে পরিমাণে উচ্চতর জীবনের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারিব সেই পরিমাণে আমরা আমাদের পথে অগ্রসর হইতে পারিব, যে সকল শক্তি আমাদের প্রগতির বিরোধী তাহাদিগকে সেই পরিমাণে জয় করিতে সমর্থ হইব। এই সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তরসাধনের বাধা-বিপত্তিই যোগের পথে যে স্খলন আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার কারণ। কেননা আমাদের সমগ্র প্রকৃতি ও তাহার পরিবেশ আমাদের সমগ্র ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত সত্তা এমন সকল অভ্যাস এবং প্রভাবে পরিপূর্ণ যাহারা আমাদের আধ্যাত্মিক নবজন্মের বিরোধী এবং সর্ব্বান্তকঃরণে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পথে অন্তরায়। এক অর্থে যে সব অভ্যাস কতকগুলি নিয়ামক ভাবনা বাসনা ও সংস্কারের সূত্রে একত্রে বাঁধা আছে আমরা শরীর মন ও স্নায়ুজালের সেই অভ্যাস সকলের একটা জটিল সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই—যে সমষ্টির মধ্যে আছে পুনরাবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু এবং দুই চারিটি বৃহৎ শক্তি-স্পন্দনের মিশ্রণ। যাহা দিয়া আমাদের সাধারণ জড়ময় ও মনোময় প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের সেই সমগ্র রূপায়ণকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং যাহা আমাদের মধ্যে এক দিব্য মানবতা অথবা এক অতিমানস প্রকৃতি গড়িয়া তুলিবে তেমন এক নূতন দিব্য কেন্দ্র এবং কর্ম্মের এক নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করা—ইহাই হইল আমাদের যোগের উদ্দেশ্য, ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর কিছু নহে।

মনের যে মুখ্য বিশ্বাস ও দৃষ্টি পুরাতন বাহ্য ব্যাপারে নিজের স্বার্থ ও পরিতুষ্টির জন্য কেন্দ্রীভূত হয় তাহাকে বিলোপ করিয়া দেওয়াই প্রথম প্রয়োজন। অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ হইল এই বহির্মুখী মনোবৃত্তির স্থানে এমন গভীরতর বিশ্বাস ও দৃষ্টিকে স্থাপন করা যাহা শুধু ভগবানকেই দেখে, কেবল ভগবানেরই সন্ধান করে। তারপরে প্রয়োজন আমাদের সমগ্র নিম্নতর সত্তাকে এই নবীন বিশ্বাস ও বৃহত্তর দৃষ্টির নিকট প্রণত হইতে বাধ্য করা। আমাদের সমগ্র প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণ চাই ; আমাদের সত্তাকে প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যেক গতিবৃত্তিতে তাঁহারই নিকট আত্মদান করিতে হইবে, যাঁহাকে

আমাদের অপ্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয়মানসের নিকট জগৎ ও তন্মধ্যস্থ বস্তুরাজি হইতে এত অধিক পরিমাণে ন্যূনতর বাস্তব বলিয়া মনে হয়। আমাদের সমগ্র সত্তা—আত্মা মন ইন্দ্রিয় হৃদয় ইচ্ছা প্রাণ দেহ—সকলকেই নিজ নিজ সমগ্র শক্তি এরূপ পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করিতে হইবে যাহাতে এই সত্তা দিব্যপুরুষের যোগ্য আধার হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে, কেননা জগতে প্রতি বস্তুই নির্দ্ধারিত নির্দ্দিষ্ট অভ্যাসের দাস, এরূপ হওয়াই তাহার পক্ষে বিধি এবং এই অভ্যাস আমূল রূপান্তরের বিরোধী। পূর্ণযোগ জীবনে যে বিপ্লব আনিতে চেষ্টা করে অন্যকিছু তদপেক্ষা অধিকতর আমূল রূপান্তর হইতে পারে না। আমাদের মধ্যের প্রত্যেক তত্ত্ব প্রত্যেক বৃত্তিকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে তাহারা কেন্দ্রগত বিশ্বাস সংকল্প ও দৃষ্টিকে যেন না ছাড়ে। প্রত্যেক ভাবনা প্রত্যেক প্রেরণাকে উপনিষদের ভাষায় মনে করাইয়া দিতে হইবে যে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে"—'তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, মানুষ এখানে যাহাকে উপাসনা করে, তাহাকে নয়'; প্রাণের প্রত্যেক তন্তুতে প্রতীতি জন্মাইতে হইবে যে এতকাল যাহাকে তাহার আপন সত্তা বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছে এখন তাহা পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। মন আর মন থাকিবে না, তাহাকে মনের অতীত কিছু দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে হইবে। জীবনকে এমন একটা বিশাল ও শান্ত, তীব্র ও শক্তিমান বস্তুতে পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে যে সে তাহার পুরাতন অন্ধ অধীর সংকীর্ণ সত্তা বা ক্ষুদ্র বাসনা ও আবেগ সকলকে আর চিনিতেই পারিবে না। এমন কি দেহকেও রূপান্তর স্বীকার করিতে হইবে, সে আর বর্ত্তমানের মত বাসনা-তাড়িত সনির্ব্বন্ধ পশু বা প্রতিরোধকারী মৃৎপিণ্ড থাকিবে না কিন্তু তাহার স্থানে চিৎ-পুরুষের সচেতন সেবক, প্রদীপ্ত যন্ত্র ও জীবন্ত রূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

কাজ এত কঠিন বলিয়াই স্বাভাবিকভাবে লোকে এক সহজ সমাধান বাহির করিতে এবং গ্রন্থি খুলিতে না পারিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে; ইহা হইতেই ধর্ম্ম ও যোগপন্থাসমূহের পক্ষে আন্তর জীবন হইতে বাহ্য জাগতিক জীবনকে পৃথক করিবার প্রবৃত্তি জাত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। তাহারা অনুভব করিয়াছে যে এই স্থূল জগতের শক্তিরাজি ও ক্রিয়াবলির সহিত ভগবানের আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই, এ সমস্ত মায়ার বা অন্য কাহারও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হতবুদ্ধিকর ব্যাপার এবং দিব্যসত্যের বিরোধী বস্তু। দেখা যায় যে ইহাদের বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী সত্যের শক্তিরাজি ও তাহাদের আদর্শ ক্রিয়াবলি চেতনার সম্পূর্ণ অন্য এক ভূমিতে অবস্থিত; যে চেতনার উপর জাগতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত, যাহা অন্ধকার ও অবিদ্যাচ্ছন্ন, যাহার আবেগ ও সামর্থ্য বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে

সেই চেতনায় নহে। এইভাবে দেখিলে তৎক্ষণাৎ একটা বিরোধ প্রতীত হয়—সে বিরোধের একদিকে ভগবানের উজ্জ্বল ও পবিত্র এবং অন্যদিকে দেবদ্রোহী দানবের অন্ধকারাচ্ছন্ন অপবিত্র রাজ্য; একদিকে যথায় আমরা শুধু হামাগুড়ি দিয়া চলিতে অভ্যস্ত সেই পার্থিব জন্ম ও জীবন আর অন্যদিকে ভগবৎচৈতন্যে বিভাসিত সমুচ্চ এক অধ্যাত্ম জীবন; তাই এই বিশ্বাস সহজে জন্মে যে মায়ার অধীন জীবনের সহিত অন্তরাত্মার শুদ্ধ-ব্রহ্ম-সত্তায় সমাহিত অবস্থিতির কোন সামঞ্জস্য নাই। সহজতম উপায় হইল ঐহিক ব্যাপারের দিক হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইয়া সোজা আধ্যাত্মিকতার নগ্ন ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে চেষ্টা করা। বোধহয় এই জন্যই সমস্ত ঐহিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হওয়ার দিকে আসিয়াছে মানুষের আকর্ষণ ও আবশ্যকতা বোধ; এই অভিনিবেশ বিশিষ্ট যোগপন্থা সকলের মধ্যে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে; কেননা সেইরূপ অভিনিবেশের দ্বারা যে অদ্বয় বস্তুর উপর একাগ্রতা সাধনের চেষ্টা করি, জগৎকে একেবারে ত্যাগ করিয়া আমরা তাহার নিকটে পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হই। নিম্নতর বৃত্তিগুলির পক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত উচ্চতর এক নূতন জীবনকে স্বীকার করা এবং তাহার প্রতিনিধিস্থানীয় হওয়া অথবা তাহার সাধনযন্ত্র হইয়া ওঠারূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা হইলে আর অনিবার্য্য থাকে না। তখন তাহা-দিগকে বিনষ্ট বা নিস্তব্ধ করিতে পারা, বড়জোর একদিকে শরীর রক্ষা এবং অন্যদিকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য যেটুকু শক্তি প্রয়োজন তাহাই শুধু রক্ষা করাই যথেষ্ট।

পূর্ণযোগের লক্ষ্য ও ধারণা আমাদিগকে সরল অথচ আয়াসসাধ্য উচ্চ-সুরে বাঁধা এই প্রণালী গ্রহণ করিতে দেয় না। কোন সংক্ষিপ্ত পথ ধরিয়া অথবা প্রতিবন্ধকের সমস্ত বোঝা ফেলিয়া দিয়া হাল্কা হইয়া ছুটিয়া চলিতে সর্ব্বাঙ্গীণ এক রূপান্তরের আশাই আমাদিগকে নিষেধ করে। কেননা আমরা ভগবানের জন্য নিজেকে ও জগৎকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিবার জন্যই যাত্রা করিয়াছি; আমরা সংকল্প করিয়াছি যে ভগবানের চরণে যেমন আমাদের সত্তা তেমনি আমাদের সম্ভূতিকে সমর্পণ করিব; শুধু দূরস্থিত কোন স্বর্গে সুদূর ও গোপন ভগবানের নিকট আমাদের শুদ্ধ ও নগ্ন আত্মাকে রিক্ত নৈবেদ্য রূপে অর্পণ করিতে অথবা এক অচল নির্ব্বিশেষ পরমবস্তুর মধ্যে আমরা যাহা কিছু তাহার সব কিছুকে নিঃশেষে বিলয় করিয়া দিতে চাই না। আমাদের যিনি ইষ্টদেবতা তিনি শুধু বিশ্বাতীত কোন সুদূর সত্য বস্তুমাত্র নহেন, তিনি অর্দ্ধ-আবৃত অভিব্যক্তিরূপে এখানে এই জগতে আমাদের নিকট উপস্থিত

আছেন। জীবন দিব্যপ্রকাশের এক ক্ষেত্র, যদিও সে প্রকাশ এখনও অপূর্ণ ; আমরা চাই এখানে, এই পৃথিবীর বুকে জীবন ও দেহের মধ্যেই উপনিষদের ভাষায় 'ইহৈব', আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই পরম-দেবতাকে প্রকট করিতে ; আমাদিগকে তাহার বিশ্বাতীত মহত্ত্ব জ্যোতি ও মাধুর্য্য আমাদের চেতনায় সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, এখানেই তাহাকে লাভ করিতে এবং যতদূর সম্ভব প্রকাশ করিতে হইবে। তাই আমাদের যোগে সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য জীবনকে আমরা স্বীকার ও গ্রহণ করিব ; এই স্বীকার ও গ্রহণের ফলে যে সমস্ত বাধা আসিয়া আমাদের সাধন-সমরকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে তাহাদিগকে এড়াইয়া চলা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে, এ পথ যদিও অধিকতর দুর্গম ও দুরারোহ যদিও আমাদের প্রচেষ্টা আরও জটিল এবং অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হইবে তথাপি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটা সময় আসিবে যখন আমরা প্রচুর পরিমাণে অনুকূল অবস্থা লাভ করিব। কেননা একবার আমাদের মন কেন্দ্রগত পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ হইলে এবং আমাদের সকল সংকল্প মোটের উপর একমুখী হইয়া উঠিলে জীবনই আমাদের সহায় হইয়া দাঁড়াইবে। একাগ্রচিত্ত সতর্ক এবং সর্ব্বাঙ্গীণরূপে সচেতন হইলে, প্রাণের প্রতি রূপ প্রতি ঘটনা আমাদের অন্তরের হোমাগ্নির হবিরূপে অর্পণ করিতে পারিব। যুদ্ধে জয়ী হইলে পৃথিবীকে পর্য্যন্ত আমাদের সিদ্ধির সহায় হইতে বাধ্য করিব, এমন কি বিরোধী শক্তিরাজির ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়া আমরা আমাদের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করিতে পারিব।

আর একটা দিক আছে যেখানে সাধারণ যোগী সাধনপন্থাকে সংকীর্ণ কিন্তু সহায়করভাবে সরল করিয়া লইয়াছে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধনের ইচ্ছুক পূর্ণযোগীর পক্ষে সে পথ নিষিদ্ধ। যোগের সাধনায় আমাদের সম্মুখে আমাদের নিজ সত্তারই অসাধারণ জটিলতা, উদ্দীপক অথচ বিব্রতকারী আমাদের বহু ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতির সমৃদ্ধ অন্তহীন বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সাধারণ মানুষ শুধু জাগ্রত বহির্ম্মুখী চেতনার মধ্যে বাস করে, আবরণের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আত্মার গভীর বিরাট স্বরূপ দেখিতে পায় না, তাহার নিকট তাহার মনোময় জীবন বেশ সহজ ও সরল। সনির্ব্বন্ধ কিন্তু অল্পসংখ্যক বাসনা, বুদ্ধি রুচি ও রসচেতনার কয়েকটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অসম্বদ্ধ বা অর্দ্ধসম্বদ্ধ বহুল পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনার প্রবল স্রোতের মধ্যে দুই চারিটি প্রভাবশালী ও সুস্পষ্ট ভাব বা ধারণা, অল্পবিস্তরভাবে অবশ্যপালনীয় কয়েকটি প্রাণের দাবী,

স্বাস্থ্য ও রোগের পর্য্যায়ক্রমে আগমন, সুখ ও দুঃখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অসম্বদ্ধ পৌর্ব্বাপর্য্য, দেহ বা মনের মধ্যে সর্ব্বদা সংঘটিত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভ ও বিপর্য্যয় আবার তাহার মধ্যে কদাচ কখন ঊর্দ্ধাভিমুখী প্রবল জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান এবং উৎক্ষেপের আবির্ভাব,—এই সকল বিচিত্র বস্তুর মধ্য দিয়া, অংশত মানুষের ভাবনা ও সংকল্পের সাহায্যে, অংশত তাহাদের সাহায্য না লইয়া অথবা তাহাদের বাধাসত্ত্বেও প্রকৃতি একটা মোটামুটি কাজ চলা গোছের ব্যবস্থায়, বিশৃঙ্খলায় ভরা মোটামুটি একপ্রকার শৃঙ্খলা গড়িয়া তুলিতেছে—ইহাই হইল সাধারণ মানব-জীবনের উপকরণ। পূর্ব্বগত আদিম মানুষ তাহার বাহ্য জীবনে যেরূপ স্থূল ও অপরিণত ছিল, আজকালকার দিনে সাধারণ মানুষ তাহার আন্তর জীবনে তেমনি স্থূল ও অপরিণত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি,—আর যোগের অর্থই অন্তরাত্মার বিচিত্র গভীর-তার মধ্যে নিমজ্জন—তখন মানুষ তাহার পরিণতি পথে পূর্ব্বে যেমন বাহিরের বস্তুরাজির দ্বারা নিজেকে পরিবৃত দেখিত, তেমনি আমরা অন্তরের ক্ষেত্রে দেখিতে পাইব যে আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে এক জটিল জগৎ, যে জগৎকে আমাদের জানিতে ও জয় করিতে হইবে।

আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয় যখন আমরা আবিষ্কার করি যে আমাদের সত্তার বিভিন্ন অঙ্গের প্রত্যেকের, বুদ্ধি সংকল্প বা ইন্দ্রিয়-মানসের, স্নায়বিক বা বাসনাময় সত্তার, হৃদয় ও দেহের যেন অন্য নিরপেক্ষ নিজস্ব একটা জটিল ব্যক্তিত্ব একটা নিজস্ব স্বাভাবিক রূপায়ণ আছে; ইহাদের কাহারও বনিবনাও হয় না নিজের সঙ্গে বা অপরের সঙ্গে অথবা প্রতি-নিধিস্থানীয় সেই অহংএর সঙ্গে যে অহং বহিঃস্থিত অজ্ঞানের উপর কেন্দ্রীয় এবং কেন্দ্রীকরণকারী কোন সত্তার দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটা ছায়া। আমরা দেখিতে পাই যে আমরা প্রত্যেকে এক নয় বহু ব্যক্তিত্বের সমাবেশে গঠিত; আবার এই বহুর প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেকের আছে নিজস্ব পৃথক দাবী। আমাদের সত্তা বর্ত্তমানে স্থূলভাবে গঠিত এক বিশৃঙ্খলা মাত্র, যাহার মধ্যে আমাদিগকে দিব্য শৃঙ্খলার এক তত্ত্ব আনয়ন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, যেমন বাহিরের ঠিক তেমনিভাবেই অন্তরের ক্ষেত্রে জগতের কোথাও আমরা এক নহি; আমাদের অহং নিজেকে প্রখর-ভাবে যে অপর হইতে বিভিন্ন মনে করে তাহা একটা প্রবল অধ্যাস, একটা ভ্রান্তি; আমরা আপনাতে আপনি বাস করি না, বস্তুতঃ অপর সকল হইতে পৃথক হইয়া অন্তরের নিরালায় একাকী থাকি না। আমাদের মন একটা যন্ত্র, ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে যাহার মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেছে, যে

প্রবাহের মধ্যে উর্দ্ধ্ব হইতে, নীচু হইতে এবং বাহির হইতে রাশিরাশি বিসদৃশ উপাদান আসিয়া পড়িতেছে, আর সে যন্ত্রটা তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছে, পরিণত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে। আমাদের ভাবনার ও অনুভূতির অর্দ্ধেকের অনেক বেশী অংশ আমাদের সত্তার বাহিরে গঠিত হইয়া আমাদের মধ্যে আসে বলিয়া তাহাদিগকে আমরা নিজের বলিতে পারি না ; এরূপ কিছু অতি অল্পই আছে যাহাদের সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে তাহারা আমাদের প্রকৃতির মূলবস্তু। ইহাদের খুব বড় একটা অংশ অপরের বা পরিবেশের নিকট হইতে আমদানী করা হয়,—কতক কাঁচামাল রূপে, কতক তৈয়ারী করা জিনিষ রূপে ; কিন্তু তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে তাহারা আসে বিশ্বপ্রকৃতি হইতে অথবা অন্য সব লোক বা অন্য সব ভূমি এবং তথাকার সত্তা, শক্তি ও প্রভাব হইতে ; কেননা আমাদের উর্দ্ধে ও চারিদিকে রহিয়াছে চেতনার অন্য অনেক ভূমি,—মনভূমি, প্রাণভূমি, সূক্ষ্ম জড়ভূমি, এখানে আমাদের প্রাণ ও ক্রিয়া এই সমস্ত ভূমি হইতে খাদ্য পায় ও তাহাদের খাদ্য যোগায়, তথা হইতে উদ্দীপিত ও শাসিত এবং তথাকার রূপ ও শক্তির অভিব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্তঃপ্রবহমান বিশ্ব-শক্তিরাজির এই অতি জটিলতার জন্য এবং আমরা নানামুখীভাবে তাহাদের দিকে খোলা এবং তাহাদের জটিলতা পাশে বদ্ধ রহি-য়াছি বলিয়া আমাদের ব্যষ্টিসত্তার বিবিক্ত মুক্তির দুরূহতা অতি বিপুলভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগকে এই সমস্ত বিষয়ের হিসাব রাখিতে হইবে এবং ইহাদের লইয়া কার্য্য করিতে হইবে ; আমাদের নিজ প্রকৃতির গোপন মূলীভূত উপাদান কি, কি কি বস্তু দিয়া সে উপাদান গঠিত এবং তাহাদের সমবায়ে কি ভাবে গতি উৎপন্ন হয় তাহা আমাদিগকে জানিতে হইবে ; এবং এ সমস্তের মধ্যে এক দিব্য কেন্দ্র, এক শুদ্ধ সুসঙ্গতি এবং এক প্রোজ্জ্বল ছন্দ স্থাপন করিতে হইবে।

সাধারণ যোগমার্গসকল এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী উপাদান সম্বন্ধে এক সহজ ও সরল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়রূপে আমাদের প্রধান প্রধান মানসিক শক্তিনিচয়ের মধ্য হইতে কোন-একটিকে বাছিয়া লওয়া হয় ; আর সকল শক্তিকে স্তব্ধ করিয়া জড়তার মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া অথবা ক্ষুদ্রতার মধ্যে তাহাদিগকে অভুক্ত ফেলিয়া রাখা হয়। তাহার সত্তার আবেগময় শক্তি এবং হৃদয়ের তীব্র ক্রিয়া-ধারাকে আশ্রয় করিয়া ভক্ত ভগবৎপ্রেমে অভিনিবিষ্ট হইয়া বাস করে, তাহার সমগ্র সত্তাকে প্রেমাগ্নির অনন্য ও ঐকান্তিক একটি মাত্র শিখার মধ্যে গুটাইয়া আনে ; সে মনের ভাবনার ক্রিয়াধারাতে উদাসীন হইয়া পড়ে, বৌদ্ধিক

যুক্তির দুরাগ্রহকে পশ্চাতে ফেলিয়া দেয়, মনের জ্ঞান-পিপাসার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। তাহার একমাত্র প্রয়োজনীয় জ্ঞান হইল বিশ্বাস এবং ভগবানের সহিত সংযুক্ত হৃদয়ের প্রেরণা। তাহার পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ পূজায় বা দেবমন্দিরের সেবায় যাহা না লাগে তেমন কোন কর্ম্মৈষণাকে সে ব্যবহার করিতে চায় না। জ্ঞানমার্গী বিচারশীল ভাবনার শক্তি ও ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় নিবদ্ধ করে, মনের অন্তর্ম্মুখী প্রচেষ্টার মধ্যে মুক্তির পথ দেখিতে পায়। সে আত্মার ভাবনার উপর নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে, এবং অন্তরের সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির সাহায্যে প্রকৃতির আবরণকারী ক্রিয়াধারা সকলের মধ্য হইতে নীরব আত্ম-সত্তাকে পৃথক করিয়া দেখিতে সমর্থ হয় এবং এই প্রত্যক্ষ ভাবনার মধ্য দিয়া বাস্তব আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পৌঁছে। সে ভাবাবেগের খেলার দিকে দৃকপাত করে না, বুভুক্ষু প্রাণের অশান্ত কলরবে সে বধির, জীবনের কর্ম্মধারার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ, এ সমস্ত বৃত্তি যতই তাহার নিকট হইতে খসিয়া পড়ে এবং তাহাকে যতশীঘ স্বাধীন নিশ্চল ও নীরব এবং নিত্য অকর্ত্তা সত্তারূপে রাখিয়া যায় ততই সে নিজেকে ধন্য মনে করে। দেহ তাহার সাধনপন্থার অন্তরায়, প্রাণশক্তির ক্রিয়াবলি তাহার শত্রু, তাহাদের দাবি সে যতটা কমাইতে পারে ততই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। বাহ্যভৌতিক ও আন্তর আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার এক দৃঢ় প্রাকার তুলিয়া পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে যে অগণ্য বাধা উত্থিত হয় তাহাদিগের নিকট হইতে সে আত্ম রক্ষা করে; বহির্জগৎ এবং অপরের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া আন্তর নীরবতার দেওয়ালের পশ্চাতে সে নির্ব্বিকার অবস্থায় বাস করে। এই সকল যোগপন্থার ধারাই হইল নিজের আত্মার বা দিব্যপুরুষের সহিত নির্জনে বাস, ভগবান এবং তাঁহার ভক্তগণের সহিত একান্তে বিচরণ, মনের একাগ্র আত্মাভিমুখী প্রয়াস অথবা ভগবদ্‌মুখী হৃদয়ের দিব্য অনুরাগের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ। এক-মাত্র যে কেন্দ্রস্থানীয় বাধা আমাদের নির্ব্বাচিত প্রযোজক শক্তির (motive force) অনুসরণ করে তাহা ছাড়া বাকি সব কিছু ছাঁটিয়া ফেলিয়াই এখানে সমস্যা সমাধান করা হয়; এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতির বহুমুখী নানা দাবির মধ্যে ব্যতিরেকী ভাবে একটির উপর একান্ত অভিনিবেশ আমাদের মুক্তিপথের পরম সহায়রূপে আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে অন্তরের বা বাহিরের এই নির্জনতা তাহার আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে সাময়িক ঘটনামাত্র হইতে পারে। জীবনকে তিনি মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া নিজের গুরুভার শুধু নয় কিন্তু তাহারই সঙ্গে জগতের ভারেরও এক বৃহৎ অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে। তাই তাহার

যোগের প্রকৃতি অনুসারে তাহাতে অপরের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ একটা সংগ্রাম দেখা দেয়; কিন্তু ইহা শুধু তাহার ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয় ইহা এক বিস্তৃত ক্ষেত্রব্যাপী সমষ্টিগত সংগ্রাম। তাহাকে যে কেবল নিজের মধ্যস্থিত অহংগত মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলতাকে জয় করিতে হইবে তাহা নহে কিন্তু জগতের মধ্যস্থিত সেই একই প্রকার অসংখ্য বিরোধী শক্তির প্রতিনিধিরূপেও তাহাদিগকে পরাভূত করিতে হইবে। প্রতিনিধি স্থানীয় এই প্রকৃতিই তাহাদের মধ্যে দুর্দ্দম্য বাধার সামর্থ্য অনেক অধিক পরিমাণে বাড়াইয়া তোলে, এক প্রকার সীমা হীন ভাবে তাহাদের পুনরাবৃত্তির অধিকার যেন দান করে। প্রায়ই তিনি দেখিতে পান যে অবিরাম চেষ্টার পর যখন তিনি নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছেন তখনও তাঁহাকে বার বার অফুরন্ত সংগ্রামে জয়ের পর জয়লাভ করিতে হইবে, কেননা তাঁহার আন্তর জীবন ইতিপূর্ব্বেই এত প্রসারিত হইয়াছে যে তাহার মধ্যে তাঁহার নিজের সত্তা ও তাহার সুস্পষ্ট অভাব ও অভিজ্ঞতাই যে রহিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাহা অপর সকলের সত্তার সাহত নিবিড়ভাবে একাত্ম হইয়াছে, কারণ তিনি তখন বিশ্বকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধির অন্বেষুকে তাহার নিজের অন্তরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যকার বিরোধও যথেচ্ছভাবে সমাধান করিতে দেওয়া হয় না। তাহাকে বিচারশীল জ্ঞানের সহিত সংশয়হীন বিশ্বাসের সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে; প্রেমের কোমল আত্মার সহিত দুর্দ্ধর্ষ শক্তির প্রয়োজনের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে; বিশ্বাতীত নীরবতায় অবস্থিত শান্তিমগ্ন আত্মার নিষ্ক্রিয়তার সহিত দিব্য সহায়ক ও দিব্য যোদ্ধার সক্রিয়তাকে মিলাইতে হইবে। সকল যোগীর মত তাহারও নিকট সমাধানের জন্য নানা সমস্যা, যথা যুক্তিবুদ্ধির বিরোধ, ইন্দ্রিয়ের আসক্তিজনক প্রভাব, হৃদয়ের বিক্ষোভ, কামনার গোপন আক্রমণ, দেহের বাধা আসিয়া উপস্থিত হইবে; তাহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাহাদের দেওয়া বাধা এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্বিরোধ কিন্তু অন্য এক প্রকারে তাহাকে দূর করিতে হইবে, কেননা এই সমস্ত বিদ্রোহী বস্তুকে শাসন ও ব্যবহার করিয়া তাহাকে অনন্তগুণে দুরূহ এক সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তাহাদিগকে দিব্য সিদ্ধি ও দিব্য প্রকাশের যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সকল বেসুরা বিরোধ তাহাকে মিটাইতে হইবে, তন্মধ্যস্থ ঘন অন্ধকার আলোকিত করিতে হইবে, প্রত্যেকটিকে পৃথক্‌ভাবে আবার সকলকে একসঙ্গে রূপান্তরিত করিতে হইবে, যেমন তাহাদের নিজেদের মধ্যে তেমনি পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে—আর এ কাজ সর্ব্বাঙ্গীণ

পূর্ণতার সহিত করিতে হইবে, একটি ক্ষুদ্র কণা একটি সূত্র বা একটিমাত্র স্পন্দনকেও বাদ দেওয়া চলিবে না, কোথাও লেশমাত্র অপূর্ণতা থাকিতে পারিবে না। তাহার জটিল কর্ম্মে একটি বিশেষ বৃত্তিতে ঐকান্তিক অভিনিবেশ অথবা পর্য্যায়ক্রমে একটির পর অন্য বৃত্তিতে সেইভাবে অভিনিবেশ শুধু সাময়িক সুবিধার জন্য সে অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার উপযোগিতা শেষ হইবে তখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বাবগাহী এক একাগ্রতা-সাধনরূপ দুরূহ ও বীরোচিত এক কর্ম্ম আছে, পূর্ণযোগের সাধককে সেই কর্ম্মেই অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে।

যে কোন যোগে মনের একাগ্রতাই হইল প্রথম অবশ্য সাধনীয় কার্য্য, কিন্তু সর্ব্বগ্রাহী ও সর্ব্বালিঙ্গনকারী এক একাগ্রতা সাধন পূর্ণযোগের বিশিষ্ট প্রকৃতি। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এ যোগেও বিশেষ বিশেষ ভাবে ধারণা, বস্তু, অবস্থা, আন্তর গতিবৃত্তি বা তত্ত্বের উপর, ভাবনা আবেগ বা সংকল্পের উপর স্বতন্ত্র সুদৃঢ় অভিনিবেশ, অনেক সময়েই প্রয়োজন; কিন্তু সে অভিনিবেশ সাধনার একটা গৌন সহায়মাত্র। অতিবিস্তৃতভাবে পূর্ণরূপে নিজেকে খুলিয়া দিয়া যিনি সর্ব্ব হইয়াও এক সেই পরমাত্মার উপর আমাদের সমগ্র সত্তা ও তাহার শক্তিরাজির সর্ব্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস অভিনিবেশই হইল এ যোগের বৃহত্তর ক্রিয়াধারা এবং ইহা ছাড়া এ যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা যাহা পরম একের মধ্যে বাস এবং সর্ব্বের মধ্যে ক্রিয়া করে সেই চেতনাই আমাদের আস্পৃহার বস্তু; আমাদের সত্তার প্রতি উপাদানের, আমাদের প্রকৃতির প্রতি বৃত্তির উপর আমরা সেই চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। এই বিশাল ও ঘনীভূত সমগ্রতাই এ সাধনার মূল প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিই ইহার সাধন প্রণালী নিরূপিত করিবে।

কিন্তু যদিও সমগ্র সত্তাকে ভগবানে অভিনিবিষ্ট করা এ যোগের স্বরূপ, তথাপি আমাদের সত্তা এত বিপুল জটিলতায় ভরা যে একাজ সহজে বা অবিলম্বে সাধিত হইতে পারে না, এ যেন গোটা পৃথিবীকে দুইহাতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সমগ্রভাবে একটিমাত্র কাজে লাগানো। মানুষের নিজেকে অতিক্রম করিবার সাধনায় সাধারণত জটিল যন্ত্রস্বরূপ তাহার প্রকৃতির কোন একটা চালনাকারী বৃত্তি কোন একটি স্প্রিং (spring) বা কোন একটি শক্তিশালী লেভার (lever) তাহাকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে হইবে; যন্ত্রের সকল অঙ্গের মধ্য হইতে এই স্প্রিং বা লেভারকে সে বাছিয়া লইবে এবং তাহার সাহায্যে যন্ত্রটিকে আপন

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিবে। এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রকৃতিই সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার পথপ্রদর্শক হইবে; কিন্তু এই কার্য্য তাহার মধ্যস্থ উচ্চতম ও বৃহত্তম প্রকৃতি দ্বারাই করিতে হইবে, নিম্নতম বা সীমিত কোন ক্রিয়াতে আবদ্ধ প্রকৃতি দ্বারা নহে। নিম্নতর প্রাণক্রিয়াতে প্রকৃতি বাসনাকেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেভাররূপে গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার সুস্পষ্ট স্বভাবে মানুষ এক মনোময় পুরুষ, সে শুধু এক প্রাণময় সত্তা নহে। সে যেমন তাহার চিন্তাশীল মন ও সংকল্পের দ্বারা তাহার প্রাণের আবেগ ও উত্তেজনাকে সংযত ও সংশোধিত করিতে পারে, তেমনি তাহার মধ্যস্থ গভীরতর আত্মা বা চৈত্যপুরুষের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত আরো উচ্চতর ও প্রদীপ্ত এক মনের ক্রিয়াধারাসকলকে আবাহন করিয়া আনিতেও পারে,—এবং সেই সকল বৃহত্তর ও শুদ্ধতর প্রযোজক-শক্তি, যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রশা-সনকে আমরা কামনা নামে অভিহিত করি তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে। মানুষ কামনাকে পূর্ণরূপে জয় করিতে অথবা তাহাকে সম্মত করিয়া দিব্য রূপা-ন্তর সাধনের জন্য তাহার দিব্য প্রভুর চরণে অর্পণ করিতে পারে। উচ্চতর মন এবং গভীরতর অন্তরাত্মা বা মানুষের মধ্যস্থিত চৈত্যসত্তা এই দুইটাই হইতেছে সেই আকর্ষী (আক্‌শী) যাহার দ্বারা ভগবান মানব প্রকৃতিকে বলপূর্ব্বক অধিকার করেন।

মানুষের উর্দ্ধ্বতর মানস তাহার যৌক্তিকবুদ্ধি অপেক্ষা অন্যতর উচ্চতর শুদ্ধতর বিশালতর ও সবলতর কিছু। পশু প্রাণময় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিশীল এক সত্তা; বলা হয় যে যুক্তিবুদ্ধির অধিকারী বলিয়াই মানুষ ইতর প্রাণী হইতে পৃথক। কিন্তু ইহা এ বিষয়ের অতি সংক্ষিপ্ত অতি অপূর্ণ এক ভ্রান্তিজনক বিবরণ। কেননা যুক্তিবুদ্ধি একটি বিশিষ্ট সসীম কার্য্যসাধনোপযোগী যান্ত্রিক ক্রিয়াধারামাত্র, তদপেক্ষা অনেক বৃহৎ এমন একটা তত্ত্ব বা একটা শক্তি হইতে তাহা জাত হইয়াছে যাহা আরো জ্যোতির্ম্ময় বিরাট ও অসীম এক ব্যোমের মধ্যে বাস করে। অব্যবহিত বা মধ্যবর্ত্তীকালের প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পর্য্যবেক্ষণ যুক্তিতর্ক গবেষণা ও বিচার করা যাহার ধর্ম্ম সেই বুদ্ধির যথার্থ ও চরম প্রয়োজন এবং উপযোগীতা এই যে, উপর হইতে অবতীর্ণ আলোককে ইহা যথার্থভাবে গ্রহণ ও যথার্থ কার্য্যে বিনিয়োগ করিবার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে; উর্দ্ধ্বের এই আলোক মানুষের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে নামিয়া আসিয়া অধিকার করিবে সেই নিষ্প্রভ ক্ষুদ্র আলোকের স্থান যাহা আজ নিম্ন হইতে সে-পশুকে পরিচালিত করিতেছে। পশুরও প্রাথমিক এক বিচারবুদ্ধি, এক প্রকার ভাবনা, এক অন্তরাত্মা, ইচ্ছা

ও তীব্র ভাবাবেগরাজি আছে ; এই সমস্ত মানুষের সহিত তুলনায় অনেক অপরিণত হইলেও মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু পশুর মধ্যে এই সমস্ত বৃত্তি আপনা আপনি পরিচালিত হয়, তাহারা তথায় কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, এমন কি প্রায় তাহাদের সকলটা নিম্নতর স্নায়ুময় সত্তার দ্বারা গঠিত। পশুর সকল বোধ অনুভূতি ও ক্রিয়াধারা শাসিত হয় প্রাণাবেগ ও প্রাণগত বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ প্রাণ এবং স্নায়ুগত সহজ প্রেরণা আকাঙ্ক্ষা অভাব ও পরিতৃপ্তি দ্বারা। প্রাণময় প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়াধারাতে মানুষও বাঁধা আছে কিন্তু ততটা পরিমাণে নয়। সে তাহার আত্মবিকাশের কঠিন কার্য্যে প্রদীপ্ত সংকল্প প্রদীপ্ত ভাবনা এবং প্রদীপ্ত ভাবাবেগাবলী প্রয়োগ করিতে পারে ; বাসনার নিম্নতর ক্রিয়াধারাকে সে এই সমস্ত অধিকতর সচেতন ও বিচারশীল পরিচালকের ক্রমবর্দ্ধমান অধীনতায় আনিতে পারে। এইভাবে যে পরিমাণে সে তাহার নিম্নতর সত্তার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে, যে পরিমাণে তাহাকে আলোকিত করিতে পারিবে, বুঝিতে হইবে সেই পরিমাণে সে পশুত্ব হইতে মানবত্বে উত্তীর্ণ হইয়াছে। যখন সে কামনাকে পূর্ণরূপে সরাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বৃহত্তর এমন প্রদীপ্ত ভাবনা দৃষ্টি ও সংকল্পকে বসাইতে আরম্ভ করিযাছে, যাহারা অনন্তের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে, সচেতনভাবে সে তাহার নিজের ইচ্ছা হইতে দিব্যতর এক ইচ্ছার অধীন হইয়াছে, এক বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত জ্ঞানের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তখন সে অতিমানবতায় উন্নীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ভগবানের দিকে যাত্রাপথে আরূঢ় হইয়াছে।

তাহার পরে ভাবনা আলোক ও সংকল্পের আধার উচ্চতম মনে অথবা গভীরতম অনুভূতি ও ভাবাবেগের ক্ষেত্র আন্তর হৃদয়ে আমাদের চেতনাকে প্রথমে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে—হয় এই দুইএর একটিকে অথবা যদি সমর্থ হই তবে এক সঙ্গে দুটিকেই এবং আমাদের প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে ভগবানের দিকে উন্নীত করিবার জন্য তাহাকে বা তাহাদিগকে উত্তোলন যন্ত্র (lever)-রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। জ্ঞানের বিরাট এক লক্ষ্যের দিকে, আমাদের কর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত এক উৎসের অভিমুখে, ভাবাবেগের অবিনাশী এক বিষয়বস্তুর দিকে উন্মুক্ত আমাদের প্রদীপ্ত ভাবনা সংকল্প ও হৃদয়ের সমন্বিত একাগ্রতা সাধন—ইহাই হইল এ যোগের পথে যাত্রারম্ভ। যে আলোক আমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে তাহার মূল উৎসকে, আমাদের সকল অঙ্গ পরিচালনা করিবার জন্য যে শক্তিকে আমরা আবাহন করিতেছি তাহার উৎপত্তিস্থানকে খুঁজিয়া বাহির করাই হইবে আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হইবেন স্বয়ং ভগবান যাঁহার দিকে জানিয়া বা না জানিয়া

আমাদের নিগূঢ় প্রকৃতির মধ্যস্থিত কোন কিছু আস্পৃহাভরে সর্ব্বদা চাহিয়া রহিয়াছে। অদ্বিতীয় ভগবানের ভাব বা ধারণা, অনুভূতি, দিব্যভাবে দৃষ্টরূপ, উদ্বোধক সংস্পর্শ এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর আমাদের ভাবনার বৃহৎ বহুমুখী অথচ ঐকান্তিক অভিনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সর্ব্বময় শাশ্বত সত্তার উপর হৃদয়ের এক জ্বলন্ত অভিনিবেশ আনিতে এবং একবার তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলে, সেই সর্ব্বসুন্দরের অধিকার ও পরমানন্দের গভীরে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইতে হইবে। আর চাই ভাগবত স্বরূপের সমগ্রতা প্রাপ্তি ও চরিতার্থতার জন্য এক প্রবল ও অচল অভিনিবেশ এবং তিনি আমাদের মধ্যে যাহা অভিব্যক্ত করিতে চান তাহার দিকে স্বচ্ছন্দ ও সাবলিল উন্মিলন —ইহাই হইল এই যোগের ত্রিমার্গ।

কিন্তু যাহাকে আমরা এখনও জানি না তাহার উপর কি করিয়া মনকে একাগ্র করিব? অথচ ভগবানের উপর আমাদের সত্তার এই একাগ্রতাসাধন করিতে না পারিলে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারিব না। যোগসাধনায় জ্ঞান অথবা জ্ঞানলাভের চেষ্টা বলিতে আমরা বুঝি চিত্তের এমন একাগ্রতা যাহার চরম পরিণাম ভগবানের এক জীবন্ত অনুভূতি এবং আমাদের ও অন্য যাহা কিছুর সম্বন্ধে আমরা সচেতন তাহাদের সকলের মধ্যে তাঁহার সান্নিধ্যের এক নিত্য বোধ। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে অথবা দার্শনিক যুক্তিবিচারের প্রভাবে ভগবানের একটা বুদ্ধিগত ধারণা গঠিত করিয়া লইবার জন্য আত্মনিয়োগ করা যথেষ্ট নহে; কারণ দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমের পরে শাশ্বত বস্তুর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সমস্তই হয়ত জানিতে পারিব, অনন্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাবনা করা হইয়াছে তাহা হয়ত অধিগত করিতে পারিব কিন্তু তথাপি হয়ত তিনি পূর্ণরূপে অবিদিতই থাকিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ শক্তিশালী যোগ-সাধনায় এই বুদ্ধিগত প্রস্তুতি একটা প্রথম ধাপ হইতে পারে কিন্তু তাহাও অপরিহার্য্য নহে; সকলের পক্ষে এ ধাপের প্রয়োজন নাই অথবা সকলকে এ ধাপের সাধনায় আহ্বান করা যায় না। পরিচিন্তনশীল অথবা অনুধ্যান-পরায়ণ যুক্তিবিচার দ্বারা জ্ঞানের এক মনোময় মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা যদি সাধনার অপরিহার্য্য বিধান অথবা অবশ্য পালনীয় প্রাথমিক কার্য্য হইত তাহা হইলে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া মানুষের পক্ষে যোগ সাধনা অসম্ভব হইয়া পড়িত। ঊর্দ্ধ্বের আলো তাহার কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেখিতে চায় আমাদের অন্তরাত্মা হইতে ভগবানের জন্য আবাহন আসিয়াছে কিনা এবং সেই আবাহনে

মনের যথেষ্ট সম্মতি আছে কিনা। এই সম্মতি আসিতে পারে ভাবনায় নিরন্তর ভগবানের ধারণা ও আমাদের সক্রিয় অঙ্গসকলে সেই ধারণানুযায়ী সংকল্প হইতে, আস্পৃহা বিশ্বাস ও হৃদয়ের প্রয়োজনবোধ হইতে। এই সমস্ত সাধনাঙ্গ যদি একস্বরে না বাজে, সমছন্দে যদি দেখা নাও দেয় তবু এ সমস্তের মধ্যে কোনটা প্রধান হইয়া সাধককে পরিচালিত করিতে পারে। আরম্ভে মনের ধারণা অপর্য্যাপ্ত হইতে পারে, হইতে পারে কেন, হয়ত হইতে বাধ্য; আস্পৃহা হইতে পারে সংকীর্ণ ও অপূর্ণ, বিশ্বাস ঈষদ্দীপ্ত এমন কি জ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তির উপর অপ্রতিষ্ঠিত, হ্রাসবৃদ্ধিশীল ও অনিশ্চিত, সহজে ক্ষীয়মান; এমন কি অনেক সময়ে তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; আবার ঝটিকাসঙ্কুল গিরিবর্ত্মের মধ্যেস্থিত মশালের মত অতিকষ্টে তাহাকে পুনরায় জ্বালাইয়া লইতে হয়। কিন্তু একবার অন্তরের গভীর হইতে দৃঢ় সংকল্পের সহিত আত্মোৎসর্গ যদি আসিয়া থাকে, যদি আত্মার ডাকে জাগরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত অপর্য্যাপ্ত বৃত্তিসকলও দিব্য উদ্দেশ্যসাধনের উপযুক্ত যন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার সকল পথই খোলা রাখিতে চাহিয়াছেন, এমন কি সংকীর্ণতম দ্বার সর্ব্বাপেক্ষা নীচু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন খিড়কীর দরজা বা হীনতম প্রবেশপথ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেন নাই। যে কোন নাম, যে কোন রূপ, যে কোন প্রতীক, যে কোন অর্ঘ্যই যথেষ্ট যদি তাহার সঙ্গে থাকে আত্মদান ও আত্মনিবেদন; কেননা ভগবান সাধকের হৃদয়ে নিজেকে দেখিতে পান এবং তাহার উৎসর্গ গ্রহণ করেন।

কিন্তু তথাপি আত্মোৎসর্গের পশ্চাতে যত বৃহত্তর ও বিস্তীর্ণতর ভাবনা-শক্তি (idea force) থাকিবে ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল; ততই তাহার সিদ্ধি পূর্ণতর ও উদারতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। যদি আমরা পূর্ণযোগের সাধনা করিতে চাই, তাহা হইলে ভগবানের এক পূর্ণাঙ্গ ভাবনা লইয়া আরম্ভ করিতে পারিলে ভাল হয়। সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণ-সীমাবন্ধনবর্জিত সিদ্ধির জন্য হৃদয়ে এক বিশাল আস্পৃহা থাকা চাই। সাম্প্রদায়িক বা ধার্ম্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিহার করাই যথেষ্ট নহে, যে সমস্ত একদেশদর্শী দার্শনিক ধারণা পরম অনির্ব্বচনীয়কে সঙ্কুচিত এক মনোময় সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চায় তাহাদিগকেও বর্জন করিতে হইবে। যে সক্রিয় শক্তিশালী ধারণা বা অনুপ্রেরণাদায়ক বোধ লইয়া আমাদের যোগ সাধনা সর্ব্বোত্তমভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে তাহা স্বভাবতই হইবে এক চিন্ময় সর্ব্বালিঙ্গনকারী অথচ সর্ব্বাতি-ক্রমী অনন্তের বোধ। আমাদের ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিতে হইবে এক স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান আনন্দময় ও পরিপূর্ণ পরম একের ও একত্বের উপর, যাহার মধ্যে

সর্ব্ব সত্তা বাস ও বিচরণ করিতেছে এবং যাহার মধ্যে দিয়া সকলেই মিলিত ও এক হইয়া যাইতে পারে। এই শাশ্বত সত্তা তাহার আত্মাভিব্যক্তিতে এবং সাধকের অন্তরাত্মার সহিত তাহার সংস্পর্শে যুগপৎ ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক এ উভয়ই বলিয়া অনুভূত হইবে। তিনি ব্যক্তিক, কেননা তিনি সেই চিন্ময় ভগবান সেই অনন্ত পুরুষ, বিশ্বের অসংখ্য দিব্য ও অদিব্য ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে যাহার অনন্তরূপের ভগ্নাংশমাত্র প্রতিফলিত হইতেছে। তিনি নৈর্ব্যক্তিক, কারণ তিনি আমাদের কাছে এক অনন্ত সৎ চিৎ ও আনন্দরূপে প্রকট হন ; কারণ তিনি সকল সত্তার, সকল শক্তির উৎস ভিত্তি ও উপাদান, আমাদের সত্তার, দেহমন প্রাণের, আমাদের আত্মার ও আমাদের মধ্যস্থ জড়ভূতের মূল তত্ত্ব। ভাবনাকে তাহার উপর অভিনিবিষ্ট করিয়া তিনি যে আছেন ইহা শুধু মনোময়ভাবে বুঝিলে অথবা তাহাকে বস্তু-নিরপেক্ষ ভাববিশেষ অথবা যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয় এক তথ্য বলিয়া ধারণা করিলেই চলিবে না ; আমাদের ভাবনা হইবে এরূপ চক্ষুষ্মান যে তাহা সব কিছুর অন্তর্যামীরূপে এখানেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে, আমাদের নিজেদের মধ্যে তাহাকে উপলব্ধি করিতে, তাহার শক্তিরাজির গতিবৃত্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও ধরিতে সমর্থ হইবে। তিনি এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ; তিনি সেই আদি সার্ব্বভৌম আনন্দ যিনি বিশ্বমূর্ত্তি হইয়াও বিশ্বাতীত ; তিনি সেই এক অদ্বিতীয় অনন্ত চিদ্বস্তু যাহা দিয়া সকল চেতনা গঠিত হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের সকল গতিবৃত্তির মধ্যে অনুস্যূত আছে, তিনি সেই অদ্বিতীয় অসীম সত্তা যাহা সকল ক্রিয়া ও সকল অভিজ্ঞতাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ; তাহার ইচ্ছাই সকল বস্তুকে পরিণতির পথে তাহাদের আজিও অনুপলব্ধ অথচ অবশ্যম্ভাবী চরম উদ্দেশ্য ও পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করিতেছে। আমাদের হৃদয় তাঁহার নিকট নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে, পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া তাহার কাছে উপনীত হইতে পারে, তাহার সর্ব্বব্যাপী মধুর প্রেমে তাহার পরমানন্দের জীবন্ত সাগরে বিচরণ করিতে, স্পন্দিত হইতে পারে। কারণ তাহারই হইল সেই নিগূঢ় আনন্দ যাহা অন্তরাত্মাকে তাহার সকল অনুভূতিতে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং যাহা অব্যবস্থিত অহংকে পর্য্যন্ত তাহার সকল ভুল ভ্রান্তি পরীক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে—যতদিন তাহার সকল দুঃখ সকল যন্ত্রণার অবসান না হয়। তাহারই হইল সেই অনন্ত দিব্য পরম প্রেমিকের প্রেম ও আনন্দ—যিনি সব কিছুকে তাহাদের আপন আপন পথে তাহার পরম সুখকর একত্বের দিকে লইয়া যাইতেছেন। মানুষের ইচ্ছাশক্তি তাহারই উপর অবিচলিত ভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে অদৃশ্যশক্তিরূপে যাহা তাহাকে চালাইতেছে ও সার্থক করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা তাহার সকল

শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস। নৈর্ব্যক্তিকতায় সক্রিয় ও স্বয়ংজ্যোতি এই শক্তির মধ্যে সকল পরিণাম নিহিত থাকে, যতদিন না সিদ্ধি লাভ করে ততদিন ইহা শান্ত স্থিরভাবে কার্য্য করিয়া যায়, ব্যক্তিকতাতে এই শক্তি আত্মপ্রকাশ করে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান যোগেশ্বররূপে, যিনি অনিবার্য্যভাবে সাধককে তাহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেন। প্রারম্ভে এই বিশ্বাস লইয়াই সাধককে তাহার অভীপ্সা ও তাহার সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে; কেননা তাহার সকল প্রচেষ্টার, বিশেষত সেই অদৃশ্যের সন্ধানের পথে মনোময় মানুষকে বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই চলিতে হয়। যখন দিব্য উপলব্ধি আসে তখন বিশ্বাস দিব্যভাবে পূর্ণ ও সার্থক হইয়া জ্ঞানের শাশ্বত শিখায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

আমাদের সকল ঊর্দ্ধমুখী প্রচেষ্টার মধ্যে কামনার নিম্নতর উপাদান প্রথমে স্বভাবতই আসিয়া প্রবেশ করিবে। কারণ আমাদের প্রবুদ্ধ সংকল্প যে বস্তুকে অবশ্যকরণীয় বলিয়া দেখে এবং জয়যোগ্য রাজমুকুট মনে করিয়া যাহার অনুসরণ করে, হৃদয় যাহাকে একমাত্র আনন্দের বস্তু বলিয়া আলিঙ্গন করে, তাহাকেই অহংগত বাসনার ক্ষুব্ধ আবেগে চাহিবে এমন কিছু আমাদের মধ্যে আছে, অথচ সে কিছু নিজেকে সীমিত ও এই প্রচেষ্টার প্রতিকূল বলিয়া বোধ করে এবং সীমিত বলিয়াই ব্যাকুল ও অশান্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রয়াসশীল হয়। আমাদের মধ্যস্থিত বাসনাময় এই প্রাণশক্তি বা কামময় আত্মাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে বা মানিয়া লইতে হইবে, তবে তাহা কেবল তাহার দিব্য রূপান্তর সাধনের জন্য। এমন কি প্রথম হইতেই ইহাকে শিখাইতে হইবে অপর সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে অভিনিবিষ্ট হইতে। একবার এই মুখ্য কাজ হইয়া গেলে ইহাকে কামনা করিতে শিখাইতে হইবে পৃথকভাবে নিজের জন্য নয় কিন্তু বিশ্বগত ভগবানের এবং আমাদের অন্তর্য্যামী দিব্য পুরুষের জন্য; সকল সম্ভবপর আধ্যাত্মিক সম্পদ যে তাহার করতলগত হইবে ইহা নিশ্চিত হইলেও ইহা কোন ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক লাভের জন্য নিজেকে নিয়োগ করিবে না; বরং ইহাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে আমাদের ও অপরের মধ্যে যে বৃহৎ কার্য্য সাধিত করিতে হইবে তাহার উপর, যাহা জগতের মধ্যে ভগবানের গৌরবময় সার্থকতা হইয়া দাঁড়াইবে সেই আগামী পরম অভিব্যক্তির উপর, সেই পরম সত্যের উপর যাহাকে পাইতে, জীবনে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে এবং চিরদিনের জন্য হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বশেষে ইহার পক্ষে যাহা একান্ত দুরূহ, যথাযথ উদ্দেশ্য লইয়া অনুসন্ধান অপেক্ষাও যাহা কঠিনতর এমন

এক কাজ তাহাকে শিখাইতে হইবে, সে কাজ হইতেছে যথাযথ প্রকারে বা পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ; কেননা আপন অহংগত ধারাতে নয়, ভগবানের ধারাতে চাওয়া ইহাকে শিখিতে হইবে। প্রবল ভেদগত দুরাগ্রহপ্রবণ ইচ্ছার মত নিজের ধারাতে সার্থকতা লাভ ও আপন অধিকারের স্বপ্ন পূর্ণ করিবার জন্য, শ্রেয় ও কাম্যের সম্বন্ধে আপনার ধারণা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবার জন্য জেদ করিলে চলিবে না ; বৃহত্তর ও মহত্তর ইচ্ছার পরিপূরণ এবং অধিকতর নিরপেক্ষ ও প্রাজ্ঞ এক পরিচালনার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে তাহাকে সম্মত হইতে হইবে। এইভাবে শিক্ষা পাইলে যে বাসনা মানুষকে প্রবলভাবে অস্থির ও জ্বালাতন করে, তাহাকে বিপদে ফেলে, যাহা সকল প্রকার পদস্খলনের মূল কারণ, তাহা তাহার দিব্য প্রতিরূপে রূপান্তরিত হইবার জন্য উপযুক্ত হইবে। কেননা কামনা-বাসনা এবং আবেগ-অনুরাগেরও একটা দিব্যরূপ আছে ; সকল বাসনা ও শোক-তাপের অতীত অন্তরাত্মার শুদ্ধ হর্ষদীপ্ত এক আকৃতি আছে, আছে এক আনন্দময় দিব্য ইচ্ছাশক্তি, যাহা পরম শিবের অধিকারে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ।

যখন একবার আমাদের ধ্যেয় বস্তু আমাদের ভাবনা হৃদয় ও সংকল্প এই তিনটি প্রধান করণ বা যন্ত্রকে অধিকার করিয়াছেন এবং তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছেন—শুধু তখনই আমাদের রূপান্তরিত প্রকৃতিতে দেহমন প্রাণের পূর্ণতা কার্য্যতঃ সফল হইয়া উঠিতে পারে—এই পূর্ণতা কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন আমাদের মধ্যস্থ কামময় আত্মা পূর্ণরূপে দিব্য বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। অহমিকার ব্যক্তিগত পরিতুষ্টির জন্য এ কাজ করা হইবে না, করা হইবে যাহাতে সমগ্র সত্তা দিব্য অধিষ্ঠানের যোগ্যমন্দির, দিব্য কর্ম্ম সাধনের নিখুঁত যন্ত্র হইয়া উঠে তাহার জন্য। কেননা কার্য্য যথার্থভাবে কেবল তখনই সংসাধিত হইতে পারে যখন যন্ত্রটি উৎসর্গীকৃত এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া নিঃস্বার্থকর্ম্মের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে—এবং ইহা তখনই সম্ভব হইবে যখন ব্যক্তিগত কামনা ও অহন্তা বর্জিত হইয়াছে কিন্তু মুক্ত ব্যষ্টি সত্তার লোপ হয় নাই। মানুষের ক্ষুদ্র অহন্তার যখন নাশ হয় তখনও তাহার যথার্থ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে, থাকিতে পারে তাহার মধ্যে ভগবানের যথার্থ সংকল্প কর্ম্ম ও আনন্দ, তাহার পূর্ণতার ও সার্থকতার আধ্যাত্মিক ব্যবহার। তখন আমাদের কর্ম্ম দিব্য এবং দিব্যভাবে কৃত হইবে ; ভগবানে অর্পিত আমাদের মন প্রাণ ও সংকল্পশক্তি তখন ব্যবহৃত হইবে যাহা আমরা নিজের মধ্যে সিদ্ধ করিয়াছি,—চিৎপুরুষের পার্থিব অভিযানের যাহা চরম লক্ষ্য, সেই মূর্ত্ত একত্ব, প্রেম, শক্তি, সামর্থ্য, বৈভব ও অমর আনন্দের

যে অভিব্যক্তি সংসাধিত হইয়াছে—সেই সমস্ত নিজের ও অপরের মধ্যে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য।

এইরূপ এক সর্ব্বাঙ্গীণ একাগ্রতা ও প্রচেষ্টা লইয়া বা অন্ততঃপক্ষে সেই দিকে স্থিরভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যোগ আরম্ভ করিতে হইবে। পরমেশ্বরের নিকট সমগ্রভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য এক অবিরাম ও অটুট সংকল্প গ্রহণ, যিনি শাশ্বত ও সর্ব্বময় তাঁহার চরণে আমাদের সমগ্র সত্তা ও বহু-অংশ-সমন্বিত প্রকৃতিকে সমর্পণ, ইহাই আমাদের নিকট যোগের দাবি। যিনি আমাদের একমাত্র কাম্যবস্তু সেই অদ্বয় পুরুষের নিকট আমাদের যে আত্ম নিবেদন, তাহার মাপকাঠি হইবে আমাদের একাগ্রতার সক্রিয় পূর্ণতা—অপর সব কিছুকে বাদ দিয়া সেই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তুতে পূর্ণরূপে অভিনিবেশ। অবশ্য এই ভাবে বাদ দেওয়াতে জগৎকে দেখিবার জন্য আমাদের মিথ্যা দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং আমাদের সংকল্পের অজ্ঞানতা ছাড়া শেষ অবধি কিছুই বাদ পড়িবে না। কেননা শাশ্বতের উপর আমাদের মনের অভিনিবেশ তখনই পূর্ণতায় পৌঁছিবে যখন আমরা ভগবানকে যেমন তাহার স্বরূপে ও আমাদের নিজেদের মধ্যে তেমনি সর্ব্ববস্তু সর্ব্বসত্তা ও সর্ব্বঘটনার মধ্যেও নিরন্তর দেখিতে পাইব। হৃদয়ের অভিনিবেশ তখনই পূর্ণ হইবে যখন সকল আবেগ সমাহৃত ও পর্য্য-বসিত হইবে ভগবৎ প্রেমে, তাঁহারই জন্য তাঁহার স্বরূপ সত্তার প্রতি প্রেমে এবং সেই সঙ্গে সকল সত্তা ও শক্তির, জগতের সকল ব্যক্তি ও রূপের মধ্যস্থিত ভগবানের প্রতি প্রেমে। ইচ্ছাশক্তির অভিনিবেশ তখনই পূর্ণ হইবে যখন আমরা সর্ব্বদা দিব্যপ্রণোদনা অনুভব ও গ্রহণ করিব এবং যখন শুধু সেই প্রণোদনাকে আমাদের একমাত্র চালক-শক্তিরূপে স্বীকার করিব; কিন্তু তাহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে অহংগত প্রকৃতির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহী ও বিভ্রান্ত আবেগের তাড়নাগুলির শেষটিকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া আমরা নিজেদিগকে সর্ব্বজনীন করিয়া তুলিয়াছি এবং সর্ব্ব বিষয়ে একমাত্র দিব্য কর্ম্মধারাকে সর্ব্বদার জন্য সানন্দে স্বীকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাই পূর্ণ-যোগের প্রথম মৌলিক সিদ্ধি।

যখন ভগবানের কাছে ব্যষ্টির পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের কথা বলি তখনও শেষ পর্য্যন্ত আমরা এতদপেক্ষা ন্যূনতর কিছু বুঝি না। আত্মোৎসর্গের এই সমগ্র পূর্ণতা কেবল তখনই আসিতে পারে যখন প্রগতির পথে সর্ব্বদা অগ্রসর হইতে গিয়া সাধনার দীর্ঘ ও দুরূহ পদ্ধতি দ্বারা বাসনাকে অম্লান চিত্তে আমরা

পরিপূর্ণরূপে আমূল রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইব। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের অর্থই পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ।

কেননা, এই অবস্থায় এই যোগের দুইটি গতিধারা বা দুইটি কাল-বিভাগ, এবং দুইএর মধ্যে পরিবর্ত্তনের একটা স্তর দেখা যায়; একটি আত্ম সমর্পণ অপরটি তাহার পরমসিদ্ধি এবং পরিণাম। প্রথমটিতে ব্যষ্টি সাধক ভগবানকে তাহার প্রতি অঙ্গে আবাহন ও গ্রহণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। প্রস্তুতির এই প্রথম পর্ব্বে তাহাকে তাহার নিম্নতর প্রকৃতির যন্ত্রসকলের সাহায্যেই কর্ম্ম করিতে হয় কিন্তু সে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে উপর হইতে সহায়তা পায়। কিন্তু এই গতির শেষের দিকের পরিবর্ত্তনের স্তরে আমাদের ব্যক্তিগত এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রচেষ্টা হ্রাস পাইতে এবং এক উচ্চতর প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে থাকে; শাশ্বত মহাশক্তি এই সীমিত মর-আধারে অবতীর্ণ হন, এবং বর্দ্ধমানভাবে তাহাকে অধিকার ও তাহার রূপান্তর সাধন করেন। প্রথমে যে অধস্তন গতিবৃত্তি অপরিহার্য্য ছিল দ্বিতীয় কাল-বিভাগে বৃহত্তর গতিধারা পূর্ণরূপে তাহার স্থান অধিকার করে; কিন্তু ইহা কেবল তখনই সাধিত হইতে পারে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ পরিপূর্ণ হয়। আমাদের মধ্যের অহংব্যক্তিটি নিজের শক্তিতে, সংকল্পে, জ্ঞানে বা নিজের কোন গুণের সাহায্যে নিজেকে দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিতে পারে না; যেটুকু সে করিতে পারে তাহা হইল নিজেকে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করা এবং যাহা সে হইয়া উঠিতে চায় ক্রমশঃ অধিকতররূপে তাহারি কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। যতদিন আমাদের মধ্যে অহমিকা কার্য্য করিতেছে ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম্ম সর্ব্বদা তাহার প্রকৃতিতে অধস্তন সত্তার অংশ থাকিবে, থাকিতে বাধ্য; সে কর্ম্ম হইবে অন্ধকারাচ্ছন্ন অথবা অর্দ্ধদীপ্ত, তাহার ক্ষেত্র হইবে সীমাবদ্ধ, তাহার শক্তি হইবে শুধু আংশিক ফলদায়ক। কিন্তু শুধু আমাদের প্রকৃতির ঈষদালোকিত অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তনে তৃপ্ত না হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন আদৌ যদি করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অলৌকিক কার্য্য সাধনের জন্য ব্যষ্টির মধ্যে আমাদিগকে ভাগবতী শক্তিকে আবাহন করিতে হইবে; কেননা একমাত্র তাঁহারই আছে সেই প্রয়োজনীয় সামর্থ্য যাহা অমোঘ, সর্ব্বজ্ঞ এবং অপরিসীম। কিন্তু ব্যক্তিগত মানবীয় ক্রিয়ার স্থানে অবিলম্বে দিব্য ক্রিয়াকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা প্রথমেই সম্ভব নহে। নিম্ন হইতে উত্থিত যাহা কিছু উচ্চতর ক্রিয়ার সত্যকে ব্যর্থ করিতে, মিথ্যায়

পরিণত করিয়া দিতে চায় প্রথমে তাহাদিগকে নিরুদ্ধ বা হীনবীর্য্য করিয়া দিতে হইবে, এবং সাধককে নিজে স্বেচ্ছায় এ কাজ করিতে হইবে। বার বার নিম্ন প্রকৃতির আবেগ ও অসত্য সকল আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে এবং আমাদের বিভিন্ন অঙ্গে বর্দ্ধনশীল সত্যকে সাগ্রহে অবিরাম সমর্থন করিতে হইবে; কেননা যে উদ্বোধক আলোক শুচিতা ও শক্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তাহাদিগকে অধিক হইতে অধিকতরভাবে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা, তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলা, রক্ষা করা ও শেষ পূর্ণতা দান করিবার জন্য প্রয়োজন খোলা মনে স্বাধীনভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ এবং যাহা কিছু তাহার বিরোধী, তদপেক্ষা নিম্নতর বা তাহার সহিত অসমঞ্জস তাহাদিগকে অতি দৃঢ়ভাবে বর্জন।

আত্ম-প্রস্তুতির প্রথম পর্ব্বে ব্যক্তিগত প্রয়াসের স্তরে, সাধককে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা হইল তাহার চিরপ্রার্থিত ভগবানের উপর সমগ্র সত্তার এই একাগ্র অভিনিবেশ এবং তাহার অনুসিদ্ধান্তরূপে যাহা কিছু খাঁটি ভাগবত সত্য নহে সে সমস্তের এইরূপ নিরন্তর প্রত্যাখ্যান ও বর্জন। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে আমরা যাহা আছি, যাহা ভাবনা ও অনুভব করি, যে-সমস্ত কর্ম্ম করি তাহার সমস্তই নিঃশেষে নিবেদন করিতে সমর্থ হইব। আবার নিবেদনের চরম পরিণতি হইবে সর্ব্বোত্তমের নিকটে সত্তার সর্ব্বাঙ্গীণ সমর্পণ; কেননা তাহার উচ্চতর শিখর ও তাহার পূর্ণতার নিদর্শন হইল সমগ্র প্রকৃতির সর্ব্বাবগাহী চরম আত্মসমর্পণ। যোগের দ্বিতীয় স্তরে মানুষী ক্রিয়া ও দিব্য ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের ভূমিতে, এক ক্রমবর্দ্ধমান বিশুদ্ধ ও জাগ্রত নৈষ্কর্ম্য, দিব্যশক্তির ডাকে অধিক হইতে অধিকতরভাবে প্রদীপ্ত এক দিব্য সাড়া—কিন্তু অন্য কোন ডাকে নয়—দেখা দিবে; এবং তাহার ফলে উপর হইতে এক বিশাল জাগ্রত ও বর্দ্ধিষ্ণু অলৌকিক ক্রিয়াধারা প্রবল বেগে তাহার ভিতরে নামিয়া আসিবে। শেষ স্তরে আর কোন চেষ্টা, কোন বাঁধাধরা প্রণালী, সাধনার কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা থাকিবে না; পরিশোধিত ও পরিণত পার্থিব প্রকৃতির কলিকার মধ্য হইতে দিব্য প্রসূনের একটা সহজ স্বাভাবিক শক্তিশালী ও আনন্দময় বিকাশ, প্রয়াস ও তপস্যার স্থান অধিকার করিবে। যোগের স্তরগুলির এই হইবে স্বাভাবিক অনুক্রম।

বস্তুতঃ কিন্তু এই সমস্ত গতিধারার পরম্পরা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা একই প্রকার হয় না। প্রথম স্তর শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়া অংশতঃ আরম্ভ হইয়া যায়; দ্বিতীয় স্তর শেষ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে প্রথম স্তর আংশিকভাবে বর্ত্তমান থাকে; প্রকৃতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ও স্বাভাবিক হইবার

পূর্ব্বে দিব্য চরম ক্রিয়া সময় সময় ভবিষ্যতের আশ্বাসরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। আবার ব্যষ্টিব্যক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর ও উচ্চতর কিছু সর্ব্বদাই তাহার মধ্যে রহিয়াছে যাহা তাহার সকল ব্যক্তিগত প্রয়াস ও পরিশ্রমের মধ্যেও তাহাকে পরিচালিত করে। অনেকসময় সে আবরণের পশ্চাতে অবস্থিত এই বৃহত্তর পরিচালনা সম্বন্ধে সাময়িকভাবে পূর্ণ সচেতন হইতে এমন কি তাহার সত্তার কোন কোন অংশে স্থায়ীভাবে সচেতন হইয়া উঠিতে পারে; আর তাহার সমগ্র প্রকৃতি সকল অঙ্গে নিম্নতর প্রকৃতির পরোক্ষ শাসন হইতে মুক্ত হইবার বহু পূর্ব্বেও ইহা ঘটিতে পারে। এমন কি আরম্ভ হইতেই সাধক এইভাবে সচেতন হইতে পারে, তাহার অন্যান্য অঙ্গ না হইলেও তাহার মন ও হৃদয় হয়ত যোগের প্রথম সোপান হইতেই কতকটা প্রাথমিক পূর্ণতার সহিতই এই শক্তিশালী ও মর্ম্মাবগাহী পরিচালনাতে সাড়া দিতে পারে। মধ্যবর্ত্তী স্তরের বিশেষত্ব এই যে তাহা যেমন অগ্রসর হইয়া তাহার শেষ সীমায় পৌঁছিতে থাকে তেমনই এই বৃহৎ সাক্ষাৎ পরিচালনায় পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন ও সুষম ক্রিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। বৃহত্তর ও দিব্যতর পরিচালনায়—যাহা ব্যক্তিগত নহে—এই প্রাধান্য ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের প্রকৃতি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপান্তরের জন্য পরিণত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের আত্মনিবেদন যে শুধু তত্ত্বতঃ গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু তাহা শক্তি ও ক্রিয়াতেও যে সার্থক হইয়াছে ইহাই হইবে তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন। বুঝিতে হইবে যে পরম-পুরুষ তাহার অলৌকিক আলোক শক্তি ও আনন্দের মনোনীত আধারস্বরূপ কোন মানুষকে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় হস্তে তুলিয়া লইয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মে আত্মসমর্পণ—গীতার পন্থা

জীবন, একমাত্র এই জীবনই আমাদের যোগের ক্ষেত্র, সুদূর নীরব অতি ঊর্দ্ধ্বস্থিত পরমানন্দময় বিশ্বাতীত কোন তত্ত্ব নয়। এ যোগের মূল উদ্দেশ্য আমাদের বাহ্য সংকীর্ণ এবং পরস্পরের সহিত অসম্বদ্ধ খণ্ডীকৃত মানবীয় চিন্তাধারা দৃষ্টি অনুভূতি ও সত্তাকে এক গভীর ও উদার আধ্যাত্মিক চেতনাতে রূপান্তরিত করা, বাহ্য ও আন্তর জীবনকে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা, এবং আমাদের সাধারণ মানুষী জীবনধারাকে দিব্য জীবনধারায় পরিণত করা। এই পরম লক্ষ্য সাধনের উপায় ভগবানের চরণে আমাদের সমগ্র প্রকৃতির আত্মসমর্পণ। আমাদের অন্তরস্থ ভগবানকে, সর্ব্বব্যাপী বিশ্বপুরুষকে, সর্ব্বাতীত পরমপুরুষকে সব কিছু সমর্পণ করিতে হইবে। আমাদের সকল সংকল্প হৃদয় ও ভাবনা, যিনি এক ও বহু উভয়রূপে বর্ত্তমান সেই ভগবানের উপর একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট করিতে, আমাদের সমগ্র সত্তা নিঃশেষে একমাত্র তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে—ইহাই হইল যোগের পথে প্রথম নিশ্চিত পদক্ষেপ, অহমিকাকে তাঁহারই দিকে ফিরানো যাহা তাহার চেয়ে অনন্তগুণে বৃহত্তর, ইহাই হইল আত্মদান, অবশ্যকরণীয় আত্মসমর্পণ।

মানুষ সাধারণতঃ যে জীবন যাপন করে তাহা অতি অপূর্ণভাবে সংযমিত ভাবনা ধারণা ইন্দ্রিয়ানুভূতি আবেগ বাসনা সম্ভোগ ও ক্রিয়ার আধা কঠিন আধা তরল সংমিশ্রণের এক সংঘাত ; এই সমস্ত বৃত্তি প্রধানতঃ গতানুগতিক ও পুনরাবৃত্তিপরায়ণ, কেবল আংশিকভাবে সক্রিয়রূপে আত্মপরিণতিশীল, আর ইহারা সকলেই বহিশ্চর এক অহমিকাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। এই সমস্ত গতি ও ক্রিয়ার সমষ্টিগত ফলে অন্তরের একটা পরিণতি ঘটে, যাহা অংশতঃ পরিদৃশ্যমান এবং এই জীবনেই কার্য্যকরী আবার অংশতঃ যাহা পরবর্ত্তী জন্মসকলের মধ্যে প্রগতির বীজস্বরূপ। চেতন সত্তার এই প্রবৃদ্ধি ও প্রসার, ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিক হইতে অধিকতর সুসমঞ্জস পরিণতি—ইহাই হইল মানবজীবনের সমগ্র তাৎপর্য্য, সমস্ত সারাংশ। ভাবনা

সংকল্প আবেগ বাসনা ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা দ্বারা চেতনার এই সার্থক পরিণতি-সাধন যাহা তাহাকে চরমে পরম এক দিব্য আবিষ্কারে পৌঁছাইয়া দিবে—ইহার জন্যই মানুষ বা মনোময় সত্তা জড়দেহ ধারণ করিয়াছে। বাকী সমস্তই হয় সহকারী ও গৌণ, না হয় আকস্মিক ও নিষ্ফল ব্যাপার, কেবল তাহাই প্রয়োজনীয় যাহা তাহার প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তিকে পোষণ এবং সহায়তা করে, যাহা তাহার অন্তরপুরুষের, তাহার আত্মার পরিণতি অথবা বরং ক্রমবর্দ্ধমান আবিষ্কার ও আত্মপ্রকাশ সম্ভব ও পরিপুষ্ট করিয়া তোলে।

আমাদের যোগের লক্ষ্য ইহজগতের এই পরম উদ্দেশ্য সাধনকে দ্রুততর করা, তদপেক্ষা ন্যূনতর কিছু নহে। প্রকৃতির বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মৃদু-গামী সাধারণ পদ্ধতিতে যেরূপ মন্থর ও বিশৃঙ্খল ভাবে বিকাশ ও বিবৃদ্ধি দেখা দেয়—তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হওয়াই এ যোগসাধনার রীতি। কেননা প্রাকৃতিক পরিণামধারা তাহার সর্ব্বোত্তম অবস্থায়ও প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া অনিশ্চিত পদে অগ্রসর হয়, এই অগ্রগতি ঘটে কতকটা পরিবেশের চাপে, কতকটা এক অধ্রুব লক্ষ্য শিক্ষা ও ঈষদ্দীপ্ত স্বেচ্ছাকৃত প্রয়াসের এবং কতকটা আংশিকালোকিত ও অর্দ্ধযান্ত্রিকভাবে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্য দিয়া সুযোগসুবিধাগুলি ব্যবহারের ফলে; আবার এ পরিণামের অনেক-খানি প্রতীয়মান আকস্মিক ঘটনাবলি ও অবস্থাবিপর্য্যয়সমূহে গঠিত হয়, যদিও সে-সকলের অন্তরালে গোপন এক দিব্য মধ্যস্থতা ও দিব্য পরিচালনা রহিয়াছে। যোগে আমরা এই বিশৃঙ্খল বক্র ককটগতির স্থানে একটা দ্রুত সজাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রিত পরিণামধারাকে প্রতিষ্ঠিত করি, যাহার লক্ষ্য সাধককে যতদূর সম্ভব সরল পথে তাহার চরম গম্যস্থানে লইয়া যাওয়া। এক অর্থে প্রগতির পথে কোথাও এক চরম গম্যস্থান আছে ইহা বলা ভুল, কেননা সে পথ হইতে পারে অপার অসীম। তবুও আমরা অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী এক লক্ষ্যের ধারণা করিতে পারি, বর্ত্তমানে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর কোন পরমলক্ষ্য, মানবাত্মার আস্পৃহার কোন বিষয় আমরা কল্পনা করিতে পারি। তাহার সম্মুখে এক নবজন্মের সম্ভাবনা আছে, সত্তার উচ্চতর ও উদারতর ভূমিতে উত্থানের এবং তাঁহার প্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে রূপান্তরিত করিবার জন্য সেই ভূমি হইতে পুনরবতরণের কার্য্য রহিয়াছে। চেতনার এমন প্রসার এমন দীপ্তিলাভের সম্ভাবনা আছে যাহাতে তাহাকে মুক্ত আত্মা ও সিদ্ধ শক্তিতে পরিণত করিবে, এমন কি সে চেতনা ব্যক্তিসত্তার উর্দ্ধে বিস্তারিত হইয়া পড়িলে তাহা দিব্যমানবজাতি অথবা অতিমানসে জাগ্রত নূতন এক অতিমানব জাতি গড়িয়া তুলিতে পারে। এই নবজন্মকেই আমরা

আমাদের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি ; আমাদের যোগের সমগ্র অর্থ হইল এক দিব্য চেতনাতে পরিণতিলাভ করা—শুধু অন্তরাত্মায় নয়, তৎসঙ্গে আমাদের প্রকৃতির সকল অঙ্গের ভগবত্তায় আমূল রূপান্তরিত হওয়া।

যোগে আমাদের উদ্দেশ্য সীমিত ও বহির্মুখী অহমিকার নির্ব্বাসন এবং তাহার স্থানে আমাদের প্রকৃতির অন্তর্যামী প্রভুরূপে ভগবানের অভিষেক। ইহার অর্থ প্রথমতঃ বাসনাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া এবং কামনার পরিতৃপ্তিকে মানুষের কর্ম্ম ও গতির পরিচালক বলিয়া আর গ্রহণ না করা। তখন আধ্যাত্মিক জীবন নিজের পুষ্টিসংগ্রহ করিবে স্বরূপ সত্তার শুদ্ধ নিঃস্বার্থ আধ্যাত্মিক আনন্দ হইতে, কামনা বাসনা হইতে নহে। যাহাতে বাসনার ছাপ দেওয়া আছে সেই প্রাণপ্রকৃতিকে শুধু নয়, কিন্তু তৎসঙ্গে মনোময় সত্তাকেও এক নূতন জন্ম পরিগ্রহ এবং দিব্য এক রূপান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বিবিক্ত অহংগত সীমিত ও অবিদ্যাচ্ছন্ন ভাবনা ও বুদ্ধিকে তিরোহিত হইতেই হইবে ; তাহার স্থানে আনয়ন করিতে হইবে ছায়াহীন দিব্যজ্যোতির উদার ও নির্দ্দোষ খেলার এক প্রবাহ, যাহার চরম পরিণতিতে এমন এক স্বাভাবিক স্বয়ম্ভূ ঋত-চিতের আবির্ভাব হইবে যাহার মধ্যে অর্দ্ধসত্যের অন্ধ অন্বেষণ অথবা স্খলনশীল বিভ্রান্তি নাই। যাহা বিশৃঙ্খল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, অহংকেন্দ্রিক ও ক্ষুদ্র অভিপ্রায়ে নিবদ্ধ আমাদের সেই সংকল্প ও ক্রিয়াকে রহিত করিয়া তাহার স্থানে বসাইতে হইবে ভগবদ প্রেরিত দিব্যভাবে পরিচালিত শক্তির এক পূর্ণক্রিয়া-ধারা, যাহা বেগবান ও বলবান, প্রোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। আমাদের সকল কর্ম্মের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক দ্বিধাহীন দৃঢ় এক সুউচ্চ সংকল্প রোপিত করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত ও ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিতে হইবে, যে সংকল্প স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অবিক্ষুব্ধভাবে দিব্য ইচ্ছার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা থাকিবে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংগত ভাব-আবেগের অতৃপ্তিকর বাহ্য সকল খেলাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং তৎস্থানে তাহাদের পশ্চাতে আমাদের মধ্যে শুভ-মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষমান যে নিগূঢ় গভীর ও সুবিশাল চৈত্যহৃদয় আছে তাহাকে প্রকট করিতে হইবে ; ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানভূমি এই আন্তর হৃদয় দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইয়া আমাদের সকল অনুভূতি, দিব্যপ্রেম ও বিচিত্র পরমানন্দের দুই যুগ্ম ভাবাবেগের প্রশান্ত ও গভীর গতিধারাতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। ইহাই হইল দিব্য মানব বা অতিমানব জাতির সংজ্ঞা। আমাদের যোগের দ্বারা এইপ্রকার অতিমানবকে আমরা অভিব্যক্ত

করিতে চাই, মানুষী বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তির অতিস্ফীত কোন রূপ, এমন কি সে শক্তির কোন উন্নীত ও পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

স্পষ্টতঃ সাধারণ মানবজীবনের তিন-চতুর্থ অথবা তদপেক্ষা বেশী অংশের ক্রিয়া বহির্ম্মুখী। শুধু ঋষি সাধুসন্ত গভীর ভাবুক কবি ও শিল্পীর মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় ; ইহারা অধিকতর পরিমাণে আপন অন্তরে বাস করে, বস্তুতঃ ইহারা অন্তত আপন আপন প্রকৃতির অন্তরতম অংশে, বাহিরের ক্রিয়া অপেক্ষা অধিকতরভাবে অন্তরের অনুভবে ও ভাবনাতে নিজদিগকে গড়িয়া তোলে। কিন্তু অন্তর ও বাহ্য জীবনের কোন এক দিকে পৃথকভাবে ঝুঁকিয়া না পড়িয়া বরং যদি সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের দ্বারা পূর্ণতার মধ্যে উভয়কে মিলিত ও এক করিয়া তুলিতে এবং তাহাদের ঊর্দ্ধস্থিত কিছুর খেলায় তাহাদিগের রূপান্তর সাধন করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা পরিপূর্ণ জীবনের রূপ সৃষ্টি করিতে পারিব। তাহা হইলে কর্ম্মযোগ, ভগবানের সহিত শুধু জ্ঞানে ও অনুভূতিতে নয়, তৎসঙ্গে আমাদের কর্ম্মে ও সংকল্পেও একত্ব স্থাপন পূর্ণযোগের অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য এক অঙ্গ। যদি আমরা আমাদের ভাবনা ও অনুভূতির রূপান্তর সাধন করি কিন্তু তৎসঙ্গে অনুরূপভাবে আমাদের কর্ম্মের আত্মা ও দেহের রূপান্তর সাধন না করি তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধি হইবে খণ্ডিত ও বিকলাঙ্গ।

কিন্তু এই সমগ্র রূপান্তর যদি সাধিত করিতে হয় তবে যেমন আমাদের মন ও হৃদয় তেমনি আমাদের ক্রিয়া ও বাহ্যবৃত্তিচয়কেও ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক বৃহত্তর ও মহত্তর শক্তির কাছে আমাদের সকল সামর্থ্য সমর্পণ স্বীকার করিয়া লইতে এবং ক্রম-বর্দ্ধমান ভাবে তাহা সম্পাদিত করিতে হইবে, আর আমরা যে কর্ম্মী বা কর্ত্তা আমাদের এ বোধ দূরীভূত করিতে হইবে। যে দিব্য সংকল্প দৃশ্যমান রূপ সকলের অন্তরালে লুক্কায়িত আছে অধিকতর সাক্ষাৎভাবে ব্যবহারের জন্য তাহারই হাতে সব-কিছু তুলিয়া দিতে হইবে ; কেননা কেবল সেই সংকল্পের অনুমতি বা অনুমোদনেই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। এক প্রচ্ছন্ন শক্তিই আমাদের কার্য্যাবলির যথার্থ প্রভু নিয়ন্তা ও দ্রষ্টা এবং অহমিকার দ্বারা আনিত অজ্ঞান ও বিকৃতির মধ্য দিয়া একমাত্র তাহাই কর্ম্মের পূর্ণ অর্থ ও চরম উদ্দেশ্য দেখিতে পায়। যাহা বর্ত্তমানে আমাদিগকে গোপনে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সেই মহত্তর দিব্যজীবন সংকল্প ও শক্তির বিশাল ও প্রত্যক্ষ নির্ঝর ধারাতে আমাদের সীমিত ও বিকৃত অহংগত জীবন ও ক্রিয়ার পরিপূর্ণ রূপান্তর

সাধন করিতে হইবে। এই বৃহত্তর সংকল্প ও শক্তিকে আমাদের অন্তরে সচেতন করিতে এবং তাহাকেই প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এখনকার মত শুধু পরিপোষণকারী অনুমন্তারূপী অতিচেতন শক্তিরূপে তাহাকে থাকিতে দিলে চলিবে না। যে সর্ব্বজ্ঞ শক্তি ও সর্ব্বসমর্থ জ্ঞান বর্ত্তমানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার প্রজ্ঞানঘন লক্ষ্য ও ক্রিয়াধারাকে আমাদের মধ্যে অবিকৃতভাবে প্রবাহিত করাইয়া দেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে যাহার ফলে আমাদের রূপান্তরিত সমগ্র প্রকৃতি সেই শক্তি ও জ্ঞানের শুদ্ধ অব্যাহত সুসম্মত ও সহযোগী প্রণালীতে পরিণত হইবে। এই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ও সমর্পণ এবং তাহার পরিণাম স্বরূপ এই পূর্ণ রূপান্তর এবং স্বচ্ছন্দ সংক্রমণ হইল পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মযোগের সমগ্র মৌলিক সাধনা ও চরম লক্ষ্য।

যে সব সাধকের মধ্যে উৎসর্গ ও সমর্পণ প্রথম স্বাভাবিক গতি ও ক্রিয়া-রূপে দেখা দেয় এবং তাহার ফলে ভাবনাশীল মন ও তাহার জ্ঞানের পরিপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয় অথবা সমগ্র আত্মোৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের স্বাভাবিক পরিণাম-বশে যাহাদের হৃদয় ও তাহার সকল ভাবাবেগের রূপান্তর আসিয়া যায়, তাহাদের পক্ষেও সে পরিবর্ত্তনের মধ্যে কর্ম্মের উৎসর্গ অতিপ্রয়োজনীয় এক উপাদান। নহিলে, যদিও তাহারা পারলৌকিক অন্য জীবনে ভগবানকে পাইতেও পারে, কিন্তু এ জীবনে তাঁহাকে সার্থক করিতে পারিবে না; তাহাদের পক্ষে জীবন এক অর্থশূন্য অদিব্য অসম্বদ্ধ তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। যাহা আমাদের পার্থিব জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ সেই প্রকৃত বিজয়শ্রী তাহারা কখন লাভ করিতে পারিবে না, তাহাদের প্রেম আত্মবিজয়ী পরম প্রেমে পরিণত হইবে না, তাহাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ বিরাট চেতনা ও সর্ব্বাবগাহী জ্ঞান হইয়া উঠিবে না। শুধু জ্ঞান বা শুধু ভগবদভিমুখী হৃদয়াবেগ অথবা এ উভয়কে একত্র যোগে লইয়া সাধনা আরম্ভ করা এবং কর্ম্মকে যোগের শেষের দিকের জন্য রাখিয়া দেওয়া অবশ্য চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা এই যে সে ক্ষেত্রে সাধক নিজের মধ্যে একান্তভাবে বাস করিতে, অন্তর্ম্মুখী সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ডুবিয়া থাকিতে, অন্তরের অঙ্গসকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে; নিজের আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার এরূপ কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া পড়িতে পারে যে ভবিষ্যতে সে আর বিজয়ীরূপে নিজেকে বাহিরের কাজে চালিয়া দিতে এবং নিজের উর্দ্ধতর প্রকৃতিতে যে সম্পদ অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা বহির্জীবনে কাজে লাগাইতে পারিবে না। অন্তরের বিজিত রাজ্যের সঙ্গে যখন আমরা বাহিরের কোন প্রদেশ যোগ করিতে চাহিব তখন দেখিতে পাইব যে বিশুদ্ধ অন্তর্মুখী ক্রিয়াধারাতে আমরা অত্যধিক পরিমাণে

অভ্যস্ত এবং জড়ের ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি; তখন বাহ্য জীবন ও দেহের রূপান্তর সাধন অতীব দুরূহ হইয়া দাঁড়াইবে; অথবা আমরা দেখিতে পাইব যে আমাদের বাহিরের ক্রিয়ার সঙ্গে অন্তরের আলোকের কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই, বাহিরের ক্রিয়াধারা তখনও পুরাতন অভ্যস্ত ভ্রান্তির পথে চলিতেছে, তখনও তাহা চিরাভ্যস্ত অপূর্ণ প্রভাব সকলের অধীন রহিয়াছে; আমাদের অন্তরের সত্য ও বাহ্য প্রকৃতির অবিদ্যাচ্ছন্ন যান্ত্রিক ক্রিয়ার মধ্যে এক মর্ম্মন্তুদ ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ অনুভব প্রায়ই হয়, কেননা এরূপ প্রণালীতে আলোক ও শক্তি আপনার মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকিয়া যায় এবং বাহ্য জীবনে আত্ম প্রকাশ করিতে চায় না, অথবা পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের জন্য যে স্থূল উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে সাধক যেন অন্য কোন সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর জগতে বাস করিতেছে এবং পার্থিব জড় জীবনের উপর তাহার কোন দিব্য প্রভাব অথবা হয়ত কোন প্রকার প্রভাবই নাই।

তথাপি আমাদের প্রত্যেককে তাহার নিজ প্রকৃতি অনুসারে চলিতে হইবে এবং যদি আমরা আমাদের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক সেই যোগপন্থা অনুসরণ করিতে চাই, তাহা হইলে কিছু কালের জন্য আমাদিগকে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। সব দিক দেখিলে যোগ প্রধানতঃ আন্তর চেতনা ও প্রকৃতির এক রূপান্তর এবং আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের সাম্য যদি এরূপই হয় যে প্রথমে একান্তভাবে কোন বিশেষ অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে এবং বাকি সব কিছু ভবিষ্যতে করিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে তাহা হইলে আমাদের এই আপাত অপূর্ণ প্রণালী গ্রহণ করিতেই হইবে। তথাপি পূর্ণ যোগের আদর্শ হইবে প্রথম হইতেই এমন এক পূর্ণাঙ্গ সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করা, যাহার প্রগতি হইবে অখণ্ড ও বহুভঙ্গিম। সে যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় হইল এমন এক যোগ সাধনা যাহার লক্ষ্য থাকিবে পূর্ণাঙ্গতা এবং গতি হইবে পূর্ণতার দিকে, যাহা কর্ম্ম হইতে যাত্রারম্ভ করিবে কর্ম্মের দ্বারাই যাহা অগ্রসর হইবে অথচ সে কর্ম্ম প্রতিপদে ক্রমশঃ অধিকতররূপে যেমন দিব্য প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা পরিচালিত তেমনি পরম সহায় দিব্য জ্ঞানের দ্বারা দীপ্তিমন্ত হইবে।

মানবজাতির ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কর্ম্মের যে উপদেশবাণী আমরা পাইয়াছি, অতীত যুগের কর্ম্মযোগের যে সর্ব্বোত্তম প্রণালী মানুষ জানিতে

পারিয়াছে তাহা ভগবদ্ গীতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের সেই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার ক্ষেত্রে কর্ম্মযোগের মহান মূল সূত্রগুলি নিশ্চিত অভিজ্ঞতার অভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া অতুলনীয় দক্ষতার সহিত চির দিনের জন্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে গীতাতে প্রাচীনেরা যেরূপে দেখিয়াছিলেন সেই ভাবে যোগপন্থার কথা শুধু বলা হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ সার্থকতা ও উচ্চতম রহস্য তেমন ভাবে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই, তাহা ইঙ্গিতে মাত্র জানান হইয়াছে; এক পরম রহস্যের অব্যক্ত অংশরূপে অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছে। এই নীরবতা, প্রকাশের এই অনিচ্ছার সুস্পষ্ট কারণ আছে, কেননা যে কোন অবস্থায় যোগের সার্থকতা অনুভূতির বিষয়, কোন প্রকার শিক্ষা বা কোন বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যে মন রূপান্তরকারী প্রদীপ্ত অনুভূতি লাভ করে নাই তাহা সত্য সত্যই যাহাতে বুঝিতে পারে এরূপভাবে ইহা বর্ণনা করা যায় না। আর যে আত্মা জ্যোতির্ম্ময় তোরণ পার হইয়া অন্তরলোকের আলোকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে তাহার পক্ষে মনোময় ও বাঙ্‌ময় বর্ণনা যেমন অসার তেমনি অনাবশ্যক ও অপ্রচুর এমন কি তাহা এক ধৃষ্টতা। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সকল দিব্য সিদ্ধির কথা এমন এক ভাষার অযোগ্য ও ভ্রান্তিজনক শব্দাবলি দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়, যাহা মনোময় মানুষের সাধারণ অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী করিয়াই গড়িয়া তোলা হইয়াছে, সে ভাষায় প্রকাশিত হইলে শুধু তাহারাই যথাযথভাবে তাহা বুঝিতে পারিবে যাহারা পূর্ব্ব হইতেই বিষয়টি জানে এবং জানিয়া এই সমস্ত অযোগ্য বাহ্য শব্দের রূপান্তরিত একটা আন্তর অর্থ দিতে পারে। আদি কালে বৈদিক ঋষিরা বলিয়াছিলেন যে কেবল জ্ঞানীই পরম জ্ঞানের বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। যেরূপ রহস্য-পূর্ণভাবে গীতা শেষ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে আমরা যে সমাধান খুঁজিতেছি তাহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া গীতা নীরব হইয়াছে; ইহা উচ্চতম আধ্যাত্মিক মনের সীমায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, তাহা পার হইয়া অতি-মানসের সৌর জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করে নাই। তবুও ইহার কেন্দ্রগত রহস্য হইল অন্তরের দিব্য পুরুষের সহিত শুধু নিষ্ক্রিয় নয় পরন্তু সক্রিয় তাদাত্ম্য লাভ; তাহার সর্ব্বোত্তম রহস্য হইল যিনি দিব্য গুরু যিনি আমাদের প্রকৃতির অন্তর্য্যামী ও প্রভু তাঁহার নিকট নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণই অতিমানস্-রূপান্তরের অপরিহার্য্য সাধন, আবার অতিমানস রূপান্তরের মধ্য দিয়াই সক্রিয়-ভাবে তাদাত্ম্যলাভ সম্ভবপর হইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা যাউক, গীতাতে কর্ম্মযোগের কোন্ কোন্ ধারা দেওয়া আছে। ইহাতে উপদিষ্ট যোগের মূলতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা সংক্ষেপে

এই বলা যায় যে তাহা সমত্ব ও একত্ব, চেতনার এই দুই মহত্তম ও উচচতম অবস্থা বা শক্তির মিলন। এ পদ্ধতির সারবস্তু হইল যেমন আন্তর সত্তায় ও আত্মাতে তেমনি আমাদের বহির্জগতে ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার ও গ্রহণ। ব্যক্তিগত বাসনার আভ্যন্তর ত্যাগ আনয়ন করে সমতা, সিদ্ধ করে ভগবানের চরণে আমাদের অখণ্ড আত্মসমর্পণ আর তাহা ভেদজনক অহমিকার হাত হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া একত্বের অধিকারী করে। কিন্তু এই যে অভেদ ও একত্ব তাহা শুধু ব্রহ্মের নিশ্চল স্থিতিতে, তাহার শান্ত নিষ্ক্রিয় আনন্দের মধ্যে লাভ হইলে চলিবে না, তাহার সক্রিয় শক্তিতেও লাভ হওয়া চাই। গীতা সকল কর্ম্ম ও প্রকৃতির পূর্ণ শক্তিরাজির মধ্যেও আমাদের আত্মার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান করে,—যদি আমরা ভেদ ও সীমার জনক অহমিকা হইতে উচচ-তর সেই পরম তত্ত্বের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তার অধীনতা স্বীকার করি। গীতা প্রশান্ত নিষ্ক্রিয়তার উপর এক শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ সক্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়; অচঞ্চল শান্তির অপরিবর্ত্তনীয় ভিত্তির উপর বৃহত্তম কর্ম্মপ্রচেষ্টা স্থাপন, অন্তরের এক পরম নীরবতা হইতে স্বচছন্দ আত্মঅভিব্যক্তি—ইহার মূল রহস্য।

এ জগতের সব কিছু স্বরূপতঃ এক অখণ্ড শাশ্বত বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত ব্রহ্ম, যিনি জীব ও বস্তুতে বহুধা বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হন—প্রতীয়মান মাত্র, কেননা সত্য এই যে তিনি সর্ব্ববস্তুতে ও সর্ব্বজীবে অখণ্ড এক রূপে ও সমভাবে বর্ত্তমান, ভেদ শুধু বাহিরে পরিদৃশ্যমান এক ঘটনা মাত্র। যতদিন আমরা এই আপাতপ্রতীয়মান অবিদ্যার মধ্যে বাস করি ততদিন আমরা অহংরূপে প্রকৃতির ত্রিগুণের অধীন। প্রতিভাসের দাসত্বে প্রপীড়িত, দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতের দ্বারা আবদ্ধ, ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, দুঃখ ও সুখ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সফলতা ও বিফলতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও অন্দোলিত হইয়া আমরা মায়ার লৌহ, অথবা গিল্টিকরা লৌহনির্ম্মিত চক্রের উপর অসহায়ভাবে ঘুরপাক খাইতেছি। বড়জোর আমাদের একটা নগণ্য আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য আছে, মানুষ না বুঝিয়া যাহাকে স্বাধীন ইচছা মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ স্বাতন্ত্র্য একটা অলীক বস্তু, কেননা প্রকৃতির গুণরাজিই আমাদের ব্যক্তিগত ইচছার মধ্য দিয়া নিজদিগকে ব্যক্ত করিতেছে; প্রকৃতির শক্তিই আমাদিগকে অধিকার করিয়া এবং আমাদের দ্বারা অধিকৃত না হইয়া আমরা কি ইচছা করিব এবং কি ভাবে ইচছা করিব তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। আমাদের স্বাধীন অহমিকা নয়, প্রকৃতিই স্থির করিয়া দেয় আমরা আমাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে কোন্ বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিব—সে আকাঙ্ক্ষা যুক্তিবিচার পরিচালিত ইচছা বা

ভাবনাহীন আবেগ যাহার বশেই আসুক না কেন। পক্ষান্তরে যদি আমরা ব্রহ্মের একত্ববিধায়ক সত্যের মধ্যে বাস করি তাহা হইলে আমরা অহমিকাকে ছাড়াইয়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাই। কারণ তখন আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাতে ফিরিয়া আত্মস্বরূপতা লাভ করি, আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির তাড়নার ঊর্দ্ধে উঠি, তাহার গুণ ও শক্তির নাগালের বাহিরে যাই। তখন আত্মায় মনে ও হৃদয়ে পরিপূর্ণ সমতা লাভ করিয়া আমরা আমাদের স্বরূপ সত্তার সার্ব্বভৌম একত্ব উপলব্ধি করি, যে সত্তা যেমন সর্ব্বসত্তার সহিত এক আবার তেমনি তাঁহারও সহিত এক যিনি সর্ব্বভূতের, আমরা যাহা কিছু দেখি ও অনুভব করি তাহাদের সব কিছুর মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন। দিব্য সত্তা দিব্য চেতনা ও দিব্য কর্ম্মের জন্য এই সমত্ব এই একত্ব অপরিহার্য্য, এই যুগল ভিত্তি আমাদিগকে স্থাপিত করিতে হইবে। সর্ব্বের সহিত এক হইতে না পারিলে আমরা আধ্যাত্মিক দিব্যত্ব লাভ করিতে পারি না। যদি আমাদের অন্তরাত্মা সকল বস্তুতে সকল ঘটনায় সকল প্রাণীতে সমভাবাপন্ন না হয় তাহা হইলে আমরা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখিতে, দিব্যভাবে জানিতে, অপরের প্রতি দিব্যভাবাপন্ন হইতে পারি না। যিনি পরমশক্তিস্বরূপ যিনি এক শাশ্বত ও অনন্তবস্তু তিনি সকল জীব ও সকল বস্তুর প্রতি সমভাবাপন্ন, আর সমভাবাপন্ন বলিয়াই তিনি তাঁহার ক্রিয়ার ও তাঁহার শক্তির সত্য এবং প্রত্যেক বস্তুর ও প্রত্যেক জীবের নিজস্ব সত্য অনুসারে নিজের পরম জ্ঞানের আলোকে কর্ম্ম করিতে পারেন।

আবার ইহাই হইল একমাত্র প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য মানুষের পক্ষে যাহা লাভ করা সম্ভব, আর ততক্ষণ এ স্বাতন্ত্র্যও সে পাইতে পারে না যতক্ষণ তাহার মনোময় ভেদজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির অন্তরস্থিত সচেতন পুরুষরূপে সে জাগিয়া না উঠে। জগতে কেবল একটিমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা আছে আর তাহা হইতেছে দিব্য ইচ্ছা, প্রকৃতি যাহার কার্য্যকরী শক্তি; কেননা প্রকৃতিই অন্য সকল ইচ্ছার স্রষ্টা ও প্রভু। এক অর্থে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির গুণরাজির অধীন অন্য সকল বস্তুর মত ইহা শুধু আপেক্ষিক ভাবে সত্য। মানুষের মন প্রাকৃতিক শক্তিমালার আবর্তের উপর অধিরূঢ় থাকে, নানা প্রকার সম্ভাবনার মধ্য হইতে একটা ভারসাম্য খাড়া করে, সে এক-বার এদিকে আবার অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং মনে করে যে নানা সম্ভাবনার মধ্যে একটাকে নিজে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছে; কিন্তু যে শক্তি পশ্চাতে থাকিয়া তাহার নির্ব্বাচন নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় তাহাকে সে দেখিতে পায় না, অতি অস্পষ্টভাবেও তাহার কথা সে অবগত নহে; দেখিতে পায় না কারণ

এই যে, সে শক্তি এমন কিছু যাহা অখণ্ড এবং মানুষের দৃষ্টিতে অনির্ণেয়। এই শক্তি নানা বিশিষ্ট নির্দ্ধারণের বৈচিত্র্যপূর্ণ জটিলতার মধ্য দিয়া তাঁহার দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া তোলে, মন বড়জোর সেই সমস্ত নির্দ্ধারণের মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটিকে কতকটা স্পষ্টতার সহিত এবং কতকটা নির্ভুলভাবে চিনিতে পারে। মন নিজেই একটি অপূর্ণ বৃত্তি, সে প্রকৃতির যন্ত্রের এক অংশের উপর শুধু আরূঢ় থাকে, কাল ও পরিবেশের মধ্যে যে শক্তিরাজি যন্ত্রকে চালায় তাহার দশভাগের নয় ভাগই সে জানে না, জানে না তাহার অতীত প্রস্তুতি ও ভবিষ্যৎ অভিপ্রায়; কিন্তু যন্ত্রের উপর অধিষ্ঠিত আছে বলিয়া সে মনে করে যে যন্ত্রটা সে-ই পরিচালিত করিতেছে। এক অর্থে মনের এই ক্রিয়ারও মূল্য আছে; কেননা মনের সেই সুস্পষ্ট প্রবণতা যাহাকে আমরা সংকল্প বলি, তাহার সেই দৃঢ় নিশ্চিত ঝোঁক যাহাকে আমরা স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচন বলিয়া জানি তাহা হইল প্রকৃতির অত্যন্ত শক্তিশালী নির্দ্দেশসকলের অন্যতম; কিন্তু মনের এই ইচ্ছা স্বাধীন নয় এবং এককও নহে। মানবসংকল্পের এই যান্ত্রিক ক্রিয়ার পশ্চাতে অতি বিশাল শক্তিশালী ও শাশ্বত একটা কিছু আছে যাহা মনের অভিপ্রায়ের ঝোঁক উপর হইতে দেখে এবং তাহার সেই সংকল্পের গতির উপর চাপ দেয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে আমাদের ব্যক্তিগত নির্ব্বাচন হইতে বৃহত্তর এক সমগ্র সত্য আছে। আর এই পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে এমন কি তাহার পশ্চাতে এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া, যাহা সমস্ত পরিণামের নিয়ামক তেমন একটা কিছু আছে; তাঁহারই সান্নিধ্য এবং গোপনজ্ঞান প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধের, পরিবর্ত্তনশীল অথবা নিরবচ্ছিন্ন নিয়তির, তাহার গতি-বৃত্তির অপরিহার্য্য ধাপগুলির সক্রিয় ও প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত বোধ অবিচলিতভাবে রক্ষা করে। শাশ্বত ও অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান একটা নিগূঢ় দিব্য সংকল্প আছে যাহা যেমন সমগ্রভাবে সারা বিশ্বে তেমনি এই সমস্ত আপাত প্রতীয়মান ক্ষণভঙ্গুর ও অচেতন বা অর্দ্ধচেতন সব কিছুর প্রত্যেকটি ব্যষ্টির মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে। সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত যে ঈশ্বর নিজ মায়ার দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়বৎ ঘুরাইতেছেন, এই শক্তি বা সান্নিধ্য অর্থে গীতা তাঁহাকেই লক্ষিত করিয়াছে।

এই দিব্য ইচ্ছা আমাদের সহিত সম্বন্ধশূন্য কোন শক্তি বা সান্নিধ্য নয়; ইহার সঙ্গে আমাদের সত্তার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আছে; আমরা ইহার অংশ বিশেষ, কারণ আমাদেরই উচ্চতম আত্মা ইহার কর্ত্তা ও ভর্ত্তা। শুধু বুঝিতে হইবে যে ইহা আমাদের সচেতন মনোময় ইচ্ছা নহে; অনেক সময় আমাদের সচেতন ইচ্ছা যাহা গ্রহণ করে ইহা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, আবার সচেতন ইচ্ছা

যাহাকে বর্জন করে এই দিব্য ইচ্ছা তাহাকে গ্রহণ করে। কেননা এই নিগূঢ় পরম-এক সব-কিছুকে, প্রতি সমগ্র বস্তুকে এবং তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রতি অংশকে পূর্ণরূপে জানেন, আর আমাদের বহিশ্চর মন শুধু বস্তুর অতি সামান্য এক অংশকে মাত্র জানে। আমাদের ইচ্ছা আমাদের মনে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, আর যেটুকু সে জানে তাহা শুধু মনের ভাবনা দ্বারা জানা ; দিব্য ইচ্ছা আমাদের নিকট অতিচেতন, কেননা মূলতঃ তাহা মনের অতীত বস্তু, সে ইচ্ছা সর্ব্বজ্ঞ কেননা তাহা নিজেই সর্ব্ব। যিনি এই বিশ্বশক্তির ধর্ত্তা ও ভর্ত্তা আমাদের সেই উচ্চতম আত্মা আমাদের অহংগত সত্তা বা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি নহেন ; তিনি হইলেন বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত কিছু, এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সেই বিরাট সমুদ্রের ফেনা এবং প্রবহমান বহির্ভাগ মাত্র। যদি আমরা আমাদের সচেতন সংকল্পকে সমর্পণ করিতে এবং তাহাকে যদি শাশ্বত ইচ্ছার সহিত এক করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে এবং শুধু তাহা হইলেই আমরা সত্য স্বাধীনতা লাভ করিব ; দিব্য স্বাধীনতার মধ্যে বাস করিয়া আমরা এই শৃঙ্খলিত তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছাতে আর তখন সংসক্ত থাকিব না, সংসক্ত থাকিব না অজ্ঞান অলীক আপেক্ষিক কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্বাধীনতার সঙ্গে যাহা নিজের অকিঞ্চন প্রাণপ্রেরণা ও মানসিক পরিকল্পনার ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ।

যান্ত্রিক প্রকৃতি এবং প্রকৃতির স্বাধীন প্রভুর মধ্যে অথবা ঈশ্বর বা তাঁহার প্রদীপ্ত অখণ্ড সংকল্প এবং বিশ্বের খণ্ড খণ্ড বহু কার্য্যকরীশক্তিরাজি ও গুণাবলীর মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য আছে তাহা আমাদের চেতনাতে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে।

প্রকৃতি—তাহার নিজের দিব্য সত্যে বা শাশ্বতের সচেতন শক্তিরূপে প্রকৃতি মূলতঃ যাহা সেরূপে নহে, অবিদ্যার মধ্যে তাহা যেরূপে আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় সেইরূপে—এক কার্য্যকরী শক্তি মাত্র, তাহার ক্রিয়াধারা যান্ত্রিক, তাহাতে সচেতন বুদ্ধি আছে বলিয়া আমাদের অনুভূতিতে বোধ হয় না, যদিও তাহার সকল ক্রিয়া এক পরম প্রজ্ঞা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এ-প্রকৃতি নিজে প্রভু নহে, কিন্তু তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া এক সচেতন শক্তি* আছে যাহার প্রভুত্ব অসীম, এবং এই শক্তি তাহাকে চালায় বলিয়া প্রকৃতি সব কিছু শাসন

* এই শক্তি ঈশ্বরেরই জাগ্রত দিব্য শক্তি, ইনিই বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত মহাজননী।

করে এবং তাহার মধ্যস্থিত ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে। প্রকৃতি নিজে ভোক্তা নয় ভোগ্য, নিজের মধ্যে সমস্ত ভোগসম্ভার বহন করে। নিসর্গরূপিণী এই প্রকৃতি জড়ভাবে সক্রিয় এক শক্তি,—কেননা ইহার উপর আরোপিত গতিবৃত্তিই সে পরিস্ফুট করিয়া তোলে, কিন্তু ইহার মধ্যে এক অদ্বয়বস্তু আছেন যিনি সব কিছু জানেন—এক পরমসত্তা সেখানে আসীন রহিয়াছেন যিনি তাহার সকল গতি ও সকল ক্রিয়াধারার কথা অবগত আছেন। এই প্রকৃতি তাহার সহিত যুক্ত বা তাহার অন্তরে অধিষ্ঠিত সত্তা বা পুরুষের জ্ঞান প্রভুত্ব ও আনন্দের আধার হইয়াই কাজ করে, কিন্তু যাহা তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া আছে সেই পুরুষের অধীন হইয়া তাহাকে প্রতিফলিত করিয়াই প্রকৃতি সে জ্ঞান ও প্রভুত্ব ও আনন্দের অংশভাগী হইতে পারে। পুরুষ জ্ঞাতা অথচ তিনি অচল ও নিষ্ক্রিয়; তিনি তাঁহার আত্মসংবিৎ ও আত্মজ্ঞানে প্রকৃতির ক্রিয়ার আধার ও ভোক্তা। তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার অনুমন্তা আর প্রকৃতি তাঁহার অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁহার পরিতুষ্টির জন্যই ক্রিয়া করে। পুরুষ নিজে কার্য্য করেন না, তিনি প্রকৃতিকে তাহার ক্রিয়াশীলতার মধ্যে ধারণ করেন, তিনি আত্মজ্ঞানে যাহা দর্শন করেন প্রকৃতিকে কর্ম্মের শক্তি পদ্ধতি ও পরিণামে তাহা অভিব্যক্ত করিতে সক্ষম করেন। সাংখ্য দর্শন প্রকৃতি পুরুষের এই ভেদ নির্ণয় করিয়াছে, এবং যদিও তাহা সমগ্ররূপে খাঁটি সত্য নহে, কোন প্রকারে প্রকৃতি বা পুরুষ কাহারই উচ্চতম সত্যও নহে, তথাপি সত্তার অপরার্দ্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা প্রামাণ্য ও অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকৃত।

ব্যষ্টি আত্মা বা দেহগত সচেতন সত্তা, হয় এই অনুভূতিশীল পুরুষের সঙ্গে না হয় সক্রিয় এই প্রকৃতির সঙ্গে একত্ব বা তাদাত্ম্যবোধে বাস করিতে পারে। যদি প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যবোধে সে বাস করে তাহা হইলে তখন ব্যক্তিসত্তা প্রভু ভোক্তা বা জ্ঞাতা নয়, সে প্রকৃতির গুণ ও কর্ম্মসকলকে প্রতিবিম্বিত করে; এই তাদাত্ম্যের ফলে সে প্রকৃতির স্বভাবসুলভ পরাধীনতা ও যান্ত্রিক কর্ম্মধারার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; এমন কি প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়া, মৃন্ময় ও ধাতব রূপের মধ্যে সুপ্ত অথবা উদ্ভিদ জীবনের মধ্যে প্রায় সুপ্ত হইয়া সে নিশ্চেতন বা অবচেতন হইয়া পড়িতে পারে। সেখানে সেই নিশ্চেতনার মধ্যে সে, অন্ধকার ও জড়তার যাহা তত্ত্ব শক্তি ও গুণ সেই তমের শাসনাধীন হইয়া পড়ে; সত্ত্ব এবং রজও তথায় আছে, তবে তাহারা তমের স্থূল আবরণের নীচে প্রচ্ছন্ন। যখন দেহগত সত্তা তথা হইতে তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক চেতনার মধ্যে প্রথমে উন্মিষিত বা উৎক্রান্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার প্রকৃতিতে তখনও তমসের প্রাধান্যের জন্য যথার্থভাবে আত্মসংবিৎ লাভ করে নাই তখন সে ক্রমশঃ অধিক

পরিমাণে রজের বশীভূত হয় ; এই রজ বাসনা ও সহজাতপ্রবৃত্তি দ্বারা পরি-চালিত ক্রিয়া ও আবেগের তত্ত্ব শক্তি ও গুণ। এই অবস্থায় পশু-প্রকৃতি গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠে, যাহার চেতনা সংকীর্ণ, বুদ্ধি অর্দ্ধস্ফুট, প্রাণের অভ্যাস ও আবেগ রজস্তমময়। বিরাট নিশ্চেতনা হইতে আধ্যাত্মিক স্থিতির দিকে আরও অধিকতর পরিমাণে উন্মিষিত হইলে দেহগত সত্তার মধ্যে জ্ঞান ও আলোকময় সত্ত্বগুণ মুক্ত ও প্রকাশিত হয় এবং সে আপেক্ষিক এক স্বাধীনতা প্রভুত্ব ও জ্ঞান লাভ করে আর তাহার সহিত আন্তর পরিতুষ্টি ও সুখের সীমিত বা পরিচ্ছিন্ন একটা বোধ জাগিয়া উঠে। মানুষ বা স্থূলদেহধারী মনোময় সত্তার প্রকৃতি এইরূপই হওয়া উচিৎ, কিন্তু অন্তরাত্মার দ্বারা অধ্যুষিত দেহীগণের এই বিপুল সমষ্টির মধ্যে দুই চারিজন ছাড়া অপর সকলের মধ্যে এ প্রকৃতি দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্থিব তামসিকতা ও অবিদ্যাচ্ছন্ন ক্লিষ্ট পাশব প্রাণশক্তির প্রভাব এত অধিক যে সে আজিও দীপ্ত আনন্দময় আত্মা অথবা এমন কি সুসমঞ্জস জ্ঞান ও সংকল্পযুক্ত মনোময় সত্তা হইয়া উঠে নাই। যিনি স্বাধীন প্রভু জ্ঞাতা ও ভোক্তা সেই পুরুষের প্রকৃত স্বভাবের দিকে এখানে মানুষের একটা স্বাভাবিক উর্দ্ধ্বগতি আছে কিন্তু সে গতি অপূর্ণ—আজিও বাধাগ্রস্ত ও ব্যর্থ বা ব্যাহত। কেননা মানুষী ও পার্থিব অভিজ্ঞতাতে এগুণগুলি আপেক্ষিক মাত্র, কোনটাই নিরপেক্ষভাবে চরমফল প্রদান করে না ; ইহারা পরস্পরের সহিত মিশ্রিত ও জড়িত, ইহাদের কোনটার মধ্যে কোথাও অবিমিশ্র শুদ্ধ ক্রিয়া দেখা যায় না। ইহাদের বিশৃঙ্খল ও অনিয়মিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই প্রকৃতির অনিশ্চিত তুলাদণ্ডে সতত দোলায়মান অহংগত মানবচেতনার সকল অভিজ্ঞতা নির্দ্ধারিত করে।

দেহগত আত্মা যে, প্রকৃতিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার নিদর্শন হইল অহন্তার সীমার মধ্যে চেতনার আবদ্ধ হইয়া পড়া। এই সীমিত চেতনার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায় মন ও হৃদয়ের অসমতায় এবং অনুভূতির সংস্পর্শে যে নানা বিচিত্র সাড়া জাগে তাহাদের মধ্যস্থিত বিশৃঙ্খলা বিরোধ ও অসঙ্গতিতে। একদিকে প্রকৃতির কাছে মানবাত্মার বশ্যতা অন্যদিকে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব ও তাহাকে ভোগের জন্য অনেক সময় তাহার যে তীব্র কিন্তু সংকীর্ণ অথচ বহুক্ষেত্রে নিষ্ফল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এই উভয়ের দ্বারা সৃষ্ট দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবীয় প্রতিক্রিয়া সতত দোলায়মান থাকে। মানবাত্মা প্রকৃতির লোভনীয় ও যন্ত্রণাদায়ক দ্বন্দ্বরাজি সফলতা ও বিফলতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখের মধ্যে অবিরাম আবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জন হইতে যখন সে জাগিয়া উঠে এই আত্মা কেবল

তখনই একদিকে পরম একের অন্যদিকে সর্ব্বভূতের সহিত তাহার একত্ব অনুভব করে যাহার ফলে সে এই সমস্ত দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয় এবং এই সক্রিয় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধ দেখিতে পায়। সে তখন প্রকৃতির ত্রিগুণে নির্ব্বিকার ও তাহার দ্বন্দ্বের প্রতি সমদর্শী হইয়া উঠে, স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব লাভে সমর্থ হয় ; নিজের শাশ্বত সত্তায় শান্ত প্রগাঢ় অবিমিশ্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া জ্ঞাতা ও সাক্ষীরূপে প্রকৃতির উর্দ্ধে রাজসিংহাসনে সমাসীন হয়। দেহগত আত্মা কর্ম্মের মধ্যে তাহার শক্তিকে প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সে তখন অজ্ঞানে বা কর্ম্মবন্ধনে আর বদ্ধ নয়, তখন কর্ম্মের কোন পরিণাম থাকে না তাহার নিজের মধ্যে, থাকে শুধু বাহিরের প্রকৃতিতে। তখন তাহার অনুভূতিতে প্রকৃতির সমগ্রগতি সমুদ্রের বুকে তরঙ্গমালার উত্থান ও পতনের মত হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু তাহা তাহার অতল গভীর প্রশান্তি, বিপুল আনন্দ, বিরাট বিশ্বব্যাপী সমতা অথবা তাহার অসীম ভাগবত সত্তাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। *

এই সমস্তই আমাদের সাধনার বিধান, ইহারা এমন এক আদর্শের নির্দ্দেশ দেয় যাহা এই সমস্ত অথবা ইহাদেব অনুরূপ নিম্নলিখিত সূত্রাবলী দ্বারা প্রকাশ করা যায় :—

ঈশ্বরের মধ্যে বাস, অহমিকাতে নহে ; এক বিশাল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বভূতাত্মা ও সর্ব্বাতীত পরম ব্রহ্মের চেতনাতে বিচরণ করা, ক্ষুদ্র অহংগত চেতনাতে নয়।

সকল ঘটনা ও সকল জীবে পূর্ণরূপে সমভাবাপন্ন হওয়া এবং তাহাদের সকলকেই নিজের সহিত ও ভগবানের সহিত এক ও অভিন্ন দেখা ও বোধ করা ; সর্ব্বভূতকে নিজের মধ্যে তথা ভগবানের মধ্যে আবার ভগবানকে তথা নিজেকে সর্ব্বভূতের মধ্যে অনুভব করা।

ঈশ্বরের মধ্যে থাকিয়া কর্ম্ম করা, নিজের অহমিকার মধ্য হইতে নয়।

* কর্ম্মযোগের জন্য গীতোক্ত দর্শনের সকল কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে মানিয়া লওয়া অপরিহার্য্য নহে। ইচ্ছা করিলে তাহাকে আমরা দেখিতে পারি মানস অনুভূতির এক বর্ণনা বলিয়া, যাহা যোগের একটা কার্য্যকরী ভিত্তিরূপে প্রয়োজনীয় বটে ; আমাদের যোগে ইহা পূর্ণরূপে প্রামাণিক, ইহার সহিত অতি উচ্চ ও উদার অনুভূতির পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এই কারণে এখানে আমি গীতার দর্শন যথাসম্ভব আধুনিক ভাষায় আলোচনা করিয়াছি কিন্তু যাহা কিছু মনোবিজ্ঞান হইতে অধিকতরভাবে তত্ত্ববিস্তার মধ্যে পড়ে তাহা বাদ দিয়াছি।

এখানে প্রথমতঃ কর্ম্ম নির্ব্বাচন করা আমাদের উপরিস্থিত জীবন্ত সর্ব্বোচচ সত্যের আদেশ অনুসারে আপন ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও মান অনুসারে নয়। তাহার পর আধ্যাত্মিক চেতনাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র আমাদের নিজের পৃথক সংকল্প ও গতিবৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম আর না করা, কিন্তু যাহা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে সেই দিব্যসংকল্পের প্রেরণা ও পরিচালনার অধীনে কর্ম্মকে ক্রমশ অধিক পরিমাণে ঘটিতে ও উপচিত হইতে দেওয়া। অবশেষে চূড়ান্ত পরিণতিতে, দিব্য শক্তির সহিত অভিন্ন একত্বে বা তাদাত্ম্যে উন্নীত হওয়া—জ্ঞানে, কর্ম্মে, শক্তিতে, চেতনাতে ও জীবনের আনন্দে; এমন এক বীর্য্যবান গতিধারা অনুভব করা যাহা মর্ত্ত্য কামনা-বাসনা, প্রাণশক্তির সহজ প্রবৃত্তি ও প্রবেগ এবং অলীক মনোময় স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত নয় কিন্তু যাহার জ্যোতির্ম্ময় উৎপত্তি ও পরিণতি অমর এক আত্মানন্দ এবং অনন্ত এক আত্মজ্ঞানের মধ্য হইতে। কেননা প্রাকৃত মানুষ যখন দিব্য আত্মা ও শাশ্বত চিৎপুরুষের অধীনতা সচেতনভাবে স্বীকার করে এবং নিজেকে তাহার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেয় তখনই এই কর্ম্ম আসে; চিদাত্মা চিরদিন এই বিশ্বপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আছেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন।

কিন্তু কার্য্যতঃ সাধনার কোন্ কোন্ ধাপ অবলম্বন করিয়া আমরা এই চরমোৎকর্ষে পৌঁছিতে পারি?

স্পষ্টতঃ সকল অহংগত কর্ম্ম ও তাহার ভিত্তিস্বরূপ অহংগত চেতনার বিলোপসাধন করাই আমাদের বাঞ্ছিত এই চরমোৎকর্ষে পৌঁছিবার চাবিকাঠি। কর্ম্মযোগের পন্থায় কর্ম্মের গ্রন্থিমোচনই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া যেখানে তাহার প্রধান বাঁধন রহিয়াছে সেইখানেই অর্থাৎ কামনা ও অহমিকার মধ্যে আমাদিগকে তাহা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; কেননা তাহা না করিলে আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চারিটি সূত্রকে শুধু কাটিয়া দিতে থাকিব কিন্তু গ্রন্থির হৃদয় বা কেন্দ্র যেমন ছিল তেমনই রহিয়া যাইবে। আমরা যে এই অবিদ্যাচ্ছন্ন ও ভেদগত প্রকৃতির অধীনতাপাশে আবদ্ধ আছি তাহার গ্রন্থি দুইটি—কামনা ও অহংবোধ। আর এই দুইটির মধ্যে কামনার স্বাভাবিক বাসস্থান রহিয়াছে ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে এবং তথা হইতে তাহা আমাদের ভাবনা ও সংকল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে; অহমিকাও প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত গতিবৃত্তির মধ্যে থাকে, কিন্তু সে তাহার শিকড়

গভীরে ভাবনাময় মন ও সংকল্পের মধ্যেও বিস্তার করে আর সেইখানেই সে পূর্ণরূপে আত্মসচেতন হয়। বিশ্বব্যাপী সর্ব্বগ্রাসী অজ্ঞানের এই যুগ্ম অন্ধকারময় শক্তিকে আলোকিত ও বিদূরিত করিতে হইবে।

কর্ম্মের ক্ষেত্রে বাসনা নানা রূপ গ্রহণ করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান হইল প্রাণময় সত্তায় কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা বা আকূতি। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল একটা অন্তরের সুখ লাভরূপ পুরস্কার হইতে পারে, হইতে পারে কোন ইঙ্গিত ভাবনা বা কোন পোষিত সংকল্পের সিদ্ধি, অহংগত কোন ভাবাবেগের পরিতৃপ্তি অথবা আমাদের উচচতম আশা এবং উচচাভিলাষের সার্থকতা জনিত গর্ব্ব। অথবা এই ফল হইতে পারে কোন বাহ্য পুরস্কার, কোন সম্পূর্ণ বাহ্যবস্তু—যথা ধন পদ সম্মান বিজয় সৌভাগ্য অথবা প্রাণগত বা দেহগত অন্য কোন কামনার তৃপ্তি। কিন্তু ইহারা সকলেই সমানভাবে প্রলোভন যাহা দ্বারা অহমিকা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে। এই সমস্ত পরিতুষ্টি সর্ব্বদাই আমাদিগকে অলীক এক স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের বোধ দিয়া ভুলাইয়া রাখে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে অন্ধ বাসনা জগৎকে চালাইতেছে তাহার কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম, কোন মহান বা নিকৃষ্ট রূপই আমাদিগকে সংবদ্ধ সঞ্চালিত সমাচ্ছন্ন ও তাড়িত করিতেছে। তাই কর্ম্মসম্বন্ধে গীতার প্রথম অনুশাসন এই যে নিষ্কামভাবে বা কোন ফলকামনা না করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

আপাত দৃষ্টিতে এ-বিধানটি কত সহজ, কিন্তু একান্ত সরলভাবে এবং মুক্তি-জনক সমগ্রতার সহিত ইহা পালন করা কত কঠিন! আমাদের অধিকাংশ কর্ম্মে এ তত্ত্বের অনুসরণ আমরা বড় একটা করি না; যেটুকু করি তাহাও প্রায়ই আমাদের স্বাভাবিক কামনা বাসনার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করিবার এবং অত্যাচারী সেই আবেগের কর্ম্মের চরমমাত্রা কিছু পরিমাণে উপশমিত করিবার জন্যই করি। যতদূর সম্ভব ভালভাবে দেখিলেও, যদি আমরা আমাদের অহমিকাকে কথঞ্চিৎ সংযত বা সংশোধিত করিতে পারি যাহাতে তাহা আমাদের নীতিবোধকে খুব বেশী আঘাত না করে এবং অপরের পক্ষে অত্যধিক পীড়াদায়ক না হয় তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। আমাদের এই আংশিক আত্মসংযমকে আমরা নানা নাম ও নানা রূপ দিয়া থাকি; পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতে, কোন নৈতিক তত্ত্ব দৃঢ়ভাব অনুসরণ করিতে, তিতিক্ষু দার্শনিকের মত সহনশীল হইতে, ধর্ম্মের প্রেরণাতে সব কিছু নত মস্তকে গ্রহণ করিতে অথবা ধীরভাবে বা আনন্দ সহকারে ভগবদিচ্ছার বশ্যতা স্বীকার করিতে আমরা নিজদিগকে অভ্যস্ত করি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় গীতার অভিপ্রেত নহে, যদিও স্বস্থানে তাহাদের প্রত্যেকের উপযোগিতা

আছে ; গীতার লক্ষ্য এমন একটা কিছু যাহা চরম ও পরম, যাহার মধ্যে কোন আপস রফা নাই, যাহাকে লাঘব করিবার কোন চেষ্টা নাই, তাহার লক্ষ্য এমন এক নূতন পথে যাত্রা, চেতনার এমন এক বিভঙ্গ গ্রহণ যাহা অন্তরাত্মার সমগ্র সংস্থিতি (poise) পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। মন দ্বারা প্রাণাবেগের সংযম তাহার বিধান নহে, মৃত্যুহীন চিৎপুরুষের অচলপ্রতিষ্ঠ স্থাণুত্বই তাহার বিধান।

গীতা বলিয়াছে সকল পরিণাম, সকল প্রতিক্রিয়া ও সকল ঘটনায় মন ও হৃদয়ের পরিপূর্ণ সমতাই এই ব্রাহ্মিস্থিতির নিদর্শন। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, মান ও অপমান, খ্যাতি ও অপবাদ, জয় ও পরাজয়, সুখকর ঘটনা ও দুঃখময় ঘটনা—এ সকলে যদি আমরা বিচলিত হওয়া দূরের কথা তাহাদের দ্বারা একটুও স্পৃষ্ট না হই, যদি আমরা হৃদয়ের আবেগ, স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া এবং মনের দৃষ্টিতে মুক্ত ও স্বতন্ত্র থাকিতে পারি, আমাদের প্রকৃতির কোন অংশের কোন সাড়ায় যদি বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ বা বিকম্পন দেখা না দেয়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে আমরা গীতার নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরম মুক্তিলাভ করিয়াছি, নতুবা নহে। কোন ক্ষুদ্রতম প্রতিক্রিয়াও যদি দেখা দেয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহাই প্রমাণিত হইল যে আমাদের শিক্ষা ও সাধনা আজিও অপূর্ণ রহিয়াছে, আমাদের সত্তায় কোন না কোন অংশ অজ্ঞান ও বন্ধনকে নিজের বিধান বলিয়া মানিয়া লইতেছে এবং পুরাতন প্রকৃতিতে এখনও সংসক্ত আছে। আমাদের আত্মবিজয় অংশতঃ শুধু সাধিত হইয়াছে ; আমাদের প্রকৃতির ক্ষেত্রে কোন এক ভাগে কোন অংশে অথবা সামান্যতম কোন ভূমিতে বিজয় এখনও অপূর্ণ ও অবাস্তব রহিয়াছে। অপূর্ণতার সেই ক্ষুদ্র উপলখণ্ডটিই যোগের সমগ্র সিদ্ধি-সৌধকে ধূলিসাৎ করিতে পারে।

গীতা যে গভীর ও বিরাট আধ্যাত্মিক সমতা শিক্ষা দিয়াছে তাহার অনুরূপ কয়েক প্রকার সমতা দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগেক গীতার সমতা বলিয়া যেন ভুল না করি। নিরাশ হতোদ্যম আত্ম-নতির সমতা, আত্মগর্ব্বের সমতা, নির্ম্মম উদাসীনতার সমতা—এ সব সমতাই তাহাদের প্রকৃতিতে অহংভাবাপন্ন। সাধনার পথে এ সমস্ত অপরিহার্য্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাদিগকে হয় বর্জন করিতে নতুবা যথার্থ প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। তাহার পর, আরও উপরের স্তরে ষ্টৌয়িক দার্শনিকের এক সহিষ্ণু সমতা, ভক্তের আত্ম-সমর্পণ বা জ্ঞানীর অনাসক্তিজাত সমতা, সংসারবিমুখ কর্ম্মে উদাসীন অন্তর-পুরুষের এক সমতা আছে। কিন্তু সাধনপথে তাহারাও পর্য্যাপ্ত নহে, তাহারা সাধনার প্রথম সোপান শুধ হইতে পারে, বড় জোর তাহারা আমাদের

আত্ম-বিকাশের শুধু প্রারম্ভিক অবস্থা অথবা আত্মার যথার্থ স্বয়ম্ভূ বিরাট সমতাযুক্ত পরম একত্বের মধ্যে প্রবেশের পথে প্রস্তুতি মাত্র হইতে পারে।

কারণ ইহা নিশ্চিত যে পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরগুলিকে বাদ দিয়া এত বৃহৎ একটা পরিণতি অবিলম্বে আসিয়া পড়িতে পারে না। প্রথমে আমাদের সত্তার কেন্দ্রীয় অংশকে অস্পৃষ্ট ও নির্ব্বাক রাখিয়া জগতের আঘাত সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, যদিও তখন আমাদের বহিশ্চর মন প্রাণ ও হৃদয় প্রবলভাবে বিচলিত হইয়া পড়িতে পারে; তথায় জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবিকম্পিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের যে অন্তরপুরুষ সাক্ষীরূপে পশ্চাতে বা অন্তরের গভীরে অপরামৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির বাহ্য-ক্রিয়াধারা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। তাহার পরে, নিরাসক্ত অন্তরাত্মার এই শান্তি ও একনিষ্ঠতা তাহার যন্ত্র বা করণ সকলের মধ্যেও প্রসারিত করিয়া দিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় কেন্দ্র হইতে ধীরে ধীরে অন্ধকার পরিধি পর্য্যন্ত প্রশান্তি বিকিরণ সম্ভব হইবে। এই ক্রিয়াধারাতে আমরা অনেক নিম্নতর অবস্থা হইতে সাময়িক সাহায্য লইতে পারি, কতকটা ষ্টৌয়িক দার্শনিকের সহনশীলতা, কতকটা দার্শনিক পণ্ডিতের প্রশান্তি, কতকটা ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস আমাদিগকে গম্যপথে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিতে সহায়তা করিতে পারে, অথবা যাহা এতটা উন্নত বা এতটা শক্তিমান নয় অথচ যাহা উপযোগী আমাদের সেই মনোময় প্রকৃতির অনুকূল শক্তিরাজির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারি। শেষপর্য্যন্ত আমাদিগকে এই সমস্ত অবলম্বন হয় ছাড়িয়া দিতে নতুবা তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে অন্তরের এক সমগ্র সমতা, একটা পরিপূর্ণ স্বয়ম্ভূ প্রশান্তিতে পৌঁছিতে হইবে, আর যদি সম্ভব হয় তবে অপরাজেয় আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত এক পরম আনন্দ দ্বারা আমাদের সকল অঙ্গকে প্রপূরিত করিতে হইবে।

কিন্তু তাহার পর আমরা আদৌ কিরূপে কর্ম্ম করিতে থাকিব? কারণ সাধারণতঃ বাসনা আছে অথবা মন প্রাণ ও দেহের অভাব ও প্রয়োজনের বোধ রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ কর্ম্ম করে; দেহের প্রয়োজন, ঐশ্বর্য্য যশ বা মানের লোভ, ব্যক্তিগতভাবে হৃদয় বা মনের পরিতৃপ্তির প্রলোভন অথবা সুখভোগের ও তজ্জন্য শক্তিলাভের লালসা—এই সকলের দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। হয়ত বা কোন নৈতিক প্রেরণা তাহাকে ধরিয়া বসে এবং তাহাকে এদিকে বা ওদিকে ঠেলিয়া দিতে থাকে, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে তাহার ভাবনা বা আদর্শ, তাহার সংকল্প, তাহার দল, তাহার দেশ তাহার দেবতা—এই সমস্তকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা কিম্বা প্রয়োজন তাহাকে

নানা দিকে চালাইয়া লইয়া যায়। এই সমস্ত বাসনা কিম্বা অন্য কিছু আমাদের কর্ম্মের হেতু বা প্রবর্ত্তকরূপে বর্ত্তমান যদি না থাকে তবে মনে হইতে পারে যে কর্ম্মের সকল প্ররোচনা বা প্রযোজকশক্তি যেন অপসারিত হইয়াছে এবং কর্ম্ম অবশ্যই বন্ধ হইয়া যাইবে। গীতা এ সমস্যার উত্তররূপে দিব্যজীবনের তৃতীয় মহান রহস্য উপস্থিত করিয়াছে, বলিয়াছে যে সকল কর্ম্ম ক্রমবর্দ্ধমান-ভাবে ভগবদভিমুখী এবং পরিশেষে ভগবদধিকৃত চেতনা দিয়াই করিতে হইবে ; আমাদের সকল কর্ম্মকেই করিতে হইবে ভগবানে উৎসৃষ্ট যজ্ঞ, অবশেষে আমাদের সকল সত্তা, মন সংকল্প হৃদয় ইন্দ্রিয় প্রাণ ও দেহ সেই পরম একের চরণে সমর্পণ করিতে হইবে, আমাদের কর্ম্মের সমগ্র প্রেরণা আসিবে ভগবৎ-প্রেম ও ভগবৎ-সেবা হইতে। কর্ম্মের প্রযোজকশক্তি ও মূল প্রকৃতির এই রূপান্তর সাধনই গীতার মুখ্য তত্ত্ব ; ইহাই গীতার কর্ম্ম প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ভিত্তি। সর্ব্বশেষে কামনা নয় চেতনাতে অনুভূত শাশ্বতের দিব্য-সংকল্পই থাকিবে আমাদের সকল কর্ম্মের একমাত্র চালকশক্তি ও সকল প্রারম্ভের একমাত্র উৎসরূপে।

সমত্ব, আমাদের কর্ম্মফলের সকল বাসনা ত্যাগ, আমাদের প্রকৃতির তথা সকল প্রকৃতির পরম প্রভুর নিকট উৎসৃষ্ট যজ্ঞস্বরূপে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান— গীতার কর্ম্মযোগপন্থার এই তিনের যুগপৎ আচরণ হইল ঈশ্বরাভিমুখে চলিবার প্রথম পদক্ষেপ।

চতুর্থ অধ্যায়

যজ্ঞ, ত্রিমার্গ ও যজ্ঞেশ্বর

সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বের অখণ্ড একত্বের প্রতীকস্বরূপ যে সাধারণ দিব্যকর্ম্ম জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাই যজ্ঞের বিধান। এই বিধানের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অহংগত ও আত্মবিভক্ত বিসৃষ্টির ভ্রান্তিরাজিকে সীমিত, সংশোধিত ও ক্রমশঃ বিদূরিত করিবার জন্য এক দিব্যভাব ও মুক্তি প্রদায়িনী শক্তি জগতে নামিয়া আসে। এই অবতরণ, পুরুষের এই যজ্ঞ, শক্তি ও জড়কে অনুপ্রাণিত ও আলোকিত করিবার জন্য দিব্য জীবাত্মার তাহাদিগের নিকট এই বশ্যতা স্বীকার, ইহাই হইল নিশ্চেতনা ও অবিদ্যার এই জগৎকে উদ্ধার করিবার বীজস্বরূপ। গীতা বলে "প্রজাপতি যজ্ঞকে তাহাদের সহচররূপে দিয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে (জীবরাজিকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" মানুষের অহমিকার পক্ষে এই যজ্ঞবিধিকে গ্রহণ করার অর্থই কার্য্যতঃ ইহা স্বীকার করা যে, এই বিশ্বে সে একক নয় অথবা প্রধানও নয়। ইহা তাহার স্বীকার করিয়া নেওয়া যে তাহার এই অতিখণ্ডিত জীবনেও তাহার সত্তার পশ্চাতে এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া সেই একটা কিছু আছে যাহা তাহার অহংগত ব্যক্তিসত্তা নহে, যাহা তাহার অপেক্ষা মহত্তর ও পূর্ণতর, দিব্যতর এক সর্ব্ব যাহা তাহার নিকট হইতে আনুগত্য ও সেবা দাবি করে। বস্তুতঃ সার্ব্বভৌম বিশ্বশক্তি এই যজ্ঞভার চাপাইয়া দিয়াছে ; এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাধ্য করিয়া তাহা সম্পন্ন করাইতেছে। যাহারা সজ্ঞানে এ বিধান স্বীকার করে না তাহাদের নিকট হইতেও যজ্ঞ, (বা উৎসর্গ) তিনি গ্রহণ করেন—গ্রহণ করেন অপরিহার্য্যরূপে, কেননা ইহাই বস্তুর সহজাত প্রকৃতি। আমাদের অজ্ঞান আমাদের জীবনের অহংগত মিথ্যাধারণা প্রকৃতির দৃঢ়ভিত্তিগত এই শাশ্বত সত্যের কোন ব্যতিক্রম করিতে পারে না। কেননা ইহাই প্রকৃতির সত্য যে, এই যে অহং নিজেকে বিবিক্ত স্বাধীন সত্তা মনে করে এবং শুধু নিজের জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া দাবি করে তাহা স্বাধীনও নয় বিবিক্তও নয়, ইচ্ছা হইলেও সে শুধু নিজের জন্য বাঁচিতে পারে না, সকলেই এক নিগূঢ় অবিচ্ছিন্ন একত্বের সূত্রে

বাঁধা আছে। প্রত্যেক সত্তা বাধ্য হইয়া নিজের ভাণ্ডার হইতে অবিরত চারিদিকে দিয়া যাইতেছে ; প্রকৃতির নিকট হইতে মন যাহা পাইতেছে অথবা দেহ ও প্রাণের যে সম্পদ তাহার নিজস্ব আছে বা যাহা সে অর্জন করিতেছে সে-সমস্ত হইতে এক অবিরাম স্রোত তাহার পরিবেষ্টনের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। আর স্বেচ্ছাকৃত বা ইচ্ছানিরপেক্ষ এই দানের বিনিময়ে সেও সর্ব্বদা পরিবেশের নিকট হইতে কিছু পাইতেছে। কেননা কেবলমাত্র এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়া সে যেমন নিজের পরিপুষ্টি সাধন করে তেমনিই তৎসঙ্গে সমষ্টিকে সহায়তা করে। অবশেষে প্রথমতঃ শুধু ধীরে ধীরে ও আংশিক হইলেও, আমরা সচেতনভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখি ; এমন কি অবশেষে আমরা আনন্দ সহকারে নিজেকে এবং নিজের যাহা কিছু আছে বলিয়া দেখিতে পাই তাহার সব কিছুকে প্রেম ও ভক্তিভরে তাঁহার কাছে সমর্পণ করি, যাঁহার সম্বন্ধে সেই মুহূর্ত্তে মনে হয় যে তিনি আমাদের নিকট হইতে এবং নিশ্চয়ই আমাদের সীমিত ব্যক্তিসত্তা হইতে পৃথক কিছু। তখন আমাদের আত্মযজ্ঞকে এবং সেই যজ্ঞের দিব্য প্রতিদানকে আমাদের পূর্ণ পরিণতির উপায় বলিয়া আনন্দের সহিত গ্রহণ করি ; কেননা ইহাকে আমাদের মধ্যে শাশ্বত দিব্য সংকল্পকে সার্থক করিবার পথ বলিয়া তখন স্বীকার করি।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গ হয় অজ্ঞান ও অহংগতভাবে, তাহার মধ্যে জ্ঞান অথবা বৃহৎ বিশ্বযজ্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত মর্ম্মবোধ অথবা স্বীকৃতি থাকে না। পার্থিব জীবের অধিকাংশের মধ্যে কর্ম্মের এই ধারাই দেখা যায়, আর যখন এইভাবে কৃত হয় তখন ব্যষ্টিব্যক্তি তাহা হইতে স্বাভাবিক ভাবে যাহা অবশ্যই উন্নতিবিধায়ক তেমন এক উপকার শুধু যান্ত্রিকভাবে ন্যূনতমমাত্রায় লাভ করে, আর তাহাও লাভ করে অহমিকার ক্ষুদ্রতা ও দুঃখতাপ দ্বারা প্রপীড়িত ও সীমিত অতি মন্থর ও কষ্টকর এক প্রগতির মধ্য দিয়া। যখন মানুষের হৃদয়, সংকল্প ও জ্ঞানময় মন ইহার বিধানের সহিত সংযুক্ত হয় এবং হৃষ্টচিত্তে সে-বিধান অনুসরণ করে কেবল তখনই দিব্য যজ্ঞের গভীর আনন্দ ও সুখকর সার্থকতা আসিতে পারে। মন যখন এ বিধানকে জানে ও বোঝে, হৃদয় যখন আনন্দে তাহা গ্রহণ করে তখন তাহার পরিণতিতে আসে এই শ্রেষ্ঠ অনুভূতি যে, আমরা উৎসর্গ করিতেছি আমার আত্মার ও সকলের আত্মার কাছে, আমার নিজের অন্তর পুরুষ ও সকলের অন্তঃপুরুষের নিকটে। এমন কি যখন আমরা অপর মানুষের অথবা নিম্নতর শক্তি ও তত্ত্বের কাছে আত্মোৎসর্গ করি, পরম পুরুষের কাছে করি না, তখনও আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজের আত্মার কাছেই উৎসর্গ করি। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "ন বা অরে ভার্য্যায়ৈ কাময়া

ভার্য্যা প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় ভার্য্যা প্রিয়া ভবতি"—'পত্নীর জন্য আমাদের নিকট পত্নী প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয় হয়।' নিম্নতর অর্থে প্রাকৃত ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধে ইহাই অহংগত রঙীন ও আবেগময় প্রেমের উচ্ছ্বাসোক্তির পশ্চাতে স্থিত কঠোর তথ্য, কিন্তু উচ্চতর অর্থে যাহা অহমিকা পরিশূন্য যাহা দিব্য সেই প্রেমেরও ইহাই গূঢ় মর্ম্ম। সকল প্রকৃত প্রেম সকল আত্মোৎসর্গ মূলতঃ মানুষের আদিম অহমিকা ও তাহাব ভেদগত ভ্রান্তিব বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিবাদ; অপরিহার্য্য প্রাথমিক খণ্ডজ্ঞান হইতে পুনরায় একত্বের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য ইহা তাহার এক প্রচেষ্টা। জীবে জীবে মিলন বা ঐক্যবোধ মূলতঃ আত্মাকে আবিষ্কার করা, যাহা হইতে আমরা বিবিক্ত ও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছি তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া এবং অপরের মধ্যে নিজের আত্মাকে খুঁজিয়া পাওয়া।

কিন্তু প্রেম ও একত্বের মানুষী রূপ যাহা অন্ধকারের মধ্যে সন্ধান করে একমাত্র দিব্য প্রেম ও দিব্য একত্ব তাহা আলোকের মধ্য দিয়াই লাভ করে। কেননা জীবনের সাধারণ প্রয়োজনে মিলিত আমাদের দেহস্থ কোষাণুগুলির (cells) মধ্যে যেরূপ এক সমবায় ও সাহচর্য্য দেখা যায়, প্রকৃত মিলন বা একত্ব সেরূপ এক সাহচর্য্য ও সমবায় শুধু নয়; এমন কি তাহা হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়া একটা জানা, একটা সহানুভূতি এক সংহতি বা পরস্পরের এক সান্নিধ্যও নহে। প্রকৃতির বিভাগের দ্বারা যাহাদের নিকট হইতে আমরা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি তাহাদের সহিত কেবল তখনই আমাদের প্রকৃত মিলন ও ঐক্য সাধিত হইবে, যখন আমরা বিভাগকে লোপ করিয়া দিতে পারিব এবং যাহাকে এখন অপর বোধ হইতেছে তাহার মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাইব। সাহচর্য্যের অর্থ দেহগত ও প্রাণগত ঐক্য; পরস্পরকে সাহায্য করা, পরস্পরে দাবিদাওয়া মানিয়া লওয়াই এখানে আত্মোৎসর্গের অর্থ। সামীপ্য সমবেদনা ও সংহতি এক মনোময় নৈতিক ও আবেগময় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে, এখানে আত্মোৎসর্গের অর্থ পরস্পরের সহযোগিতা ও তুষ্টিসাধন। কিন্তু যথার্থ ঐক্য ও মিলন এক আধ্যাত্মিক বস্তু; যেখানে আত্মোৎসর্গ হইবে পরস্পরে পূর্ণ আত্মদান, আমাদের চিন্ময় ধাতুর পারস্পরিক সংযোগ। যজ্ঞবিধান এইভাবে প্রকৃতির মধ্যে অগ্রসর হইয়া এই পরিপূর্ণ ও নিঃশেষ আত্মদানে পর্য্যবসিত হয়; ইহা উৎসর্গকারী বা যজ্ঞের হোতা ও যাহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বা যজ্ঞ করা হয় সেই যজ্ঞেশ্বর এই উভয়ের মধ্যে যে একই আত্মা আছে সেই চেতনা জাগাইয়া তোলে। মানুষের প্রেম ও ভক্তি যখন দিব্য হইয়া উঠিবার জন্য সাধনা করে, তখন যজ্ঞের এই চরম পরিণতিতেই তাহার পরাকাষ্ঠা লাভ

হয়, কেননা এখানে প্রেমের উত্তুঙ্গ শিখর পূর্ণরূপে পারস্পরিক আত্মদানের এক পরম স্বর্গে প্রবেশ করে ; দুইটি আত্মার মিলনানন্দেই ইহার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।

বিশ্বব্যাপী বিধানের এই গভীরতর ভাবনাই কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার শিক্ষার মূলে রহিয়াছে ; যজ্ঞের দ্বারা পরাৎপরের সহিত আধ্যাত্মিক মিলন, শাশ্বতের চরণে নিঃশেষে আত্মদান—গীতার শিক্ষার ইহাই সার কথা। যজ্ঞের সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, ইহা কষ্টকর আত্মবলিদান, কঠোর আত্মনিগ্রহ, দুরূহ আত্মবিলোপের এক ক্রিয়া ; এই ভাবের যজ্ঞ শেষ পর্য্যন্ত নিদারুণ আত্মনিপীড়ন এবং নিজেকে বিকলাঙ্গ করা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। মানুষের প্রকৃত সত্তাকে অতিক্রম করিবার কঠোর সাধনায় এ সমস্ত সাময়িকভাবে প্রয়োজন হইতে পারে ; যদি তাহার প্রকৃতিতে অহমিকা অতি উগ্র ও দুর্দ্দমনীয় হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে কখনও কখনও প্রবল অন্তর্নিগ্রহ বা প্রচণ্ড উগ্রতার প্রত্যাঘাত করা আবশ্যক হয়। কিন্তু গীতা অতিরিক্ত আত্মনিগ্রহ অনুমোদন করে না ; কেননা মানুষের অন্তরাত্মা প্রকৃতপক্ষে পরিণতিশীল পরম দেবতা, স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, অসুরের মত তাহাকে কষ্ট দেওয়া ও নিপীড়ন করা মানবোচিত কর্ম্ম নয়, মানুষকে বর্দ্ধমানভাবে তাহার পোষণ ও পরিপুষ্টি করিতে, এক দিব্য আলোক, শক্তি আনন্দ ও উদারতার দিকে জ্যোতির্ম্ময় ভাবে তাহাকে খুলিয়া ধরিতে হইবে। আত্মোৎকর্ষের বেদীমূলে আত্মার আন্তর শত্রুবর্গকে নিস্তেজ, নির্ব্বাসন করিতে অথবা বলি দিতে হইবে, আত্মাকে নহে ; নির্ম্মমভাবে উচ্ছেদ করিতে হইবে তাহাদিগকে যাহাদের নাম বাসনা, ক্রোধ, অসমতা, লোভ, বাহ্য সুখ ও দুঃখের প্রতি আসক্তি, হনন করিতে হইবে সেই সমস্ত দস্যু দানবকে, যাহারা মানবাত্মাকে বলপূর্ব্বক অধিকার করে, যাহারা তাহার সকল জ্বালাযন্ত্রণা ও ভ্রান্তির একমাত্র কারণ। দেখিতে ও বুঝিতে হইবে যে ইহারা আমাদের সত্তার কোনও অংশ নহে, পরন্তু অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে—আমাদের আত্মার প্রকৃত ও দিব্য প্রকৃতিকে বিকৃত ও বিপথগামী করিয়া দেওয়ার জন্য ; ইহাদিগকে নির্ম্মমভাবে বলি দিতেই হইবে,—যাইবার সময় ইহারা সাধকের চেতনায় প্রতিফলনের দ্বারা যতই যন্ত্রণা প্রক্ষিপ্ত করিয়া যাউক না কেন।

কিন্তু যজ্ঞ বা উৎসর্গের প্রকৃত সার বস্তু আত্মবলি নহে আত্মদান, তাহার লক্ষ্য আত্মবিলোপ নয় আত্মার পূর্ণ সার্থকতাসাধন, তাহার প্রণালী আত্মনিগ্রহ নহে, এক বৃহত্তর জীবন ; নিজের অঙ্গহানি নয় আমাদের প্রাকৃত মানবীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিব্য রূপান্তর-সাধন ; আত্মনিপীড়ন নহে, ক্ষুদ্র পরিতৃপ্তি হইতে

বৃহত্তর আনন্দের মধ্যে উত্থান। প্রারম্ভে আমাদের বাহ্যপ্রকৃতির অসংস্কৃত ও মলিন অংশের নিকট একটি মাত্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার আছে; যে যন্ত্রণা অপরিহার্য্য আত্মসংযমের দাবি হইতে যে অস্বীকৃতি বা প্রত্যাখ্যান অপূর্ণ অহংএর বিলোপসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় তাহা হইতে জাত হয়; কিন্তু তাহার জন্য শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমরা অপরের মধ্যে, সর্ব্বভূতে সমগ্র বিশ্বের একত্বের মধ্যে বিশ্বাতীত আত্মা ও চিৎপুরুষের পরম স্বাতন্ত্র্যের ও ভাগবত সংস্পর্শের পরম আনন্দের মধ্যে এক যথার্থ মহত্তর বা চরম পূর্ণতার সন্ধান পাই। আমাদের উৎসর্গ এমন কাহারও নিকট দান নহে যাহার নিকট প্রতিদান ও ফলপ্রদ স্বীকৃতির কোন আশা নাই; ইহা একদিকে আমাদের মধ্যস্থিত দেহগত আত্মা ও সচেতন প্রকৃতি অন্যদিকে শাশ্বত পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এক আদানপ্রদান। কেননা, কোন প্রতিদান আমরা না চাহিলেও, আমাদের হৃদয়ের গভীরে এক জ্ঞান থাকে যে অপরূপ এক প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অন্তরাত্মা জানে যে সে ভগবানের চরণে বৃথাই আত্মোৎসর্গ করিতেছে না; কোনরূপ দাবি না কবিয়াও দিব্যশক্তির ও দিব্য সান্নিধ্যের অসীম সম্পদ সে লাভ করে।

পরিশেষে আমাদিগকে যজ্ঞের (বা উৎসর্গের) পাত্র (বা গ্রহীতা) ও উৎসর্গের প্রণালীর কথা বিবেচনা করিতে হইবে। উৎসর্গ অপরের কাছে বা দিব্য শক্তিরাজির নিকট করা যাইতে পারে—আবার বিশ্বগত সর্ব্বস্বরূপের অথবা সর্ব্বাতীত পরাৎপরের কাছে, করা যাইতে পারে। পূজাও নানা রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা একটি পত্র বা পুষ্প, এক ঘটি জল, এক মুঠি অন্ন, একখানি রুটি নিবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের যাহা কিছু আছে অথবা আমরা যাহা কিছু আছি তাহার সব কিছু সমর্পণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। যিনিই যজ্ঞের দেবতা হউন না কেন, যাহা কিছুই নিবেদিত হউক না কেন, যিনি পরাৎপর সব কিছুর মধ্যস্থিত শাশ্বত বস্তু তিনিই সকল অর্ঘ্য গ্রহণ করেন—এমন কি সে ক্ষেত্রেও গ্রহণ করেন, যেখানে যাহাকে সাক্ষাৎভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছিল তিনি তাহা উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছেন। কেননা বিশ্বের অতীত সেই পরমপুরুষ এখানেও রহিয়াছেন, যতই প্রচছন্নভাব হউক না কেন তিনিই রহিয়াছেন আমাদের অন্তরে, বিশ্ব ও তাহার সকল ঘটনার মধ্যে, রহিয়াছেন আমাদের সকল কর্ম্মের সর্ব্বজ্ঞ দ্রষ্টা ও গ্রহীতা হইয়া তাহাদের নিগূঢ় প্রভুরূপে। আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল প্রচেষ্টা, এমন কি আমাদের পাপ, পদস্খলন, দুঃখকষ্ট ও সংগ্রাম, অস্পষ্ট বা স্পষ্ট ও সচেতনভাবে দৃষ্ট ও জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে ও ছদ্মবেশে—যে রূপে তাহারা আসুক না কেন তাহাদের শেষ

পরিণতিতে তাহারা সকলেই সেই পরম একের দ্বারাই শাসিত হয়। সব কিছুই তাঁহার অগণিতরূপের নিকট উৎসর্গ করা হইতেছে এবং সকল অর্ঘ্যই সেই রূপরাজির মধ্য দিয়া একই অখণ্ড সর্ব্বব্যাপীর চরণে পৌঁছিতেছে। যে কোন রূপে ও যে ভাব লইয়া আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই সেই রূপে ও সেই ভাবে তিনি আমাদের উৎসর্গ গ্রহণ করেন।

কর্ম্মযজ্ঞের ফল ও কর্ম্মের স্বরূপ তাহার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের পশ্চাতে স্থিত ভাব অনুসারে নানারূপে দেখা দেয়। কিন্তু অপর সকল যজ্ঞই আংশিক, অহংগত, বিমিশ্র, ক্ষণিক, অপূর্ণ—এমনকি উচচতম শক্তি ও তত্ত্বরাজির নিকট যে উৎসর্গ তাহাদের প্রকৃতিও এইরূপ ; আবার তাহাদের ফলও তেমনি আংশিক, সীমিত ও পার্থিব ; প্রতিক্রিয়ায় বিমিশ্র, অপ্রধান ও গৌণ বা সাধনপথের মধ্যবর্ত্তী উদ্দেশ্যসাধনে শুধু সক্ষম। যজ্ঞদেবতার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় একমাত্র উৎসর্গ হইল এক চরম পরম ও পরিপূর্ণ আত্মদান ; ইহা সামনাসামনি দাঁড়াইয়া জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে স্বাধীনভাবে এক নিঃশেষ সমর্পণ সেই এক অদ্বয় বস্তুর চরণে—যিনি যুগপৎ আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মা, পরিবেশ ও উপাদান রূপে সর্ব্বময় ব্রহ্ম, এই বা যে কোন অভিব্যক্তির অতীত পরম সত্য, আবার যিনি নিগূঢ়ভাবে যুগপৎ এই সব কিছু, সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সর্ব্বগত অথচ সর্ব্বাতীত। কারণ যে জীবাত্মা পরিপূর্ণরূপে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করে, ভগবানও তাহার কাছে পূর্ণরূপে নিজেকে দান করেন। যে তাহার সমগ্র প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে শুধু সে-ই পরমাত্মাকে পায় ; যে সব কিছু দান করে শুধু সেই সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে ভোগ করে। পরম এক আত্মসমর্পণ দ্বারাই শুধু পরাৎপরকে পাওয়া যায়। আমরা যাহা কিছু তাহার সবই উৎসর্গের ফলে যে উর্দ্ধায়ন হয় কেবল তাহারই বলে আমরা সর্ব্বোত্তমকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারি এবং এখানে এই পৃথিবীতে সর্ব্বাতীত চিদ্বস্তুর সর্ব্বানুস্যূত চেতনার মধ্যে বাস করিতে পারি।

মোট কথা, আমাদের নিকট দাবী এই যে আমাদের সমগ্র জীবনকে এক সচেতন যজ্ঞে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের সত্তার প্রতিমুহূর্ত্তকে প্রতি গতিবৃত্তিকে শাশ্বত ব্রহ্মের নিকট ভক্তিপূর্ণ আত্মদানের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের সকল কর্ম্ম, যেমন আমাদের বৃহত্তম অতি

অসামান্য ও মহৎ কর্ম্ম, ঠিক তেমনি আমাদের ক্ষুদ্রতম অতি সাধারণ ও তুচ্ছ কর্ম্ম পর্য্যন্ত সমস্তই উৎসর্গীকৃত কর্ম্মরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। ব্যষ্টি-ভাবাপন্ন আমাদের প্রকৃতিতে বাস করিতে হইবে অন্তর ও বাহিরের গতিবৃত্তির এমন একমাত্র চেতনাতে যাহা আমাদের সত্তার অতীত এবং অহমিকার অপেক্ষা বৃহত্তর কিছুর নিকট নিবেদিত হইয়াছে। কি অর্পণ করিতেছি এবং কাহাকে অর্পণ করিতেছি তাহাতে কিছু যায় আসেনা, কর্ম্মের মধ্যে এই চেতনা রাখিতে হইবে যে সর্ব্বভূতস্থিত পরম এক দিব্য পুরুষের নিকটই অর্পণ করিতেছি। আমাদের অতি সাধারণ অতি স্থূল জড় কর্ম্মকে পর্য্যন্ত এইভাবে উন্নীত ও সংস্কৃত করিয়া তুলিতে হইবে ; যখন আমরা আহার গ্রহণ করিতেছি তখন আমরা সচেতন থাকিব যে আমাদের খাদ্য উৎসর্গ করিতেছি অন্তরে অধিষ্ঠিত সেই পরমদেবতাকে ; অনুভব করিব যে দেবমন্দিরে পূত নৈবেদ্য অর্পণ করিতেছি ; কেবলমাত্র দৈহিক প্রয়োজনের কিম্বা আত্মপরিতৃপ্তির বোধ সে ক্রিয়া হইতে মুছিয়া যাইবে। আমাদের নিজেদের জন্য কি অপরের জন্য কিম্বা জাতির জন্য যখন আমরা কোন বৃহৎ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, কোন উন্নত আত্মসংযম ও শিক্ষা, কোন দুরূহ ও মহান উদ্যমে প্রবৃত্ত হই তখন কেবলমাত্র জাতির, নিজেদের বা অপরের ধারণা লইয়া বসিয়া থাকা আর সম্ভবপর হইবে না। তখন বুঝিতে হইবে যে আমরা যে কর্ম্ম করিতেছি তাহা সচেতনভাবে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে ইহাদের নিকট নয়, কিন্তু হয় ইহাদের মধ্য দিয়া অথবা সাক্ষাৎ-ভাবে একমাত্র অদ্বয় পরম দেবতার নিকট ; যে দিব্য অন্তর্য্যামী পুরুষ এই সমস্ত মূর্ত্তির পশ্চাতে লুক্কায়িত হইয়া বাস করিতেছিলেন তাঁহাকে আর লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না ; আমাদের আত্মা, মন ও বোধ বা ইন্দ্রিয়ের নিকট তাঁহাকে নিত্য প্রকট করিতে হইবে। আমাদের সকল কর্ম্মের ধারা ও ফল সেই পরম একের হাতেই তুলিয়া দিতে হইবে, এই বোধ ও অনুভূতি লইয়া যে, আমাদের মধ্যে যে অনন্ত ও সর্ব্বোচ্চ সত্তা আছেন তিনিই আমাদের সকল কর্ম্ম ও সকল অভীপ্সার উৎস ও প্রণোদক। কারণ তাঁহার সত্তার মধ্যেই সব কিছু ঘটে ; আমাদের নিকট হইতে সকল কর্ম্ম ও সকল অভীপ্সা তাঁহারই জন্য গৃহীত এবং তাঁহারই বেদীমূলে প্রকৃতি দ্বারা নিবেদিত হয়। এমন কি যে সমস্ত ব্যাপারে প্রকৃতি নিজেই স্পষ্টতঃ কর্ত্রী আর আমরা শুধু তাহার কর্ম্মের সাক্ষী এবং ধর্ত্তা বা ভর্ত্তা, সেখানেও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ও তাহার দিব্য প্রভুর সেই একই নিত্য স্মৃতি ও সনির্ব্বন্ধ চেতনা রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃদয়ের স্পন্দন পর্য্যন্ত এক বিশ্বযজ্ঞের জীবন্ত ছন্দ করিয়া তোলা যাইতে পারে এবং সচেতনভাবে তাহা করিয়া তুলিতে হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে এইভাবের ধারণা ও ব্যবহারিকভাবে তাহার প্রয়োগের তিন প্রকার ফল হইতে পারে, যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শের পক্ষে মূলতঃ প্রয়োজনীয়। স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে প্রথমে যদি ভক্তিশূন্য ভাবেও আরম্ভ হয় তথাপি এরূপ সাধনা সোজাসুজি এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে ভক্তির উচ্চতম শিখরের দিকে লইয়া যায়, কেননা স্বভাবতই ইহা পূর্ণতম অনুরাগ ও ভক্তিতে এবং ভগবৎপ্রেমে পরিণত হয়। ইহার সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান এই অনুভূতি যুক্ত থাকে যে ভগবান সর্ব্ববস্তুর মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই হয় যে আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সকল ভাবনাতে সকল সংকল্পে ও সকল ক্রিয়াতে তাঁহার সঙ্গে নিবিড় হইতে নিবিড়তর এক আন্তর মিলন ও প্রেমালাপ চলে; আর চলে ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তার উপচীয়মান ভাবোদ্বেল আত্মসমর্পণ। কর্ম্মযোগের মধ্যে অন্তর্নিহিত এই সমস্ত অর্থব্যঞ্জনা পূর্ণাঙ্গ ও চরম ভক্তিরও মূলবস্তু। যে সাধক এই সমস্ত ভাবকে জীবন্তভাবে সাধনায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে সে নিজের মধ্যে অনুরাগ ও ভক্তির সক্রিয় কার্য্যকরী ও স্বরূপগত এক প্রতিমূর্ত্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছে এবং ইহা অবশ্যম্ভাবী যে সেই ভক্তি, যাঁহার উদ্দেশ্যে এই সেবা অর্পিত হইয়াছে সেই সর্ব্বোত্তমের প্রতি অতি তন্ময় এক পূজা ও অর্চ্চনায় পরিণত হইবে। উৎসৃষ্ট কর্ম্মীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামী ভগবানের এক অন্তরঙ্গ নৈকট্য-বোধ তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ নিবিড়ঘন প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। আবার তাহার সঙ্গে জন্মিবে অথবা তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে, এই সমস্ত সত্তা জীবন্ত রূপ ও প্রাণীর প্রতি, যাহাদের মধ্যে ভগবান বাস করেন তাহাদের প্রতি এক সার্ব্বভৌম প্রেম —এ প্রেম ভেদে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ের লোলুপ বাসনার ক্ষণস্থায়ী অস্থির আবেগ নয়, ইহা অহমিকাবর্জিত এক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেম যাহা একত্বেরই এক গভীরতর স্পন্দন। তখন সাধক সকল বস্তুতে যিনি তাহার প্রেম ভক্তি ও সেবার একমাত্র বস্তু তাঁহাকেই দেখিতে আরম্ভ করিবে। আত্মনিবেদনের এই পথ দিয়া কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হয়; কর্ম্মযোগ তখন নিজেই, হৃদয় যতদূর চাহিতে বা মনের আবেগ যতটা কল্পনা করিতে পারে তেমন তন্ময় পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ এক অনুরাগ ও প্রেম হইয়া উঠে।

এই যোগের সাধনা তাহার পর দাবি করে যে অন্তরে একমাত্র মুক্তিপ্রদ কেন্দ্রগত জ্ঞানের স্মরণ নিয়ত চলিবে, এবং বাহ্য কর্ম্মে সেই জ্ঞানের নিয়ত সক্রিয় প্রয়োগের ফলে সেই স্মৃতি তীব্রতর হইয়া উঠিবে। সকলের মধ্যে আছে একই আত্মা, অদ্বয় ভগবানই সব কিছু; সব কিছুই রহিয়াছে ভগবানের

মধ্যে, সব কিছুই ভগবান, তিনি ছাড়া জগতে আর কিছু নাই—এই ভাবনা বা এই বিশ্বাসই হইবে কর্ম্মীর চেতনার সমগ্র পটভূমিকা, অবশেষে ইহাই তাহার চেতনার সমগ্র উপাদান হইয়া দাঁড়াইবে। এইভাবের এক নিত্যস্মরণ স্বয়ং সক্রিয় এক ধ্যান যাহাকে আমরা এত প্রবলভাবে স্মরণ করি অথবা যাহাকে এরূপ নিয়ত ধ্যান করি, পরিশেষে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁহারই এক গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন দর্শন হইয়া দাঁড়াইবে, তাঁহারই এক প্রত্যক্ষ ও সর্ব্বালিঙ্গনকারী চেতনায় পরিণত হইবে। কেননা ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে যিনি সর্ব্বসত্তা, সর্ব্বসংকল্প ও সর্ব্বকর্ম্মের উৎস সাধককে তাহার পরিচিন্তনে নিয়ত বাধ্য করে ফলে যিনি তাহাদের কারণ, ধর্ত্তা, ও ভর্ত্তা, তাঁহারই মধ্যে সকল বিশিষ্টরূপ সকল মূর্ত্তির সঙ্গে সাধক যুগপৎ মিলিত হইতে এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই-ভাবে অগ্রসর হইতে গিয়া পথের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সাধক সর্ব্বত্র বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের কর্ম্মাবলি জীবন্ত ও চলন্তভাবে দেখিতে পাইবে আর সে দেখা স্থূল দৃষ্টিতে দেখা অপেক্ষা কোনপ্রকার ন্যূনতরভাবে বাস্তব বলিয়া মনে হইবে না। পথের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইলে সে অতিমানসভূমিতে বিশ্বাতীত পরাৎপরের সান্নিধ্যে পৌঁছিবে এবং তথায় সর্ব্বদা বাস ভাবনা সংকল্প ও কর্ম্ম করিবে। যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি যাহা কিছু আমরা স্পর্শ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধ করি, যাহা কিছুর সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই তাহাদের সব কিছুকেই সেই পূজার ও সেবার বস্তু বলিয়া জানিতে এবং বুঝিতে হইবে; সব কিছুকে পরিণত করিতে হইবে ভগবানের মূর্ত্তিতে, সব কিছুকেই জানিতে হইবে পরম দেবতার মন্দিররূপে, সব কিছুকে দেখিতে হইবে শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী পরমসত্তার দ্বারা সমাবৃত বলিয়া। যদি ইতিপূর্ব্বেই না ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে পরিশেষে কর্ম্মযোগের এই পন্থা দিব্যসত্তা, দিব্যসংকল্প ও দিব্যশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠযোগ স্থাপনের ফলে জ্ঞানমার্গে পরিণত হইবে, সেখানে জ্ঞান হইবে এমন পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীণ যাহা জীবের বুদ্ধি নিজে কখনও গড়িয়া তুলিতে বা যুক্তিবিচার অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় না।

পরিশেষে এই আত্মসমর্পণ যোগের সাধনা আমাদের অন্তরে অহমিকার যে সমস্ত আশ্রয় আছে তাহাদিগকে বর্জন করিতে, আমাদের মন, সংকল্প ও ক্রিয়ার মধ্য হইতে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে, অহংকারের বীজ, তাহার অস্তিত্ব এবং আমাদের প্রকৃতির উপর তাহার সকল প্রভাব পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে আমাদিগকে বাধ্য করে। ভগবানেরই জন্য সকল কার্য্য করিতে হইবে, সকল গতিবৃত্তিকে তাঁহারই দিকে ফিরাইতে হইবে। বিবিক্ত সত্তা রূপে আমাদের নিজেদের জন্য কিছু করা চলিবেনা; তেমনি প্রতিবেশী

বন্ধু, পরিবার, দেশ, মানবজাতি বা অন্যপ্রাণীরূপে অবস্থিত অপরের জন্য, তাহারা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, ভাবনা বা ভাবাবেগের সহিত সম্বদ্ধ অথবা আমাদের অহং তাহাদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক বলিয়া,—কিছুই করা চলিবে না। এইভাবে দেখিলে ও কর্ম্ম করিলে আমাদের সকল কর্ম্ম ও জীবন, যে ভগবান তাঁহারই নিজ বিরাট বিশ্বসত্তারূপ সীমাহীন মন্দিরে নিত্য অবস্থিত তাঁহারই নিত্য সক্রিয় পূজা ও সেবায় শুধু পরিণত হইবে। জীবন তখন উত্তরোত্তর হইয়া উঠিবে পরাৎপর পুরুষের প্রতি ব্যষ্টিসত্তার মধ্যস্থিত শাশ্বত পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মসমর্পণ (যজ্ঞ)। শাশ্বত বিশ্বপুরুষের বিরাট যজ্ঞভূমিতে এই অর্ঘ্য অর্পিত হইতেছে; যে শক্তি এই অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছেন তাহা বা তিনিও শাশ্বত শক্তি বা সর্ব্বব্যাপিনী বিশ্বজননী। সুতরাং এই পন্থা কর্ম্মদ্বারা এবং কর্ম্মের মধ্যে নিহিত আত্মশক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলন ও যোগাযোগ সাধনের এক প্রণালী, ততটা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ যতটা আমাদের ঈশ্বরাভিমুখী সংকল্প আশা করিতে অথবা আমাদের অন্তরাত্মার শক্তি সাধিত করিতে পারে।

এই যজ্ঞের মধ্যে কর্ম্মযোগের সমস্ত শক্তি সর্ব্বাঙ্গীণ ও চরমরূপে নিহিত আছে উপরন্তু ইহার মধ্যে দিব্য আত্মা ও পরম প্রভুর নিকট আত্মোৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের বিধান আছে বলিয়া একদিকে ভক্তিমার্গের অপর দিকে জ্ঞানমার্গের সমস্ত শক্তি ইহার সঙ্গে বর্ত্তমান আছে। পরিশেষে এই তিন দিব্যশক্তির সকলেই একত্রে কার্য্য করে, এক হইয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায় পরস্পরের দ্বারা পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়।

শাশ্বত পরমেশ্বরই আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের প্রভু; আমাদের সমগ্র সত্তা ও চেতনাতে এবং সত্তার প্রকাশশীল সকল যন্ত্রে তাঁহার সহিত মিলন ও একত্ব সাধনই আমাদের যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সুতরাং কর্ম্মযোগের প্রথম সোপানগুলির পরিমাপ করিতে হইবে, প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু গড়িয়া উঠিতেছে কিনা যাহা আমাদিগকে দিব্য প্রকৃতির অধিকতর সন্নিকটে লইয়া যাইবে, দ্বিতীয়তঃ ভগবান ও তাঁহার সান্নিধ্যের অনুভূতি পাইয়াছি কিনা, আমাদের মধ্যে তাঁহার অভিব্যক্তি হইতেছে কিনা তাঁহার সহিত ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছি কিনা, তাঁহার সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়াছি

কিনা—এই সমস্ত দ্বারা। কিন্তু ভগবান স্বরূপতঃ অনন্ত তাঁহার অভিব্যক্তিতেও তিনি বহুধাবিচিত্ররূপে অনন্ত। তাহাই যদি হয়, তবে শুধু একাঙ্গীন উপলব্ধি দ্বারা আমাদের সত্তা ও প্রকৃতি যে প্রকৃত সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিবে ইহা সম্ভব নয়; তজ্জন্য প্রয়োজন দিব্য অনুভূতির নানা বিভিন্ন সূত্রের সমাহার ও সমন্বয়। ব্যতিরেকী ভাবে তাদাত্ম্যের একটিমাত্র ধারার দ্বারা চরমোৎকর্ষে পৌঁছিলেও সে অবস্থা লাভ হইবে না। অনন্তের বহু বিভাবকে আমাদের সত্তায় সুসমঞ্জস করিয়া লইতে হইবে। আমাদের প্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপান্তর সাধন করিবার জন্য সক্রিয় ও শক্তিশালী বহুমুখীন অনুভূতিযুক্ত এক পূর্ণাঙ্গ চেতনা লাভ করা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন।

এই অনন্তের একটা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অথবা বহুমুখী অভিজ্ঞতা পাইতে হইলে একটা মৌলিক বোধ একান্ত আবশ্যক। সে বোধ হইল রূপ এবং জগৎব্যাপার দ্বারা অপরিবর্ত্তিত স্বরূপ সত্তা ও সত্যের মধ্যে ভগবানের উপলব্ধি। তাহা না হইলে আমরা বাহ্য রূপাবলির জালে জড়াইয়া পড়িতে অথবা বিশ্বগত বা বিশিষ্ট বিশৃঙ্খল নানাভাবের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতে পারি; আবার এ গণ্ডগোল এড়াইতে গিয়া কোনপ্রকার মানস প্রণালী অথবা ব্যক্তিগত সীমিত কোন অনুভূতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেও পারি। বিশ্বব্যাপারের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ একমাত্র নিঃসংশয় সর্ব্বসমন্বয়ী সত্য এই যে, জীবন অজ ও অনাদি আত্মা বা চিৎপুরুষের এক অভিব্যক্তি এবং এই চিৎপুরুষের সহিত তাহার নিজ বিসৃষ্টির সত্য সম্বন্ধ নির্ণয়ই জীবনের গুপ্ত রহস্যের চাবিকাঠি। এই সমস্ত জীবনব্যাপারের পশ্চাতে নিজেরই বহুরূপী সম্ভূতির উপরে শাশ্বত সংস্বরূপের এক দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে; কালের ক্ষেত্রে সেই কালাতীত অব্যক্ত শাশ্বত বস্তু নিজের অভিব্যক্তির সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যোগসাধনাতে এই জ্ঞানের কোন মূল্য নাই যদি তাহা বুদ্ধিগত বা দার্শনিক ধারণা মাত্র এবং প্রাণশূন্য ও অফলপ্রসু বস্তু হয়; কেবল এক মনোময় উপলব্ধি সাধকের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কেননা সাধনা শুধু ভাবনার সত্য বা মনের সত্য চায় না, সে চায় জীবন্ত ও স্বপ্রকাশ আধ্যাত্মিক অনুভূতির সক্রিয় শক্তিশালী সত্য। যিনি সত্য ও অনন্ত সান্নিধ্যরূপে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান তাঁহার সুস্পষ্ট এক উপলব্ধির, তাঁহার এক নিবিড় অনুভূতির ও তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের, তাঁহার সংস্পর্শ ও অনুভবের এক বাস্তব বোধের মধ্যে আমাদের জাগ্রত হওয়া চাই, আর চাই তাঁহার সহিত এরূপ এক নৈকট্যবোধ যাহা অনুভব করিবে যে তিনি সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে বাস করিতেছেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার অধিষ্ঠানের বোধ আমাদের মধ্যে এক জীবন্ত সর্ব্বব্যাপী সত্যরূপে থাকা চাই, যে অধিষ্ঠানের মধ্যে রহিয়াছে আমাদের ও সর্ব্বভূতের বসতি, গতি ও কর্ম্ম ; আমাদিগকে অনুভব করিতে হইবে যে এই সান্নিধ্য সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র বাস্তব ও পরিদৃশ্যমান রূপে সব কিছুর অন্তরে রহিয়াছে ; আমাদের বোধে সুস্পষ্ট করিতে হইবে যে তিনিই সর্ব্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপ, তাহাদের অবিনাশী মূল সত্তা, অন্তরঙ্গভাবে জানিতে হইবে যে তিনিই তাহাদের অন্তরতম আত্মা। অন্য সকল জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকা চাই যে মূল অনুভূতি, তাহা এই আত্মা এই চিৎপুরুষকে সর্ব্বভূতের মধ্যে শুধু মনে ধারণা করা নয়, তাঁহাকে এখানে সর্ব্বপ্রকারে দেখা, অনুভব ও বোধ করা এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসা আবার তেমনি সুস্পষ্টভাবে সর্ব্বভূতকে এই আত্মার এই চিন্ময় সতের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জানা, দেখা ও অনুভব করা।

সর্ব্বভূতের এই অনন্ত ও শাশ্বত আত্মা এক সর্ব্বব্যাপী সদ্বস্তু, সর্ব্বত্র অবিভক্ত এক সত্তা ; অদ্বয় তত্ত্বের এই অধিষ্ঠান সর্ব্ববস্তুকে একত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, বিভিন্ন জীবের মধ্যে তাহা বিভিন্ন নহে ; জগতের প্রত্যেক অন্তরাত্মাতে বা প্রত্যেকরূপে এই অধিষ্ঠানের আমরা সাক্ষাৎ পাইতে, তাহাকে দেখিতে বা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারি। কেননা ইহার আনন্ত্য আধ্যাত্মিক ও মৌলিক তাহা শুধু দেশের অসীমতা বা কালের নিরবচ্ছিন্ন অন্তহীনতা নয় ; এই অনন্তকে যতখানি নিশ্চয়তার সহিত যেমন অনুভব করা যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুতে বা কালের এক ক্ষণে ততখানিই অনুভব করা যায় অগণিত যুগযুগান্তের অতি বিস্তারের বা সৌরমণ্ডলরাজির বিরাট অপরিমেয় মহা-ব্যোমের মধ্যে। এই জ্ঞান বা অনুভূতি আরম্ভ হইতে পারে যে কোন স্থান হইতে, তাহার আত্মপ্রকাশ হইতে পারে যে কোন বস্তুর মধ্য দিয়া ; কেননা ভগবান আছেন সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত রহিয়াছে ভগবানে।

তথাপি বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে এই মৌলিক অনুভূতি বিভিন্নভাবে আরম্ভ হইবে এবং ইহার সহস্র বিভাবের মধ্যে যে সত্য লুক্কায়িত আছে তাহা সমগ্র-ভাবে ফুটিয়া উঠিতে বহু সময় লাগিবে। হয়ত প্রথমে আমি আমার নিজের মধ্যে সেই শাশ্বতের অধিষ্ঠান দেখি বা বোধ করি অথবা নিজের সহিত তাঁহার তাদাত্ম্য অনুভব করি এবং শুধু তাহার পরে আমার এই বৃহত্তর আত্মার দর্শন ও অনুভবকে সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে বিস্তৃত করিতে পারি। তখন আমি বিশ্বকে দেখি আমার মধ্যে অথবা আমার সহিত এক বলিয়া। জগৎকে তখন আমার সত্তাতে একটা দৃশ্যপটরূপে অনুভব করি, তাহার নানাখেলাকে আমারই বিশ্ব-সত্তার মধ্যেস্থিত রূপ, আত্মা ও শক্তির গতিবৃত্তি বলিয়া দেখি ; সর্ব্বত্র আমি

আমারই সাক্ষাৎ পাই আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা। এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এইভাবে আমিকে দেখা অসুর বা দৈত্যের ভ্রান্ত দর্শন নয়, অসুর তাহার নিজেরই অতিস্ফীত ছায়ার মধ্যে বাস করে, ভুল করিয়া নিজের অহমিকাকে আত্মা বা চিৎপুরুষ মনে করে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক সব কিছুর উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্তারূপে নিজের ভেদগত খণ্ডসত্তাকে চাপাইয়া দিতে চায়। কারণ জ্ঞানলাভের পর আমি এই সত্য উপলব্ধি করি যে আমার খাঁটি আত্মা আমার অহমিকা নয়; তাহা হইতে ভিন্ন; তাই আমি অনুক্ষণ অনুভব করি যে আমার বৃহত্তর আত্মা হয় এক বিরাট নৈর্ব্ব্যক্তিক তত্ত্ব, অথবা তাহা আমাদের আত্মসত্তার অতীত অথবা সকল ব্যক্তিসত্তার আধার এক মূল ব্যক্তপুরুষ, কিম্বা তাহা যুগপৎ এ উভয়ই; কিন্তু তাহাকে নৈর্ব্ব্যক্তিক, সীমাহীন ব্যক্তিক অথবা একাধারে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্ব্যক্তিক যে রূপে দেখি না কেন আমাদের এই আত্মা অহমিকার অতীত এক অনন্ত সত্তা। যদি তাঁহাকে অপর রূপ সকলের মধ্যে নয় বরং যাহাকে আমি বলি সেই রূপের মধ্যে প্রথমে খুঁজিয়া এবং পাইয়া থাকি, তাহার কারণ শুধু এই যে আমাদের চেতনার অন্তর্ম্মুখীনতার (subjectivity) জন্য সেই আমির মধ্যে তাঁহাকে আবিষ্কার করা, তৎক্ষণাৎ জানা ও উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। কিন্তু যদি যন্ত্ররূপী সংকীর্ণ অহমিকা এই আত্মাকে দেখিবামাত্র তাহার মধ্যে লীন হইয়া যাইতে আরম্ভ না করে যদি মনদ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র বাহ্য 'অহং' সেই বৃহত্তর অজ শাশ্বত চিন্ময় 'অহং' এর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমার প্রকৃত উপলব্ধি লাভ হয় নাই অথবা যে উপলব্ধি হইয়াছে তাহা মূলতঃ অপূর্ণ। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা অহংগত বাধা আছে; আমার প্রকৃতির কোন না কোন অংশ তাহার আত্মম্ভরিতা এবং আত্মসংরক্ষণের জন্য চিৎপুরুষের সর্ব্বগ্রাহী সত্যের প্রত্যাখ্যান দ্বারা প্রতিরোধ করিতেছে।

পক্ষান্তরে, প্রথমে আমি আমার বাহিরের জগতের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পারি, আমার মধ্যে নয় অপরের মধ্যে, এবং কাহারও কাহারও পক্ষে ইহাই সহজতর পন্থা। আরম্ভ হইতেই তাহাকে বিশ্বের অন্তর্যামী ও সর্ব্বাধার অনন্তরূপে দেখি, দেখি যে তিনি এই যে সকল রূপ, জীব ও শক্তি তাঁহার বহিশ্চেতনায় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তাহাদের সীমায় আবদ্ধ নহেন। নয়তো তাঁহাকে দেখি ও অনুভব করি এই সমস্ত শক্তি ও সত্তার আধার এক শুদ্ধ নিঃসঙ্গ পরমাত্মা ও চিন্ময় সত্তারূপে, এবং আমার চতুর্দ্দিকস্থ নীরব সেই সর্ব্বব্যাপ্তির মধ্যে আমার সকল অহংবোধ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পরে এই

সর্ব্বব্যাপী সত্তা আমার যান্ত্রিক সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে এবং তাহাকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে এবং মনে হয় যেন তাহারই মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে আমার কর্ম্মের সকল প্রেরণা, আমার ভাবনা ও বাক্যের সকল আলোক, আমার চেতনার সকল রূপায়ণ, এবং এই অদ্বয় বিশ্বব্যাপী সত্তার অন্য আত্মরূপ সকলের সহিত রহিয়াছে আমার চেতনার সকল সম্বন্ধ ও সংযোগ। এখন আর আমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা নহি, আমি তিনি, এই অর্থে যে আমার প্রকৃত সত্তা তাঁহার স্বরূপ সত্তারই এক প্রকৃত অংশ যাহা এই জগদ্‌ব্যাপারে এক বিশিষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট রূপের ভর্ত্তা ও বিধায়ক।

যাহা সকল উপলব্ধির চরম তেমন এক মৌলিক উপলব্ধিও কখন কখন প্রথমেই যথার্থ উন্মীলন অথবা যোগের প্রাথমিক পর্য্যায় রূপে দেখা দিতে পারে। ইহা এক ঊর্দ্ধস্থিত অনির্ব্বচনীয় সর্বাতীত অজ্ঞেয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, যাহা আমার এবং যে জগতে আমি বিচরণ করি বলিয়া বোধ করি সেই জগতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, যাহা দেশ ও কালের অতীত এক অবস্থা বা সত্তা, যাহাকে আমার মধ্যস্থ কোন মৌলিক চেতনা শুধু যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে তাহা নয়, তাহার দিকে কোন এক অলক্ষ্য কারণে অনিবার্য্যরূপে আকৃষ্ট ও তাহার অনন্য তাত্ত্বিক বাস্তবতা দ্বারা অভিভূত হয়। এই অনুভূতির সহিত সাধারণতঃ সমান অনিবার্য্যরূপে এই বোধ জাগিয়া উঠে যে, এখানকার সব কিছুই স্বপ্ন বা ছায়ার মত মিথ্যা অথবা তাহাদের স্বভাবে তাহারা সাময়িক, অর্দ্ধ সত্য মাত্র। কোনটাই কোন মূল বস্তু নহে। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য মনে হইবে আমার চতুর্দ্দিকে যেন এক চলচ্চিত্রের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ছায়ারূপ বা বাহ্য আকার মাত্র দেখা যাইতেছে, এবং আমার নিজের ক্রিয়াকে বোধ হইবে যেন আমাদের ঊর্দ্ধস্থ বা বহিঃস্থ এখনও অজ্ঞাত এবং হয়ত অজ্ঞেয় কোন উৎস হইতে নিঃসৃত এক তরল রূপায়ণ। যদি এই চেতনাতে থাকিয়া যাই, যদি এই প্রারম্ভিক সূত্র ধরিয়াই চলি অথবা বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রথম নির্দ্দেশ যদি মানিয়া লই, তাহা হইলে আমরা অজ্ঞেয় তত্ত্বের মধ্যে আত্মা ও বিশ্বের বিলয়ের অর্থাৎ মোক্ষ ও নির্ব্বাণের দিকে অগ্রসর হইব। কিন্তু ইহাই পরিণামের একমাত্র ধারা নহে; তাই বরং কালাতীত এই শূন্যগর্ভ মুক্তির নীরবতার মধ্যে ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব যতদিন না তাহার মধ্য দিয়া আমার সত্তা ও কর্ম্মের সেই আজিও অজানা উৎসের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে আরম্ভ না হইতেছে; তখন দেখিব যে শূন্য পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এবং ইহার মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে অথবা ইহাতে সবেগে প্রবিষ্ট হইতেছে ভগবানের বহুভঙ্গিম সমগ্র

সত্য, জাগতিক অভিব্যক্তির সমস্ত বিভাব এবং সক্রিয় অনন্তের অসংখ্য স্তররাজি। এই অনুভূতি গভীরতম, প্রায় অতলস্পর্শ এক পরম শান্তি ও নীরবতা লইয়া আসিয়া প্রথমে মনকে এবং তারপর সমগ্র সত্তাকে সমাচ্ছন্ন করে। অভিভূত ও অধিকৃত, স্তিমিত ও নিজ হইতে মুক্ত (বা স্ব-নির্ম্মুক্ত) হইয়া মন সেই নীরবতাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় কিন্তু তাহার পর সাধক আবিষ্কার করে যে সেই নীরবতার মধ্যেই তাহার জন্য সব কিছু রহিয়াছে অথবা নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে, অথবা সেই নীরবতার মধ্য দিয়া এক বৃহত্তর নিগূঢ় সর্ব্বাতীত সত্তা হইতে সে সমস্ত তাহার উপর নামিয়া আসিতেছে। কেননা এই সর্ব্বাতীত, এই পরাৎপর তত্ত্ব শুদ্ধ এক অলক্ষণ শূন্যতার শান্তি শুধু নয়; ইহার মধ্যে রহিয়াছে তাহার নিজস্ব অনন্ত বৈচিত্র্য ও বৈভবের অতি বিপুল সমারোহ, আমাদের পার্থিব বৈভব যাহার এক বিকৃত ও খর্ব্বীভূত অংশ মাত্র। সকল বস্তুর এই আদি উৎস যদি না থাকিত তাহা হইলে বিশ্ব সম্ভূত হইতে পারিতনা; সকল শক্তি, সকল কর্ম্ম ও ক্রিয়া হইত এক ভ্রান্তি, সকল সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি হইত অসম্ভব।

এই তিনটিই যোগের মৌলিক উপলব্ধি, এতটা মৌলিক যে জ্ঞানমার্গের সাধকের নিকট বোধ হয় তাহারা চরম, আপনাতে আপনি পূর্ণ, উচ্চতায় অপর সকলকে অতিক্রম এবং তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। তথাপি এ সমস্ত অনুভূতি যোগসাধনার প্রাথমিক অবস্থায় অলৌকিক দৈবানুকম্পায় অকস্মাৎ সহজেই লাভ হউক কিম্বা দীর্ঘকাল-ব্যাপী সাধনা ও প্রগতির পথে বহুকষ্টে চলিবার পর অর্জিতই হউক, পূর্ণ-যোগীর দৃষ্টিতে তাহারা একমাত্র অথবা পরিপূর্ণ সত্য নহে, শাশ্বতের পূর্ণাঙ্গ সত্য বা রহস্য নির্ণয়ের সূত্র মাত্র, বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে তাহারা বৃহত্তর এক দিব্য জ্ঞানের অপূর্ণ আরম্ভ ও প্রশস্ত ভিত্তি। অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় আরও বহু উপলব্ধি আছে, যাহাদের অনুসরণ তাহাদের সম্ভাবনার শেষ সীমা পর্য্যন্ত করিতে হইবে; এবং যদিও প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তাহাদের কোন কোনটি জীবনের কর্ম্মসাধনের যন্ত্ররূপে ভগবানের বিভাব মাত্র, তাঁহার মূল স্বরূপে নিহিত নয় তবু অবশেষে তাহাদের সেই কর্ম্মধারার মধ্য দিয়া তাহাদের শাশ্বত আদি কারণ পর্য্যন্ত অনসরণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহারা ভগবানের এমন এক স্বপ্রকাশে লইয়া যায়, যাহা না হইলে জগতের পশ্চাতে স্থিত সত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিঃস্ব ও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। আপাতপ্রতীয়মান এই সমস্ত উপকরণই এমন এক গুহ্য তত্ত্বের চাবিকাঠি, যাহা ছাড়া মৌলিক তত্ত্ব সকল তাহাদের সকল গোপন রহস্য উদঘাটিত করে

না। পূর্ণযোগের বিরাট জালে ভগবানের আত্মপ্রকাশক সকল বিভাবকেই ধরিতে হইবে।

জগৎ ও তাহার কর্ম্মধারাসকল হইতে পলায়ন, এক পরম মুক্তি ও নিষ্ক্রিয়তা, যদি সাধকের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের সার্থকতার জন্য এই তিন মূল উপলব্ধিই যথেষ্ট ; একমাত্র তাহাদের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া সে দিব্য বা পার্থিব জ্ঞানের সকল বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে এবং সকল দায়মুক্ত হইয়া নিজে শাশ্বত নীরবতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে জগৎ ও তাহার ক্রিয়াবলির হিসাব লইতে হইবে, তাহাদের পশ্চাতে কোন্ দিব্য সত্য রহিয়াছে তাহা জানিতে এবং দিব্য সত্য ও ব্যক্ত বিসৃষ্টির মধ্যে যে আপাতবিরোধ বর্ত্তমান আছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে, যাহা হইতে আমাদের অধিকাংশ আধ্যাত্মিক অনুভূতির সূত্রপাত হয়। এখানে, সাধক যে পথেই অগ্রসর হউক না কেন তাহার সম্মুখে সতত আসিয়া উপস্থিত হয় এক অবিরাম দ্বৈত, তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় জীবনের পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রতীত দুই রূপ, আর তাহার মনে হয় যেন এই বিরোধই রহিয়াছে জগতের সকল প্রহেলিকা ও সমস্যার মূলে। তাহার পর সে আবিষ্কার করিতে পারে ও করে যে এই দুই রূপ এক অদ্বয় সত্তারই দুই মেরু, তাহারা বিপরীতমুখী ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুইটি যুগপৎ শক্তিপ্রবাহের দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, এই দুইশক্তির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত পরম সৎ-এর মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার অভিব্যক্তির বিধান বা কারণ এবং তাহাদের পুনর্মিলনই জীবনের সকল বিরোধ সামঞ্জস্যের ও সাধকের অভীপ্সিত পূর্ণাঙ্গ সত্যের আবিষ্কারের বিধি-নির্দ্ধারিত উপায়।

কারণ, একদিকে সে সর্ব্বত্র অনুভব করে এই আত্মাকে, এই অনন্ত কাল-স্থায়ী সদ্বস্তুকে, এই শাশ্বত ব্রহ্মকে ; বোধ বা অনুভব করে এখানে কালের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে স্থিত সেই স্বয়ম্ভূ সত্তাকে, আবার কালকে ভুবনকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত সর্ব্বাতীত সেই পরাৎপব তত্ত্বকে। পরমপুরুষের এই প্রবল অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া সাধক উপলব্ধি করে যে এই আত্মা আমাদের সসীম অহমিকা কিম্বা আমাদের মনপ্রাণ দেহ নহেন তিনি জগৎ-ব্যাপী অথচ বাহ্য প্রাতিভাসিক কোন বস্তু নহেন, অনুভব করে যে সাধকের

মধ্যস্থ কোন এক আধ্যাত্মিক বোধের নিকট তিনি যে কোন রূপ বা ঘটনার অপেক্ষাও অনেক বেশী বাস্তব, তিনি বিশ্বব্যাপী তথাপি তাঁহার সত্তা বিশ্বের কোন বস্তুর বা বিশ্বের অখণ্ড সমগ্রতার উপর নির্ভর করে না ; জগতের সব কিছু যদি অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা হইলে সে অবলুপ্তিতে সাধকের নিকট এই শাশ্বতের অন্তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতির কোন ইতরবিশেষ হয় না। সে এক অনির্ব্বচনীয় স্বয়ম্ভূ সত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছে যিনি তাঁহার নিজের ও সর্ব্ববস্তুর স্বরূপ সত্য ; সে এক মূল পরম চেতনাকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছে আমাদের ভাবনাশীল মন প্রাণ-বোধ (life-sense) এবং দেহ-বোধ (body-sense) যাহার আংশিক ও খর্ব্বরূপ, এই চেতনার সহিত আছে এমন এক অসীম শক্তি, যাহা হইতে হইয়াছে সকল শক্তির উদ্ভব, তথাপি এই সমস্ত শক্তির একত্রীভূত সমষ্টি বা বীর্য্য বা প্রকৃতি দ্বারা সে পরম শক্তির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া, কোন বিবরণ দেওয়া যায় না ; সাধক অনুভব করে যে সে এক অবিচ্ছেদ্য স্বয়ম্ভূ পরম আনন্দের মধ্যে বাস করিতেছে যে আনন্দ নিম্নতর এই পার্থিব ক্ষণিক আমোদ-আহ্লাদ-হর্ষ-সুখ নহে। এই স্থির অবিকম্প অনুভূতির চারিটি লক্ষণ—অবিকারী অবিনাশী আনন্ত্য কালাতীত এক নিত্যতা, এমন এক আত্ম-সচেতনতা যাহা গ্রহণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল অথবা ইতস্ততঃ অন্ধ অন্বেষণকারী মানস চেতনা নয়, কিন্তু মানস চেতনার পশ্চাতে উপরে ও নীচে এমনকি যাহাকে আমরা নিশ্চেতনা বলি তাহারও মধ্যে অবস্থিত এবং যাহার মধ্যে অন্য কোন সত্তার থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই তেমন এক একত্ব। তথাপি সাধক ইহাও দেখিতে পায় যে এই স্বয়ম্ভূ সৎই এক চিন্ময় কালপুরুষ (Time-spirit) সকল ঘটনার প্রবাহ নিজের মধ্যেই বহন করিতেছেন, এক আত্মপ্রসারিত অধ্যাত্মদেশ (Spiritual space) রূপে সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বসত্তা নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এক অধ্যাত্ম ধাতু (Spirit-substance) রূপে, যাহা অনাধ্যাত্মিক ক্ষণিক ও সীমিত বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র তিনিই তাহাদের সকলের সকলরূপ ও উপাদান হইয়াছেন। কেননা তিনি জগতে যাহা কিছু ক্ষণবিধ্বংসী সসীম, দেশ ও কালগত সে সকলকেও তাহাদের মূল-ধাতু শক্তি ও বীর্য্যে সেই অদ্বয়, শাশ্বত ও অনন্ত হইতে অভিন্ন বলিয়া দেখেন।

তথাপি শাশ্বত আত্মসচেতন এই সৎ চিন্ময়, এই চৈতন্য স্বয়ংজ্যোতি, মহাশক্তির এই আনন্ত্য, কালাতীত ও অন্তহীন এই পরম আনন্দ, সাধকের অন্তরে বা তাহার সম্মুখে শুধু যে রহিয়াছে তাহা নহে। ইহা ছাড়াও তাহার অনুভূতিতে সর্ব্বদা রহিয়াছে পরিমেয় দেশ ও কালের মধ্যে অবস্থিত এই বিশ্ব, হয়ত বা এক প্রকার সীমাহীন সান্ত, যাহার মধ্যে রহিয়াছে যত সব অচিরস্থায়ী,

সসীম, খণ্ডিত, বহুগুণিত, অজ্ঞানে আবৃত সত্তাসকল, যাহারা দুঃখ ও তাপ, বিরোধ ও অনৈক্য দ্বারা সর্ব্বদা আক্রান্ত হইতেছে এবং অস্পষ্ট ও অনিশ্চিতভাবে আজিও অনুপলব্ধ অথচ অন্তর্নিহিত একত্বের সঙ্গতি ও অভেদ খুঁজিতেছে, যাহারা অচেতন বা অর্দ্ধ-চেতন অথবা যখন অধিক মাত্রায় সচেতন তখনও আদিম অবিদ্যা ও নিশ্চেতনাতে আবদ্ধ। সাধক সর্ব্বদা শান্তি বা আনন্দময় সমাধিতে নিমজ্জিত থাকে না, আর যদি সেভাবে থাকিত তাহাতেও এই সমস্যার সমাধান হইত না, কারণ সে জানে যে তাহার বাহিরে অথচ তাহারই কোন বৃহত্তর সত্তার মধ্যে এ সমস্ত যেন চিরকাল চলিয়া আসিতেছে ও চলিতে থাকিবে। কখনও কখনও সাধকের নিকট তাহার সত্তার এই দুই অবস্থা তাহার চেতনার অবস্থানু-সারে পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া মনে হয়; আবার অন্য সময় দেখা যায় যে এ দুই অবস্থা তাহার সত্তার মধ্যে দুই বিসদৃশ অংশরূপে—একটি উপরে অপরটি নীচে, একটি অন্তরে অপরটি বাহিরে,—পরস্পরের সহিত মিলন ও সামঞ্জস্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। সে শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে তাহার চেতনার এই ভেদবোধের মধ্যে মুক্তির এক বিশাল শক্তি রহিয়াছে, কেননা ইহার জন্যই সে আর অজ্ঞানে ও নিশ্চেতনায় আবদ্ধ থাকে না; তখন সে এই অজ্ঞানকে জানে, যাহাকে জয় করা যায় তেমন এক ভ্রান্তি অথবা অন্ততঃপক্ষে একটা অস্থায়ী মিথ্যা আত্মানুভূতি বা মায়া বলিয়া, তাহার নিজের বা বস্তুমাত্রের অপরি-হার্য্য স্বভাব বলিয়া নহে। তাহার লোভ হয় বটে এই মায়াকে পরমেশ্বরের একান্ত বিপরীত কিছুরূপে শুধু ধরিয়া লইতে এক অবোধ্য রহস্যের খেলা বা অনন্তের একটা মুখোস অথবা বিকৃতি বলিয়া দেখিতে—তাই তাহার অনু-ভূতিতে সময় সময় ইহা অনিবার্য্যরূপে বোধ হয় যে একদিকে রহিয়াছে ব্রহ্মের দিব্য ভাস্বর সত্য, অন্যদিকে রহিয়াছে মায়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিভ্রম। কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সত্তাকে এরূপভাবে কাটিয়া চিরদিনের জন্য দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতে দেয়না; তাই আরও গভীররূপে দেখিয়া সে আবিষ্কার করে যে এই অর্দ্ধ-আলোক বা অন্ধকারের মধ্যেও শাশ্বত বস্তু রহিয়াছেন—ইহাও ব্রহ্ম, মায়ার রূপ ধরিয়া প্রকটিত ব্রহ্ম।

ইহা এক বর্দ্ধিষ্ণু আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রারম্ভ, ইহাই তাহার নিকট ক্রমশঃ অধিকতর রূপে প্রকাশ করে যে যাহা এতকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ব্বোধ্য মায়া বলিয়া বোধ হইয়া আসিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা যিনি কালাতীত ও বিশ্বাতীত অনন্ত সেই শাশ্বতের চিৎশক্তি ছাড়া আর কিছু নহে; কিন্তু এখানে আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্বরূপ ছদ্মবেশে তিনি নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন—মন প্রাণ ও জড়ের মধ্যে মন্থর গতিতে ভগবানের দিব্য প্রকাশরূপ অলৌকিক

ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিবেন বলিয়া। সমগ্র কালাতীত সত্তা কালের মধ্যস্থিত খেলার দিকে চাপ দিতেছে, আবার কালের মধ্যস্থিত সব কিছু কালাতীত চিৎস্বরূপের অভিমুখ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। কাল ও কালাতীতের এই ভেদমূলক অনুভূতি যেমন মুক্তিপ্রদ ছিল তেমনি এই অভেদের উপলব্ধি সক্রিয় ও ফলপ্রসূ। কেননা সে তাহার আত্মবস্তুতে (Soul-substance) শাশ্বতের অংশ, তাহার স্বরূপ সত্তা বা আত্মায় সে শাশ্বত সৎ স্বরূপের সহিত এক ও অভিন্ন ইহাই নিজের মধ্যে শুধু যে সে এখন অনুভব করে তাহা নহে, কিন্তু ইহাও জানে ও বুঝে যে তাহার সক্রিয় প্রকৃতিতেও সে সর্ব্বজড়াধার ও সর্ব্বশক্তিমান চিৎতপসেরই এক করণ, এক যন্ত্র। বর্ত্তমানে তাহার মধ্যে এই চিৎতপসের খেলা যতই সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক হউক না কেন, সে তাঁহার বৃহৎ হইতে বৃহত্তর [illegible] চেতনা ও শক্তির কাছে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারে, আর তাহার চেতনার সেই প্রসারতার কোন নির্দ্ধারিত সীমা আছে বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয় এমন কি সেই চিৎতপসের ঊর্দ্ধস্থিত এক আধ্যাত্মিক ও অতিমানস স্তর সাধকের নিকট নিজেকে প্রকট করিতেছে এবং আনত হইয়া তাহার সহিত সংস্পর্শে আসিতেছে। যেখানে তাহার মধ্যে এই সমস্ত বাধা ও সীমার বন্ধন নাই এবং আর সেখানে তাহার শক্তি কালগত এই খেলার মধ্যে আত্মপ্রভাব প্রেরণ করিতেছে এবং তৎসঙ্গে এই আশার বাণী বহন করিয়া আনিতেছে যে শাশ্বতের এমন এক বৃহত্তর প্রকাশ অবতরণ করিবে যাহা আর তেমন ছদ্মবেশী অথবা আদৌ ছদ্মবেশী নয়। যাহারা এক সময় বিরোধী বলিয়া অনুভূত হইত কিন্তু এখন এক হইয়া ব্রহ্ম-মায়ার যুগল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে সেই দ্বৈক বস্তু, সাধকের নিকট সকল আত্মার আত্মা, সকল সত্তার অধীশ্বর, বিশ্ব যজ্ঞ ও তাহার ব্যক্তিগত যজ্ঞের প্রভুর অনাদি বিরাট সক্রিয় বিভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

অন্য এক পথে অগ্রসর হইলে অন্য এক প্রকার দ্বৈতভাব সাধকের অনুভূতিতে দেখা দেয়। এক দিকে সে জানিতে পায় সাক্ষী, গ্রহীতা দ্রষ্টা অনুভবিতা রূপে বর্ত্তমান এক চেতনাকে, যাহা কর্ম্ম করে বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু মনে হয় তাহারই জন্য বাহ্য ও আন্তর এই সকল কর্ম্মই প্রবর্ত্তিত ও অনুষ্ঠিত হইতেছে। অন্যপক্ষে সেই সঙ্গেই কার্য্যকরী বা কার্য্যপ্রবাহনিয়ন্ত্রী এক মহাশক্তিকে সে দেখিতে পায় যে শক্তি স্বয়ং আমরা যাহা ধারণা করিতে পারি তেমন সকল কর্ম্মের মূল উপাদান প্রেরক ও পরিচালক, যাহা আমাদের দৃশ্য বা অদৃশ্য অগণিত রূপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, আবার তাহার নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়া ও সৃষ্টির প্রবাহের নিশ্চল আধাররূপে থাকিয়া তাহাদিগকে ব্যবহার

করিতেছে। ব্যতিরেকী অথবা অন্যনিরপেক্ষভাবে শুধু এই সাক্ষীচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সাধক নীরব, নির্বিকার ও নিশ্চল হইয়া যায় ; সে দেখিতে পায় এতদিন সে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রকৃতির গতিবৃত্তি সকলকে প্রতিফলিত ও নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, আর এই প্রতিফলনের গতিবৃত্তিগুলি তাহার অন্তরঙ্গ সাক্ষীরূপী আত্মার নিকট হইতেই তাহাদের প্রতীয়মান আধ্যাত্মিক মূল্য ও অর্থলাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে আরোপ বা তাদাত্ম্যজাত প্রতিফলন হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়াছে ; সে এখন তাহার চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু গতি-শীল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহার নীবব আত্মার চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সকল ক্রিয়া তাহার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহাদের নিবিড় প্রাক্তন সত্য ; এখন মনে হইতেছে তাহারা যান্ত্রিক এবং তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া বা শেষ করিয়া ফেলা যায়। ব্যতিরেকী ভাবে শুধু সক্রিয় গতিবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধকের মধ্যে এক বিপরীত আত্মবোধ দেখা দেয় ; তখন তাহার নিজের অনুভূতিতেই মনে হয় যে সে নিজে ক্রিয়ারাজির এক সমষ্টি, শক্তিসকলের এক রূপায়ণ এক পরিণাম ; এই সকলের মধ্যে তাহার কোন সক্রিয় চেতনা এমনকি এক প্রকার এক সক্রিয় সত্তা যদি থাকে তথাপি তাহার মধ্যে কোথাও আর স্বতন্ত্র আত্মা নাই। সত্তার এই দুই বিভিন্ন ও বিরোধী অবস্থা তাহার মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া দেখা দেয় অথবা একই সঙ্গে আসিয়া পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়ায় ; আন্তর সত্তায় অধিষ্ঠিত এক নীরব ভাব বা অবস্থা শুধু পর্য্যবেক্ষণ কবে কিন্তু থাকে নিশ্চল ও অসম্পৃক্ত ; অন্য ভাব বাহিরে বা বহিশ্চর সত্তাতে সক্রিয়ভাবে অবস্থিত থাকিয়া তাহাব অভ্যাসগত গতিবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলে। এসময় সাধক অন্তরাত্মা ও প্রকৃতি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির বিরাট দ্বৈতভাবের সুতীব্র কিন্তু বিবিক্ত উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কিন্তু যেমন তাহার চেতনা গভীর হইতে থাকে তেমনি সে বুঝিতে থাকে যে ইহা শুধু একটা প্রাথমিক বহিরঙ্গ সত্যাভাস মাত্র। কারণ সে দেখিতে পায় যে তাহার মধ্যস্থ নীরব ভর্ত্তারূপী সাক্ষীপুরুষের অনুমোদন ও অনুমতির বলেই এই কার্য্যকরী প্রকৃতি তাহার সত্তার উপর অন্তরঙ্গ বা অবিরামরূপে কার্য্য করিতে পারে ; যদি অন্তরাত্মা তাহার অনুমোদন প্রত্যাহার করিয়া নেয় তাহা হইলে তাহার উপর ও তাহার মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়াবলি পূর্ণরূপে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ তাহারা প্রবল থাকে যেন তখনও তাহাদের প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরে ক্রমশঃ তাহাদের সক্রিয়তা ও বাস্তবতা হ্রাস পাইতে থাকে। প্রকৃতির কার্য্যের এই অনুমোদন বা অস্বীকৃতির শক্তি

অধিকতর সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করিলে সে বুঝিতে পারিবে যে প্রথমে মন্থর ও অনিশ্চিতভাবে কিন্তু ক্রমশঃ দৃঢ় ও স্থিরভাবে প্রকৃতির গতিবৃত্তিসকল পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। পরিশেষে তাহার নিকট প্রকাশিত হয় যে এই সাক্ষী আত্মার মধ্যে অথবা তাহার পশ্চাতে প্রকৃতির মধ্যে এক জ্ঞাতা, এক ঐশী সংকল্পের অধিষ্ঠান আছে, এবং ক্রমশঃ সাধক অধিকতর ভাবে অনুভব করে যে প্রকৃতির যাবতীয় গতিবৃত্তি, প্রকৃতির এই অধীশ্বর যাহা জানেন এবং যাহা সক্রিয়ভাবে ইচ্ছা করেন অথবা নিক্রিয়ভাবে অনুমতি দেন তাহার এক প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এ সময় সুনিযন্ত্রিত তাহার ক্রিয়ার বাহ্যরূপেই শুধু প্রকৃতি যান্ত্রিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি এক সচেতন শক্তি, যাহার মধ্যে এক আত্মা আছে, কার্য্যের এক আত্মসচেতন তাৎপর্য্য আছে, যাহার প্রতি পদক্ষেপে প্রতি বাহ্য অবয়বে এক নিগূঢ় সংকল্প ও জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। এই দ্বৈত দৃশ্যতঃ পৃথক কিন্তু মূলতঃ অবিভাজ্য ; যেখানেই প্রকৃতি তথায় পুরুষ আবার যেখানেই পুরুষ তথায় প্রকৃতি আছে। তাহার নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও পুরুষ আত্মবিকিরণের জন্য প্রস্তুত প্রকৃতির সকল শক্তি ও বীর্য্য নিজের মধ্যেই ধারণ করিয়া থাকেন ; এমন কি তাহার সকল ক্রিয়াব প্রবেগের মধ্যে প্রকৃতি নিজের সঙ্গে তাহার সৃষ্টিক্রিয়ার পরিপূর্ণ আধার ও অর্থরূপে পুরুষের সমগ্র পর্য্যবেক্ষক এবং আদেশাত্মক চেতনাকে বহন করিয়া চলে। সাধক আর একবার তাহার অনুভূতিতে আবিষ্কার করে যে অদ্বয় সত্তার দুই মেরু, দুই দিক, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই বীর্য্যবিভাব যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার মধ্যস্থিত বস্তু অভিব্যক্ত করে। পূর্ব্ববৎ এখানেও সে দেখিতে পায় যে এই বিবিক্ত বিভাব মুক্তিপ্রদ ; কেননা অবিদ্যার মধ্যেস্থিত প্রকৃতির সীমিত কার্য্যধারার সহিত তাহার নিজসত্তাব একত্ববোধ-জাত বন্ধন হইতে ইহা তাহাকে মুক্তি দেয়। একত্ব বিধায়ক বিভাব সক্রিয় ও কার্য্যকরী ; কেননা তাহা সাধককে প্রভুত্ব ও পূর্ণতালাভে সমর্থ করে ; প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু অল্প-দিব্য বা আপাত-অদিব্য তাহাদিগকে বর্জন করিয়া, একটা মহত্তর আদর্শে এবং বৃহত্তর সত্তার বিধান ও ছন্দে সাধক নিজের মধ্যে প্রকৃতির রূপ ও গতিবৃত্তি-সকলকে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে পারে। এক আধ্যাত্মিক ও অতিমানস স্তরে এই দ্বৈত আরও পূর্ণরূপে দ্বৈতাদ্বৈত হইয়া দাঁড়ায়—তাহার অন্তঃস্থিত চিন্ময়ী শক্তি এবং তাহার সম্ভূতিবীর্য্যকে সঙ্গে লইয়া ঈশান পুরুষ কোন বাধাই মানেন না, সকল গণ্ডী সকল সীমাকে ভাঙ্গিয়া দেন। এইভাবে এক সময় যাহা পৃথক ছিল এখন পুরুষ প্রকৃতির অভিন্ন যুগলরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা, তাহার সকল সত্যে, যিনি সকল আত্মার আত্মা, সকল সত্তার প্রভু, সকল

যজ্ঞের অধীশ্বর তাহার দ্বিতীয় মহান্ পরিণামী ও কার্য্যকরী বিভাবরূপে সাধকের নিকট আত্মপ্রকাশ করে।

আবার এক পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে সাধক এই ভাবের দ্বৈতের বিভিন্ন অথচ সুস্পষ্ট এক বিভাবের সাক্ষাৎলাভ করে, যেখানে এই দ্বৈক (দুই হইয়াও এক) স্বভাব আরও সাক্ষাৎভাবে পরিষ্কার বোঝা যায়,—তাহা হইল ঈশ্বর শক্তির সক্রিয় যুগলরূপ। একদিকে সাধক অনুভব করে এক অসীম স্বয়ম্ভূ সৎস্বরূপ পরম দেবতাকে, যিনি অনির্ব্বচনীয়ভাবে নিজসত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে, সম্ভূতিবীর্য্যরূপে সর্ব্ববস্তু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,—যিনি সকল আত্মার আত্মা, সকল ব্যক্তিপুরুষের পরম পুরুষ, সকল বস্তুর চিন্ময় মূল বস্তু, যিনি নৈর্ব্ব্যক্তিক অবর্ণনীয় সৎস্বরূপ ; কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি আবার এক অসীম পুরুষ, যিনি এখানে অসংখ্য ব্যক্তিপুরুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ; তিনি জ্ঞানের প্রভু, শক্তির প্রভু, প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের অধীশ্বর, জগৎসমূহের অদ্বিতীয় কারণ, তিনিই আপনাকে আপনি প্রকাশ ও সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই বিশ্বপুরুষ, বিশ্বমানস ও বিশ্বপ্রাণ আবার যাহাকে আমরা অচেতন প্রাণহীন জড় বস্তু বলিয়া বোধ করি তাহারও ধর্ত্তারূপে তিনিই এক অদ্বয় সচেতন জীবন্ত সত্য। অন্য-দিকে সাধক অনুভব করে সেই একই ভগবান চেতনা ও শক্তির পরিণাম-সাধনের জন্য নিজেকে এক আত্মসচেতন শক্তিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, যে শক্তি, সব কিছুকে নিজের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে—বিশ্বব্যাপী দেশ ও কালের মধ্যে তাহা প্রকট করিবার জন্য। তখন তাহার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে এখানে একই অনন্ত পরম সত্তা আছেন যিনি আমাদের নিকট নিজেরই পরস্পরের সম্বন্ধে বিভিন্ন বা বিপরীত দিকবর্ত্তী দুইরূপে আমাদের নিকট দেখা দিতেছেন। সব কিছুই এই পরম দেবতার মধ্যে, তাহার সত্তায় হয় প্রস্তুত অথবা পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে এবং তাহার মধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া তাহারই সংকল্প এবং অধিষ্ঠান দ্বারা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে ; শক্তিতে অধিষ্ঠিত সেই পরম দেবতা দ্বারাই উৎসারিত হইয়া সব কিছু সক্রিয় ও গতিশীল হয়, সব কিছুরই রূপায়ণ ক্রিয়া ও পরিণতি এই শক্তি দ্বারা সাধিত হয় এবং ইহারই মধ্যে সব কিছুর ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত নিয়তি বা লক্ষ্য বর্ত্তমান। আবার সৃষ্টি বা অভি-ব্যক্তির জন্য এই দ্বৈত বা যুগল তত্ত্ব চাই ; জগতের ক্রিয়াধারার জন্য সর্ব্বদা যাহা প্রয়োজন বোধ হয়, এই যুগলই শক্তির সেই যুগ্ম স্রোতধারা, একই সত্তার সেই দুই মেরু সৃষ্টি করিতেছে তাহাদিগকে কার্য্য সাধন সক্ষম করিয়া তুলিতেছে ; কিন্তু এখানে ঈশ্বর-শক্তিতে এই দুই ধারা পরস্পরের আরও সন্নিকটে আসিয়াছে এবং প্রত্যেকেই তাহার মূলস্বরূপে এবং সক্রিয় প্রকৃতিতে অপরের শক্তি সর্ব্বদা

অতি স্পষ্টভাবে ধারণ করিয়া আছে। সেই সঙ্গে দিব্য রহস্যের দুইটি প্রধান উপাদান, ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা এখানে পরস্পরের সহিত মিলিত ও একীভূত হয় বলিয়াই পূর্ণযোগের সাধক ঈশ্বর-শক্তির এই দ্বয়ী তত্ত্বের মধ্যে একই সঙ্গে বিশ্বাতীত তত্ত্ব ও তাহার অভিব্যক্তির চরম রহস্য যত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে আর কোন অনুভূতিতে তাহা করিতে পারে না।

কেননা যিনি ঈশ্বরীশক্তি, দিব্য চিৎশক্তি ও বিশ্বজননী তিনিই শাশ্বত পরম এক এবং অভিব্যক্ত বহুর মধ্যে সংযোগ সেতু হইয়া দাঁড়ান। একদিকে অদ্বয় তত্ত্ব হইতে যে বীর্য্যধারা লইয়া আসেন তাহার অবাধগতির দ্বারা এই বিশ্বজননী বিশ্বের মধ্যে অনন্তরূপী ভগবানকে অভিব্যক্ত করেন। নিজেরই প্রকাশশীল সত্তা হইতে সংবৃতির পথে তাঁহার অন্তহীন রূপসৃষ্টি করেন; অপর-দিকে আবার তিনিই সেই বীর্য্যধারাকে পুনরূর্দ্ধমুখী করিয়া যাহা হইতে তাহারা উদ্ভূত হইয়াছে সেই আদি উৎস তৎস্বরূপের দিকে সব কিছুকে ফিরাইয়া লইয়া যান যাহাতে অন্তরাত্মা তাহার পরিণতিশীল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বর্দ্ধ-মানভাবে বিশ্বোত্তীর্ণ ভগবানের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারে অথবা এই বিশ্বেই দিব্যপ্রকৃতি লাভ করিতে পারে। যে প্রকৃতির বা নিসর্গশক্তির প্রাথমিক নিশ্চেতন যান্ত্রিক কার্য্যকরী রূপ আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয় তাহার স্রষ্টী হইয়াও এই ঈশ্বরীশক্তি বা চিৎশক্তি তাহার দ্বারা অপরামৃষ্ট; তাঁহার মধ্যেই জাগিয়াছে সেই অবাস্তবতাবোধ যাহা বিভ্রম বা অর্দ্ধবিভ্রম সৃষ্টি করে ও যাহা প্রথমে আমাদের চক্ষুতে মায়া বলিয়া প্রতীত হয়। অনুভবকারী অন্তরাত্মার নিকট তৎক্ষণাৎ ইহা স্পষ্ট বোধ হয় যে এখানে সে এক চিন্ময়শক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছে যাহা, সে নিজে যথা হইতে আসিয়াছে সেই পরাৎপরের সহিত ধাতু এবং প্রকৃতিতে এক। যদিচ যাহার এখনও আমরা কোন ব্যাখ্যা দিতে পারিনা এমন কোন পরিকল্পনা অনুসারে এই পরাশক্তিই আমাদিগকে অবিদ্যা ও নিশ্চেতনার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়াছেন, যদিচ তাহার শক্তিরাজি নিজদিগকে বিশ্বের অনিশ্চিতার্থক এই সমস্ত শক্তিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছে তথাপি অনতিবিলম্বে ইহা দেখা যায় যে তিনিই আমাদের মধ্যে দিব্যচেতনা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তৎপর রহিয়াছেন, উপরে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার নিজের ঊর্দ্ধতন সত্তার দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইতেছেন এবং ক্রম-বর্দ্ধমানভাবে আমাদের মধ্যে দিব্যজ্ঞান সংকল্প ও আনন্দের সার মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিতেছেন। এমন কি অবিদ্যার গতিবৃত্তির মধ্যেও সাধকের অন্তরাত্মা জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই জননীর সচেতন পরিচালনাই তাহার পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; তিনিই সাধককে লইয়া চলিয়াছেন ধীরে বা দ্রুতগতিতে,

সরল বা বহু আঁকাবাঁকা পথে, অন্ধকার হইতে বৃহত্তর এক চেতনার আলোকে, মৃত্যু হইতে অমৃতে, অনর্থ ও দুঃখতাপ হইতে এমন এক চরম ও পরম মঙ্গল ও আনন্দের দিকে, মানুষের মন এখন যাহার অতি অস্পষ্ট কল্পনা শুধু করিতে পারে। তাই তাঁহার শক্তি যুগপৎ মুক্তিপ্রদ এবং সক্রিয়, সৃষ্টিশীল ও অমোঘ-বীর্য্য,—বস্তুরাজি বর্ত্তমানে যে রূপে আছে তাহাই যে তিনি শুধু সৃষ্টি করেন তাহা নয়, তাহারা ইহার পর যে নবরূপে দেখা দিবে তাহাও হইবে তাঁহারই সৃষ্টি; কেননা অজ্ঞানের উপাদানে গঠিত তাহার নিম্নতর চেতনার বিকৃত ও জটিল গতিবৃত্তিকে দূর করিয়া দিয়া, এই ভাগবতীশক্তি সাধকের সত্তা ও প্রকৃতিকে ঊর্দ্ধতন দিব্যপ্রকৃতির উপাদান ও শক্তিতে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন।

এই দ্বৈতের মধ্যেও ভেদমূলক অনুভূতিলাভের সম্ভাবনা আছে। এক মেরুতে সাধক সচেতন হইতে পারেন শুধু বিশ্বসত্তার প্রভু সম্বন্ধে যিনি তাহাকে মুক্ত ও দিব্যভাবান্বিত করিবার জন্য নিজের জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের বীর্য্যরাজি তাহার উপর ঢালিয়া দিতেছেন; তখন তাহার নিকট শক্তি শুধু এই সমস্ত প্রকাশ করিবার এক নৈর্ব্ব্যক্তিক সামর্থ্য অথবা ঈশ্বরের এক বিভূতি বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। অন্য মেরুতে তাহার দৃষ্টিপথে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন বিশ্ববিধাত্রী বিশ্বজননী যিনি তাঁহার স্বরূপ ধাতুর মধ্য হইতে দেবদেবী ও জগৎরাজি, সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বসত্তা সৃজন করিতেছেন। অথবা সাধক হয়ত যদিও দুই বিভাব একসঙ্গে দেখিতে পান, তথাপি সে দেখা অসম ও ভেদমূলক হইতে পারে; তাহাতে এককে মুখ্য অপরকে গৌণ করা হইবে এবং শক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির এক সাধন মাত্র রূপে দেখা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধনা একদেশ-প্রবণ হইয়া পড়ে বা তাহাতে সাম্য থাকে না, সাধকের পুরুষকার ধাত্রীশক্তির পূর্ণ আশ্রয়ের অভাবে পঙ্গু হইয়া পড়ে দিব্যপ্রকাশের আলোকে সম্পূর্ণ সক্রিয় হয় না। কিন্তু যখন সাধকের মধ্যে এই যুগলবিভাবের পরিপূর্ণ মিলন সাধিত হয় এবং তাহাই তাহার চেতনাকে শাসিত ও পরিচালিত করে তখন সে এক পূর্ণতর শক্তির দিকে নিজেকে উন্মুক্ত রাখিতে আরম্ভ করে, যাহা পার্থিব জীবনের ভাবনা ও শক্তিরাজির বিশৃঙ্খল সংঘর্ষের মধ্য হইতে তাহাকে চিরতরে বাহির করিয়া আনিয়া এক বৃহত্তর সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং অজ্ঞানের এই জগতে সেই সত্যকে অবতরণ করাইয়া তাহাকে উদ্ভাসিত ও প্রমুক্ত করিতে এবং আত্মবীর্য্যকে নিরঙ্কুশভাবে তথায় কার্য্য করিতে সমর্থ করিবে। সে তখন এক পূর্ণাঙ্গ রহস্যের প্রথম সন্ধান পাইতে আরম্ভ করিয়াছে যাহা পূর্ণরূপে কেবল তখনই তাহার অধিগত হইবে যখন এখানে জ্ঞানের ও তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্য-

ভাবে সম্বদ্ধ অজ্ঞানের যে যুক্ত রাজত্ব চলিতেছে তাহা অতিক্রম করিতে এবং তাহার সীমা পার হইয়া তথায় পৌঁছিতে সমর্থ হইবে যেখানে অতিমানস বিজ্ঞানের মধ্যে আধ্যাত্মিক মনের বিলয় ঘটে। অদ্বয় তত্ত্বের এই তৃতীয় এবং সক্রিয়তম দ্বৈত ভাবের মধ্য দিয়াই সাধক যজ্ঞেশ্বরের সত্তার গভীরতম রহস্যের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার সহিত প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

কারণ নিশ্চেতনা হইতে চেতনার অভিব্যক্তি, প্রাণহীন বস্তুর মধ্য হইতে প্রাণের উদ্ভব, অচেতন জড়ের মধ্য হইতে আত্মার প্রকাশের মত আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান দৃশ্যমান নৈর্ব্ব্যক্তিক বিশ্বের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান রহস্যের পশ্চাতে লুকানো রহিয়াছে। এখানে আবার আর এক সক্রিয় দ্বৈতের সাক্ষাৎ পাই, যাহা প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয় তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এবং ধীরে ধীরে প্রকাশমানা পরমা শক্তির খেলার জন্য গভীরভাবে প্রয়োজন। এই দ্বৈতের এক মেরুতে দাঁড়াইয়া নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে তাহার মনকে অনুসরণ করিয়া সাধকের পক্ষে সর্ব্বত্র এক মৌলিক নৈর্ব্ব্যক্তিকতা দেখা সম্ভব। জড়জগতে পরিণামশীল অন্তরাত্মা এক বিরাট নৈর্ব্ব্যক্তিক নিশ্চেতনা হইতে যাত্রা আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার মধ্যেই আমাদের আন্তর দৃষ্টি আবরণের পশ্চাতে এক অনন্ত চিদ্‌বস্তুকে দেখিতে পায় ; তাহার প্রগতির পথে এক অনিশ্চিত চেতনা ও ব্যক্তিত্ব উন্মিষিত হইয়া উঠে যাহাদের জাগরণ যখন সম্পূর্ণ হয় তখনও তাহাকে একটা অবান্তর ঘটনা মাত্র মনে হয়, যদিও নিরবচ্ছিন্ন এক পর্য্যায়ক্রমে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে ; প্রাণের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সকলের মধ্য দিয়া এই অন্তরাত্মা মনের মধ্য হইতে এক অনন্ত নৈর্ব্ব্যক্তিক পরম অতিচেতনার মধ্যে উন্নীত হয় যেখানে ব্যক্তিত্ব, মনশ্চেতনা, প্রাণচেতনা সব কিছু যেন মনে হয় এক মুক্তিপ্রদ বিলয় বা নির্ব্বাণের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহার চেয়ে একটু নিম্নতর ভাবেও সাধক অনুভব করে যে এই মৌলিক নৈর্ব্ব্যক্তিকতা সর্ব্বত্রই এক প্রবল মুক্তিপ্রদ শক্তি। সে দেখিতে পায় যে এই নৈর্ব্ব্যক্তিকতা তাহার জ্ঞানকে ব্যক্তিগত মনের সংকীর্ণতা হইতে, সংকল্পকে ব্যক্তিগত কামনার কবল হইতে, তাহার হৃদয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদা পরিবর্ত্তনশীল আবেগ সকলের বন্ধন হইতে, প্রাণকে ক্ষুদ্র ব্যষ্টি গতানুগতিকতার অধিকার হইতে, আত্মাকে অহমিকার পাশ হইতে মুক্তি দিতেছে, আবার এই নৈর্ব্ব্যক্তিকতাই প্রশান্তি সমতা, উদারতা, সর্ব্বজনীনতা ও আনন্ত্যকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে তাহাদিগকে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে। মনে হইতে পারে যে ব্যক্তিত্বই কর্ম্মযোগের প্রধান অবলম্বন, এমন কি প্রায় তাহার উৎস, কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে নৈর্ব্ব্যক্তিকতাই অতি সাক্ষাৎভাবে

মুক্তিপ্রদ শক্তি, এক উদার অহমিকাশূন্য নৈর্ব্ব্যক্তিতার মধ্য দিয়াই সাধক মুক্তকর্ম্মী ও দিব্যদ্রষ্টা হইতে পারে। এই দ্বৈতের নৈর্ব্বক্তিক মেরু হইতে এই অনুভূতির প্রবল শক্তি দেখিয়া মুনিঋষিগণ যে ইহাকেই একমাত্র গম্যপথ এবং নৈর্ব্ব্যক্তিক অতিচেতনাকেই শাশ্বতবস্তু একমাত্র সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

তথাপি সাধক এই দ্বৈতের অন্যবিপরীত প্রান্তে দাঁড়াইলে অনুভূতির আর একটা ধারা তাহার নিকট আসিয়া দেখা দেয় যাহা আমাদের হৃদয়ের পশ্চাতে গভীরে এবং প্রাণশক্তির মর্ম্মস্থলে অবস্থিত এই বোধিকে সমর্থন করে যে চেতনা প্রাণ ও আত্মার মত আমাদের ব্যক্তিত্বও নৈর্ব্ব্যক্তিক শাশ্বত বস্তুর মধ্যে ক্ষণিকের এক অতিথিমাত্র নয় বরং তাহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সকল জীবনলীলার যথার্থ তাৎপর্য্য। এই ব্যক্তিত্ব, বিশ্বশক্তির এই চমৎকার পুষ্প, নিজের মধ্যে চরম লক্ষ্যের একটা পূর্ব্বাভাস এবং বিশ্বপ্রকৃতির সাধনার উদ্দেশ্যের একটা ইঙ্গিত বহন করিতেছে। সাধকের অন্তর্দৃষ্টি যখন খুলিয়া যায় তখন এ জগতের অন্তরালে স্থিত জগৎরাজির সম্বন্ধে সে সচেতন হয়, যে সমস্ত জগতে চেতনা ও ব্যক্তিত্বের একটা অতিবড় স্থান ও সর্ব্বপ্রধান মূল্য আছে ; এমন কি এখানে এইজড়জগতেও এই সূক্ষ্মদৃষ্টির নিকট ধরা পড়ে যে, এক গোপন ব্যাপক চেতনা জড়ের নিশ্চেতনাকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, জড়ের প্রাণহীনতা নিজের মধ্যে এক স্পন্দনশীল প্রাণকে বহন করিতেছে, ইহার যান্ত্রিকতা অন্ত-র্নিহিত প্রজ্ঞার একটা কৌশল, ঈশ্বর ও আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। সবার উপরে দাঁড়াইয়া আছেন এক অনন্ত চিন্ময় পুরুষ, যিনি এই সমস্ত জগতে নানারূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন ; নৈর্ব্ব্যক্তিকতা সেই অভিব্যক্তির এক প্রথম সাধন মাত্র। এই নৈর্ব্ব্যক্তিকতা তত্ত্ব ও শক্তিরাজির এক ক্ষেত্র, নিখিল অভিব্যক্তির সমভাবাপন্ন ভিত্তি ; কিন্তু এই সকল শক্তি নানা সত্তার মধ্য দিয়া নিজদিগকে প্রকাশ করে, তাহাদের চালকরূপে বহু চিৎসত্তা রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের উৎস চিন্ময় সৎস্বরূপের বিভূতি। অসংখ্য বিচিত্রবিভাব সম্পন্ন ব্যক্তিসত্তার রূপে সেই অদ্বয় পরম একের বহুধা আত্মপ্রকাশই এ অভি-ব্যক্তি বা সৃষ্টির যথার্থ মর্ম্ম ও মূল উদ্দেশ্য ; আজ যদি সেই ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ, খণ্ডিত ও অবরোধক বলিয়া বোধ হয় তাহার একমাত্র কারণ এই যে সে এখনও তাহার আদি উৎসের দিকে উন্মীলিত হইতে অথবা বিশ্বসত্তা ও অনন্ত সৎকে আত্মসংবিতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিজের দিব্য সত্য ও পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতএব এই জগৎসৃষ্টি আর অলীক বিভ্রম নয়, আকস্মিক এক যান্ত্রিক ব্যাপার অথবা যাহা ঘটিবার কোন প্রয়োজন ছিল না তেমন এক

খেলা, কিম্বা পরিণামহীন এক ঘটনাপ্রবাহমাত্র নহে; ইহা চিৎস্বরূপ প্রাণময় শাশ্বতের সক্রিয় অন্তরঙ্গ এক লীলা।

সত্তার দুই মেরু হইতে এই দুই একান্তবিরোধী দৃষ্টি পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে কোনও মৌলিক বাধা সৃষ্টি করে না; কেননা তাহার সমগ্র অনুভূতি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে অখণ্ড সৎস্বরূপের মধ্যে যাহা আছে তাহার অভিব্যক্তির জন্য এই দুই ভাবের এবং তাহাদের মধ্যস্থিত পরস্পরবিপরীত-দিক্‌গামী শক্তিপ্রবাহসমূহের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁহার নিকট ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা হইল দুইটি পক্ষ যাহার সাহায্যে সে আধ্যাত্মিকতার উর্দ্ধাকাশে উড্ডীন হইবে, আর সে এমন এক ভবিষ্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছে যাহাতে সে জানে যে একদিন সে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছিবে যেখানে এই ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার পরস্পর সহায়কর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাহাদের শক্তির এক অন্তরঙ্গ একত্বে রূপান্তরিত হইবে, পূর্ণাঙ্গ সত্যবস্তুকে প্রকাশ করিবে এবং দিব্যপুরুষের আদ্যা শক্তিকে কর্ম্মের মধ্যে মুক্ত করিবে। তাহার সাধনার মৌলিক বিভাবে শুধু নয় কিন্তু তাহার সকল কর্ম্মধারায় সাধক তাহাদের যুগ্ম সত্য এবং পরস্পরের অনুপূরক কর্ম্মধারা অনুভব করিয়াছে। এক নৈর্ব্যক্তিক সান্নিধ্য উর্দ্ধ হইতে তাহাকে শাসিত করিয়াছে অথবা তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রকৃতিকে অধিকার করিয়াছে; এক জ্যোতি নামিয়া আসিয়া তাহার মন, প্রাণশক্তি, তাহার দেহের কোষাণুরাজি পর্য্যন্ত পরিপ্লুত করিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে আর সেই দীপ্তি তাহার নিজেকে এবং নিজের মধ্যস্থিত সব কিছুকে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ছদ্মবেশী অজানা অচেনা গতিবৃত্তিকে পর্য্যন্ত তাহার নিজের নিকটে প্রকাশ করিয়াছে, যাহা কিছু অবিদ্যার অধিকারে ছিল তাহার সব কিছুকে অনাবৃত, পরিশুদ্ধ বা বিনষ্ট অথবা জ্যোতির্ম্ময়ভাবে রূপান্তরিত করিতেছে। এক মহাশক্তি নানাধারাতে তাহার মধ্যে নামিয়া আসিতেছে অথবা সাগরের মত তাহাকে পরিপ্লাবিত করিতেছে, তাহার সত্তার ও তাহার প্রতি অঙ্গের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে, সর্ব্বত্র সব কিছুকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতেছে, নব রূপ দিতেছে, আমূল রূপান্তরিত করিতেছে। এক পরম আনন্দ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ ও অভিভূত করিয়া দিতেছে এবং দেখাইতেছে যে সে আনন্দ দুঃখ ও তাপকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে এবং বেদনাকে পর্য্যন্ত দিব্য হর্ষে পরিণত করিতে পারে। এক অপরিমেয় প্রেম আসিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রাণীর সঙ্গে এক করিয়া দিয়াছে, অথবা অবিচ্ছেদ্য এক অন্তরঙ্গতা এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের এক জগৎ তাহার নিকট প্রকাশিত করিয়াছে এবং পার্থিব জীবনের অসামঞ্জস্যের মধ্যেও

নিজের পূর্ণতা ও পরমোল্লাসের বিধান আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক আধ্যাত্মিক সত্য ও ন্যায় এই জগতের ভালমন্দকে ত্রুটিপূর্ণ ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং এক পরমমঙ্গলকে, তাহার সূক্ষ্ম সুষমার সূত্রকে ও তাহার ক্রিয়া সংবেদন ও জ্ঞানের ঊর্দ্ধায়িত ধারাকে অনাবৃত করিয়াছে। কিন্তু এ সবের পশ্চাতে এবং ইহাদেরই মধ্যে সাধক অনুভব করিয়াছে এক দিব্য-পুরুষকে যিনি একাধারে এ সমস্তই, যিনি আলোক ও আনন্দ দাতা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, যিনি তাহার সহায়, গুরু, সখা, পিতা, মাতা, যিনি বিশ্বলীলায় তাহার খেলার সাথী, তাহার সত্তার পরম প্রভু, তাহার আত্মার প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ। মানুষের ব্যক্তিত্ব যত প্রকার সম্বন্ধের কথা জানে মানবাত্মার সহিত দিব্য পুরুষের সংস্পর্শের মধ্যে তাহাদের সবগুলিই নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু সে সমস্ত সম্বন্ধ অতিমানবতার স্তরের দিকে উন্নীত হইয়া উঠে এবং মানুষকে দিব্যপ্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করে।

পূর্ণযোগের সাধক চায় এক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও এক পূর্ণাঙ্গ শক্তি, সে চায় যিনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বভূতের পশ্চাতে অনন্তরূপে অবস্থিত আছেন তাঁহার সঙ্গে পরিপূর্ণ অখণ্ড এক মিলন। কোন একটা বিশেষ উপলব্ধি ভগবানের কোন এক বিশেষ বিভাবকে—তাহা মানব-মনকে যতই অভিভূত করুক না কেন তাহার সামর্থ্যের পক্ষে যতই পর্য্যাপ্ত বোধ হউক না কেন, একমাত্র বা চরম সত্য বলিয়া যতই সহজে গ্রহণযোগ্য মনে হউক না কেন—শাশ্বত বস্তুর একমাত্র সম্যক সত্য বলিয়া ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা পূর্ণযোগ সাধকের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহার পক্ষে বহুরূপে অভিব্যক্ত ভগবানের অনুভূতি পূর্ণরূপে লাভ করিবার চেষ্টা দ্বারাই অখণ্ড পরমের চরম অনুভূতি গভীরতর ভাবে স্বীকার এবং প্রশস্ততর-রূপে তন্মধ্যস্থ দিব্য সম্পদের উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। একেশ্বরবাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদ এ উভয়ের পশ্চাতে গোপন সত্যরূপে যাহা কিছু আছে তাহা পূর্ণ-যোগীর অভীপ্সিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু পরমেশ্বরের মধ্যে তাহাদের গুহ্য সত্যের রহস্য ধরিতে গিয়া তাহাদের সম্বন্ধে মানব মনের দেওয়া বাহ্য বোধ বা ধারণা সাধককে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পরস্পর বিবদমান সম্প্রদায় ও দর্শনের লক্ষ্য কি তাহা সে দেখে, সত্যের প্রত্যেকটি বিভাবকে স্বক্ষেত্রে সে স্বীকার করে কিন্তু তাহাদের সঙ্কীর্ণতা ও ভুলভ্রান্তিগুলি বর্জন করিয়া সে অগ্রসর হয় সেই পরম অদ্বয় সত্যকে খুঁজিয়া বাহির কবিতে যাহা সত্যের সকল বিভাবকে একসূত্রে গ্রথিত করে। ঈশ্বরকে নররূপে পূজা ও উপাসনার অভিযোগ তাহাকে বিচলিত করেনা—কেননা সে দেখিতে পায় যে এ নিন্দাবাদ আসে অজ্ঞান ও দাম্ভিক তর্কবুদ্ধির কুসংস্কার হইতে, যেখানে

বস্তু-ব্যতিরেকী মন শুধু নিজেরই সংকীর্ণ বাঁধাপথে আবর্ত্তিত হয়। মানুষের সহিত মানুষের বর্ত্তমান অভ্যাসগত ব্যবহার যদিও ক্ষুদ্রতা দুরাগ্রহ ও অজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তথাপি তাহারা পরমাত্মার মধ্যস্থিত কিছুরই বিকৃত ছায়া ; পূর্ণযোগের সাধক যখন তাহাদিগকে ভগবানের দিকে ফিরাইয়া ধরে তখন তাহারা যে বস্তুর ছায়া তাহাকে দেখিতে পায় এবং জীবনের মধ্যে অভিব্যক্তির জন্য তাহাকে নামাইয়া আনে। যখন মানুষ তাহার মানবত্বকে অতিক্রম করিয়া পরম পূর্ণতার দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারে তখনই শুধু ভগবান এখানে আত্মপ্রকাশ করেন, কেননা এই আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তন, তাহার ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া তাহার এ আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, অতএব 'মানুষী তনু আশ্রিত' পরম পুরুষকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা সাধকের পক্ষে সম্ভব নহে। ভগবান সম্বন্ধে মানুষের সসীম ধারণাকে অতিক্রম করিয়া সাধক তাঁহাকে অদ্বয় শাশ্বত দিব্য সদ্বস্তুরূপে দেখিবে ত বটেই কিন্তু তাহা ছাড়া তাঁহাকে দেখিবে তাহার বিশ্ব-লীলার সহায় ব্যক্তিরূপধারী দেবতাবৃন্দের মধ্যে, তাঁহার বিভূতি সকলের, মূর্ত্তিমন্ত বিশ্বশক্তিরাজির বা মানব-নেতাগণের মুখোসের অন্তরালে, তাঁহাকেই ভক্তিশ্রদ্ধা ও অনুসরণ করিবে গুরুমূর্ত্তিতে, তাঁহাকেই পূজা করিবে অবতার-রূপে। বুঝিতে হইবে তাহার পরম সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে যদি সে এমন কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পায় যিনি তাহার উপাস্য ইষ্ট দেবতাকে উপলব্ধি করিয়াছেন অথবা তাঁহার সহিত একাত্ম হইতেছেন, আর যদি সে পরমের অভিব্যক্তিরূপে সেই মানবাধারের মধ্য দিয়া তাঁহারই নিকট নিজেকে খুলিয়া ধরিয়া নিজেও তাঁহার উপলব্ধি লাভ করে। কারণ তাহাই উপচীয়মান পূর্ণতার স্পষ্টতম চিহ্ন, জড়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে তাঁহার অবতরণরূপ পরম রহস্যের আশা ও আশ্বাস ; যে অবতরণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে ভূত সৃষ্টির গূঢ় মর্ম্ম এবং পার্থিব জীবনের সমর্থন ও সার্থকতা।

এইভাবে যজ্ঞ বা উৎসর্গের পুষ্টি ও প্রগতির মধ্যে যজ্ঞেশ্বর নিজেকে সাধকের নিকট প্রকট করেন। সাধনার পথে যে কোন স্থানে এই আত্মপ্রকাশ দেখা দিতে পারে ; যিনি কর্ম্মের প্রভু তিনি তাহার যে কোন বিভাবে সাধকের অন্তরে আসিয়া তাহার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারেন এবং নিজের সান্নিধ্য অনাবৃতভাবে প্রকাশের জন্য তাহার ও তাহার কর্ম্মের উপর ক্রমবর্দ্ধমানভাবে নামিয়া আসেন। কালক্রমে তাহার সমস্ত বিভাবই আত্মপ্রকাশ করে কখন পৃথকরূপে কখন একত্রে কখনও সম্মিলিত ও একীভূত হইয়া। অবশেষে তাহাদের সকলের মধ্য দিয়া ভাস্বর দীপ্তিতে প্রকাশিত হন সেই পরম পূর্ণাঙ্গ সত্যবস্তু যিনি অবিদ্যার অংশভূত মনের

নিকট অজ্ঞেয় ; কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা ও অতিমানস জ্ঞানের আলোকে স্বয়ংপ্রজ্ঞ বলিয়া যিনি জ্ঞেয়।

আমাদের আত্মোৎসর্গরূপী যজ্ঞের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য এবং চরম সিদ্ধি হইল এক উচ্চতম সত্য বা উচ্চতম সত্তার, চেতনার ও শক্তির, আনন্দ ও প্রেমের যুগপৎ ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই অভিব্যক্তি এবং এইভাবে তাহা দ্বারা আমাদের সত্তার উভয় দিক অধিকার—কেননা আমাদের মধ্যেও এক ব্যক্তি-পুরুষের সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক নানা তত্ত্ব ও শক্তির এক বিপুল সম্পদ দ্ব্যর্থ-বোধকভাবে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সিদ্ধির নিজ রূপ হইবে আমাদের ব্যক্তিসত্তার সহিত সেই তৎস্বরূপের মিলন যিনি বা যাহা আমাদের দৃষ্টিতে ও অনুভূতিতে এইভাবে প্রকট হইয়াছেন ; এই মিলনের প্রকৃতি ত্রিবিধ। প্রথম মিলন অধ্যাত্মস্বরূপে, তাদাত্ম্যবোধে ; দ্বিতীয় মিলন হইবে এই পরম আত্মা ও পরা চেতনার মধ্যে আমাদের অন্তরাত্মার নিবাস ; তৃতীয় সেই পরম সত্তা ও আমাদের এখনকার করণ সত্তার মধ্যে প্রকৃতির সাহায্যে একত্বের এক সক্রিয় মিলন। প্রথম মিলনের স্বরূপ মোক্ষ ও সাযুজ্য, অজ্ঞান হইতে মুক্তি এবং সত্য ও শাশ্বত বস্তুর সহিত তাদাত্ম্য বা একত্ব লাভ—ইহাই হইল জ্ঞান-যোগের বিশেষ লক্ষ্য। দ্বিতীয়টির স্বরূপ সামীপ্য, সালোক্য। ভগবানের সঙ্গে অথবা তাঁহার মধ্যে অন্তরাত্মার বাস—যাহা প্রেম ও আনন্দ যোগের পরম কাম্য ও ঐকান্তিক আশার বস্তু। তৃতীয় সাধর্ম্ম্য, ভগবানের সহিত স্বভাব বা প্রকৃতির একত্ব, তাঁহার সাদৃশ্য, তাঁহার পূর্ণতার অনুরূপ পূর্ণতা লাভ—শক্তি ও সিদ্ধির যোগের অথবা দিব্য কর্ম্ম ও সেবার যোগের ইহাই পরম উদ্দেশ্য। পূর্ণযোগে এই তিনটি পূর্ণরূপে একত্রিত হইয়াছে, এই জগতে আত্মপ্রকাশ-শীল ভগবানের বহুধা অভিব্যক্ত একত্বই সে পূর্ণতার ভিত্তি ; পূর্ণযোগের মধ্যে এ তিনের পূর্ণ পরিণাম দেখা যাইবে, ইহাই এই ত্রিমার্গের লক্ষ্য এই ত্রয়ী যজ্ঞের ফল।

তাদাত্ম্য বোধ দ্বারা এক একত্ব আমরা লাভ করিতে পারি আমাদের সত্তার মূল উপাদান সেই পরম চিদ্‌বস্তুর মধ্যে মুক্তি পাইতে, এবং তাহাতে রূপান্তরিত হইতে পারে, আমাদের চেতনা সেই দিব্য চেতনাতে পরিণত হইতে পারে, আমাদের অন্তরাত্মার নিষ্কম্প প্রশান্তি আধ্যাত্মিক পরমার্থের সেই হর্ষোল্লাসে

অথবা সত্তার সেই স্থির শাশ্বত অখণ্ড আনন্দে পরিপূরিত হইয়া যাইতে পারে। অজ্ঞান ও অন্ধকারের এই অধস্তন চেতনায় পতন বা নির্ব্বাসনের ভয়শূন্য হইয়া আমরা ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় সত্তাতে বাস করিতে পারি, আমাদের অন্তর-পুরুষ তাহার নিজের আলোক, আনন্দ, স্বাতন্ত্র্য এবং একত্বের জগতে অচঞ্চল ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। এইযোগে বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত অন্য কোন লোকে গিয়া এ অবস্থা লাভ করিলে শুধু চলিবেনা, কিন্তু এখানে ইহজগতেও সেই অবস্থার অনুসরণ ও আবিষ্কার করিতে হইবে, আর ইহা কেবল সম্ভব হইতে পারে দিব্য সত্যকে উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া এখানেই অন্তরাত্মার আপন স্বভাবগত আলোক, আনন্দ, স্বাতন্ত্র্য এবং একত্বের জগৎ প্রতিষ্ঠা দ্বারা। চিৎপুরুষের সহিত আমাদের অন্তরাত্মা যেমন নিবিড় ভাবে যুক্ত হয় ঠিক সেই প্রকার নিবিড় ভাবে চিৎপুরুষের সহিত আমাদের করণ-সত্তার (instrumental being) মিলন অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতির সাদৃশ্য ও প্রতিরূপে রূপান্তরিত করিবে; সে করণ-সত্তাকে তাহার অবিদ্যাজনিত অন্ধ বিকৃত বিকলাঙ্গ বিবদমান গতিবৃত্তি-সমূহ পরিহার করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত আলোক, শান্তি, আনন্দ, সামঞ্জস্য, সার্ব্বভৌমতা, প্রভুত্ব, শুচিতা ও পূর্ণতার দিব্য বসন পরিধান করিতে হইবে; তাহাকে পরিণত হইতে হইবে দিব্য জ্ঞানের এক আধারে, দিব্য সংকল্পের বীর্য্যের ও সত্তার শক্তির এক যন্ত্রে এবং দিব্য প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যধারার এক প্রণালীতে। এই রূপান্তরসাধন করিতে হইবে, আমরা আজ যাহা আছি অথবা যাহা আছি মনে করি তাহার সব কিছুর এক সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তরসাধন, কালের মধ্যস্থিত সসীম সত্তার সহিত শাশ্বত অসীমের যোগ বা মিলন দ্বারা।

এই সমস্ত দুরূহ পরিণাম পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ হইতে পারে শুধু যদি সত্তার একটা বিশাল রূপান্তর ঘটে, যদি আমাদের সমগ্র চেতনার বিপরীতমুখী একটা আমূল বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, যদি আমাদের প্রকৃতির পূর্ণ অলৌকিক রূপান্তর সাধিত হয়। এজন্য প্রয়োজন আমাদের সমগ্র সত্তার উর্দ্ধায়ন, প্রয়োজন তাহার নিজের সাধন যন্ত্র বা করণাবলি এবং পরিবেশের দ্বারা ব্যাহত-গতি ও শৃঙ্খলিত জীবসত্তার শুদ্ধ মুক্ত পরম পুরুষের মধ্যে উত্থান, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে আমাদের অন্তরাত্মার উর্দ্ধারোহণ, প্রদীপ্ত কোন অতিমানসের দিকে মনের উন্নয়ন, এক বিরাট অতি-প্রাণের (super-life) অভিমুখে প্রাণের উত্তরণ, এমন কি তাহার নিজের উৎসস্বরূপ শুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গীণ কোন চিদ্বস্তুর আত্ম-ধাতুর সহিত যোগসাধনের জন্য আমাদের জড় দেহেরও এক উর্দ্ধগতি। আবার ইহা একবারে দ্রুতবেগে উর্দ্ধারোহণ হইতে পারে না;

ইহা বেদবর্ণিত যজ্ঞের মত এক ঊর্দ্ধগতি, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে আরোহণ, এবং ইহার প্রত্যেক শৃঙ্গ হইতে সাধক ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে আরও কত বেশী উত্তুঙ্গ শিখরে তাহাকে আরূঢ় হইতে হইবে। সেই সঙ্গে ঊর্দ্ধে যাহা লব্ধ হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক অবরোহণও থাকিবে; প্রত্যেক শিখর অধিকার করিয়া তথাকার শক্তি ও দীপ্তি অধস্তন মর গতিবৃত্তির মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে; নিত্য জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধের আলোকের সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলোকে লুক্কায়িত সেই একই আলোককেও অবচেতন প্রকৃতির গভীরতম গুহা পর্য্যন্ত সত্তার সকল অঙ্গ হইতে বন্ধন মুক্ত করিতে হইবে। দিব্য জ্যোতির সন্ধানে এই ঊর্দ্ধায়ন এবং নিম্ন প্রকৃতির রূপান্তরসাধনের জন্য এই অবরোহণ অবশ্যম্ভাবীরূপেই এক যুদ্ধ, নিজের সঙ্গে এবং চারিদিকের বিরোধী শক্তিসমূহের সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী এক সংগ্রাম এবং যত দিন এ যুদ্ধ চলিবে ততদিন মনে হইবে যেন ইহার শেষ নাই। কেননা অজ্ঞান ও অন্ধকারাচ্ছন্ন আমাদের পুরাতন প্রকৃতি রূপান্তরকারী প্রভাবকে সনির্ব্বন্ধভাবে পুনঃপুনঃ বাধা দিবে, আর পরিবেশ-রূপে স্থিত বিশ্বপ্রকৃতির অধিকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তি এই মন্থরগামী অনিচ্ছুক ও প্রবল বাধাদানরত আমাদের নিম্নপ্রকৃতিকে প্রশ্রয় দিবে; অজ্ঞান-সাম্রাজ্যের শক্তিরাজি তথাকার প্রধানগণ ও শাসকসম্প্রদায় সহজে আপন অধিকার ছাড়িতে চায়না।

হয়ত প্রথম দিকে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সত্তা বৃহত্তর সত্য ও আলোকের অথবা দিব্য প্রভাব ও সান্নিধ্যের দিকে উন্মীলনের জন্য উপযুক্ত ও প্রস্তুত না হইতেছে ততদিন সমগ্রভাবে তাহার পরিশুদ্ধি ও প্রস্তুতির জন্য অনেক সময় যাহা কষ্টজনক ও আয়াসসাধ্য এমন এক দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইতে পারে। এমন কি যখন আমাদের কেন্দ্রগত সত্তা উপযুক্ত ও প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার অন্তরের দ্বার ইতিমধ্যেই খুলিয়া গিয়াছে তখনও আমাদের মন প্রাণ ও দেহের সকল গতিবৃত্তিকে, আমাদের ব্যক্তিত্বের নানা বিরোধী সকল অঙ্গ ও উপাদানকে রূপান্তরসাধনে সম্মতি দেওয়াইতে অথবা তাহারা সম্মতি দিলেও সে কার্য্যের দুরূহ ও কঠিন দাবি সহ্য করিবার শক্তিলাভ করিতে অনেক দিনের প্রয়োজন হইবে। আমাদের মধ্যে সব কিছু সম্মত ও ইচ্ছুক হইলেও, বর্ত্তমান অচিরস্থায়ী সৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট বিশ্বশক্তির যে সংগ্রাম আমাদিগকে চালাইতে হইবে তাহা তখনই কঠিনতম হইয়া দাঁড়াইবে, যখন আমরা সত্তার চরম অতি-মানস রূপান্তর সাধন করিতে এবং চেতনার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চাহিব —সত্তা ও চেতনার যে রূপান্তরের ফলে ভাগবত সত্য আমাদের সত্তার মধ্যে

পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যাহা তাহারা অপেক্ষাকৃত সহজেই সাধিত হইতে দিবে তেমন এক উদ্ভাসিত অজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই থামিয়া যাইবে না।

সেই জন্যই যে পরমপুরুষ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন তাঁহার নিকট আনুগত্য এবং তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন—যাহার ফলে তাঁহার শক্তি অবাধে পরিপূর্ণভাবে আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতে পারিবে। যেমন এই আত্মদান অগ্রসর হইবে, আমাদের আত্মোৎসর্গ ক্রিয়া তত সহজ ও শক্তিমান হইবে এবং বিরোধী শক্তিরাজির বাধা দেওয়ার সামর্থ্য আবেগ ও গুরুত্ব ততই দুর্ব্বল ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। অন্তরের দ্বিবিধ পরিবর্ত্তন যাহা এখন কঠিন বা অসম্ভব মনে হয় তাহা সম্ভব এমন কি নিশ্চিত করিয়া দিতে সাহায্য করে। মনের চঞ্চল ক্রিয়া, প্রাণাবেগের বিক্ষোভ এবং শারীর চেতনার অন্ধকার—যে তিন শক্তির বিশৃঙ্খলভাবে মিলিত অবস্থাকে আমরা বর্ত্তমানে আমি বা আত্মা বলি তাহার—দ্বারা যাহা এতদিন আবৃত ও লুক্কায়িত ছিল আমাদের সেই অন্তরস্থ এক নিগূঢ় আত্মা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই অন্তরাত্মার আবির্ভাবের ফলে আমাদের সত্তার কেন্দ্রস্থানে অধিকতর অবাধিতভাবে তাহার মুক্তিপ্রদ আলোক ও কার্য্যকরী শক্তি লইয়া দিব্য সান্নিধ্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে জাগিয়া উঠিবে এবং আমাদের প্রকৃতির চেতন ও অবচেতন সকল অংশে তাহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। এই হইবে দুইটি নিদর্শন, সেই পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ রূপান্তর ও আত্মনিবেদন, আর ভগবান দ্বারা আমাদের সেই আত্মোৎসর্গের চরম স্বীকৃতি।

পঞ্চম অধ্যায়

যজ্ঞের উর্দ্ধায়ন (১)

জ্ঞানময়কর্ম্ম—চৈত্যপুরুষ

তাহা হইলে যে অনন্ত পরম-পুরুষের নিকট আমরা আত্মোৎসর্গ করি তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের এই সমস্ত হইল ভিত্তি ; আর কর্ম্মযজ্ঞ, প্রেমভক্তিযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ —ইহারাই হইল উৎসর্গের এই প্রকৃতির তিনটি বিভাব। কেননা আমরা যখন শুদ্ধ কর্ম্মযোগের কথা বলি তখন এমন মনে করি না যে আমরা আমাদের বাহ্য কর্ম্মাবলিই শুধু নিবেদন করিতেছি ; কর্ম্মযোগের অর্থ নিজের ভিতরে যাহা কিছু সক্রিয় ও সচল আছে সে সকলেরই নিবেদন ; যেমন আমাদের বাহ্য কর্ম্মাবলি ঠিক তেমনি আমাদের অন্তরের গতিবৃত্তিরাজিকেও উৎসর্গ করিতে হইবে সেই একই বেদির উপর। যে-সকল কর্ম্মকে আমরা যজ্ঞ করিয়া তুলি তাহাদের সকলেরই অন্তরের সারবস্তু হইল আত্মসংযম এবং আত্মোৎকর্ষের সাধনা, যাহার সাহায্যে আমরা আশা করিতে পারি যে আমাদের মন হৃদয় সংকল্প ইন্দ্রিয় প্রাণ ও দেহের সকল গতিবৃত্তির মধ্যে উর্দ্ধ হইতে বর্ষিত এক জ্যোতির দ্বারা আমরা সচেতন ও দীপ্তিমান হইয়া উঠিব। দিব্যচেতনার এক ক্রমবর্দ্ধমান জ্যোতি আমাদের অন্তরাত্মাকে বিশ্বযজ্ঞের অধীশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে লইয়া যাইবে, আমাদের অন্তরতম সত্তা ও আধ্যাত্মিক উপাদানকে তাদাত্ম্যবোধে তাঁহার সহিত এক ও অভিন্ন করিয়া দিবে—প্রাচীন বেদান্ত যাহা জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য করিতে চাহিয়াছিল , শুধু তাহাই নহে, আমাদের প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া আমাদের সম্ভূতিকেও ইহা আমাদিগকে তাঁহার সহিত এক করিয়া তুলিবে—বৈদিক ঋষিদের নিগূঢ়ার্থ ভাষাতে যজ্ঞ-রূপ প্রতীকের তাহাই ছিল পরম রহস্যময় তাৎপর্য্য।

পূর্ণযোগের উদ্দিষ্ট মনোময় সত্তা হইতে অধ্যাত্ম সত্তাতে দ্রুত পরিণতির প্রকৃতি যদি ইহাই হয় তাহা হইলে জটিল অথচ অতি প্রয়োজনীয় একটা ব্যবহারিক প্রশ্ন উঠে। আমাদের বর্ত্তমান জীবন ও কর্ম্ম এবং আমাদের

আজিও অপরিবর্ত্তিত মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা সম্বন্ধে আমাদের আচরণ কিরূপ হইবে? এক মহত্তর চেতনাতে আরোহণ, আর তাহার শক্তি-রাজিদ্বারা আমাদের মন প্রাণ ও দেহকে অধিকার, ইহাই যোগের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু তথাপি আমাদের পার্থিব জীবনই —অন্য কোন স্থানের অন্য কোন জীবন নয়,—আমাদের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ ও নিকটতম কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের করণ-সত্তা ও প্রকৃতির রূপান্তর, বিলয়-সাধন নহে। তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানলাভ ও তাহা প্রকাশের দিকে উন্মুক্ত মনের ক্রিয়াধারার, আমাদের আবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় ক্রিয়াধারার, আমাদের বহির্ম্মুখী আচরণ, সৃষ্টি ও উৎপাদনের ক্রিয়াধারার, মানুষ বস্তু জীবন জগৎ ও প্রকৃতির শক্তির উপর প্রভুত্বস্থাপনে ব্যাপৃত আমাদের সংকল্পের ক্রিয়াধারার অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান যাবতীয় ক্রিয়াধারার পরিণাম কি হইবে? এ সমস্ত কি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাহার স্থানে অন্য কোন নবীনতর জীবনধারা কি লইয়া আসিতে হইবে, যাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন চেতনা তাহার যথার্থ রূপ ও যথার্থ অভি-ব্যক্তির সন্ধান পাইবে? অন্তরস্থিত চিৎসত্তার দ্বারা তাহাদের রূপান্তর সাধন করিয়া ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদের বর্ত্তমান বাহ্যরূপকে কি বজায় রাখিতে হইবে অথবা চেতনার বিপরীতমুখী এক পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিয়া নূতন রূপরাজির মধ্যে কি ইহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে—যেমন পৃথিবীতে এক দিন দেখা গিয়াছিল যখন মানুষ আসিয়া পশুর প্রাণময় কর্ম্মধারারাজি গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যুক্তিবিচার, ভাবনাশীল সংকল্প, পরিমার্জিত ভাবাবেগ, সুগঠিত এক বুদ্ধি সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে মন-বিভাবিত প্রসারিত ও রূপান্তরিত করিয়াছিল? অথবা এ সমস্ত ক্রিয়াধারার কতকাংশ ত্যাগ করিয়া যাহা আধ্যাত্মিক রূপান্তর গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা-দিগকে শুধু রক্ষা করিয়া, বাকি সমস্তের মধ্যে এমন এক নবজীবন কি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহা যেমন তাহার রূপে তেমনি তাহার আন্তর প্রেরণায় ও প্রযোজক শক্তিতেও মুক্ত পুরুষের একত্ব উদারতা শান্তি আনন্দ ও সামঞ্জস্যের অভিব্যক্তি ঘটাইতে সক্ষম হইবে? মানুষের পক্ষে ভগবানে পৌঁছিবার সুদীর্ঘ যোগ-অভিযানের পথ যাহারা খুঁজিয়াছেন, এই সমস্যাই তাঁহাদের মনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যাপৃত রাখিয়াছে।

এই সমস্যা নানাপ্রকারে সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহার একদিকে আছে যতদূর পারা যায় জীবন ও কর্ম্মকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করা আর অন্য দিকে যে ভাবে আছে সেইভাবেই জীবনকে গ্রহণ করা কিন্তু সেই সঙ্গে এক

নূতন আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তাহাকে উজ্জীবিত ও তাহার সকল বৃত্তিকে উর্দ্ধা-য়িত করিয়া তোলা, যাহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে তাহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই রহিয়া যাইবে কিন্তু ভিতরে তাহাদের প্রকৃতিতে এবং সুতরাং আন্তর তাৎপর্য্যে তাহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর অথবা অন্তরাবৃত্ত রসোন্মত্ত আপনভোলা ধ্যানরসিক সাধকগণের দেওয়া চরম সমাধান স্পষ্টত: পূর্ণযোগের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ; কেননা এই জগতের মধ্যেই যদি ভগবানকে উপলব্ধি করিতে বা পাইতে হয় তাহা হইলে জাগতিক কর্ম্ম বা কর্ম্মমাত্রকে একেবারে পরিহার করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে না। তদপেক্ষা একটু নিম্নস্বরে প্রাচীন কালের ধার্ম্মিকমনের দেওয়া বিধান এই যে সাধক কেবল সেই সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারে যাহা তাহাদের প্রকৃতিতে ভগবানের এষণার বা তাহার সেবা ও পূজার অঙ্গ কিম্বা তাহার আনুষঙ্গিক, তাহা ছাড়া সাধারণ-ভাবে জীবনযাত্রার জন্য যতটুকু অপরিহার্য্য ততটুকু মাত্র কর্ম্ম করিবার অধিকার সে বিধানে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাও অন্তরে ধর্ম্মভাব লইয়া ঐতিহ্যগত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে করিতে হইবে। কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে মুক্ত আত্মার পরম চরিতার্থতা এই রূপ অত্যন্ত অনুষ্ঠানপয়ারণ বিধানের দ্বারা হইতে পারে না ; তাহা ছাড়া একমাত্র যে পারত্রিক জীবন তখনও এ বিধানের চরমলক্ষ্যে রহিয়াছে এই জাগতিক জীবন হইতে সেই জীবনে উঠিবার পথের সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত একটা সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ণযোগ বরং গীতার এই উদার নির্দ্দেশের দিকে অধিক পরিমাণে ঝুঁকিয়া পড়িবে যে সত্যের মধ্যে বাস করিয়া মুক্ত আত্মাও সকল কর্ম্মই এমনভাবে করিয়া যাইবেন যাহাতে গোপন দিব্যশক্তি পরিচালিত জাগতিক বিকাশ ধারার পরিকল্পনা ব্যাহত ও খর্ব্ব না হয়। কিন্তু যদি সকল কর্ম্মই বর্ত্তমানে অবিদ্যার মধ্যে যেরূপ চলিতেছে সেই একই রূপে একই ধারায় সাধিত হইতে থাকে, তবে আমাদের লাভ হইবে শুধু অন্তরের দিকে এবং আমাদের বাহ্য জীবনে এমন এক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিবে যাহাতে তাহা অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে আন্তর জ্যোতিকে আমাদের বাহ্য প্রকৃতির ক্ষীণ প্রদোষালোকে কর্ম্ম করিতে হইবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিৎপুরুষকে তাহার নিজস্ব প্রকৃতির পক্ষে যাহা বিসদৃশ এমন এক অপূর্ণ আধারের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে। যদি কিছু কাল এত-দপেক্ষা সুন্দর কিছু করা না যায়—এবং পর্ব্বান্তর সংক্রমণের সময় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ঘটা অবশ্যম্ভাবী—তাহা হইলে এই অবস্থাকে চলিতে দিতে হইবে যতদিন না প্রস্তুতি শেষ হইতেছে এবং অন্তরস্থ পুরুষ দেহের ও বাহ্য

জগতের জীবনের উপর নিজ রূপের ছাপ ফেলিবার মত উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় না করিতেছে; কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তনকালীন ব্যবস্থার একটা সোপান মাত্র রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাকে আমাদের অন্তরাত্মার আদর্শ বা আমাদের পথের চরম লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া চলিবে না।

সেই একই কারণে নীতি দ্বারা দেওয়া সমাধান পূর্ণ হইতে পারে না; কেননা নীতির বিধান প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত অশ্বগুলির মুখে কাঁটা-লাগাম পরায় মাত্র এবং বহুকষ্টে কেবল আংশিক ভাবে তাহাদিগকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এরূপ-ভাবে রূপান্তর সাধন করিবার শক্তি তাহার নাই যাহাতে প্রকৃতি দিব্য আত্মজ্ঞান হইতে জাত বোধির প্রেরণা সিদ্ধ ও চরিতার্থ করিয়া স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে চলিতে পারে। নীতি বড় জোর একটা সীমা নির্দ্দেশ করিতে, শয়তানকে দমিত করিয়া রাখিতে এবং আমাদের চারিদিকে যেমন তেমন গোছের এক দেওয়াল গড়িয়া তুলিতে পারে যাহাকে কোনক্রমেই নিরাপদ বলা চলেনা। সাধারণ জীবনে অথবা যোগের পথে আত্মরক্ষার জন্য এই বা এই ভাবের একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কিছু কালের জন্য আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু যোগমার্গে ইহা হইবে শুধু পরিবর্ত্তন কালের এক নিদর্শন মাত্র। এক আমূল রূপান্তর সাধন এবং শুদ্ধ ও উদার এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য, আর যদি সে লক্ষ্যে পৌঁছিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে এক গভীর-তর সমাধান, অতিনৈতিক সক্রিয় ও ধ্রুবতর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে। অন্তরে আধ্যাত্মিক এবং বহির্জীবনে নৈতিক হওয়া—ইহাই সাধারণ ধর্ম্মের সমাধান কিন্তু তাহা একটা গোঁজামিল মাত্র; আমরা চাই আন্তর সত্তা ও বহি-র্জীবন এ উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা, বহির্জীবন ও চিৎসত্তার মধ্যে এক আপোষ রফা আমাদের লক্ষ্য নহে। মানুষ তাহাদের যথার্থ মূল্যের সম্বন্ধে গোলমাল করিয়া আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পার্থক্য মুছিয়া ফেলে এবং এমন কি নীতিবোধই আমাদের প্রকৃতির যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাদান ইহা দাবি করে, কিন্তু এ ব্যবস্থাও আমাদের সাধনায় কোন কাজে লাগে না; কেননা নীতি একটা মানসিক সংযম মাত্র এবং সীমিত ভ্রমশীল মন মুক্ত ও চিরদীপ্ত অন্তরাত্মা নয় এবং হইতে পারে না। তেমনই সেই সিদ্ধান্তকে মানিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব যাহা প্রাণকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, প্রাণের উপাদানসমূহ বর্ত্তমানে মূলতঃ যাহা আছে তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা-দিগকে বিভূষিত ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য এক অর্দ্ধ বা কৃত্রিম আধ্যা-ত্মিকতাকে শুধু আবাহন করে। তাহা ছাড়া সে ব্যবস্থাও অপ্রচুর সুতরাং আমাদের গ্রহণের অযোগ্য যাহাতে প্রাণ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা বিসদৃশ

সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা অনেক সময় করা হয়—যাহাতে ভিতরে এক নিগূঢ় মরমীয়া অনুভূতির সঙ্গে বাহিরে থাকে রসাস্বাদলিপ্সু বুদ্ধিভাবিত ইন্দ্রিয়সুখানু-রাগী এক প্রকৃতি-উপাসনা অথবা উন্নত ধরণের এক ভোগসুখবাদ, যাহা সেই অনুভূতির দিকে ঝুঁকিয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিক সমর্থনের আভায় নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করে; কেননা এ ব্যবস্থাও অনিশ্চিত ও নিষ্ফল একটা গোঁজামিল এবং ইহা দিব্য সত্য ও তাহার পূর্ণাঙ্গতা হইতে ততদূরে অবস্থিত যতদূরে অবস্থিত ইহার বিপরীত কঠোর নৈতিকতাবাদ। যে ভ্রমশীল মানব-মন উচচ আধ্যাত্মিক শিখরের সহিত নিম্নস্থিত সাধারণ মন ও প্রাণ যাহা চায় তাহার যোগসাধন করিবার সূত্র অন্ধের মত ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়ায়, এ সমস্ত তাহারই বিভ্রান্ত সমাধান। ইহাদের পশ্চাতে যেটুকু আংশিক সত্য গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে তাহা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হইবে যখন তাহা অধ্যাত্মক্ষেত্রে উন্নীত, পরম সত্য চেতনা দ্বারা পরীক্ষিত এবং অজ্ঞানের ক্ষেত্র ও ভ্রম হইতে মুক্ত করা হইবে।

মোট কথা এই যে ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে ততদিন সাময়িক ভাবে ছাড়া কোন স্থায়ী বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান হইতে পারেনা, যতদিন আমরা অতিমানস সত্য-চেতনায় পৌঁছিতে না পারিতেছি, যেখানে বস্তুর বাহ্যরূপের যথাযথ মূল্যাঙ্কন ও তাহার সার সত্য প্রকট হয় এবং সেই সত্যের মধ্যে মূলগত আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে যাহা উদ্ভূত হয় তাহাও প্রকাশিত হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে আমাদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায় হইবে আধ্যাত্মিক অনুভূতিব পরিচালনসমর্থ একটি বিধান খুঁজিয়া বাহির করা, নতুবা অন্তরে এমন এক আলোক মুক্ত করা যাহা আমাদিগকে আপাততঃ পথ দেখাইয়া লইয়া চলিবে যতদিন ঊর্দ্ধ্বস্থিত সেই বৃহত্তর ঋতচিৎকে অপরোক্ষভাবে প্রাপ্ত হইতে না পারি অথবা যতদিন পর্য্যন্ত তাহা আমাদের মধ্যে সঞ্জাত না হয়। কারণ আমাদের মধ্যে বাকি যাহা কিছু শুধু বাহ্য, যাহা কিছু আধ্যাত্মিক বোধ বা দর্শন নহে, অর্থাৎ যাহা কিছু বুদ্ধির পরিকল্পনা প্রতিরূপ বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত, প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা বা প্ররোচনা, জড় বস্তুর দুর্ব্বার প্রয়োজনীয়তা—তাহারা সকলেই কখনও বা অর্দ্ধ আলোক, কখনও বা মিথ্যা আলোক, যাহা বড় জোর কিছু কাল পর্য্যন্ত অথবা আংশিকভাবে আমাদের কাজে লাগে কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদিগকে আটক করিয়া রাখে অথবা হতবুদ্ধি করিয়া দেয়। মানবচেতনাকে দিব্য-চেতনার দিকে খুলিয়া ধরিবার ফলেই শুধু আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচালনার বিধান আমরা লাভ করিতে পারি; এজন্য দিব্যশক্তির ক্রিয়াধারা, অনুজ্ঞা এবং সক্রিয় সদ্‌ভাবনা বা সান্নিধ্যবোধ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকা

এবং তাহার শাসন ও নিয়ন্ত্রণের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া চাই ; আমাদের এই সমর্পণ ও দিব্যশক্তির এই অনুশাসন এই যুগ্মক্রিয়ার ফলেই আমরা পাইব আমাদের সাধনার সুষ্ঠু পরিচালনা। কিন্তু যতদিন আমরা মনের কল্পনা-জল্পনা, প্রাণের আবেগ এবং অহমিকার প্ররোচনাদ্বারা অবরুদ্ধ থাকি—যাহারা সহজেই আমাদিগকে মিথ্যা অনুভূতির হাতে ধরাইয়া দিতে পারে—ততদিন আমাদের আত্মসমর্পণ হয় অনিশ্চিত এবং দিব্য পরিচালনারও স্থির নিশ্চয়তা থাকে না। যিনি সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয়ভাবে আমাদের সত্তার মধ্যে অবস্থিত আছেন সেই বর্ত্তমানে চৌদ্দ আনা প্রচ্ছন্ন আমাদের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষকে যদি জাগাইয়া তুলিতে পারি তবেই শুধু এই বিপদের হাত হইতে আমরা বাঁচিতে পারি। এই অন্তরের জ্যোতিকে আমাদের মধ্যে মুক্ত করিতে হইবে ; কেননা যতদিন আমরা অবিদ্যার অবরোধের মধ্যে বিচরণ করিতেছি এবং ক্বচিৎ আমাদের ভগবদভিমুখী সমস্ত সাধনাব নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন এই অন্তরতম আত্মাই আমাদের একমাত্র নিশ্চিত আলোকের উৎস। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে সংক্রমণের সময় এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিকতা ও অতিমানস প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিতেছে ততদিন যে দুই শক্তি মিলিয়া আমাদের ক্রিয়ার এক সদা বর্ত্তমান আন্তর বিধান সৃষ্টি করিবে, তাহারা হইতেছে আমাদের মধ্যস্থিত দিব্য শক্তির ক্রিয়াধারা এবং চৈত্য সত্তার আলোক, যাহা আমাদিগকে অবিদ্যাশক্তির দাবী ও প্ররোচনা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে এবং সচেতনভাবে ও সজ্ঞানে সেই উচ্চতর প্রেরণার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত করিতেছে। এই অবস্থান্তরে এমন একটা সময় স্বচ্ছন্দে আসিতে পারে যখন শুদ্ধি ও রূপান্তরের জন্য এবং তাহাদের মধ্যস্থিত সত্যকে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের সকল জীবন ও ক্রিয়াকে গ্রহণ করিয়া ভগবৎ-চরণে সমর্পণ করিতে পাবিব ; আর একটা সময় দেখা দিতে পারে যখন আমরা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিজের চারিদিকে একটা আধ্যাত্মিক দেওয়াল গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব যাহার দ্বারপথে শুধু সেই সমস্ত কর্ম্মকে প্রবেশ করিতে দিব যাহারা দিব্য রূপান্তরের বিধান স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইবে ; তৃতীয় আর একটা সময়ও উপস্থিত হইতে পারে যখন আমাদের মধ্যে চিৎপুরুষের পূর্ণ সত্য প্রকাশোপযোগী নূতন রূপ ধারণ করিয়া একটা মুক্ত ও সর্ব্বাবগাহী কর্ম্মধারা প্রকাশ সম্ভব হইবে। এ সমস্ত কোন মনোময় বিধান দ্বারা স্থির হইবে না, স্থির হইবে আমাদের মধ্যস্থিত অন্তরাত্মার আলোকে দিব্যশক্তির নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান শাসন ও পরিচালনা দ্বারা যে শক্তি গোপনে বা

প্রকাশ্যে আমাদের যোগে প্রথম প্ররোচনা দেয়, তারপর স্পষ্টতঃ তাহাকে অনুশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং অবশেষে তাহার সকল ভার নিজ হাতে তুলিয়া নেয়।

যজ্ঞের ত্রয়ী প্রকৃতি অনুসারে আমরা কর্ম্মকেও তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি : জ্ঞানের কর্ম্ম, প্রেমের কর্ম্ম, এবং জীবনে সংকল্প-শক্তির কর্ম্ম; তারপর দেখিতে পারি এই অধিকতর সাবলীল আধ্যাত্মিক বিধান ইহাদের প্রত্যেক বিভাগে কিরূপে বা কতটা প্রযোজ্য এবং নিমৃতর হইতে উচ্চতর প্রকৃতিতে উত্তরণের পথে ইহার ফল কি।

যোগের দিক হইতে দেখিলে মানব-মনের জ্ঞানানুশীলন ক্রিয়াধারাকে স্বাভাবিক রূপে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। প্রথমটি বুদ্ধির অতীত পরমজ্ঞান, যাহা অনন্ত এক অদ্বয় তত্ত্বের বিশ্বাতীত বিভাবের আবিষ্কারে অভিনিবিষ্ট হয় অথবা বোধিজ্ঞান ধ্যান ও অন্তরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শের দ্বারা প্রকৃতির নাম-রূপের পশ্চাতে অবস্থিত চরম সত্য সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চেষ্টা করে; দ্বিতীয়টি, নিমৃতর প্রাকৃত বিজ্ঞান যাহা নিজেকে ছড়াইয়া দেয় সেই প্রতিভাস বা পার্থিব ঘটনাসমূহের বাহ্য জ্ঞানের মধ্যে, আমাদের নিকট যাহা প্রতিভাত হয় চারিদিকে অবস্থিত বিশ্ব-বিসৃষ্টির অধিকতর বাহ্যরূপের মধ্য দিয়া পরম এক ও অনন্তের অশেষ ছদ্মবেশে। জ্ঞানানুশীলনে এই যে দুই বিভাব, পরার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধ, অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের সীমার মধ্যে মানুষ যে ভাবে তাহাদিগকে গঠন করিয়াছে অথবা যে রূপে তাহাদের ধারণা করিয়াছে, তাহাতে তাহারা ক্রমবিকাশের পথে কতকটা তীক্ষ্ণভাবে পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।...দর্শন শাস্ত্র কখনও আধ্যাত্মিকতা অন্ততঃপক্ষে বোধি দ্বারা দীপ্ত, কখনও বা বস্তুনিরপেক্ষভাবে বুদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, আবার কখনও তাহা আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে বুদ্ধি বিভাবিত অথবা চিদাত্মার সম্বন্ধে আবিষ্কারসমূহকে যুক্তিবিচারের সাহায্যে সমর্থিত করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই তাহা দাবি করিয়া আসিয়াছে যে চরম সত্য নির্দ্ধারণ তাহারই নির্দ্দিষ্ট কাজ। কিন্তু বুদ্ধিগত দর্শন বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য যখন ব্যবহারিক জগৎ এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তুরাজির অনুসরণের মধ্যে যে জ্ঞান আছে তাহা হইতে

নিজেকে পৃথক করিয়া লইয়া গিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে নিজেকে নিবদ্ধ করে নাই তখনও জীবনের ক্ষেত্রে কদাচ তাহা শক্তিশালী হইতে সমর্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতের কোন উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য সম্মুখে না রাখিয়া মনোময় সত্যের জন্যই তাহাকে অনুসরণ করিয়া উচ্চ গবেষণার জন্য, আবার কখনও বা শব্দ ও ভাবের মেঘরাজ্যের কুহেলী-ঘন আলোকের মধ্যে অবস্থিত হইয়া মনের সূক্ষ্ম ব্যায়াম বা কসরতের জন্য ইহা প্রবল শক্তিশালী হইয়াছে, কিন্তু জীবনের অধিকতর বাস্তব সত্য সকল হইতে বহুদূরে চলিয়াছে তাহার এই অগ্রাভিযান ও ব্যায়ামপ্রক্রিয়া। ইউরোপের প্রাচীন দর্শন পরবর্ত্তী যুগের দর্শন অপেক্ষা অধিক সক্রিয় ছিল বটে কিন্তু অল্প কয়েক জনের জন্য মাত্র ; ভারতে ইহার অধিকতর আধ্যাত্মিকরূপ জাতীয় জীবনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু জাতিকে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হয় নাই।... দর্শন শাস্ত্রের মত ধর্ম্ম শুধু উচ্চচূড়ায় বাস করিতে চেষ্টা করে নাই ; মানুষের মনোময় অংশগুলির অপেক্ষা বরং তাহার প্রাণময় অংশরাজিকে অধিকতর রূপে অধিকার করা এবং তাহাদিগকে ভগবানের দিকে ফিরাইয়া আনা ইহার উদ্দেশ্য ছিল ; আধ্যাত্মিক সত্য এবং প্রাণময় জড় জীবনের মধ্যে ইহা এক সেতু নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিল ; অধস্তনকে উর্দ্ধতনের অধীন এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে, জীবনকে ভগবানের সেবায় লাগাইতে, পৃথিবীকে স্বর্গের অনুগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই প্রয়োজনীয় চেষ্টার ফল অনেক সময় বিপরীত হইয়াছে, স্বর্গকে দিয়া পার্থিব ভোগ বাসনার অনুমোদন করানো হইয়াছে ; কেননা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের ভাব বা ধারণা:ক মানুষ তাহার অহংএর পূজা ও সেবার অজুহাত করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্ম বার বার তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র মর্ম্মস্থান ছাড়িয়া নিজের সহিত বাস্তব জীবনের সদা বিস্তারশীল স্বার্থ-বোধক আপোষরফার অন্ধকাররাশির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে ; বিচারশীল মনকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনেক সময় ইহা ধর্ম্মবিজ্ঞানের গোঁড়া মতবাদ দ্বারা নিজেই নিজেকে প্রপীড়িত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে, আর সে প্রয়াসের ফলে ইহা নিজেই ভক্তিমূলক ভাবালুতা ও উদ্বেলিত রোমাঞ্চকর উচ্ছ্বাসের গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছে, নিজের প্রভুত্ববিস্তারের জন্য মানুষের প্রাণপ্রকৃতিকে অধিকার করিতে গিয়া ইহা নিজেই কলুষিত ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে ; ধর্ম্মান্ধতা, রক্তপিপাসু হিংস্রতা, কঠোর বা বর্ব্বর অত্যাচার-প্রবৃত্তি, উপচীয়মান মিথ্যাচার, অবিদ্যার প্রতি দুরপনেয় আসক্তি প্রভৃতি যাহা কিছুর দিকে প্রাণ-প্রকৃতির প্রবল প্রবণতা আছে তাহাদের কবলে

পড়িয়াছে ; ইহাতে মানুষের মধ্যস্থ স্থূল অন্নময় সত্তাকে ভগবদভিমুখী করিবার যে বাসনা আছে তাহাই ইহাকে ধর্ম্মযাজকগণের যান্ত্রিকতা, অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠান ও প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা প্রাণশক্তির সেই বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বাপকৃষ্টে পরিণত হইয়াছে, যে ক্রিয়া ভাল হইতে মন্দ আবার মন্দ হইতে ভাল জন্মাইতে পরে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্নদিকের এই আকর্ষণ ও গতি হইতে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতে গিয়া ধর্ম্ম মানবজীবনকে জ্ঞান কর্ম্ম শিল্পকলা জীবনব্যাপাররূপে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক, ধার্ম্মিক ও পার্থিব, অশুদ্ধ ও শুদ্ধ এইরূপ দুই বিরোধী বিভাবে দ্বিখণ্ডিত করিতে বাধ্য হইয়াছে ; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কৃত এই বিভেদ কৃত্রিম ও আচরণগত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা ব্যাধি আরোগ্য না করিয়া বরং বাড়াইয়া তুলিয়াছে।...পক্ষান্তরে প্রাকৃত বিজ্ঞান, ললিতকলা এবং জীবনের জ্ঞান যদিও প্রথমে ধর্ম্মকে সেবা করিত অথবা তাহার ছায়ায় বাস করিত তবু অবশেষে নিজদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত কবিয়া ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন বা তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কি তাত্ত্বিক দর্শন ও ধর্ম্মের আদর্শকে সুদূর, নীরস ও নিষ্ফল মনে করিয়া অথবা তাহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য ও ভ্রমপূর্ণ অবাস্তবতার এক উচচ অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিযা উদাসীনতা ঘৃণা বা অবিশ্বাসের সহিত তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুকালের জন্য তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ মানব-মনে একদেশদর্শী অসহিষ্ণুতা যতটা ঘটাইতে পারে ততটা পূর্ণ করিয়াছে ; এমন কি ভয় হইতেছে যে উচচতর অথবা অধিকতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের চেষ্টার বুঝি সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল। তথাপি পার্থিব বৈষয়িক জীবনের পক্ষেও উচচতর জ্ঞান সর্ব্বদাই এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু ; এবং সে জ্ঞান না থাকিলে, নিম্নতর বিজ্ঞানরাজি ও তাহাদের অনুশীলন যতই ফলপ্রসূ, যতই সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র হউক না কেন, যতই অপরূপ ভাবে তাহাদের ফলের প্রাচুর্য্য দেখা দিক না কেন তাহা মিথ্যাদেবদেবীর বেদীমূলে অবিধিপূর্ব্বক এক পূজা ও উৎসর্গ হইয়া দাঁড়ায় ; অবশেষে মানুষের হৃদয়কে কলুষিত ও কঠিন এবং তাহার মানসিক পরিমণ্ডলকে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করিয়া তাহারা তাহাকে জড়ের পাষাণকারাগারে আবদ্ধ করে অথবা তাহাকে এক চরম অনিশ্চয়তা ও আশাভঙ্গের মধ্যে লইয়া যায়। যাহা এখনও অজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয় সেই অর্দ্ধজ্ঞানের উজ্জ্বল অনুপ্রভার (phosphorescence) ঊর্দ্ধে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে এক ব্যর্থ নিষ্ফল অজ্ঞেয়বাদ।

যে যোগ পরাৎপরের সর্ব্বাঙ্গীণ উপলব্ধিকে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে সে

বিশ্বগত পুরুষের কর্ম্মকে এমন কি তাহার স্বপ্নকে—যদিও বা তাহা স্বপ্নই হয় —ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে না বা সে সঙ্কোচবশে পিছাইয়া পড়িবে না সেই বিরাট কর্ম্ম ও বহুমুখী বিজয় গৌরব হইতে যাহা তিনি নিজের কাছে মানবরূপী প্রাণীর জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এই উদারতার প্রথম সর্ত্তই হইবে এই যে জগতেও আমাদের কর্ম্ম হইবে সেই মহাযজ্ঞের অংশ, সম্যক্ মনোভাব ও সম্যক্ জ্ঞানের সঙ্গে যাহা সর্ব্বোত্তমের নিকট উৎসৃষ্ট হইয়াছে, অপর কাহারও নিকটে নয়; উৎসৃষ্ট হইয়াছে সেই দিব্যশক্তির নিকট অপর কোন শক্তির নিকট নয়, আর তাহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে মুক্ত স্বাধীন আত্মার দ্বারা, জড়প্রকৃতির মোহমুগ্ধ দাসের দ্বারা নয়। কর্ম্মের মধ্যে কোন বিভাগ যদি করিতেই হয় তবে তাহা হইবে যে-সমস্ত কর্ম্ম পবিত্র হোমাগ্নির হৃৎকেন্দ্রের অতি নিকটে অবস্থিত এবং যে-সমস্ত কর্ম্ম অধিকতর দূরবর্ত্তী বলিয়া সে অগ্নির অতি অল্প সংস্পর্শে আসিয়াছে অথবা তাহার দ্বারা স্বল্প পরিমাণে আলোকিত হইয়াছে, এই উভয়-বিধ কর্ম্মের মধ্যে; অথবা বিভাগ করা হইবে যে সমিধ্ অগ্নিতে প্রবল ও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে আর সেই সমস্ত কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে যাহাদিগকে যদি বেদীর উপর স্তূপীকৃতভাবে রাখা হয় তবে তাহাদের আর্দ্রতা, গুরুভার এবং পরিব্যাপ্ত প্রাচুর্য্যের দ্বারা অগ্নির উদ্দীপনা ব্যাহত করিতে পারে। কিন্তু এই প্রভেদের কথা ছাড়িয়া দিলে যাহা সত্যকে খোঁজে বা প্রকাশ করে জ্ঞানের সেইরূপ সকল কর্ম্মই পরিপূর্ণভাবে যজ্ঞ বা নিবেদনের উপযুক্ত উপাদান; দিব্যজীবনের বিশাল কাঠামো হইতে তাহাদের কোনটাই বাদ দেওয়ার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই। যে সকল মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান বস্তুর রূপ বিধান ও ক্রিয়াধারার সম্বন্ধে আলোচনা করে, যে সমস্ত বিদ্যা মানুষ বা পশুর জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করে, মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ভাষা ও ইতিহাস লইয়া বিচার করে, যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা সেই সকল প্রচেষ্টা ও ক্রিয়াধারা রাজিকে জানিতে ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মানুষ তাহার জগৎ ও পরিবেশের উপর প্রভুত্বস্থাপন ও তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, যে নানাপ্রকার মহান ও সুকুমার ললিত কলা একাধারে কর্ম্ম ও জ্ঞান এ উভয়েরই সমুচ্চয়—কেননা সুরচিত বা সুগঠিত ও সার্থক প্রত্যেক কবিতা চিত্র মূর্ত্তি বা অট্টালিকা স্জনী প্রতিভারই এক কাজ, চেতনার জীবন্ত এক আবিষ্কার, সত্যের এক মূর্ত্তি, মানুষের মন প্রাণের অথবা বিশ্বপ্রকৃতির আত্মপ্রকাশের সক্রিয় এক রূপ—অর্থাৎ যাহা কিছু সন্ধান করে, যাহা কিছু সন্ধান পায়, যাহা কিছু রূপ বা ধ্বনির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে সে-সমস্তই এক অনন্ত শাশ্বতবস্তুর লীলার কিয়দংশের অভিব্যক্তি, তাহা-দিগকে সেই পরিমাণে ঈশ্বরোপলব্ধি বা দিব্য রূপায়ণের সাধন করিয়া তোলা

যাইতে পারে। কিন্তু যোগীকে দেখিতে হইবে যে অবিদ্যাচ্ছন্ন মনোময় জীবনের অংশরূপে আর যেন ইহা কৃত না হয়; সে ইহাদের স্বীকার করিয়া লইতে পারে কেবল যদি ইহার অন্তরস্থ অনুভূতি স্মৃতি ও উৎসর্গের সাহায্যে ইহাকে আধ্যাত্মিক চেতনার এক গতিতে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়, যদি সেই চেতনার বিরাট সর্ব্বাবগাহী দীপ্ত জ্ঞানের এক অংশরূপে পরিণত হয়।

কেননা সকল কর্ম্মই যজ্ঞরূপে বা উৎসর্গহিসাবে করিতে হইবে, অদ্বয় ভগবানই হইবেন তাহাদের উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য। জ্ঞানলাভের জন্য আলোচিত বিজ্ঞানরাজির চর্চ্চায় যোগীর উদ্দেশ্য হইবে মানুষ ইতরপ্রাণী বস্তু ও শক্তির মধ্যে দিব্য চিৎশক্তির ক্রিয়াধারাগুলিকে তাঁহার নানা সৃষ্টিশীল তাৎপর্য্যকে তাঁহার গূঢ় রহস্যরাজির বাস্তবরূপে অভিব্যক্তিকে এবং যে সমস্ত প্রতীকের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রকাশ ঘটে তাহাদিগকে আবিষ্কার করা ও বোঝা। বিজ্ঞানগুলির ব্যবহারিক দিকে—সে-বিজ্ঞান ভৌতিক এবং মানসিক অথবা অলৌকিক রহস্যময় ও চৈত্য যাহাই হউক না কেন, যোগীর লক্ষ্য হইবে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের কর্ম্মধারা ও পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করা, আমাদিগকে যে কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহার উপায় ও উপাদান জানা, যাহাতে আমরা সেই দিব্যপুরুষের ঈশিত্ব আনন্দ ও আত্মচরিতার্থতাকে সচেতন ও নির্দ্দোষভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে পারি। ললিত কলার মধ্যে যোগার উদ্দেশ্য হইবে না কেবল সৌন্দর্য্যের উপভোগ, মন বা প্রাণের পরিতৃপ্তি, উদ্দেশ্য হইবে ভগবানকে সর্ব্বত্র দেখিয়া তাঁহার সকল কর্ম্মের তাৎপর্য্যের দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে পূজা করা, দেবতা মানুষ প্রাণী ও বস্তুসকলের মধ্যে সেই অদ্বয় ভগবানকে অভিব্যক্ত করা। যে মতবাদ ধর্ম্মের অভীপ্সা এবং যথার্থতম ও উচ্চতম শিল্পকলার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ দেখিতে পায় তাহা মূলতঃ সত্য; কিন্তু এখানে বিমিশ্র ও অনিশ্চিত ধর্ম্মভাবের প্রযোজনার স্থলে আমাদিগকে এক আধ্যাত্মিক আস্পৃহা দিব্যদৃষ্টি এবং মর্ম্মপ্রকাশক অনুভূতিকে বসাইতে হইবে। কেননা এই দৃষ্টি যতবেশী ব্যাপক ও উদার হইবে, তাহার মধ্যে মানব ও সর্ব্ববস্তুর অন্তরস্থ নিগূঢ় ভগবানের বোধ যত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে যতই তাহা বাহ্য ধর্ম্মভাব হইতে অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে উন্নীত হইয়া উঠিবে, সেই উচ্চতর প্রেরণা হইতে জাত ললিতকলা তত অধিক পরিমাণে প্রদীপ্ত ও নমনীয়, গভীর ও শক্তিমান হইবে। অন্য মানুষের সঙ্গে যোগার প্রভেদ এই যে তিনি এক উচ্চতর ও বৃহত্তর আধ্যাত্মিক চেতনায় বাস করেন; তথা হইতেই উঠিবে তাঁহার জ্ঞানের বা সৃজনের সকল কর্ম্ম,

মানুষী-মন হইতে নয়—কেননা যোগীকে মনোময় মানুষের দেখা সত্য ও দৃষ্টি হইতে এক বৃহত্তর সত্য ও দৃষ্টি প্রকাশ করিতে হইবে, বরং বলা যাইতে পারে যে সেই বৃহত্তর সত্য ও দৃষ্টি তাহার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে এবং তাহার কর্ম্মকে যথার্থভাবে গড়িয়া তুলিবে—যে কর্ম্মের লক্ষ্য সাধকের ব্যক্তিগত তৃপ্তি নয় কিন্তু ভগবদুদ্দেশ্যসাধন।

সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে যিনি পরমপুরুষকে জানেন সেই যোগীর এই সমস্ত কর্ম্ম করিবার কোন প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতা নাই ; কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে কর্ম্ম তাঁহার অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে না, ইহা তাঁহার মনের অনিবার্য্য উপজীব্য বা উচ্চধরণের প্রমোদবিলাস নহে, মানুষের উত্তুঙ্গ উদ্দেশ্য দ্বারা তাহার উপরে আরোপিত কিছুও নহে। তিনি কোন কর্ম্মে আসক্ত কোন কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ বা সীমিত নহেন, অথবা এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা তিনি ব্যক্তিগত মহত্ব ও যশ অথবা ব্যক্তিগত পরিতুষ্টির আকাঙ্ক্ষী নহেন ; তাঁহার অন্তরস্থিত ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তিনি কর্ম্ম করিতে পারেন অথবা কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতেও পারেন ; পক্ষান্তরে উচ্চতর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সাধনায় তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজনও নাই। পরাশক্তি যেভাবে কর্ম্ম ও সৃষ্টি করেন যোগী ঠিক সেইভাবে এই সমস্ত করিবেন অর্থাৎ তিনি কর্ম্ম করিবেন সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশের একপ্রকার এক আধ্যাত্মিক আনন্দের জন্য অথবা ভগবৎ-কর্ম্মের এই জগতে লোকসংগ্রহ ও ধর্ম্মসংস্থাপন এবং তাহার প্রগতির পথে পরি-চালনার সাহায্যের জন্য। গীতার শিক্ষা এই যে জ্ঞানীব্যক্তি তাঁহার আচরণের দ্বারা যাহাদের মধ্যে এখনও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগে নাই তাহাদিগকে সকল কর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি রক্ষা এবং তাহা অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিবেন,—যে সমস্ত কর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতিগতভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান বা তপশ্চর্য্যামূলক শুধু তাহাদের প্রতি নহে পরন্তু সর্ব্বকর্ম্মের প্রতি ; তিনি তাঁহার উদাহরণ দ্বারা মনুষ্যগণকে জাগতিক কর্ম্মত্যাগের দিকে আকৃষ্ট করিবেন না। কেননা ঊর্দ্ধমুখী প্রবল অভীপ্সা লইয়াই জগৎকে অগ্রসর হইতে হইবে ; মানুষকে ও জাতিকে অবিদ্যাচ্ছন্ন ক্রিয়াধারা হইতেও নৈষ্কর্ম্ম্যের অপকৃষ্টতর অজ্ঞানের মধ্যে টানিয়া লওয়া উচিত হইবে না অথবা জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তামসিকতার তত্ব প্রাধান্য লাভ করিলে—অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রম অথবা অবসাদ ও জড়ত্ব যে রূপেই সে প্রাধান্য দেখা দিক না কেন—যে শোচনীয় ক্ষয় বা ধ্বংসের দিকে প্রবণতা অপরিহার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে তাহার মধ্যে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেওয়া চলিবে না। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন ''আমার করণীয় কিছু নাই, কেননা আমার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি নিরলস-

ভাবে কর্ম্ম করি, আমি যদি কর্ম্ম না করিতাম তাহা হইলে সকল বিধিবিধান বিশৃঙ্খলায় পরিণত হইত, জগৎসকল উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং আমিই এই প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইয়া পড়িতাম।" এমন কোন কথা নাই যে আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তাহার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনির্ব্বচনীয় পরমতত্ত্ব ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কোন আগ্রহ ও অনুরাগ রাখা চলিবে না অথবা বিজ্ঞান শিক্ষা ও জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেই হইবে। পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কর্ম্মের এরূপ একটা পরিণাম নিশ্চয়ই হইতে পারে যে তাহা আমাদের শিল্পবিজ্ঞান ও প্রাণকে তাহাদের সীমা ছাড়াইয়া উর্দ্ধে তুলিবে, মন তাহাদের অনুশীলনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন পরিচ্ছিন্ন কবোষ্ণ বা উদ্বেগচঞ্চল যে সুখটুকু পায় তাহার স্থানে মুক্ত তীব্র উন্নয়নকারী আনন্দের এক প্রণোদনা আনয়ন করিবে এবং সৃষ্টিশীল আধ্যাত্মিক শক্তি ও দীপ্তির এক নূতন উৎসমুখ খুলিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা শিল্প বিজ্ঞানাদির চর্চাকে দ্রুততর ও গভীরতর ভাবে লইয়া যাইবে তাহাদেরই জ্ঞানের এক পরম আলোকের দিকে, তাহাদের আজিও স্বপ্নাতীত সম্ভাবনা সকলের পরিপূরণের দিকে, বস্তুতে রূপে ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব শক্তিতে সক্রিয় হওয়ার দিকে। যাহা একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, প্রথম হইতে সর্ব্বদা তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে ; আর সব কিছু আসিবে তাহার ফলরূপে, —আসিবে আমাদের সত্তার পরিপূরক ভাবে নয় বরং সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর আত্মজ্যোতিতে পুনর্লব্ধ ও পুনর্গঠিত হইয়া এবং তাহার আত্মপ্রকাশক অঙ্গরূপে।

তাহা হইলে দিব্যজ্ঞান ও মানুষী জ্ঞানের মধ্যে ইহাই খাঁটি সম্বন্ধ ; জ্ঞানকে ধর্ম্মবিষয়ক ও সাংসারিক এই দুই বিসদৃশ ক্ষেত্রে ভাগ করাই পরস্পরের সহিত পার্থক্যের মূল কথা নহে ; তাহাদের পার্থক্যের প্রকৃত কেন্দ্র দেখা যাইবে তাহাদের কর্ম্মধারার পশ্চাতে অবস্থিত চেতনার প্রকৃতিতে। শুধু বাহ্যরূপের বা উপরের স্তরের এবং ক্রিয়াপ্রণালীর উপর অভিনিবিষ্ট ঘটনাকে কেবল মাত্র ঘটনার জন্য দেখিতে অথবা অন্য কোন উপযোগিতার অথবা বাসনা বা বুদ্ধির প্রাণময় বা মনোময় পরিতুষ্টির দিক হইতে দেখিতে অভ্যস্ত সাধারণ মনোময় চেতনা হইতে যাহা প্রসূত হয় তাহাই হইবে মানুষী জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানের এই সমস্ত অনুশীলনই যোগের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে পারে যদি তাহা আধ্যাত্মিকতা

বা আধ্যাত্মিকতাবর্দ্ধক চেতনা হইতে জাত হয়, যে চেতনা যাহা কিছু পরি-দর্শন করে অথবা যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহাদের সকলের অন্তরে কালাতীত সনাতনের সান্নিধ্য এবং কালের ক্ষেত্রে সেই সনাতনের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ধারা খোঁজে ও দেখিতে পায়। ইহা সুস্পষ্ট যে অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় অপরিহার্য্যরূপে এমন এক একাগ্রতার প্রয়োজন হইবে যাহাতে সাধককে তাহার সমগ্র সামর্থ্য একত্র করিয়া কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে শুধু সেই সমস্তের উপর যাহারা এই অতিক্রান্তির সাহায্য করিবে এবং যাহা কিছু সেই একমাত্র উদ্দেশ্যসাধনের দিকে সাক্ষাৎভাবে ফিরিয়া দাঁড়ায় নাই তাহাদিগকে সেই সময়ে দূরে সরাইয়া বা গৌণ করিয়া রাখিতে হইবে। হয়ত সাধক দেখিতে পাইবে যে মানুষী জ্ঞানের এক কি অপর যে ধারা সে অনুসরণ করিতেছিল, মনের বাহ্যশক্তির দ্বারা যাহার সহিত ক্রিয়া বা কারবারে সে অভ্যস্ত ছিল তাহাই এখনও তাহার সেই প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের জন্য তাহাকে নিজের গভীরতা হইতে বাহিরের ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিতেছে, যে উচ্চতায় বা তাহার নিকটে সে পৌঁছিয়াছিল তথা হইতে নিম্নতর ভূমিতে নামাইয়া দিতেছে। তাই এই সমস্ত ক্রিয়াধারা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বা বর্জন করিতে হইবে, যতদিন সাধক এক উচ্চতর চেতনায় নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথা হইতে তাহার শক্তি মনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সমর্থ না হইবে ; তখন সেই আলোকের অধীন অথবা তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাধকের চেতনার রূপান্তরের ফলে সেই সমস্ত মনোভূমি দিব্য ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের অংশ হইয়া দাঁড়াইবে। যে সমস্ত কর্ম্ম এইভাবে রূপান্তরিত হইতে পারিবে না অথবা যাহা কিছু দিব্য চেতনার অংশ হইয়া দাঁড়াইতে অস্বীকার করিবে, কোন প্রকার ইতস্তত না করিয়া সাধক তাহাদিগকে বর্জন করিবে ; কিন্তু সে বর্জন তাহার এমন কোন পূর্ব্বসংস্কার বশে যেন না হয় যে সে কর্ম্ম তাহার অন্তঃসারশূন্যতা বা অসামর্থ্যের জন্য নূতন অন্তর্জীবনের কোন উপাদান হইতেই পারে না। এই সমস্ত বিষয় যাচাই করিবার কোন মানসিক কষ্টিপাথর বা বিধান নাই ; সুতরাং সাধক কোন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বশে চলিবে না ; বরং নিজের আন্তর অনুভূতি, অন্তর্দ্দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা অনুসারে মনের ক্রিয়াকে স্বীকার বা অস্বীকার করিয়া চলিতে থাকিবে, যতদিন না মহত্তর শক্তি ও জ্যোতি নামিয়া আসিয়া নিজের অভ্রান্ত দৃষ্টি নিম্নস্থিত সব কিছুকে পরীক্ষার জন্য প্রয়োগ করিয়া মানুষ ক্রম-পরিণতি পথে এ যাবৎ দিব্য কর্ম্মের জন্য যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে তাহার মধ্য হইতে যাহা প্রয়োজন তাহা নির্ব্বাচন এবং যাহার প্রয়োজন নাই তাহা বর্জন করিবে।

ঠিক কি ভাবে বা কোন সোপান পরম্পরার মধ্য দিয়া এই উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে তাহা ব্যক্তিগত প্রকৃতির রূপ, তাহার প্রয়োজন ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে মূলবস্তু সর্ব্বদাই এক; তথাপি তাহার রূপবৈচিত্র্যও অনন্ত; অন্ততঃ পূর্ণযোগে বাঁধাধরা মনোময় নিয়মের কঠোরতা প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেননা দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি যখন একই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তখনও তাহারা ঠিক একই ধারা অবলম্বন করে না, একইভাবে পদক্ষেপ করে না, অথবা তাহাদের উন্নতিতে ঠিক একই প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলে না। তবু মোটামুটি বলা যায় যে প্রগতিপথের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা যুক্তিসঙ্গত অনুক্রম এই প্রণালীতেও আছে। প্রথমে আসে একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন যাহাতে ব্যক্তিগত প্রকৃতির সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াধারাকে গ্রহণ করিয়া উপরের দিকে ফিরাইয়া ধরা হয় অথবা কোন উচচতর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং যিনি আমাদের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ, যিনি যজ্ঞের হোতা তিনি তাহাদিগকে উৎসর্গ করেন ভগবানের সেবাতে; তাহার পর সত্তার উর্দ্ধারোহণের এক প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার ফলে লব্ধ কোন নূতন উচচতর চেতনার উপযোগী শক্তি ও দীপ্তিকে আমাদের জ্ঞানের সমগ্র ক্রিয়াধারার মধ্যে নামাইয়া আনিবার সাধনা চলে। এখানে চেতনার কেন্দ্রগত আন্তর রূপান্তর সাধনের জন্য সাধককে গভীররূপে অভিনিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তখন মনোময় জীবনের বহির্ম্মুখী গতিবৃত্তির এক বৃহদংশকে হয় ত্যাগ করিতে, না হয় ক্ষুদ্র ও গৌণ করিয়া রাখিতে হয়। পরে সাধনার বিভিন্ন স্তরে অন্তরের চৈত্যসত্তা বা অধ্যাত্ম পুরুষের নূতন চেতনা তাহাদের গতিবৃত্তির মধ্যে কত পরিমাণে আনিতে পারা যায় তাহা দেখিবার জন্য সময় সময় সেই পরিত্যক্ত জীবনকে বা তাহার কোন কোন অংশকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারা যায়; কিন্তু যাহা মানুষকে এ-কাজ কি সে-কাজ করিতে এবং করণীয় কাজ তাহার জীবনের প্রায় অপরিহার্য্য এক অংশ মনে করিতে বাধ্য করে, তাহার স্বভাব বা প্রকৃতির সেই বশ্যতা হ্রাস পাইবে এবং অবশেষে তাহাতে কোন আসক্তি থাকিবে না, নিম্নতর ভাবের কোন বাধ্যবাধকতা বা চালকশক্তি সত্তার মধ্যে কোথাও আর অনুভূত হইবে না। শুধু ভগবান হইবেন তাহার ভাবনা, একমাত্র ভগবান হইবেন তাহার সমগ্র সত্তার অনন্যপ্রয়োজন, যদি তাহার কর্ম্মের পশ্চাতে কোন বাধ্যকর প্রেরণা থাকে তবে তাহা হইবে কোন মহত্তর চেতনা-শক্তির দীপ্ত-প্রেরণা যাহা ক্রমবর্দ্ধমানভাবে তাহার সমগ্র জীবনের একমাত্র চালকশক্তি হইয়া উঠিতেছে, তাহার অন্তর্নিহিত কোন কামনা বা বাহ্য প্রকৃতির কোন তাড়না নহে। অপর-

পক্ষে ইহাও সম্ভব যে তাহার অন্তরের আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে যে কোন সময় সে অনুভব করিতে পারে যে তাহার কর্ম্মধারাগুলি সঙ্কুচিত না হইয়া বরং প্রসারতা লাভ করিতেছে; যোগশক্তির অলৌকিক সংস্পর্শে তাহার মধ্যে মনোময় বিসৃষ্টির নব নব সামর্থ্য এবং জ্ঞানের নূতন নূতন ক্ষেত্র উন্মোচিত হইতে পারে। রসবোধ বা সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি, এক কিম্বা যুগপৎ বহু ক্ষেত্রে শিল্পকলা সৃষ্টির সামর্থ্য, সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভা বা কুশলতা, দার্শনিক ভাবনা ও ধারণার বৃত্তি, চক্ষু কর্ণ হস্ত বা মনের কোন শক্তি—ইহাদের কোনটাই যে-আধারে পূর্ব্বে দেখা যাইত না সেখানে এ সমস্ত জাগিয়া উঠিতে পারে। অন্তর্য্যামী ভগবান, আমাদের সত্তার গভীর প্রদেশে যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত ছিল তাহা হইতে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া প্রকাশ করিতে পারেন অথবা ঊর্দ্ধ হইতে এক দিব্যশক্তি, তাহার বীর্য্যধারা আমাদের করণাত্মক প্রকৃতির উপর ঢালিয়া দিয়া তাহাকে সেই সমস্ত কার্য্য বা সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারেন, যাহার জন্য প্রণালী বা রচয়িতা রূপে সে অভিপ্রেত। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত যোগেশ্বর যে পদ্ধতি বা প্রগতির যে-ধারাই বাছিয়া লউন না কেন এই সোপানের সাধারণ শেষ পরিণতিতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত তিনিই যে আমাদের মনের সকল গতিবৃত্তির এবং আমাদের জ্ঞানের সকল কর্ম্মের প্রযোজক নির্দ্ধারক ও রূপকার এই চেতনাই বর্দ্ধমানভাবে জাগিয়া উঠিবে।

চিৎস্বরূপের জ্যোতিতে প্রথমতঃ আংশিক পরে পূর্ণরূপে ক্রিয়া করিয়া অজ্ঞান হইতে মুক্ত চেতনার ধারাতে প্রবিষ্ট হইবার পথে সাধকের জ্ঞানময় মন ও জ্ঞানময় কর্ম্মের রূপান্তরের দুইটি লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে চেতনার একটা কেন্দ্রগত পরিবর্ত্তন আসে এবং পরাৎপর পুরুষের ও বিশ্বসত্তার, স্বরূপে স্থিত ঈশ্বরের ও সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ভগবানের বর্দ্ধমান এক সাক্ষাৎ উপলব্ধি, দর্শন ও অনুভূতিলাভ হয়; প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ইহাতে সাধকের মন ক্রমশঃ অধিকতররূপে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবে এবং অনুভব করিবে যে তাহা ঊর্দ্ধে ও চারিদিকে উন্নীত ও প্রসারিত হইয়া এই একমাত্র মৌলিক জ্ঞানের অভিব্যক্তির ক্রমবর্দ্ধমান জ্যোতির্ম্ময় সাধন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কেন্দ্রগত চেতনাও তাহার দিক হইতে দিন দিন অধিকতররূপে জ্ঞানের বাহ্য মনোময় ক্রিয়াধারাগুলিকে অধিকার করিবে, তাহাদিগকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবে অথবা নিজের অধিকৃত প্রদেশে পরিণত করিবে, তাহাদের মধ্যে নিজের খাঁটি গতিবৃত্তি সঞ্চারিত করিবে, বর্দ্ধিষ্ণুভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও আলোকিত মনকে, যেমন নিজের গভীরতর চিন্ময় সাম্রাজ্যে তেমনি এই সমস্ত প্রকৃতির নববিজিত

বহিরঙ্গণে নিজের সাধনযন্ত্র করিয়া লইবে। কোন প্রকার পূর্ণতা ও চরমোৎ-কর্ষের দ্বিতীয় লক্ষণ এই হইবে যে ভগবান নিজেই জ্ঞাতা হইয়া দাঁড়াইবেন এবং যাহা একসময় বিশুদ্ধ মানবমনের ক্রিয়া ছিল তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া সমস্ত আন্তর গতিবৃত্তি তাঁহারই জ্ঞানের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু নির্ব্বাচন করা, কোন মতামত পোষণ করা, কোন কিছুতে বিশেষ আসক্ত হওয়া হ্রাস পাইতে থাকিবে ; বুদ্ধির কস্‌রত, মানসিক বিচারজাল-বয়ন, ক্রীতদাসের মত মস্তিষ্কের নিয়ত কঠোর পরিশ্রম—সমস্তই ক্রমশ লোপ পাইতে থাকিবে ; অন্তরের এক জ্যোতি যাহা দেখিবার তাহা দেখিবে, যাহা জানিবার তাহা জানিবে, সব কিছুকে স্বষ্ট পুষ্ট ও সুবিন্যস্ত করিবে। অন্তর্য্যামী জ্ঞাতাই ব্যষ্টির মুক্ত ও বিশ্ববিস্তৃত মনের মধ্যে সর্ব্বাব-গাহী জ্ঞানের ক্রিয়া সম্পাদিত করিবেন।

এই দুই প্রকার পরিবর্ত্তন হইল এক প্রাথমিক পরিণতির নিদর্শন, যে পরি-ণতিতে মানসপ্রকৃতির ক্রিয়াধারাগুলি উন্নীত আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মুক্ত উদার ও বিশ্বব্যাপী হয়, মন এমন এক চেতনার মধ্যে উঠিয়া যায় যাহাতে বোঝা যায় যে তাহাব সকল গতিবৃত্তির খাঁটি উদ্দেশ্য হইল কালগত বিশ্বের মধ্যে ভগ-বানের আত্ম-অভিব্যক্তিকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার কাজে তাঁহার সাধনযন্ত্র হইয়া উঠা। কিন্তু ইহাই রূপান্তরের সমগ্র অভিপ্রায় হইতে পারে না ; কেননা এই সমস্তের সীমার মধ্যে থাকিয়া পূর্ণযোগের সাধক তাহার ঊর্দ্ধারোহণ হইতে বিরত হইতে অথবা তাহাদের মধ্যে নিজপ্রকৃতির প্রসরণকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারে না। কেননা যদি তাহাই হইত তাহা হইলে তখনও মনের এক ক্রিয়া থাকিয়া যাইত, সে মন মুক্ত সার্ব্বভৌম আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত হইলেও, মানবমনের সাধারণ প্রকৃতি অনুসারে স্বভাবতই তাহা অনেকটা সীমাবদ্ধ, আপেক্ষিক ও তাহার মূল ক্রিয়াশক্তিতে অপূর্ণ হইত ; তাহা সত্যের বৃহৎ রচনা সকল প্রদীপ্তভাবেই প্রতিফলিত করিত কিন্তু সেই রাজ্যে বিচরণ করিত না যেখানে সত্য স্বয়ংসিদ্ধ অপরোক্ষ একচ্ছত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এই চূড়া হইতেও তাহাকে আরো ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে যাহাতে অধ্যাত্মভাবাপন্ন মন নিজেকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের এক অতিমানসশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। আধ্যাত্মিকতায় বিভাবিত হইবার ধারার মধ্যে তাহা ইতিপূর্ব্বেই মানুষী বুদ্ধির উজ্জ্বল দারিদ্র্যের গণ্ডী পার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে ; তথা হইতে তাহা উত্তর মানসের এক বিশুদ্ধ বিশাল প্রসারতায় অধিরূঢ় হইবে এবং আবার তথা হইতে তদপেক্ষা বৃহত্তর মুক্ত বুদ্ধির এক প্রদীপ্ত প্রদেশে উঠিয়া যাইবে, যে স্থান ঊর্দ্ধের জ্যোতিতে সদা সমুজ্জ্বল। এইখানে মন আরও স্বাধীনভাবে

অনুভব করিতে আরম্ভ করিবে এবং নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবে বোধির প্রথম কিরণমালা—যে গ্রহণের মধ্যে আর পূর্ব্বের মত বিমিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকিবে না—এই বোধি প্রতিফলিত কোন আলোকে আলোকিত নয় কিন্তু নিজেই জ্যোতির্ম্ময়, নিজেই সত্য ; ইহা আর পূর্ণরূপে মনোময় নয় ; সুতরাং মনের মধ্যে যেরূপ প্রচুর ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে ইহার মধ্যে তাহা নাই। এখানেও উত্তরায়ণের শেষ নয় ; কেননা ইহাকেও অতিক্রম করিয়া আরও ঊর্দ্ধে সেই অবিভক্ত সম্বোধির নিজ রাজ্যে তাহাকে উন্নীত হইতে হইবে, যে সম্বোধি মূল সৎস্বরূপেব আত্মসংবিৎ হইতে প্রথম আগত সাক্ষাৎ এক জ্যোতি এবং তাহারও পরে সেই জ্যোতির উৎসমূলে তাহাকে পৌঁছিতে হইবে। কেননা মনের পশ্চাতে আছে এক অধিমানস যাহা আরও আদি ও সক্রিয় এক শক্তি, যাহা মনের ধর্ত্তা ও ভর্ত্তা, যাহা তাহাকে নিজেরই খর্ব্বিত কিরণছটা বলিয়া জানে, যাহা আত্মজ্যোতি নিম্নাভিমুখী প্রেরণের জন্য মনকে এক প্রণালী রূপে অথবা অবিদ্যাসৃষ্টির এক যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। উত্তরণের শেষ ধাপ হইবে অধিমানসকে অতিক্রম করিয়া নিজেরই বৃহত্তর উৎসে ফিবিয়া যাওয়া, দিব্যবিজ্ঞানের অতিমানস জ্যোতিতে রূপান্তরিত হওয়া। কেননা সেই মানসোত্তর জ্যোতির মধ্যেই সমাসীন রহিয়াছে দিব্য ঋতচিৎ ; বিশ্বগত নিশ্চেতনা ও অবিদ্যাব ছায়া সম্পাতে আর যাহা মলিন হইতে পারে না এমন এক সত্যের কর্ম্মধারা গঠিত করিয়া তুলিবার সহজ শক্তি এই ঋতচিতেরই শুধু আছে যাহা এতদপেক্ষা অধস্তন অন্য কোন চেতনার নাই। সেই সুউচ্চ লোকে পৌঁছা এবং তথা হইতে অবিদ্যার রূপান্তর সাধনক্ষম অতিমানস এক সক্রিয় শক্তিধারাকে নামাইয়া আনাই হইল পূর্ণযোগের চরম উদ্দেশ্য—সে উদ্দেশ্য সুদূর হইলেও অবশ্যসাধনীয়।

এই সমস্ত উচ্চতর শক্তির আলোক মানবজ্ঞানের ক্রিয়াধারাগুলির উপর যে পরিমাণে আসিয়া পড়ে সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ, মানুষী ও দিব্য সকল পার্থক্যবোধ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, অবশেষে নিরর্থক বলিয়া লোপ পাইয়া যায় ; কেননা দিব্যবিজ্ঞান যাহাকে স্পর্শ করে এবং যাহার মধ্যে পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহাই রূপান্তরিত এবং তাহার আত্মজ্যোতি ও আত্মশক্তির এক গতিবৃত্তিতে পরিণত হয়, যে গতিবৃত্তি নিম্নতর বুদ্ধির পঙ্কিলতা ও সীমাবদ্ধতা হইতে মুক্ত। আর জ্ঞানযজ্ঞের উচ্চ হইতে অধিকতর উচ্চ শক্তি ও দীপ্তিতে অধিরোহণের পথে কেবল যে কয়েকটি বিশিষ্ট কর্ম্মের এইভাবে নির্ব্বাচন হয় তাহা নহে পরন্তু অন্তঃস্থিত চেতনার রূপান্তরের ফলে ঘটে সকল কর্ম্মেরই রূপান্তর এবং তাহাই মুক্তির পথ। মন ও বুদ্ধির

সকল ক্রিয়াকে প্রথমতঃ উন্নত ও বিশাল, তাহার পরে তাহাদিগকে দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া উচ্চতর বুদ্ধির রাজ্যে তুলিয়া লইতে হইবে; পরে আবার তাহাদিগকে মনের অতীত বৃহত্তর এক সম্বোধির ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত এবং তাহারও পরে অধিমানসের অমিতবীর্য্য জ্যোতিঃপ্রপাতে পরিণত করিতে এবং সর্ব্বশেষে তাহাদিগকে অতিমানস বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ পরা দীপ্তি ও সর্ব্বজয়ী শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। জগতে ক্রমবিকাশশীল চেতনা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত কিন্তু গোপন ও অব্যক্ত বীজাকারে প্রকৃতির প্রবল সাধনধারার অন্তরে তীব্র এষণাময় উদ্দেশ্যরূপে ইহাকেই বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে এবং যতদিন চিৎস্বরূপের বর্ত্তমান অপূর্ণ অভিব্যক্তির স্থানে তাহার পূর্ণ প্রকাশের উপযোগী যন্ত্রসকল গড়িয়া না উঠিতেছে ততদিন সে সাধনধারা, সে পরিণতি থামিতে পারে না।

জ্ঞান যদি চেতনার উদারতম শক্তি এবং মুক্তি ও দীপ্তি দানই যদি তাহার কর্ম্ম হয় তাহা হইলেও প্রেম সেই চেতনার গভীরতম ও তীব্রতম বৃত্তি যাহার আছে দিব্যরহস্যের গূঢ়তম ও অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশের চাবিকাঠি হওয়ার শ্রেষ্ঠ অধিকার। মানুষ মনোময় সত্তা বলিয়া ভাবনাময় মন ও তাহার যুক্তি-বিচার ও সংকল্পকে এবং মন যে ভাবে সত্যের সম্মুখীন হয় ও যে ভাবে তাহাকে সংশোধিত করিয়া তোলে তাহাদিগকে সে উচ্চতম মর্য্যাদা দিতে চায়, এমন কি এ-কার্য্য আর কোন বৃত্তি দ্বারা যে সাধিত হইতে পারে ইহা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়। বুদ্ধির দৃষ্টিতে হৃদয় ও তাহার ভাবাবেগ এবং অননুমেয় গতিবৃত্তি হইল এরূপ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন শক্তি যাহার উপর নির্ভর করা যায় না, যাহা প্রায়ই মানুষকে বিপদে ফেলে ও বিপথে লইয়া যায়, তাই যুক্তিবুদ্ধি ও মনোময় সংকল্পের দ্বারা তাহাকে সংযত রাখিবার প্রয়োজন আছে। তথাপি ইহা সত্য যে হৃদয় বা তাহার পশ্চাতে গভীরতর রহস্যময় এক আলোক আছে যাহা আমরা যাহাকে বোধি বলি তাহা না হইলেও—কেননা বোধি যদিও মন হইতে উদ্ভূত হয় না তবু মনের মধ্য দিয়াই নামিয়া আসে—তাহার সঙ্গে সত্যের এক সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আছে; আর জ্ঞানগর্ব্বে মুগ্ধ মানুষী বুদ্ধি অপেক্ষা তাহা ভগবানের অনেক বেশি নিকটে। প্রাচীন শিক্ষা অনুসারে সর্ব্বগত দিব্য পুরুষের আসন মানুষের রহস্যময় হৃদয়ে, উপনিষদের ভাষায় "হৃদয়ে-

গুহায়াম্''—'হৃদয়রূপ গুহার মধ্যে', আর অনেক যোগীর অনুভূতি এই যে এই হৃদয়ের গভীর হইতেই আসে অন্তরের চৈত্যগুরুর বাণী বা অনুপ্রেরণাদায়ী প্রাণশক্তি।

এই দ্ব্যর্থবোধ পরস্পরবিরোধী গভীর দৃষ্টি ও দৃষ্টিহীনতা এ উভয়ের এই যে আবির্ভাব, তাহা আবেগময় মানবসত্তার দ্বৈত স্বভাব হইতেই সৃষ্ট হয়। কেননা মানুষের অন্তরের সম্মুখভাগেই রহিয়াছে এক প্রাণাবেগময় হৃদয়, যাহা পশু হৃদয়ের সদৃশ, যদিও মানুষে তাহা বহুমুখীভাবে আরও পুষ্ট হইয়াছে; তাহার ভাবাবেগ অনুশাসিত হয় অহংগত প্রণোদনা ও উত্তেজনা, অন্ধ সহজাত রাগ-অনুরাগ এবং প্রাণ-তাড়নার সর্ব্বপ্রকার খেলার দ্বারা, আবার সে তাড়নার সঙ্গে থাকে প্রাণের নানা অপূর্ণতা, বিকৃতি, অনেক সময় ঘৃণ্য অবনতি—মানুষের হৃদয় এমনি যে তাহা অবরুদ্ধ ও অধিকৃত থাকে কাম, বাসনা, ক্রোধ, তীব্র বা প্রচণ্ড দাবী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুব্ধতা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পতিত প্রাণশক্তির হেয় ক্ষুদ্রতাসকলের দ্বারা, আর যে-কোন আবেগের তাড়নার দাসত্ব স্বীকার করিয়া মানবহৃদয় দূষিত বা বিকৃত হইয়া পড়ে। আবেগময় হৃদয় ও বুভুক্ষু সংবেদনশীল প্রাণশক্তি এই উভয়ে মিলিয়া মানুষের মধ্যে একটা মিথ্যা কামময় আত্মা সৃষ্টি করে; ইহাই আমাদের মধ্যের সেই স্থূল ও বিপদজনক উপাদান যাহাকে যুক্তিবুদ্ধি ন্যায়সঙ্গতভাবেই অবিশ্বাস করিবার এবং শাসনে রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করে, যদিও তাহা আমাদের অসংস্কৃত ও দুরাগ্রহী প্রাণপ্রকৃতিকে বস্তুত: যেটুকু শাসন অথবা বরং দমন করিতে সমর্থ হয় তাহা সর্ব্বদা খুবই অনিশ্চিত এবং ভ্রমাত্মক। কিন্তু মানুষের যথার্থ আত্মা তথায় নাই, সে-আত্মা প্রকৃতির এক জ্যোতির্ম্ময় গুহার মধ্যে লুক্কায়িত খাঁটি অদৃশ্যহৃদয়ের অন্তরে বর্ত্তমান; সেখানে এক দিব্য আলোকের জ্যোতি বিচ্ছুরণের মধ্যে আমাদের অন্তরাত্মা বা নীরব অন্তরতম পুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, অথচ অধিকাংশ লোকই তাহাকে জানেনা; কেননা যদিও প্রত্যেকেরই এক অন্তরাত্মা আছে কিন্তু অল্প লোকই নিজের সেই খাঁটি আত্মার সম্বন্ধে সচেতন, অথবা তাহার প্রেরণা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে। তথায় ভগবানেরই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটি বাস করে যাহা আমাদের প্রকৃতির এই অন্ধকারময় পিণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহারই চারিদিকে চৈত্যপুরুষ বা মূর্ত্ত অন্তরাত্মা বা আমাদের মধ্যস্থ প্রকৃত মানুষটি গড়িয়া উঠিতেছে। মানুষের মধ্যে এই চৈত্যপুরুষ যত বর্দ্ধিত ও পরিণত হইতে থাকে এবং তাহার হৃদয়ের গতিবৃত্তি সকল তাহার ভবিষ্যজ্ঞান ও তাহার প্রেরণাকে যতটা প্রতিফলিত করিতে থাকে, ততই সে ক্রমশ: অধিকতরভাবে তাহার অন্তরাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে, তখন সে উচ্চতর পশু আর থাকে

না, তাহার অন্তরস্থিত ভগবানের চকিত সাক্ষাতে জাগ্রত হইয়া একটা গভীরতর জীবন ও চেতনার স্পষ্টতর সঙ্কেতবাণী শুনিবার এবং দিব্য সম্পদের দিকে অগ্রসর হইবার এক বর্দ্ধিষ্ণু প্রেরণা প্রাপ্ত হয়। বুঝিতে হইবে যে তখন পূর্ণ-যোগের সিদ্ধিনির্ণায়ক একটা মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে যখন চৈত্যপুরুষ মুক্ত হইয়া আবরণের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মানুষের মন প্রাণ ও দেহের উপর তাহার ভবিষ্যদ্‌বাণী, দৃষ্টি ও প্রেরণা অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এই পার্থিব প্রকৃতিতেই দিব্যভাবের সংগঠন আরম্ভ করিয়াছে।

জ্ঞানকর্ম্মের মত হৃদয়ক্রিয়ার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরস্থ দুইপ্রকার গতিধারার মধ্যে একটা প্রাথমিক প্রভেদ করিতে বাধ্য হই—প্রথম, যে সমস্ত গতিবৃত্তি আমাদের যথার্থ অন্তরাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয় অথবা যাহারা প্রকৃতির বন্ধন মোচন এবং তাহাকে শাসন করিবার কার্য্যে সহায়তা করে আর দ্বিতীয় যে সমস্ত গতিবৃত্তি শুধু আমাদের অসংস্কৃত প্রাণপ্রকৃতির পরিতুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই অর্থে সাধারণতঃ যে প্রভেদ করা হয়, তাহা যোগের গভীর বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশেষ সাহায্য করে না। যেমন ধর্ম্মের ভাবোচ্ছ্বাস এবং সাংসারিক হৃদয়াবেগের মধ্যে এইভাবে একটা পার্থক্য দেখান যাইতে পারে যে ধর্ম্মের আবেগকে শুধু পোষণ ও পরিপুষ্টি করিতে হইবে এবং সকল পার্থিব আবেগ ও অনুভূতিকে বর্জন করিতে হইবে, তাহাদিগকে জীবন হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যতঃ ইহার পরিণাম হইবে এমন ভক্ত বা সাধুসন্তের জীবন যাহারা শুধু ভগবানের সহিত নিভৃত মিলনে অথবা সাধারণ ভগবৎপ্রেমে স্বমার্গগামীর সঙ্গে কেবল সম্বদ্ধ, অথবা বড় জোর ধাম্মিকের, ভক্তিপন্থীর মনোভাবের দ্বারা প্রণোদিত পবিত্র প্রেমধারাকে বাহ্য জগতের উপর বর্ষণেই পরিতৃপ্ত। কিন্তু ধাম্মিকের হৃদয়াবেগও সর্ব্বদা প্রাণময় গতিবৃত্তির কোলাহল ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং অনেক সময় তাহা স্থূলতা, সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির আধার হইয়া পড়ে অথবা এমন সকল গতিবৃত্তির সহিত মিশিয়া যায় যাহাদিগকে চিৎপুরুষের পূর্ণতার লক্ষণ বলা চলে না। তাহা ছাড়া ইহা স্পষ্ট যে নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের কঠোর শৃঙ্খলে বদ্ধ, তীব্র আবেগভরা সাধুসন্তের আদর্শ তাহার শ্রেষ্ঠ অবস্থায়ও পূর্ণযোগের উদার আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। পূর্ণযোগের পক্ষে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজন—ভগবান ও জগতের সহিত আত্মা ও হৃদয়ের এমন এক বৃহত্তর সম্বন্ধ স্থাপন, যাহা মূলতঃ অধিকতর গভীর ও সাবলীল, যাহা

গতিবৃত্তিতে অধিকতর ব্যাপক ও সর্ব্বগ্রাহী, যাহা সমগ্র জীবনকে এক সঙ্গে বাহুপাশে ধরিতে সমর্থ।

নীতিবোধকে ভিত্তি করিয়া সাংসারিক মানব একটা উদারতর দৃষ্টিতে দেখিবার উপায় বাহির করিয়াছে; কেননা মানুষের বুদ্ধি নীতিবোধ দ্বারা সমর্থিত আবেগ এবং অহংগত ও সাধারণ ঐহিক জীবনের স্বার্থপর আবেগের মধ্যে একটা প্রভেদ দেখিয়াছে। নীতিবোধে আমাদের আদর্শ হইল পরার্থপরতা, লোকহিত, ভূতদয়া, পরোপকারশীলতা, মানবতা, সেবা, মানব ও সকল প্রাণীর হিতসাধন জন্য কর্ম্ম করা; এই মত অনুসারে অহমিকার নাগপাশকে দূর করিয়া দিয়া আত্মত্যাগশীল যে অন্তরাত্মা কেবল বা প্রধানত পরার্থে অথবা সমগ্র জগদর্থে বাস করে সেই সত্তারূপে গঠিত হইয়া উঠাই মানুষের আন্তর পরিণতির ধারা। অথবা এই আদর্শ যদি বড় বেশী ঐহিক ও মনোময় বলিয়া আমাদের সমগ্র সত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে না পারে—কেননা শুধু লোকহিতৈষণা প্রণোদিত কর্ম্মধারা মানুষের অন্তরে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার যে একটা গভীরতর মূলসুর আছে তাহাকে অবহেলা করে—তাহা হইলে এ মতের ভিত্তি স্বরূপে ধর্ম্মপ্রণোদিত নীতিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে; বস্তুতঃ তাহার মূলভিত্তি সেইরূপই ছিল। সে ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভক্তিদ্বারা ভগবানের বা পরাৎপরের আন্তর আরাধনার অথবা উচ্চতম এক জ্ঞানের পথে অনির্ব্বচনীয় পর-তত্ত্বের সন্ধানের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে পরার্থপর কর্ম্মধারার মধ্য দিয়া এক পূজা বা মানবজাতির অথবা আমাদের চারিপাশে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের প্রতি প্রেম, শুভৈষণা ও সেবার মধ্য দিয়া এক প্রস্তুতি। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও নীতির মিলনেই বৈদান্তিক বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় আদর্শ সৃষ্ট হইয়াছিল, তথায় সর্ব্বমঙ্গলেচ্ছা সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও করুণা এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম ও সেবার বিধান গৃহীত হইয়াছিল; আর মানবহিতৈষণার এ আদর্শ শুধু এক প্রকার ঐহিকবাদের তুষারস্পর্শে নিজ-মধ্যস্থিত প্রদীপ্ত ধর্ম্মভাবকে নির্ব্বাপিত করিয়া নিজেকে পৃথক করিয়া লইতে এবং মনোময় ও নীতিমূলক ঐহিক কর্ম্মধারার এক চূড়ান্ত পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছে। কেননা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে কর্ম্মের এই বিধান একটা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইলে তাহার আর কোন প্রয়োজন থাকে না অথবা তাহা একটা গৌণ বস্তু হইয়া দাঁড়ায়; যে ধর্ম্মপ্রণালীর দ্বারা সাধক ভগবানকে সন্ধান ও তাহার পূজা করে ইহা তাহার একটা অংশ অথবা নির্ব্বাণের পথে আত্মবিলোপ সাধনের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী একটা সোপান। ঐহিক নীতিবাদের আদর্শে এই ভাবের কর্ম্মকেই উদ্দেশ্য বা মুখ্যবস্তু করিয়া নেওয়া হইয়াছে, ইহাই মানুষের নৈতিক আদর্শের নিদর্শন হইয়া উঠিয়াছে, অথবা বলা যায় যে

ইহাই জগতে মানুষের অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের, উন্নততর সমাজব্যবস্থার, জাতির পূর্ণতর একতাবদ্ধ জীবনের হেতু বা নিমিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পূর্ণযোগ আমাদের সম্মুখে আত্মার যে দাবি উপস্থাপিত করে, ইহাদের কোনটাই তাহা মিটাইতে সমর্থ নহে।

সর্ব্বভূতে দয়া, পরার্থপরতা, লোকহিতৈষণা ও লোকসেবা মনোময় চেতনার বিকশিত কুসুম, যতদূর সম্ভব ভালভাবে ধরিয়া লইলেও তাহারা সার্ব্বভৌম দিব্য প্রেমের চিন্ময় শিখার উত্তাপহীন ও মলিন অনুকরণ মাত্র। অহমিকার বোধ হইতে তাহারা যথার্থ মুক্তি পাইতে পারে না ; বড় জোর তাহার বিস্তার সাধন করিয়া তাহাকে একটা উচ্চতর ও বৃহত্তর পরিতৃপ্তি দিতে পারে ; তাহারা মানুষের প্রাণময় জীবন ও প্রকৃতিকে কার্য্যতঃ রূপান্তরিত করিতে পারে না, পারে শুধু তাহার ক্রিয়ার সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন ও তাহার দোষকে কিছু লঘু করিতে এবং তাহার অসংস্কৃত মূলগত অহং-এর উপর আনাড়ীর মত কিছু রং ফলাইতে। যদিই-বা আমরা সরল ও ঐকান্তিক সংকল্প সহকারে গভীররূপে তাহাদের অনুসরণ করি তবে আমাদের প্রকৃতির এক অঙ্গের অতিবর্দ্ধিত অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে ; কিন্তু সেরূপ সম্প্রসারণে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত তত্ত্বের দিকে আমাদের ব্যষ্টিসত্তার দিব্য পরিণতিকে নানামুখে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিবার কোন সূত্র পাওয়া যাইবে না। ধর্ম্ম ও নীতির মিলনজাত আদর্শও আমাদের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক হইতে পারে না, কারণ এই আদর্শ ধর্ম্মীয় ও নৈতিক এই দুই প্রেরণার মধ্যে পরস্পরের সহায়তার জন্য একটা আপোষনিষ্পত্তি, প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু ত্যাগ করিয়া একটা সন্ধি, যাহার মধ্যে ধর্ম্মীয় প্রেরণা চায় সাধারণ মানবস্বভাবের উচ্চতর ভাবগুলি নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া জগতের উপর ঘনিষ্ঠতর প্রভাব বিস্তার করিতে, আর নৈতিক প্রেরণা আশা করে যে ধর্ম্মের আবেগের কতকটা সংস্পর্শে আসিয়া নিজের মনোময় শুষ্কতা ও কাঠিন্য হইতে নিজেকে উর্দ্ধে তুলিতে সক্ষম হইবে। এই সন্ধিস্থাপন করিতে গিয়া ধর্ম্ম নামিয়া পড়ে মনের স্তরে আর স্বীকার করিয়া নেয় মনের অন্তর্নিহিত অপূর্ণতাকে, জীবনের ধর্ম্মান্তর ও রূপান্তরসাধন বিষয়ে তাহার অক্ষমতাকে। মন দ্বৈতের ক্ষেত্র এবং সে আপেক্ষিক সত্য বা ভ্রমমিশ্রিত সত্যকে শুধু ধরিতে সক্ষম, কোন নিরপেক্ষ সত্যকে নহে, তেমনিই নিরপেক্ষ শিব বা মঙ্গলকে ধরাও তাহার সাধ্যাতীত ; কেননা নৈতিক মঙ্গল একটা আপেক্ষিক বস্তু তাহা অমঙ্গলের পরিপূরক ও পরিশোধকরূপেই বর্ত্তমান থাকে আবার অমঙ্গলকে সর্ব্বদাই তাহার ছায়া ও অনুপূরকরূপে এমন কি নিজের অস্তিত্বের কারণরূপে সঙ্গে লইয়া চলে ;

কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনার স্থান মনোভূমির ঊর্দ্ধে, সেখানে দ্বৈত বা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে ; কেননা যাহা একদিন সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিয়া তাহাকে অধিকারকরতঃ তাহা দ্বারা লাভবান হইতেছিল সেই অনৃতকে এখানে সাক্ষাৎ সত্যের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, তদ্রূপ যাহা শিবের এক বিকৃতি বা তাহার বিবর্ণ এক অনুকল্প সেই অশিবকে এখানে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপের সম্মুখে গিয়া উপনীত হইতে হয়, কিন্তু সে ভূমিতে অনৃত ও অশিব এ উভয়কে নির্বীর্য্য ও নিঃসম্বল হইয়া বিনাশ পাইতে হয়। মনোময় বা নৈতিক আদর্শের মত ভঙ্গুর পদার্থের উপর নির্ভর করিতে অস্বীকার করিয়া পূর্ণযোগ এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ও শক্তিশালী তিনটি কেন্দ্রগত সাধনধারার উপর তাহার সমগ্র মনোযোগ অর্পণ করিতে বলে : খাঁটি অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষকে উদ্বুদ্ধ ও পুষ্ট করিয়া মিথ্যা কামময় পুরুষের স্থানে অভিষিক্ত করা ; মানব-প্রেমকে পরিশোধিত ও উন্নীত করিয়া দিব্যপ্রেমে রূপান্তর সাধন করা ; মনোভূমি হইতে চেতনাকে সেই আধ্যাত্মিক ও অতিমানস ভূমিতে উন্নয়ন করা, যাহার সামর্থ্যের দ্বারাই অন্তরাত্মা ও প্রাণশক্তি এ উভয়কে অবিদ্যার আবরণ ও অপলাপ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত করা যাইতে পারে।

যেমন সর্য্যমুখী ফুল সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে তেমনি অন্তরাত্মা বা চৈত্য পুরুষের স্বভাবই এই যে দিব্য সত্যের দিকে সে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া দাঁড়ায় ; যাহা কিছু দিব্য অথবা যাহা কিছু দিব্য ভাবের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে চৈত্য পুরুষ তাহাকেই স্বীকার করে, তাহাতেই সংসক্ত থাকে ; আর যাহা কিছু তাহার বিকৃতি বা অস্বীকৃতি যাহা কিছু অসত্য ও অদিব্য তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। তথাপি প্রারম্ভে আমাদের এই অন্তরাত্মা একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র, তারপর চারিদিকের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাহা দেবত্বের এক ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা হইয়া দাঁড়ায় ; প্রধানতঃ এ পুরুষ অন্তরের নিভৃতকক্ষে আবরণের পশ্চাতে বাস করে, আত্মপ্রকাশ করিতে হইলে তাহার ডাক দিতে হয় মন প্রাণশক্তি ও দেহগত চেতনাকে এবং তাহারা তাহাকে যতটা প্রকাশ করিতে সমর্থ তাহা করিতে তাহাদিগকে প্ররোচিত করিতে হয় ; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা নিজের আলোকে তাহাদের বহির্ম্মুখীনতাকে শুধু উদ্ভাষিত করিতে, নিজের পরিশোধক সূক্ষ্মপ্রভাব দ্বারা তাহাদের তামস আবিলতা বা স্থূলতর বৃত্তিশঙ্কর বড় জোর কিছুটা মাত্র পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়। এমন কি যখন চৈত্যপুরুষ গঠিত হইয়া কতকটা সাক্ষাৎভাবে প্রাণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে তখনও ইহা শুধু অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলের মধ্যে সত্তার এক ক্ষুদ্রতর অংশ হইয়া থাকে—প্রাচীনেরা যাহার কথা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' এই রূপকের

ভাষায় বলিয়াছেন—তখনও ইহা দেহগত চেতনার অন্ধকার ও অজ্ঞ ক্ষুদ্রতা, মনের প্রমত্ত অতিপ্রত্যয় অথবা প্রাণশক্তির দম্ভ ও উদ্দণ্ডতাকে সর্ব্বদা পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। এই অন্তরাত্মাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয় মানুষের মনোময় এবং আবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় জীবন যে ভাবে রহিয়াছে তাহাকে, তাহার সকল সম্বন্ধ ও ক্রিয়াধারাকে, তাহার আদৃত বা পোষিত রূপ ও মূর্ত্তিকে; ভ্রান্তিজনক অনৃত দ্বারা সর্ব্বদা মিশ্রিত এই সকল আপেক্ষিক সত্য, পাশবদেহের সেবাতে এবং প্রাণময় অহমিকার পরিতুষ্টিতে প্রবৃত্ত এই আমাদের প্রেম, যাহার মধ্যে ক্বচিৎ কখনও পরমদেবতার অতি ক্ষীণ আভাসমাত্র প্রকাশ পায় আর পশু ও দানবের অন্ধ পঙ্কিলতা শুধু দেখা যায় সেই সাধারণ মানুষের এই জীবন—ইহাদের সকলের মধ্য হইতে দিব্য উপাদানকে মুক্ত ও বর্দ্ধিত করিবার সাধনা ইহাকে করিতে হয়। ইহার স্বরূপ সংকল্পে ইহা অভ্রান্ত; তথাপি নিজেরই সাধনযন্ত্র সকলের চাপে অনেক সময় ইহা নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয় নানা প্রকার ভুলের নিকট—কর্ম্মের ভুল, অনুভূতির প্রয়োগে ভুল, লোক নির্ব্বাচনে ভুল, ইহার সংকল্পের যথার্থ রূপে ভুল, ইহার অমোঘ আন্তর আদর্শের অভিব্যক্তির বাহ্য পরিবেশের ভুল। তথাপি ইহার অন্তরে এক সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে যাহার জন্য বুদ্ধির অথবা এমন কি উচ্চতর বাসনার অপেক্ষা ইহার চালনার উপর অনেক অধিক পরিমাণে নির্ভর করা যায়, ইহার ডাক বা বাণী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচার বিবেচনাশীল মনের অপেক্ষা সুষ্ঠুতরভাবে নানা আপাত ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে। অন্তরাত্মার এই বাণী আমরা যাহাকে বিবেক বা ধর্ম্ম-বুদ্ধি বলি তাহা নহে; কারণ বিবেক শুধু তাহার এক মনোময় অনুকল্প যাহার মধ্যে অনেক সময় গতানুগতিকতার ভাব ও ভুলভ্রান্তি থাকে; আত্মার ডাক আরও গভীরের বস্তু, আমরা প্রায়ই তাহা শুনিতে পাই না; তবু শুনিতে পাইলে তাহার নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য; এমন কি যুক্তিবুদ্ধির নির্দ্দেশ বা বহির্ম্মুখী নীতিবোধের উপদেশে যাহা সরল পথ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাতে চলা অপেক্ষা নিজ আত্মার এই ডাকে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করাও শ্রেয়স্কর। কিন্তু কেবল যখন জীবন ভগবানের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, তখন অন্তরাত্মা সত্যই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে এবং বাহ্য অঙ্গ সকলকে নিজ শক্তিদ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতে পারে; কেননা ইহা নিজে ভগবানেরই একটা স্ফুলিঙ্গ এবং তদভিমুখে শিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠাই ইহার যথার্থ জীবন, ইহার অস্তিত্বের প্রকৃত কারণ।

যোগসাধনার বিশেষ এক স্তরে যখন মন যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত হইয়াছে,

আর প্রতি পদে আপন সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিতেছে না, যখন প্রাণ স্থির এবং বশীভূত হইয়াছে আর নিজের অপরিণামদর্শী সঙ্কল্প দাবি ও ও বাসনা পূরণের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে না, যখন দেহের এতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাহাতে তাহা বহির্ম্মুখীনতা অন্ধকার ও জড়তা দ্বারা অন্তরের শিখাকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন রাখিতেছে না, তখন যাহার প্রভাব আমরা কদাচ কখনও অনুভব করিয়াছি সেই নিগূঢ় অন্তরতম সত্তা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে, বাকি সকল অংশকে আলোকিত করিতে এবং সাধনার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সত্তার স্বভাবই এই যে তাহা একমুখী হইয়া ভগবানের বা সর্ব্বোত্তমের দিকে সর্ব্বদা ফিরিয়া রহিয়াছে—একমুখী অথচ কার্য্য ও গতি-বৃত্তিতে নমনীয় বা সাবলীল ; একমুখী বুদ্ধিবৃত্তির মত তাহা কঠোর অনমনীয়তা অথবা একমুখী প্রাণশক্তির মত প্রভুত্বকারী ভাবনা বা তাড়নার এক গোঁড়ামী বা অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে না ; প্রতিমুহূর্ত্তে তাহা এক নমনীয় নিশ্চয়তার সহিত সত্যের পথ দেখাইয়া দেয়, ভ্রান্ত ও খাঁটি পদক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য স্বতঃই দর্শন করে, অদিব্য বস্তুরাজির দুর্ম্মোচনীয় সংমিশ্রনের মধ্য হইতে দিব্য বা ভগবদভিমুখী গতিবৃত্তিকে মুক্ত করিয়া দেয়। তাহা আমাদের প্রকৃতির যে যে অংশ রূপান্তরিত করিতে হইবে তাহাদিগকে সন্ধানী বৈদ্যুতিক আলোকের (search light) মতই দেখাইয়া দেয় ; তাহার মধ্যে সংকল্পের এক প্রজ্বলন্ত শিখা আছে যাহা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পূর্ণতা লাভের এবং আন্তর ও বাহ্য জীবনের ঊর্দ্ধায়িত রূপান্তর সাধনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাহা দিব্য সত্যস্বরূপকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায় কিন্তু যাহা কেবল তাহার মুখোশ ও ছদ্মবেশ তাহা বর্জন করে। এই অন্তরাত্মা জোর দেয় সত্যের উপর, সংকল্প সামর্থ্য ও প্রভুত্বের উপর, প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের উপর ; কিন্তু সে সত্য হইবে নিত্য জ্ঞানের স্থায়ী সত্য, যাহা অবিদ্যার কেবল ক্ষণস্থায়ী বাস্তব সত্যকে অতিক্রম করিয়াই শুধু লাভ হইতে পারে ; সে আনন্দ হইবে অন্তরের আনন্দ বাহিরের প্রাণগত সুখ শুধু নহে—কেননা চৈত্যপুরুষ বরং চায় সেই দুঃখ তাপ যাহা বিশুদ্ধি আনয়ন করে তবু চায় না তেমন সুখ যাহা আমাদিগকে অশুদ্ধি ও অবনতির দিকে লইয়া যায়—আবার সে যে প্রেম চায় তাহা ঊর্দ্ধের দিকে উন্নয়নশীল যাহা অহংগত বাসনার খুঁটিতে আবদ্ধ নয় অথবা যাহার পদদ্বয় পঙ্কে নিমগ্ন নয় ; যে সৌন্দর্য্য সে চায় তাহা হইবে শাশ্বতের সম্যক্ অভিব্যঞ্জনার পুরোহিত, আর যে শক্তি সংকল্প ও প্রভুত্ব তাহার কাম্য তাহা হইবে চিৎপুরুষের যন্ত্র, অহমিকার নয়। তাহার সংকল্প হইবে জীবনকে দিব্যরূপ দান, জীবনের মধ্য

দিয়া এক উচ্চতর সত্যের অভিব্যক্তি আর শাশ্বত ভগবানের নিকট সে জীবনের উৎসর্গ।

কিন্তু চৈত্যপুরুষের অন্তরঙ্গতম স্বভাব হইল পবিত্র প্রেম, আনন্দ ও তাদাত্ম্য-বোধের মধ্য দিয়া ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হওয়া। এই দিব্য প্রেমই তাহার মুখ্য সন্ধানের বস্তু, ইহাই তাহার প্রণোদক শক্তি তাহার চরম লক্ষ্য, সত্যের ধ্রুবতারা যাহা আমাদের জায়মান দেবতার জ্যোতির্ময় গুহার অথবা আমাদের মধ্যস্থ নবজাত পরমদেবতার এখনও প্রচ্ছন্ন দোলার উপর আলোকবর্ষণ করি-তেছে। তাহার পরিণতির এবং অপরিণত জীবনের প্রাথমিক দীর্ঘস্তরে তাহাকে নির্ভর করিতে হয় পার্থিব ভালবাসা স্নেহ কোমলতা শুভেচ্ছা অনু-কম্পা জনহিতৈষণার উপর, ইহজগতে যত সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য যত আলোক শৌর্য্য ও বীর্য্য আছে তাহাদের উপর, যাহা কিছু মানবপ্রকৃতির প্রকৃত ভাব ও স্থূলতাকে বিশোধিত ও পরিমার্জিত করিতে সাহায্য করিতে পারে তাহাদের সকলের উপর; কিন্তু সে জানে যে তাহাদের অত্যুত্তম অবস্থায়ও এ সমস্ত মানুষী গতিবৃত্তি কতটা বিমিশ্র আর তাহাদের নিম্নতম অবস্থায় তাহারা কতটা অধঃপতিত এবং তাহাদের উপর কতটা ছাপ পড়িয়াছে অহমিকার ও আত্মপ্রবঞ্চক আবেগময় মিথ্যার, আর তাহার সহিত কতটা জড়ীভূত হইয়া আছে আত্মার গতিবৃত্তির অনুসরণকারী নিম্নতর সত্তার লাভ ও স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি। আত্মপ্রকাশ করিয়াই সে প্রাচীন সকল বন্ধনকে অপূর্ণ ভাব-আবেগের সকল ক্রিয়াধারাকে ভাঙ্গিয়া দিতে এবং তাহাদের স্থানে প্রেম ও একত্বের বৃহ-ত্তর আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রস্তুত ও উৎসুক হয়। তখনও সে মানবসুলভ মূর্ত্তি ও গতিবৃত্তিকে হয়ত স্থান দিতে পারে কিন্তু কেবল এই সর্ত্তে যে তাহারা একমাত্র সেই পরম একের অভিমুখী হইবে। যাহা সাধন পথের অনুকূল হইবে শুধু সেই সমস্ত সম্বন্ধবন্ধনকে সে স্বীকার করিবে, স্বীকার করিবে গুরুর প্রতি হৃদয়ের ভক্তি, ঈশ্বরান্বেষুগণের সহিত মিলন ও মৈত্রী, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব ও পশু জগতের প্রতি আধ্যাত্মিক অনুকম্পা, সর্ব্বত্র ঈশ্বরা-নুভূতি জাত আনন্দ হর্ষ ও সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি। তাহার হৃদয়ের গোপনকেন্দ্রে যে সর্ব্বগত ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য সে তাহার সমগ্র প্রকৃতিকে অন্তরে ডুবাইয়া দেয়, আর যতক্ষণ সে আহ্বান সে শুনিতে পায় ততক্ষণ স্বার্থপরতার অপবাদে সে কান দেয় না, কেমলমাত্র বাহ্য কোন পরার্থপরতা, কর্ত্তব্য, জনহিত বা লোকসেবার দাবি তাহাকে ভুলাইতে অথবা তাহার পবিত্র আকূতি ও অন্তরস্থ পরমদেবতার আকর্ষণ হইতে তাহাকে অন্য-দিকে ফিরাইতে পারে না। সে তাহার সত্তাকে এক জগদতীত পরম আনন্দের

মধ্যে উত্তোলিত করে এবং সেই অদ্বয় সর্ব্বোত্তমের দিকে উড্ডীন হওয়ার পথে নিম্নজগতের সকল অধোমুখী আকর্ষণ সে তাহার পক্ষ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে; সেইসঙ্গে ঘৃণা দ্বেষ ভেদ অন্ধকার ও বিক্ষোভকর অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন জগৎকে মুক্ত ও রূপান্তরিত করিবার জন্য লোকাতীত এই প্রেম ও পরমানন্দকে নিম্নে নামাইয়া আনিবার জন্যও তাহাকে আহ্বান করে। সে সর্ব্বব্যাপী এক দিব্য প্রেম, বিশাল এক করুণা ও জ্বলন্ত এক বিরাট সংকল্পের নিকট নিজেকে খুলিয়া ধরে, সেই জগজ্জননীর দিব্য আলিঙ্গনের জন্য, সকলের কল্যাণ সাধনের জন্য যিনি তাহার সকল সন্তানকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন সকলকে নিজের কাছে সমবেত করিতেছেন, দিব্য স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ যিনি সার্ব্বভৌম অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন এই জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য এই তমোরাশির মধ্যে অবগাহন করিয়াছেন। জীবনের গুহাহিত এই সমস্ত মহান সত্যের মানসিক অনুকরণ অথবা প্রাণিক কোন প্রকার অপব্যবহার তাহাকে আকৃষ্ট বা পথভ্রষ্ট করিতে পারে না; তাহার নিজের সন্ধানী আলোক-রশ্মির সাহায্যে সে তাহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত দোষ ও ত্রুটি ধরিয়া ফেলে এবং দিব্য প্রেমের সমগ্র সত্যকে আবাহন করিয়া নিম্নে নামাইয়া আনে এই সমস্ত অঙ্গবিকৃতিকে নিরাময় করিবার জন্য, মনোময় প্রাণময় ও দৈহিক প্রেমকে তাহাদের অপূর্ণতা ও বিকৃতি হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং তাহাদের নিকট অন্তরাত্মা, একত্ব, আরোহণ ও অবরোহণশীল পরমানন্দের মধ্যে তাহাদের যে সুপ্রচুর অংশ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য।

তাহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রেমের এবং প্রেমকর্ম্মের সকল খাঁটি সত্যই চৈত্যপুরুষ গ্রহণ করে এবং ইহার পুণ্যশিখা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধেই আরোহণ করে এবং অধিরোহণের পথে সে সত্যের নিম্নতর হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যাইতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক, কেননা সে জানে যে উচ্চতম সত্যের ভূমিতে পৌঁছিয়া এবং তথা হইতে সেই উচ্চতম সত্যকে নামাইয়া আনিয়াই শুধু প্রেমকে পার্থিব ক্রুশ হইতে মুক্ত করিয়া সিংহাসনে বসান যায়; কেননা ক্রুশ হইল সেই অবস্থার প্রতীক যাহাতে দিব্য অবতরণের খাড়া (vertical) সরলরেখার উপর পার্থিব বিকৃতির আড় রেখা (transversal) পড়িয়া সেই অবতরণকেই প্রতিরুদ্ধ ও বিকলাঙ্গ করিয়া তোলে যাহার ফলে জীবন দুঃখতাপ ও দুর্ভাগ্যের আগার হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র মূল সত্যে উত্তরণের দ্বারা এ বিকৃতিকে দূর করা যাইতে পারে, একমাত্র তখনই সকল প্রেমকর্ম্ম তথা সকল জ্ঞান কর্ম্ম ও জীবন কর্ম্মকে এক দিব্য তাৎপর্য্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এক আধ্যাত্মিক জীবনের অংশে পরিণত করা সম্ভব হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যজ্ঞের ঊর্দ্ধায়ন (২)

প্রেমকর্ম্ম—জীবনকর্ম্ম

সুতরাং চৈত্যপুরুষকে যজ্ঞের নেতা ও হোতা করিয়া লইয়া প্রেমযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ সাধনার মধ্য দিয়া জীবনকে তাহার নিজস্ব খাঁটি আধ্যাত্মিক মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। যদিও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত জ্ঞানযজ্ঞ সহজেই পরমতত্ত্বের নিকট বৃহত্তম ও শুদ্ধতম উৎসর্গ তথাপি আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য আমাদের পক্ষে প্রেমযজ্ঞ সাধনের প্রয়োজনীয়তা তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নহে ; এমন কি একমুখীতায় ইহা আরও বেশী প্রগাঢ় ও সমৃদ্ধ, আর ইহাকে জ্ঞান-যজ্ঞের মতই বিরাট ও বিশুদ্ধ করিয়া নেওয়া যায়। প্রেমযজ্ঞের মধ্যে এই পরিশুদ্ধ উদারতা তখনই আসে যখন আমাদের সকল কর্ম্মধারার মধ্যে দিব্য অনন্ত আনন্দের প্রকৃতি ও শক্তির প্রবল প্রবাহ আসিয়া পড়ে এবং আমাদের জীবনের সমগ্র পরিমণ্ডল সর্ব্বময় সর্ব্বোত্তম অদ্বয় স্বরূপের প্রতি প্রধাবিত অভিনিবেশকর এক পরম অনুরাগের দ্বারা অনুবিদ্ধ ও পরিপ্লুত হয়। কেননা তখনই প্রেম-যজ্ঞ তাহার চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন তাহা সর্ব্বস্বরূপ ভগবানের পদে অর্পিত হয়, তখন তাহা পূর্ণাঙ্গ উদার ও অসীম হইয়া উঠে, আর যখন পরমদেবতার চরণে উন্নীত হয় তখন মানুষ যাহাকে প্রেম বলে তাহা একটা বাহ্য অক্ষম ক্ষণিক বৃত্তি মাত্র থাকে না, বিশুদ্ধ গভীর মহান মিলনসাধক আনন্দে পরিণত হয়।

বিশ্বগত পরমপুরুষের প্রতি দিব্য প্রেমই হইবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিধান কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে সকল প্রকার ব্যক্তিগত প্রেমকে বর্জন করিতে হইবে, ব্যক্ত বিশ্বে অন্তরাত্মার সঙ্গে অন্তরাত্মার কোন বন্ধন থাকিবে না। তবে সেখানে আবশ্যক এক চৈত্য রূপান্তরের, আবশ্যক অজ্ঞানের সকল মুখোশ খসাইয়া ফেলিবার, আবশ্যক অহংগত মন প্রাণ দেহের সেই সকল গতিবৃত্তির পরিশুদ্ধি যাহারা আমাদের পুরাতন নিম্নতর চেতনাকে দীর্ঘকালস্থায়ী

করিয়া রাখে ; প্রেমের প্রত্যেক গতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে আর তাহা মনের রুচি, প্রাণের রাগ অনুরাগ, দেহের কামনা বাসনার উপর নির্ভর করিবে না, তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে আত্মার সঙ্গে আত্মার পরিচয়ের উপর—প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক মূল ভিত্তির উপর, মন প্রাণ ও দেহ সেই মহান একত্বের আত্মপ্রকাশের যন্ত্র ও উপাদান মাত্র হইয়া থাকিবে। এই রূপান্তরে ব্যক্তিগত প্রেমও এক স্বাভাবিক উত্তরণের দ্বারা সর্ব্বানুস্যূত পরম একের দ্বারা অধিকৃত দেহ মন ও আত্মার মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাত্মার, দিব্যপুরুষের প্রতি দিব্য প্রেমে পরিণত হইবে।

বস্তুতঃ অনুরাগ ও পূজায় ভরা সকল প্রেমের পশ্চাতে এক আধ্যাত্মিক শক্তি আছে ; এমন কি যখন সে প্রেম অজ্ঞানবশে কোন সসীম পাত্রে অর্পিত হয় তখন সে অনুষ্ঠানের দৈন্য ও তাহার পরিণামের ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়াও সেই মহিমার একটা ছটা বাহির হয়। কেননা আরাধনাত্মক প্রেম যুগপৎ এক অভীপ্সা ও এক প্রস্তুতি ; সে প্রেম তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেও ক্ষণেকের জন্য এমন উপলব্ধি আনিতে পারে যাহা অল্পবিস্তর অন্ধ ও অপূর্ণ হইলেও এক অপরূপ বস্তু ; কেননা উপলব্ধির এই সমস্ত মুহূর্ত্তে আমরা নহি কিন্তু সেই পরম একই আমাদের মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হইয়া দাঁড়ান এবং এই অনন্ত প্রেম ও প্রেমিকের ক্ষীণ আভাসে মানুষী অনুরাগও উর্দ্ধায়িত ও মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। এই কারণেই দেবদেবীর অর্চ্চনা, প্রতিমার পূজা, আকর্ষণের বস্তুরূপে কোন মানুষের বা আদর্শের আরাধনাকে অবজ্ঞা করা যায় না ; কেননা এ সমস্ত হইল সোপানাবলি যাহাদের মধ্য দিয়া মানবজাতি অনন্তের সেই পরম অনুরাগ ও পরম আনন্দের দিকে অগ্রসর হয়; এ সমস্ত সেই অনন্তকে সীমিত করে বটে, তথাপি প্রকৃতি যে সমস্ত অধস্তন সোপান আমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে তাহা এখনও যখন আমাদিগকে ব্যবহার এবং আমাদের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর রূপে স্বীকার করিতে হইবে তখন আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টির নিকট তাহারাই সে অনন্তের প্রতীকরূপে কার্য্য করে। আমাদের আবেগময় সত্তার পরিপুষ্টি ও পরিণতির জন্য কোন না কোন প্রকার মূর্ত্তি বা প্রতীকের পূজা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন, আর এই সত্য যে মানুষ জানে সে যতক্ষণ পূজকের হৃদয়স্থ মূর্ত্তি যাহার প্রতীক সেই পরমসদ্বস্তুকে তাহার স্থানে না বসাইতে পারিবে ততক্ষণ কখনও সে মূর্ত্তিকে চূর্ণ করিতে ব্যগ্র হইবে না। তাহা ছাড়া, এ সমস্তের এই শক্তি আছে এইজন্য যে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই অন্তর্নিহিত হইয়া এমন একটা কিছু আছে যাহা ইহাদের বাহ্যরূপের চেয়ে

অনেক বড়, এমন কি যখন আমাদের পজা পরমপূজায় পরিণত হইবে তখনও সেই কিছু থাকিয়া যাইবে, তখন তাহা সেই পূজার উদার সার্ব্বভৌমিকতার অংশে বা প্রবর্দ্ধিত রূপে পরিণত হইবে। আমাদের জ্ঞান তখনও অপরিণত, প্রেম তখনও অপূর্ণ থাকিবে যখন আমরা সকল রূপ ও সকল অভিব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া যে পরাৎপর রহিয়াছেন তাঁহাকেও জানিয়াছি বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সর্ব্বজীবে সর্ব্ব বস্তুতে মানুষে জাতিতে পশুতে বৃক্ষে ফুলে, আমাদের সকল কাজে প্রকৃতির সকল শক্তিতে তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই বা স্বীকার করি নাই ; যখন সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইব তখন এ সমস্ত আমাদের নিকট এক জড় যন্ত্রের অন্ধক্রিয়া মাত্র থাকিবে না ; সব কিছুকে দেখিব এক বিরাট সার্ব্বভৌম শক্তির রূপ ও বীর্য্যরূপে, কারণ এই সমস্ত বস্তুর মধ্যেও তো সেই শাশ্বত বিদ্যমান আছেন।

বাক্য-মনের অতীত পরমভাব স্বরূপ পরাৎপরকে অর্পিত অনির্ব্বচনীয় চরম ভক্তি এবং আরাধনাও অপূর্ণ থাকে, যদি যেখানেই তাঁহার প্রকাশ ঘটে অথবা এমন কি যেখানে তিনি তাঁহার ভগবত্তাকে ঢাকিয়া রাখেন সেই খানে, মানুষীতনুতে সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব বস্তুতে আমাদের পূজা অর্পণ করিতে না পারি। ইহাও সত্য যে এক অবিদ্যা আমাদের হৃদয়কে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহার অনুভূতিকে বিকৃত করিতেছে, তাহার উৎসর্গের যথার্থ তাৎপর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ; যে সকল আংশিক পূজা, যে সকল ধর্ম্ম উপাস্য দেবতার একটা মানস বা ভৌতিক প্রতিমা গড়িয়া নেয় তাহারা অবিদ্যার এক প্রকার এক আবরণ দ্বারা মূর্ত্তির অন্তরস্থ সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার ও রক্ষণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হয় এবং সহজেই মূর্ত্তির মধ্যে সত্যকে হারাইযা ফেলে। কিন্তু ব্যতিরেকী জ্ঞানের দম্ভ ও সংকীর্ণতাও তো একটা বন্ধন, একটা অন্তরায়। কারণ ব্যক্তিগত প্রেমের অন্তরালে তাহার অজ্ঞান মানুষী মূর্ত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে মনের অগোচর এক নিগূঢ় তত্ত্ব, ভগবদ্ বিগ্রহের এক পরম রহস্য, অনন্তের রূপের গুহ্যাতিগুহ্য এক তথ্য ; হৃদয়ের মহা আনন্দ এবং বিশোধিত ও ঊর্দ্ধায়িত ইন্দ্রিয়ের পরম অনুরাগের মধ্য দিয়াই শুধু যাঁহার নিকটে আমরা পৌঁছিতে পারি ; আর তাঁহার যে আকর্ষণ তাহা দিব্য মুরলিধর পরম দেবতারই ডাক, সর্ব্বসুন্দরেরই সর্ব্বাতিশয়ী সর্ব্বজয়ী আহ্বান, যাহা আমরা ধরিতে পারি অথবা যাহা আমাদিগকে ধরে শুধু অন্তরের এক গোপন প্রেম ও আকূতির মধ্য দিয়া, যে প্রেম অবশেষে একদিন রূপ ও অরূপের ভেদ ঘুচাইয়া দিয়া চিদাত্মার সহিত জড়কে এক করিয়া তোলে। এখানে এই অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্যে প্রেমাবিষ্ট আত্মা তাঁহাকেই খুঁজিতেছে

এবং তাঁহারই সন্ধান সে পায় যখন মানুষী প্রেম জড় বিশ্বে আবির্ভূত বিশ্বগত ভগবানের পরম প্রেমে রূপান্তরিত হয়।

ব্যক্তিগত প্রেমের সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল বিশ্বগত প্রেমের পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য ; সমবেদনা, মৈত্রী, সকলের মঙ্গলকামনা, জন হিতসাধন, সর্ব্বভূত ও সর্ব্ব মানবের প্রতি প্রেম, পারিপার্শ্বিক সকল নামরূপের দিকে আকর্ষণের মধ্য দিয়া আমাদের যে আত্মবিস্তৃতি ঘটে যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের অহমিকার প্রাথমিক বন্ধনগুলি হইতে মুক্তিলাভ করি তাহাকে সর্ব্বময় পরম-পুরুষের ঐক্যসাধক দিব্য প্রেমের মধ্যে আনিয়া মিলাইয়া দিতে হইবে। ভক্তির সার্থকতা হয় প্রেমে, প্রেম আনন্দে পর্য্যবসিত হয়—ভক্তিমার্গের শেষস্তরে এক সর্ব্বাতিক্রমী প্রেম, পরাৎপরের সত্তাতে পরম আনন্দের আত্ম-বিস্মৃতিকর এক রসোল্লাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে—এই প্রেমভক্তি ও আনন্দের এক উদারতর পরিণতিতে দেখা দেয় সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেম, যাহা কিছু আছে তাহাতে আনন্দ ; তখন সকল আবরণের পশ্চাতে আমরা ভগবানকেই অনুভব করি, আত্মা দিয়া আলিঙ্গন করি সেই সর্ব্বসুন্দরকে তাঁহার সকল রূপে। তাঁহার অপার আত্মপ্রকাশের এক সর্ব্বজনীন আনন্দ আমাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই স্রোতের মধ্যে গ্রহণ করে সকল রূপ সকল গতিবৃত্তিকে, অথচ কোন রূপে তাহা বদ্ধ হয় না, কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়ায় না, সর্ব্বদা অগ্রসর হইয়া চলে মহত্তর ও পূর্ণতর অভিব্যক্তির দিকে। এই সার্ব্বভৌম প্রেম মুক্তিপ্রদ এবং রূপান্তর সাধনের সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন ; কেননা, যে হৃদয় সকল রূপ ও বাহ্য মূর্ত্তির পশ্চাতে স্থিত অদ্বয় সত্যকে অনুভব করিয়াছে এবং তাহাদের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছে, তাহাদের বিরোধ ও বৈষম্য সে হৃদয়ের উপর আর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। নিরহঙ্কার কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অন্তরাত্মার নিরপেক্ষ সমতা, দিব্য প্রেমের ঐন্দ্রজালিক সংস্পর্শে এক সর্ব্বগ্রাহী রসোল্লাসে, অনন্ততনু এক পরমানন্দে রূপান্তরিত হয়। তাহার অপার অনন্ত এই ক্রীড়াগৃহে সকল বস্তুই সেই দিব্য পরম প্রেমাস্পদের দেহ, সকল গতিবৃত্তিই তাঁহার খেলা হইয়া দাঁড়ায় ; এমন কি দুঃখ যন্ত্রণাও রূপান্তরিত হইয়া যায়, দুঃখদায়ক বস্তুরাজির প্রতিক্রিয়া ও তাহাদের স্বরূপ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়, তাপ ও ক্লেশের সকল রূপ অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থানে আনন্দের নানা বিচিত্ররূপের আবির্ভাব হয়।

ইহাই হইল চেতনার রূপান্তরের মূল প্রকৃতি, যে রূপান্তর সমগ্র জীবনকে ভগবদ্ প্রেম ও আনন্দের এক গৌরবময় ক্ষেত্রে পরিণত করে। সাধকের পক্ষে স্বরূপতঃ ইহার সূত্রপাত হয় যখন সে সাধারণ প্রাকৃত হইতে আধ্যাত্মিক

স্তরে উন্নীত হইতে এবং নিজেকে অপরকে ও জগৎকে হৃদয়ের এক নবীন জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়া দেখিতে থাকে। ইহার চরম অবস্থা ঘটে যখন আধ্যাত্মিক স্তরও অতিমানস স্তর হইয়া দাঁড়ায় এবং সাধকের পক্ষে তখন ইহাকে স্বরূপে অনুভব করা শুধু যে সম্ভব হয় তাহা নহে কিন্তু ইহা যে সমগ্র আন্তর জীবন এবং সমগ্র বাহ্য সত্তাকে রূপান্তরিত করিবার এক অমোঘ বীর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সক্রিয়ভাবে উপলব্ধ হয়।

*

প্রেমের স্বরূপ ও প্রকৃতির পক্ষে বিমিশ্র সসীম মানুষী আবেগ হইতে সর্ব্বব্যাপী দিব্য পরানুরক্তিতে এই যে রূপান্তর, মন যে একেবারে তাহা ধারণা করিতে পারে না তাহা নহে, যদিও নিজের বহুপ্রকার পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ মানবেচ্ছা তাহা সহজে মানিয়া লইতে পারে না। প্রেমের পক্ষে কর্ম্মে অভিব্যক্তির সময় হয়ত কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আসিয়া পড়িতে পারে। জ্ঞানমার্গের একপ্রকার উচ্চ আতিশয্যে অভিভূত সাধকের মত এখানেও সমস্যার গ্রন্থিমোচন না করিয়া গ্রন্থিচ্ছেদন করা এবং প্রেমের উচ্চ প্রকৃতির সহিত পার্থিবক্রিয়ার স্থূলতার মিলনসাধনের দুরূহতা এড়াইয়া চলা সম্ভব হইতে পারে; বাহ্যজীবন ও কর্ম্ম হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইয়া হৃদয়ের নীরবতার মধ্যে একান্তে নিরালায় ভগবানে ভক্তি ও আরাধনায় নিমগ্ন হইয়া বাস করা যাইতে পারে। প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ, পূজা অনুষ্ঠানাদি প্রতীকস্থানীয় যে সমস্ত কর্ম্ম স্বভাবতঃ ভগবৎপ্রেমেরই অভিব্যক্তি অথবা যাহা এই সমস্তের সহিত যুক্ত হইতে অথবা ইহাদের ভাব ও প্রকৃতির অংশীভূত হইতে পারে তেমন গৌণ কর্ম্ম শুধু স্বীকার, আর বাকি সব ত্যাগ করাও সম্ভব হইতে পারে; অন্তরাত্মা তখন সাধু ও ভক্তসুলভ, ভগবৎকেন্দ্রিত বা ভগবল্লীন জীবনে আন্তর আকূতি পরিতৃপ্তির জন্য সব কিছু হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। আমাদের জীবনের দ্বার আরও বৃহৎভাবে খুলিয়া দিয়া যাহারা আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে তাহাদের এবং সমগ্র জাতির সেবার জন্য দিব্য প্রেমকে নিযুক্ত করিতে পারাও আমাদের পক্ষে সম্ভব; পরার্থপরতা লোকহিত ও জনসেবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে, দানশীলতা প্রীতি ও সদিচ্ছার বৃদ্ধি সাধন করিতে, মানব পশু ও সর্ব্বপ্রাণীর উপচিকীর্ষা-পরায়ণ হইতে পারি, একপ্রকার আধ্যাত্মিক অনুরাগের দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তিকে রূপান্তরিত করিতে, অন্ততঃপক্ষে তাহাদের কেবল মাত্র নৈতিক আকারের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণার বৃহত্তর শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারি। বস্তুতঃ আধুনিক ধার্ম্মিক মানুষের মন প্রায় সর্ব্বদাই এইরূপ সমাধানকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করে, চারিদিক হইতে বিশ্বাসভরে এই কথাই বলিতে শোনা যায় যে ঈশ্বরান্বেষুর

অথবা যাহার জীবন দিব্য প্রেম ও জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মানুষের ইহাই যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্র। কিন্তু যাহার লক্ষ্য ভগবানের সঙ্গে পার্থিব জীবনের পরিপূর্ণরূপে ঐক্যসাধন সেই পূর্ণযোগী এই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে অথবা জনহিত ও লোকসেবার ক্ষুদ্রতর নৈতিক আদর্শের বিধানের আয়তনের মধ্যে তাহার সেই পূর্ণ মিলনকে সীমিত করিয়া রাখিতে পারে না। পূর্ণযোগে কেবল প্রেম ও জনসেবার কর্ম্ম নহে পরন্তু আমাদের জ্ঞানের কর্ম্ম, শক্তির কর্ম্ম, উৎপাদন ও সৃষ্টির কর্ম্ম, আনন্দ সৌন্দর্য্য ও অন্তরাত্মার সুখকর কর্ম্ম, সংকল্প চেষ্টা ও সামর্থ্যের কর্ম্ম অর্থাৎ আমাদের সকল কর্ম্মই ভাগবত জীবনের অঙ্গীভূত কবিয়া লইতে হইবে। এই সমস্ত কর্ম্ম করিবার পদ্ধতিও হইবে আন্তর ও আধ্যাত্মিক, বাহ্য ও মনোগত নহে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন তাহাদের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে দিব্য প্রেমের ভাব, ভক্তি ও পূজার ভাব, ভগবান এবং ভগবৎ সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে দিব্য আনন্দের ভাব, যাহাতে তাহার সমগ্র জীবন হইয়া উঠিবে অন্তরাত্মার দিব্যপ্রেমের এক কর্ম্মযজ্ঞ, যিনি জীবনের অধীশ্বর তাঁহাব আরাধনা।

এইরূপে কর্ম্মের আন্তর ভাবের বলে জীবনকে পরমদেবতার ভক্তি ও আরাধনার কর্ম্মে পরিণত করা সম্ভব হইতে পারে; কেননা গীতা বলিয়াছে "যদি কেহ হৃদয়ের ভক্তির সঙ্গে একটি পত্র, একটি পুষ্প অথবা একটু জল আমাকে অর্পণ করে, আমি তাহা গ্রহণ করি এবং সেই ভক্তিনিবেদিত অর্ঘ্য সাদরে ভোগ করি", আর এরূপ প্রেম ও ভক্তিভরে বাহ্যবস্তুর অর্ঘ্যই শুধু তাহাকে নিবেদন করা যায় তাহা নহে, আমাদের সমস্ত ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, সমস্ত বাহ্য কর্ম্ম, কর্ম্মের সমস্ত রূপ ও বস্তু শাশ্বতের চরণে এইভাবে উৎসর্গ করা যাইতে পারে। ইহা সত্য যে বিশিষ্ট কোন কর্ম্মের বা কর্ম্মের কোন বিশিষ্ট রূপের নিজস্ব মূল্য আছে, এমন কি এক বৃহৎ মূল্য আছে, কিন্তু যে ভাবের প্রেরণায় কর্ম্ম করা হয় তাহাই তাহার মূলবস্তু; কর্ম্মটা হইল সেই ভাবের প্রতীক বা বাহ্য অভিব্যক্তি, ভাবই তাহার সমগ্র মূল্য প্রদান করে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ করে। অথবা বলা যাইতে পারে যে দিব্য প্রেম ও পূজার একটি সম্পূর্ণ কর্ম্মের তিনটি অঙ্গ বা অংশ আছে যাহারা একই সমগ্র কর্ম্মের অভিব্যক্তি,—প্রথম অঙ্গ কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবানের এক বাস্তব পূজা; দ্বিতীয়, যাহা কোন আন্তর দর্শন ও আকূতি অথবা ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ প্রকাশ করে কর্ম্মের তেমন মূর্ত্তিকে পূজার জন্য এক প্রতীকরূপে গ্রহণ; তৃতীয়, হৃদয়ে চৈত্যপুরুষে ও আত্মায় একত্বের বা একত্ব অনুভূতির জন্য অন্তরের এক ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আস্পৃহা। জীবনের পশ্চাতে বিশ্বাতীত ও বিশ্বব্যাপী প্রেমের,

একত্বের এষণা ও একত্ববোধের স্থাপনা করা ; প্রত্যেক কর্ম্মকে ভগবদভিমুখী ভাবাবেগের অথবা ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধের প্রতীক ও অভিব্যক্তি করিয়া তোলা ; আমরা যাহা কিছু করি তাহা ভগবদর্চ্চনায়, আত্মার সহিত সংযোগস্থাপনায়, মনের তদ্‌বোধে প্রাণের আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় হৃদয়ের আত্ম-সমর্পণে পরিণত করা—এই সমস্ত ধারা অনুসরণ করিয়া আমরা সমগ্র জীবনকে ভগবৎপূজায় রূপান্তরিত করিতে পারি।

যে কোন ধর্ম্মে প্রতীক, গূঢ়ার্থসূচক অনুষ্ঠান বা ভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি শুধু যে সৌন্দর্য্যবোধকে উদ্দীক্ত ও সম্পুষ্ট করে তাহা নহে, কিন্তু এ সমস্ত হইল স্থূল উপায় যাহার সাহায্যে মানুষ তাহার হৃদয়ের আবেগ ও আস্পৃহাকে বাহ্যভাবে স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত সক্রিয় ও শক্তিশালী করিয়া তোলে। কেননা যদি একথা সত্য হয় যে আধ্যাত্মিক আস্পৃহা ব্যতীত পূজা অর্থশূন্য ও নিষ্ফল, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে ক্রিয়া ও রূপ ব্যতীত আস্পৃহা হইয়া দাঁড়ায় এক অমূর্ত্তশক্তি যাহা জীবনের পক্ষে অপূর্ণরূপে কার্য্যকরী। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে মানবজীবনের সকল ক্রিয়াকলাপের নিয়তিই হইতেছে একটা দানা বাঁধিয়া যাওয়া, কেবল বাহ্যরূপ মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়া এবং ফলে সারহীন হইয়া পড়া ; এবং যদিও সেই লোকের জন্য সে সকল পদ্ধতি ও পূজার শক্তি রক্ষিত হয় যে তখনও তাহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তবু অধিকাংশ লোক পূজা-অর্চ্চনাকে যান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও প্রতীককে প্রাণশূন্য একটা চিহ্নমাত্র রূপে ব্যবহার করিতে থাকে আর তাহার ফলে ধর্ম্মের যথার্থভাব বিনষ্ট হয়, তাই অবশেষে তাহার রূপ ও পদ্ধতি হয় পরিবর্ত্তিত করিতে, না হয় একেবারে বর্জন করিতে হয়। এমন লোকও দেখা যায় যাহার কাছে সকল অনুষ্ঠান ও মূর্ত্তি এই কারণে অপ্রীতিকর ও পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায় ; কিন্তু বাহ্য প্রতীকের সাহায্য পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল ; তাছাড়া মানবপ্রকৃতির মধ্যে এমন একটা দিব্যভাব আছে যাহা আপনার পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির জন্য সর্ব্বদাই ঐরূপ প্রতীককে চায়। প্রতীক সর্ব্বদাই বিধিসঙ্গত হইবে যদি তাহা হয় সত্য, অকপট, সুন্দর ও আনন্দময় ; এমন কি একথাও বলা চলে যে যাহার মধ্যে সুন্দরের উপলব্ধি ও ভাবের আবেগ নাই তেমন আধ্যাত্মিক চেতনা পূর্ণরূপে অথবা অন্ততঃপক্ষে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবনে কর্ম্মের ভিত্তিরূপে থাকিবে নিরবচ্ছিন্ন এবং সঞ্জীবনী এক চিন্ময় চেতনা যাহা সর্ব্বদাই নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে অনুপ্রাণিত অথবা কোন রূপের মধ্যগত সত্যকে চিৎস্বরূপের প্রবাহদ্বারা নবভাবে উজ্জীবিত করিতে সর্ব্বদা সক্ষম, আর যাহার সৃজনী দৃষ্টি

ও আবেগের প্রকৃতিই হইবে এইভাবে আত্মপ্রকাশ করা এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে অন্তরাত্মার কোন সত্যের এক জীবন্ত প্রতীক করিয়া তোলা। আধ্যাত্মিকতার অন্বেষুকে এইভাবে জীবনকে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে হইবে, এইভাবে তাহার রূপকে পরিবর্ত্তিত এবং তাহাকে মূলতঃ গৌরবময় করিয়া তুলিতে হইবে।

পরম দিব্য প্রেম একটা স্জনীশক্তি, যদিও সে শক্তি নীরব ও নিশ্চলভাবে নিজেতেই অবস্থিত থাকিতে পারে, তথাপি বাহ্যরূপ ও অভিব্যক্তি তাহারই আনন্দলীলা, অমূর্ত্ত ও অবাক্ দিব্যভাবে বদ্ধ থাকিতে সে বাধ্য নহে। ইহাও বলা হইয়াছে যে স্ষ্টি প্রেমেরই এক ক্রিয়া, অন্ততঃপক্ষে তাহা এমন এক ক্ষেত্র গড়িয়া তোলা যাহার মধ্যে দিব্য প্রেম আপন প্রতীকরাজি উদ্ভাবন করিয়া অন্যোন্যপরতা ও আত্মদানের কার্য্যে নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে; আর যদি স্ষ্টির প্রাথমিক প্রকৃতি নাও হয় তথাপি ইহা নিশ্চয়ই চরম কাম্য ও লক্ষ্য হইতে পারে। এখন যে আমাদের সেরূপ মনে হয় না তাহার কারণ এই যে যদি বা দিব্যপ্রেমই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রাণীর এই ক্রমা-ভিব্যক্তিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি প্রাণের উপাদান ও কর্ম্ম গঠিত হইয়া উঠিয়াছে অহমিকার এক রূপায়ণ এক বিভাজন দ্বারা, আপাত উদাসীন এমন কি প্রতিকূল প্রাণহীন নিশ্চেতন জড়-জগতের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণশক্তি ও চেতনার এক সংগ্রামের মধ্য দিয়া। এই সংঘর্ষজনিত বিপর্য্যয় ও অন্ধকারের মধ্যে সকলেই পরস্পরের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, প্রত্যেকের মধ্যে সংকল্প রহিয়াছে যে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সে নিজের মধ্যে এবং তার পর শুধু গৌণভাবে অপরের মধ্যে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং শুধু আংশিকভাবে পরার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে; কেননা মানুষের পরার্থপরতাও মূলতঃ অহংগত আর ততদিন তাহা অহংগত থাকিতে বাধ্য যতদিন অন্তরাত্মা দিব্য একত্বের পরম রহস্যের সন্ধান না পাইতেছে। এই একত্বকে তাহার পরম উৎসের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া, অন্তর হইতে তাহাকে বাহিরে লইয়া আসা, সকল দিকে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাকে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া—ইহাই হইল যোগসাধনার কাম্য। সকল কর্ম্ম সকল বিস্ষ্টিকে পরিণত করিতে হইবে পূজায়, ভক্তির আত্মদানের এক সাক্ষাৎ-রূপে, এক প্রতীকে; তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই যাহা নিজের মধ্যে এক উৎসর্গের, দিব্য চেতনাকে গ্রহণ ও স্বীকারের বা প্রতিফলনের, পরম প্রেমাস্পদের সেবার, তাহার নিকট আত্মনিবেদনের ও আত্মসমর্পণের এক অভিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইবে। কর্ম্মের বাহ্যরূপ ও মূর্ত্তির মধ্যে যেখানেই সম্ভব সেখানে ইহা করিতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বদা ইহা করা চাই অন্তরের এরূপ ভাবাবেগ ও তীব্রতার

সঙ্গে যাহা দেখাইয়া দিবে যে ইহা অন্তরাত্মা হইতে শাশ্বতের দিকে প্রবহমান একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্রোতোধারা।

কর্ম্মের মধ্যে ভক্তি ও অর্চ্চনার ভাব নিজেই এক মহান পূর্ণ ও শক্তিমান যজ্ঞ, যাহা নিজেকে বহুগুণিত করিয়া পরম এককে আবিষ্কার করিবার পথে পৌঁছিতে এবং ভগবানের আত্মবিকিরণ সম্ভব করিয়া তুলিতে চায়। কেননা ভক্তি কর্ম্মে মূর্ত্ত হইয়া উঠিলে কেবল যে তাহার নিজের পথ পরিপূর্ণ ও উদার, সবল ও সক্রিয় করিয়া লয় তাহা নহে, পরন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ পার্থিব কর্ম্মের কঠিনতর পথের মধ্যেও প্রেম ও আনন্দের আবেগময় এমন উপাদান লইয়া আসে, অনেক সময় সাধনার প্রারম্ভে যাহার অস্তিত্ব থাকে না—যখন শুধু কঠোর আধ্যাত্মিক সংকল্প দুরারোহ উর্দ্ধায়নের পথে প্রবল প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় আর হৃদয় যখন নিদ্রামগ্ন বা নীরবতায় বদ্ধ থাকে। যদি ইহার মধ্যে দিব্য প্রেমের ভাব প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে হ্রাস পায় পথের শুষ্ক কঠোরতা, লঘু হয় মনের উপর চাপের গুরুভাব, বাধা বিপত্তি ও সংগ্রামের মর্ম্মমূলেও সঞ্চারিত হয় এক আনন্দ-মধুর রস। বস্তুতঃ পরম দেবতার কাছে আমাদের সংকল্প ও ক্রিয়াকর্ম্মের অবশ্যকরণীয় নিবেদন ও সমর্থন শুধু তখনই পরিপূর্ণ ও সর্ব্বতো-ভাবে কার্য্যকরী হয় যখন তাহা হয় প্রেমবশে এক সমর্পণ। যখন সমগ্রজীবনকে এই ভক্তিপূর্ণ পূজায় পরিণত করা যায়, ভগবৎ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমে ভরপুর হইয়া নানা ছদ্মবেশে অভিব্যক্ত ভগবান বলিয়া দেখিয়া ও অনুভব করিয়া জগতের সকল প্রাণীর প্রতি প্রেমের বশে সকল কর্ম্ম করা যায়, তখন তাহা দ্বারাই আমাদের সেই সমগ্র জীবন ও কর্ম্ম পূর্ণযোগের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

হৃদয়স্থ ভক্তির আন্তর নিবেদন, প্রতীকের মধ্যে তাহার আত্মার দর্শন, কর্ম্মের মধ্যে তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের উপলব্ধি, ইহাই হইবে যজ্ঞ বা উৎ-সর্গের প্রাণ। যদি উৎসর্গকে পরিপূর্ণ ও সার্ব্বভৌম করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের সকল ভাবাবেগকে ভগবানের দিকে নিশ্চিতরূপে ফিরাইয়া দিতে হইবে। মানব-হৃদয়ের পবিশুদ্ধির ইহাই প্রবলতম উপায়, আর ইহাই যে কোন প্রকার নীতি ও রসবোধের তপস্যা, তাহাদের অর্দ্ধশক্তি ও বাহ্য প্রভাবের দ্বারা যতটা শক্তিশালী হইতে আশা করিতে পারে তদপেক্ষাও অধিক শক্তি ও সামর্থ্য ধারণ করে। অন্তরের বেদীতে এক চৈত্য হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ভগবানের নামে সব কিছু নিক্ষেপ করিতে হইবে। সেই হুতাশনে আমাদের ভাবাবেগরাজি তাহাদের সকল স্থূলতর উপাদান বিসর্জন দিতে বাধ্য হইবে, অদিব্য বিকৃতি যাহা কিছু আছে তাহা তাহাতে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, বাকি সব কিছু তাহাদের অপ্রাচুর্য্য পরিত্যাগ করিবে, অবশেষে সেই অগ্নির

শিখা ধূম্র ও ধূপগন্ধের মধ্য দিয়া বৃহত্তম প্রেম ও অনবদ্য দিব্য আনন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটিবে। এইভাবে উন্মিষিত দিব্য প্রেম, আন্তর অনুভূতিতে মানুষ ও সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরস্থ ভগবানের দিকে সক্রিয় সার্ব্বভৌম সমতার সহিত যখন বিস্তার লাভ করিবে তখনই তাহা জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের পক্ষে অধিকতর ফলশালী হইবে এবং ভ্রাতৃভাবের মনোময় নিষ্ফল আদর্শের চরম অবস্থা হইতেও অধিকতর খাঁটি এক সাধনযন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। কর্ম্মের মধ্যে প্রবাহিত এই প্রেমই শুধু জগতে এক সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিতে সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে প্রকৃত এক একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ. পার্থিব প্রকৃতির নিরঙ্কুশ অভিব্যক্তির মর্ম্মরূপে যতদিন পর্য্যন্ত দিব্যপ্রেম আত্মপ্রকাশ না করিতেছে ততদিন এ উদ্দেশ্যসাধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

এইখানে যজ্ঞের পুরোধারূপে আমাদের অন্তরে নিগূঢ় চৈত্যপুরুষের উন্মেষ ও প্রকাশ সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; কেননা কেবলমাত্র এই অন্তরপুরুষই কর্ম্মের মধ্যে চিৎপুরুষের পূর্ণশক্তিকে, প্রতীকের মধ্যে আত্মাকে প্রকট করিতে সমর্থ। যখন অধ্যাত্মচেতনা অপূর্ণ রহিয়াছে, এমন কি তখনও শুধু ইনিই প্রতীকের মধ্যে চিরনবীনতা সরলতা ও সৌন্দর্য্যকে স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখিতে এবং তাহার প্রাণহীন রূপমাত্রে অথবা দূষিত ও দোষজনক ইন্দ্রজালে পর্য্যবসিত হওয়া নিবারণ করিতে পারেন; কেবলমাত্র ইনিই কর্ম্মের তাৎপর্য্যের সহিত তাহার শক্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ। মন প্রাণশক্তি শরীরচেতনা প্রভৃতি আমাদের সত্তার অন্যান্য সকল অঙ্গ এতটা অজ্ঞানের শাসনাধীনে রহিয়াছে যে তাহারা সাধনযন্ত্র বা করণরূপেও নির্ভরযোগ্য নহে, আমাদের পরিচালক নেতা অথবা কোন অভ্রান্ত প্রেরণার উৎস হওয়া তো দূরের কথা। এই সমস্ত শক্তির প্রণোদনা ও ক্রিয়ার অধিকাংশ সর্ব্বদাই প্রাচীন বিধিবিধানে, প্রবঞ্চক অনুশাসনে, প্রকৃতির বহুকাল পোষিত অধস্তন গতিবৃত্তিতে সংসক্ত থাকে এবং যখন ঊর্দ্ধ হইতে আবাহন ও শক্তি আসিয়া আমাদিগকে আত্মাতিক্রম করিয়া যাইতে এবং বৃহত্তর সত্তা ও উদারতর প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইতে প্ররোচিত করে তখন তাহারা অসম্মতি, ভীতি, বিদ্রোহ বা প্রতিবন্ধক জড়তা সঙ্গে লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সাড়া হয় প্রকাশ্য প্রতিরোধ, নয় ত সঙ্কোচযুক্ত স্বীকৃতি অথবা স্বার্থকুটিল সাময়িক সম্মতি। কারণ যখন তাহারা ডাক শুনিতে এবং তদনুসারে চলিতেও চায় তখনও—হয় সচেতনভাবে না হয় গতানুগতিক অভ্যাসবশে—আধ্যাত্মিক ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহাদের নিজেদের স্বাভাবিক অক্ষমতা ও ভ্রান্তি আনিয়া ফেলে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা চৈত্য ও আধ্যাত্মিক প্রভাবকে অহংগত সুখসুবিধালাভের জন্য প্রয়োগ করিতে

চায়, লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে তাহারা ঐ সব উর্দ্ধতন প্রভাবের শক্তি দীপ্তি ও আনন্দকে নিম্নতর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিতেছে। তাহার পরেও যখন সাধক বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত বা বিশ্বানুস্যূত দিব্য প্রেমের নিকট নিজেকে খুলিয়া ধরিতে সমর্থ হয়, তখনও সেই প্রেমধারাকে জীবনের মধ্যে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেলেই সে দেখিতে পায় যে এই সমস্ত নিম্নতর প্রাকৃতশক্তি সে ধারাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া দিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সমস্ত শক্তি সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন গহ্বরের দিকে টানিয়া লইতে চায়, সেই উচ্চতর তীব্রতার মধ্যে নিজেদের খর্ব্বকারী উপাদানরাজি ঢালিয়া দেয়, যে শক্তি নামিয়া আসিতেছে নিজেদের এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইবার জন্য তাহাকে অধিকার করিতে এবং অধঃপাতিত করিয়া বাসনা ও অহমিকার জন্য অতিস্ফীত মন প্রাণ ও দেহের যন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। দিব্যপ্রেমকে সত্য ও জ্যোতির এক নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর স্রষ্টারূপে গ্রহণ না করিয়া পুরাতন এই পৃথিবীর কর্দ্দমকে স্বর্ণিম করিবার এবং ভাবোচ্ছ্বাসময় প্রাণিক কল্পনার এবং মনের আদর্শে গঠিত কল্পলোকের স্বপ্নরাজির পঙ্কিল অবাস্তব প্রাচীন আকাশকে শুধু গোলাপী ও নীলরঙে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিবার এক প্রচণ্ড সমর্থক ও গৌরবদায়ক উর্দ্ধায়িত শক্তিরূপে সে প্রেমকে এখানে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়। এই মিথ্যার খেলাকে যদি চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উচ্চতর জ্যোতি শক্তি ও আনন্দ অপসৃত হয়, সাধক আবার নিম্নতর ভূমিতে নামিয়া পড়ে; নতুবা তত্ত্বোপলব্ধি অর্দ্ধপথে এক বিপদসঙ্কুল মিশ্রণে বাঁধা পড়িয়া থাকে অথবা যাহা খাঁটি আনন্দ নহে তেমন এক নিম্নতর উল্লাসের দ্বারা আবৃত এমন কি তাহার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই কারণে যাহা সর্ব্ববিসৃষ্টির অন্তরে অনুস্যূত এবং যাহা সৃজনের ও উদ্ধারসাধনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি সেই দিব্য প্রেম পার্থিব জীবনে আজিও খুব অল্পই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, অতি অল্প পরিমাণে সৃষ্টি করিতে বা মানুষকে তাহার অবর প্রকৃতির পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সকল দিব্যশক্তির মধ্যে প্রেমই প্রবলতম শুদ্ধতম দুর্লভতম ও তীব্রতম বলিয়াই মানবপ্রকৃতি বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই; মানুষ ইহার সামান্য যে অংশটুকু মাত্র ধরিতে পারিয়াছে তাহাও তৎক্ষণাৎ বিকৃত করিয়া পরিণত করিয়াছে প্রাণগত ধার্ম্মিকতার এক উৎকট আবেগে, ধর্ম্ম বা নীতির সমর্থনের অযোগ্য এক ভাববিলাসে, ইন্দ্রিয়সুখানুরাগী এমন কি কামভোগপরায়ণ মনের গোলাপী রং-এ রঞ্জিত আদিরসাত্মক এক রহস্যময় ভাবুকতায় অথবা মলিন ও পঙ্কিল এক উদ্দাম প্রাণতাড়নায়, এবং এই সমস্ত

নকল বস্তু দ্বারা নিগূঢ় যে অধ্যাত্ম বহ্নি আপন যজ্ঞশিখারাজির দ্বারা জগৎকে পুনর্গঠিত করিতে পারিত তাহাকে অন্তরগৃহে স্থাপন করিবার অসামর্থ্যের ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিয়াছে। একমাত্র অনাবৃত ও নিজের পূর্ণশক্তি লইয়া বিকাশশীল আমাদের অন্তরতম চৈত্যপুরুষই ঊর্দ্ধাভিমুখী যজ্ঞকে এই সমস্ত গুপ্ত আক্রমণ ও চোরাগর্তের মধ্য দিয়া অক্ষত অবস্থায় পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে পারেন ; এই পুরুষই প্রতিমুহূর্তে মন ও প্রাণের সকল অসত্যকে ধরেন, তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ ও তাহাদিগকে বিদূরিত করেন, দিব্য প্রেম ও আনন্দের সত্যকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন এবং মনের আবেগ ও উত্তেজনা এবং প্রাণশক্তির অন্ধ ভ্রমজনক তাড়না ও উন্মাদনা হইতে পৃথক করিয়া তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় সত্তার মর্ম্মমূলে যাহা কিছু সত্য আছে তাহার সবকে মুক্ত করিয়া তাহাব অভিযানের সঙ্গে লইয়া তিনি অগ্রসর হন, অবশেষে সুউচ্চ শিখরে পৌঁছিলে তাহারা নূতন প্রকৃতি ও মহিমাময় রূপে বিভূষিত হয়।

তথাপি অন্তরতম চৈত্যপুরুষের পরিচালনা পূর্ণরূপে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে না যতদিন সে-সত্তা অধস্তন প্রকৃতির এই পিণ্ড হইতে নিজেকে উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভূমিতে তুলিয়া লইতে না পারিবে, যতদিন এখানে অবতীর্ণ দিব্য স্ফুলিঙ্গ ও শিখা তাহাদের মূল প্রদীপ্ত মহাকাশের সঙ্গে পুনরায় যোগস্থাপন না করিবে। কারণ সেই মহাকাশে এমন কোন আধ্যাত্মিক চেতনা নাই যাহা এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে এবং যাহা মানুষের মন-প্রাণ-দেহের ঘন আবরণের পশ্চাতে নিজের অর্দ্ধেকটা হারাইয়া বসিয়াছে—কিন্তু তথায় নিজস্ব পবিত্রতা স্বাধীনতা ও তীব্র বিশালতায় গরীয়ান এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক চৈতন্য বিরাজ-মান রহিয়াছে। সেখানে যেমন যিনি শাশ্বত পরম জ্ঞাতা তিনিই আমাদের মধ্যে জ্ঞাতা হইয়া সকল জ্ঞানের প্রয়োগ ও পরিচালনা করিতেছেন তেমনি যিনি শাশ্বত পরম আনন্দ ও পরমপূজ্য তিনিই তাঁহার নিজের সত্তা ও আনন্দের যে দিব্য শাশ্বত অংশ বিশ্বলীলার মধ্যে প্রসৃত হইয়াছে তাহাকেই নিজের নিকট আকর্ষণ করিতেছেন, যিনি অনন্ত প্রেমিক তিনি আনন্দময় এক একত্বের মধ্যে আপনাকে আপনারই অসংখ্য প্রকটমূর্ত্তির মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিতে-ছেন। সেখানে জগতের সকল সৌন্দর্য্যই সেই পরম প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের সকল রূপকেই দাঁড়াইতে হয় সেই শাশ্বত সুন্দরের জ্যোতির তলে আর নিজেদিগকে নত করিয়া দিতে হয় অনাবৃত দিব্য পূর্ণতার শুদ্ধি ও উন্নতিবিধায়িনী রূপান্তরকারিণী শক্তির সম্মুখে। সেখানে সকল আনন্দ ও উল্লাসই সেই সর্ব্বানন্দময়ের আনন্দ, আর এই পরমানন্দের তীব্র প্লাবন

অথবা স্রোতোবেগের অভিঘাত সকল রূপের উপর আসিয়া পড়ে এবং সেই দারুণ অভিঘাতের ফলে, হয় কাঁচা অপূর্ণ বস্তু বলিয়া তাহারা ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় নয়ত দিব্য আনন্দে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য হয়। এইভাবে ব্যক্তিগত চেতনাতে এক শক্তির অভিব্যক্তি হয় যাহা এক নিরঙ্কুশ সামর্থ্যের সহিত অবিদ্যার মধ্যস্থ ইষ্টার্থের (value) খর্ব্বতা 'ও পরিভ্রষ্টতা বিদূরিত করিতে পারে। অবশেষে শাশ্বতের প্রেম ও আনন্দের বিরাট সত্য 'ও তীব্র বাস্তবতাকে মর্ত্ত্যজীবনে নামাইয়া আনা সম্ভবপর হইয়া উঠিতে থাকে। অন্ততঃ আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার পক্ষে নিজেকে মনের ভূমি হইতে অতিমানসের জ্যোতি শক্তি 'ও বিশালতার মধ্যে তুলিয়া লওয়া সম্ভব হইয়া উঠে; সেইখানে অতিমানস বিজ্ঞানের জ্যোতি 'ও বীর্য্যের মধ্যে আছে দিব্য আত্মপ্রকাশ 'ও আত্মসংগঠনের শক্তির সেই সমৃদ্ধি 'ও আনন্দ যাহা অবিদ্যার জগৎকে'ও উদ্ধার করিয়া চিদ্বস্তুর সত্যের রূপে তাহাকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে সমর্থ।

সেখানে সেই অতিমানস বিজ্ঞানে আছে পরিপূর্ণ সার্থকতা, চরম উচ্চতা, আন্তর ভক্তি 'ও পূজাব সর্ব্বালিঙ্গনকারী পবিব্যাপ্তি, গভীর ও সার্ব্বভৌম একত্ব ও মিলন, প্রেমের প্রদীপ্ত পক্ষ পুটে বিধৃত পবম জ্ঞানের শক্তি 'ও আনন্দ। কেননা অতিমানস প্রেম লইয়া আসে এক সক্রিয় পবমানন্দ যাহা রিক্ত নিষ্ক্রিয় শান্তি 'ও নিশ্চলতা বা মুক্তমনের স্বর্গকে ছাপাইয়া উঠে অথচ যে গভীরতর 'ও ও বৃহত্তর প্রশান্তিতে অতিমানস নীরবতার সূত্রপাত তাহাকে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ করে না। প্রেমের যে একত্ব নিজের মধ্যে সমস্ত ভেদ-বিভেদকে ধারণ করিয়াও তাহাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতা ও আপাতবৈষম্যের দ্বারা খর্ব্ব বা বিনষ্ট হয় না তাহা অতিমানস ভূমিতে পূর্ণ সামর্থ্যে উন্নীত হয়। কেননা তথায় অন্তরাত্মা ও ভগবানের সুগভীর একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজীবের সহিত নিবিড় একাত্মবোধ বিশ্বের সমস্ত সম্বন্ধের খেলার সহিত এমন এক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য লইয়া আসিতে পারে যাহার ফলে একত্ববোধ আর'ও পূর্ণ হয়, পরাকাষ্ঠা লাভ করে। অতিমানস–বিভাবিত প্রেমের শক্তি নিঃসঙ্কোচে 'ও নিরাপদে জীবনের সকল সজীব সম্বন্ধকে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে স্থূল বিমিশ্র 'ও সংকীর্ণ মানুষী যোজনা হইতে মুক্ত এবং দিব্যজীবনের আনন্দময় উপাদানে উন্নীত করিয়া ভগবানের দিকে ফিরাইয়া ধরিতে পারে। কেননা অতিমানস অনুভূতির স্বভাবই এই যে তাহা দিব্য মিলন বা অসীম একত্বকে বিসর্জন বা বিন্দুমাত্র খর্ব্ব না করিয়া ভেদের খেলাকে স্থায়ীভাবে চলিতে দিতে পারে। অতিমানস-বিভাবিত চেতনার পক্ষে বিশ্ব 'ও মানুষের সকল সংস্পর্শকে শুদ্ধ

প্রদীপ্ত শক্তিতে এবং রূপান্তরিত তাৎপর্যে বরণ করিয়া লওয়া সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব, তাহার কারণ এই যে অন্তরাত্মা তখন প্রেম বা সৌন্দর্য্যের সকল আবেগ ও অনুসন্ধানের বিষয়রূপে সর্ব্বদা অদ্বিতীয় শাশ্বত বস্তুকেই অনুভব করিবে এবং এক উদার মুক্ত প্রাণপ্রণোদনাকে আধ্যাত্মিকভাবে ব্যবহার করিয়া সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরস্থ সেই অদ্বয় ভগবানের সাক্ষাৎ পাইতে ও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হইবে।

যজ্ঞকর্ম্মের এই তৃতীয় ও শেষ বিভাগে কর্ম্মযোগের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে যাহা প্রশস্ত তাহার সব কিছুকে একত্র করা যাইতে পারে; কেননা এখানেই রহিয়াছে তাহার সংসাধন ক্ষেত্র এবং বৃহত্তর প্রদেশ। জীবনের অধিকতরভাবে দৃশ্যমান সকল কার্য্যধারা ইহার অন্তর্গত; জড়জীবনের যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করিবার জন্য যে প্রাণৈষণা নিজেকে বাহিরে চারিদিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে তাহার নানাবিধ শক্তিরাজিও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। বৈরাগ্যপরায়ণ বা পরলোককামী আধ্যাত্মিকতা অনুভব করে যে এইখানেই তাহার সন্ধানের বস্তু পরম সত্যের এক দুস্তর অস্বীকৃতি রহিয়াছে; তাই সে পার্থিবজীবন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে এবং অনতিক্রম্য অবিদ্যার অন্ধকার ক্রীড়াক্ষেত্রকে চিরদিনের জন্য বর্জন করিতে বাধ্য হয়। তথাপি কিন্তু পূর্ণযোগ আধ্যাত্মিক বিজয় এবং দিব্যরূপান্তর সাধনের জন্য ঠিক এই সকল কর্ম্মধারাকে চায়। অধিকতররূপে বৈরাগ্যপরায়ণ সাধকগণ দ্বারা পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত, অপর অনেক সাধনপথযাত্রীর দ্বারা একটা সাময়িক পরীক্ষাক্ষেত্র কিম্বা প্রচ্ছন্ন আত্মাপুরুষের এক ক্ষণিক বাহ্য ও অস্পষ্ট লীলামাত্র-রূপে স্বীকৃত এই পার্থিব জীবনকে পূর্ণযোগের সাধক তাহার সিদ্ধির ভূমি, দিব্য কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রচ্ছন্ন অন্তর্যামী পুরুষের পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের স্থানরূপে সাদরে সমগ্রভাবে বরণ করিয়া লয়। তাহার জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য নিজেরই মধ্যে পরমদেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করা, এই জগতের মধ্যে তাঁহার পরিকল্পনা এবং বাহ্য মূর্ত্তিরাজির দ্বারা উপস্থাপিত আপাত-অস্বীকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত ভগবানকে এবং সর্ব্বশেষে বিশ্বাতীত শাশ্বতের সক্রিয় শক্তিনির্ঝরকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার করাও তাহার লক্ষ্য; কেননা পরাৎপরের অবতরণের ফলে এই বিশ্ব ও জীবাত্মার এমন শক্তিলাভ হইবে যে তাহারা তাহাদের ছদ্ম আবরণ বিদীর্ণ করিয়া

আত্মপ্রকাশক রূপে ও অভিব্যক্তির ধারায় সেইরূপ দিব্য হইয়া উঠিবে, বর্ত্তমানে তাহাদের নিগূঢ় স্বরূপসত্তায় গোপনভাবে তাহারা যেরূপ রহিয়াছে।

যাহারা পূর্ণযোগের মার্গ অনুসরণ করিতে চায় তাহাদিগকে যোগের এই লক্ষ্যকেই সমগ্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু সে গ্রহণ তাহার সিদ্ধির পথে যে প্রবল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া করিলে চলিবে না ; পক্ষান্তরে অন্য অনেক সাধনা যে কারণে বাধ্য হইয়া পার্থিব জীবনের যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এই লক্ষ্যের অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতি মানিয়া লওয়া দূরের কথা, ইহার সম্ভাবনাকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারে নাই তাহার সম্বন্ধেও পূর্ণরূপে সচেতন হইতে হইবে। কারণ এখানে এই পার্থিব প্রকৃতিতে জীবনের কর্ম্মধারার মধ্যেই রহিয়াছে সেই প্রচণ্ড বাধার মর্ম্মস্থান যাহা দর্শনকে ব্যাবৃত্তির উত্তুঙ্গ শিখরে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছে, ধর্ম্মের উৎসুক দৃষ্টিকে মরদেহে জন্মের ব্যাধি হইতে সুদূর স্বর্গের অথবা নির্ব্বাণের নীরব প্রশান্তির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। মর্ত্ত্যের সীমাবন্ধন ও অজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন গর্ত্তরাজি সত্ত্বেও শুদ্ধ জ্ঞানের পথ সাধকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল ; নিছক ভক্তি বা প্রেমের পথে নানা বাধাবিপত্তি দুঃখযন্ত্রণা ও পরীক্ষা থাকিলেও এই অবস্থার সহিত তুলনায় তাহা নির্ম্মেঘ নীলাকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়নের মত সহজ হইতে পারে। কেননা জ্ঞান ও প্রেম মূলতঃ বিশুদ্ধ ; তাহারা বিমিশ্র ব্যাহত দূষিত ও স্খলিত হইতে পারে কেবল তখনই যখন তাহারা প্রাণশক্তিরাজির অনিশ্চিত গতিধারার মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাহ্য জীবনের স্থূল ক্রিয়াবলি ও অনমনীয় অধস্তন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হয়। এই সমস্ত শক্তির মধ্যে কেবল এক প্রাণকে অথবা অন্ততঃপক্ষে কোন কোন প্রধান প্রাণজ সংকল্পকে যেন মূলতঃ অশুদ্ধ অভিশপ্ত বা অধঃপতিত বলিয়া মনে হয়। ইহার সংস্পর্শে ইহার নিস্তেজ কোষসমূহ দ্বারা আবৃত অথবা ইহার চাকচিক্যময় কর্দ্দমভূমিতে আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং দেবতারা পর্য্যন্ত প্রাকৃত পঙ্কলিপ্ত হইয়া পড়ে, ইহার অধোমুখী আকর্ষণের বশে বিকৃত হওয়ার এবং বিপদ পূর্ণভাবে আসুরী ও দানবী ভাবে পরিণত হওয়ার হাত হইতে মানুষ কদাচিৎ মুক্তি পায়। ইহার মূলে রহিয়াছে এক তমসাচ্ছন্ন অসাড় জড়ত্ব—যেখানে সব কিছু বাঁধা আছে দেহ ও দৈহিক অভাব আকাঙ্ক্ষার দ্বারা এক তুচ্ছ মনের সঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবেগ ও বাসনা, নগণ্য ও অসার ক্রিয়াধারা, অকিঞ্চিৎকর পুনরাবৃত্তি, প্রয়োজন, দায়িত্ব, সুখ ও দুঃখের সঙ্গে যাহারা মানুষকে তাহাদের বহিঃস্থিত কোন কিছুতে পৌঁছাইয়া দেয় না, নিজেদের অঙ্গেই এমন এক অজ্ঞানের ছাপ বহন করে যাহা আপন গতিবিধির কারণ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্ধ। জড়ত্বে ভরা এই দেহগত

মন তাহার ক্ষুদ্র পার্থিব দেবতাবৃন্দ ছাড়া অন্য কোন দিব্যবস্তুকে বিশ্বাস করে না ; হয়ত বৃহত্তর আরাম শৃঙ্খলা ও সুখভোগের প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু পরমোন্নতি এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি সে চায় না। কেন্দ্রস্থলে অধিকতর ভোগপরায়ণ এক সবলতর প্রাণ-সংকল্পের সাক্ষাৎ পাই কিন্তু সে এক অন্ধ দেবতা এক বিকৃত প্রেতাত্মা, তাহার উল্লাস সেই সব জিনিসে যাহা জীবনকে এক সংগ্রামশীল কোলাহল এবং এক দুঃখজনক পঙ্কিল আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ইহা মানবীয় বা দানবীয় কামনাময় এক আত্মা যাহা এই জগতের ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, আলো ও অন্ধকার, মত্ত হর্ষ ও তিক্ত মর্ম্মবেদনামিশ্রিত প্রবাহের বাহ্য চাক্‌চিক্যময় বর্ণ, বিশৃঙ্খল কাব্য, ভীষণ বিয়োগান্ত বা উত্তেজনা-পূর্ণ মিলনান্ত নাটকে সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা এই সমস্ত পদার্থকে ভালবাসে, অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে পাইতে চায়, এমন কি বেদনায় কাতর হইয়া যখন ইহাদের বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে অনুযোগ করে তখনও ইহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু গ্রহণ করিতে চায় না অথবা অন্য কিছুতে আনন্দিত হয় না ; ইহা উচ্চতর বস্তুকে ঘৃণা করে, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় ; যদি কোন দিব্যতর শক্তি ধৃষ্টতাবশতঃ জীবনকে পরিশুদ্ধ প্রদীপ্ত ও আনন্দময় করিয়া দিতে চায়, যদি তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে তীব্র উত্তেজক নানাদ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত এই সুরা কাড়িয়া লইতে চায় তাহা হইলে এই দানব ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে, পদদলিত করিতে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারিতে ধাবিত হয়। আর এক প্রকার প্রাণসংকল্প আছে যাহা উন্নতিশীল মানস আদর্শ অনুসরণ করিতে চায় এবং সে-আদর্শ যখন জীবনের মধ্য হইতে কতকটা সুসঙ্গতি সৌন্দর্য্য আলোক মহত্তর শৃঙ্খলার প্রতিশ্রুতি আনিয়া উপস্থিত করে তখন তাহার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, কিন্তু ইহা প্রাণপ্রকৃতির এক ক্ষুদ্রতর অংশমাত্র যাহা তাহার প্রচণ্ডতর অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ সঙ্গীদের দ্বারা সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতে পারে ; তাহা ছাড়া ইহা মনের অপেক্ষা কোন উচ্চতর ডাকে সহজে সাড়া দিতে পারে না,—যাহাতে আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণপ্রকৃতির বোধগম্য হয় তজ্জন্য সে ডাক যদি তাহার দাবিকে হ্রাস করিয়া (যেমন ধর্ম্ম সাধারণতঃ করিয়া থাকে) নিজেকেই ব্যর্থ করিয়া না দেয়। আধ্যাত্মিকতার অন্বেষু নিজের মধ্যে এই সমস্ত শক্তির সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহাদিগকে নিজের চারিপাশে দেখিতে পায়, ইহাদের মুষ্টিবন্ধন হইতে, তাহার নিজের ও তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত সকল মানবজীবনের উপর তাহাদের যে দীর্ঘকালব্যাপী আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে তাহার হাত হইতে মুক্ত হইবার এবং তাহা অপ-সারিত করিবার জন্য তাহাকে প্রবলভাবে সচেষ্ট হইতে, নিয়ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত

হইতে হয়। ইহাদের দেওয়া বাধা অতি প্রবল ; কেননা তাহাদের অধিকার এত শক্তিশালী, আপাত দৃষ্টিতে এত দুর্জয় যে তাহা সেই অবজ্ঞাসূচক প্রবচনকে ঠিকই সমর্থন করে যাহা মানবপ্রকৃতিকে কুকুরের লাঙ্গুলের সহিত তুলনা করে ; কারণ ধর্ম্ম নীতি যুক্তি অথবা মুক্তিপ্রদ অন্য কোন প্রচেষ্টার দ্বারা যতই সোজা করা যাক না কেন তাহা আবার তাহার প্রকৃতিগত বক্রতায় ফিরিয়া যায়। আবার সেই অধিকতর বিক্ষুব্ধ প্রাণসংকল্পের তীব্রতা এত উৎকট, তাহার মুষ্টিবন্ধন এত দৃঢ়, তাহার কামক্রোধাদির আবেগ ও ভ্রমপ্রমাদ এমনই বিষম বিপদজনক, তাহার আক্রমণের প্রচণ্ডতা অথবা অক্লান্ত বাধাবিঘ্নের দুরাগ্রহের প্রাবল্য এত সূক্ষ্ম, অভিযান এত দুর্দ্দম্য, স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত এত সনির্ব্বন্ধ যে সাধুসন্ত এবং যোগী পুরুষেরাও তাহাদের জটিল চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে তাহাদের নিজেদের নির্ম্মুক্ত পবিত্রতা অথবা সাধনলব্ধ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব রক্ষা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। সাধকের সংগ্রামরত সংকল্পের নিকট মনে হয় সে লাঙ্গুলের এই স্বাভাবিক বক্রতা দূর করিবার জন্য সকল চেষ্টাই বৃথা ; সংসার ছাড়িয়া পলায়ন, সুখময় স্বর্গলোকে প্রয়াণ অথবা শান্তিপূর্ণ বিলয়প্রাপ্তি—ইহাই জ্ঞানীর একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া সহজেই প্রশংসা পায়, আর যাহাতে পুনর্জন্ম না হয় তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন, এই পার্থিব জীবনের অবসাদজনক দাসত্বের বা হেয় নিকৃষ্ট বুদ্ধি বিভ্রমের অথবা অন্ধ অনিশ্চিত সুখ ও সম্পদের একমাত্র প্রতিবিধান হইয়া দাঁড়ায়।

তথাপি একটা উপায় থাকা উচিত এবং আছেও বটে, প্রতিকারের একটা পন্থা ও বিক্ষুব্ধ প্রাণপ্রকৃতির রূপান্তরের একটা সম্ভাবনা নিশ্চয়ই রহিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য জীবনের অন্তরতম প্রদেশে এবং তাহার নিজ তত্ত্বের মধ্যেই উন্মার্গগমনের কারণ খুঁজিয়া বাহির ও তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে, কেননা প্রতীয়মান বাস্তব দৃষ্টিতে যতই তমসাচ্ছন্ন ও বিকৃত বোধ হউক না কেন প্রাণও ভগবানের এক শক্তি, কোন দুষ্ট নিয়তি বা অন্ধ আসুরী প্রবেগ হইতে সৃষ্ট নহে। জীবনের মধ্যেই রহিয়াছে তাহার নিজের মুক্তির বীজ, তাই প্রাণবীর্য্যের মধ্য হইতেই আমাদিগকে উত্তরণের শক্তি ও শক্তিপ্রয়োগের যন্ত্র লাভ করিতে হইবে ; কেননা যদিও জ্ঞানের মধ্যে এক মুক্তিপ্রদ আলোক, প্রেমের মধ্যে এক পরিত্রাণ ও রূপান্তরের শক্তি আছে তবুও যতক্ষণ তাহারা প্রাণের স্বীকৃতি না পায় এবং যতক্ষণ ভ্রমশীল মানবীয় প্রাণশক্তিকে বিশোধিত ও উন্নীত করিবার কাজে তাহার কেন্দ্রস্থলে প্রমুক্ত কোন বীর্য্যকে ব্যবহার করিতে না পারে ততক্ষণ তাহারা এখানে ফলপ্রসূ হইতে পারে না। যজ্ঞকর্ম্মকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া সমস্যা-সমাধান সম্ভব নহে ; আমরা শুধু জ্ঞান ও প্রেমের

কর্ম্ম করিব, এই স্থির করিয়া ইচ্ছা ও সামর্থ্যের, প্রাপ্তি ও অধিকারের, উৎপাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা ফললাভের, যুদ্ধ এবং বিজয় ও প্রভুত্বের সকল কর্ম্মকে এক পাশে সরাইয়া রাখিতে পারি এবং বাসনা ও অহমিকার উপাদানে গঠিত বলিয়া অসামঞ্জস্য এবং শুধু বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পরিণত হইতে বাধ্য বিবেচনা করিয়া জীবনের এই বৃহত্তর অংশকে কাটিয়া ফেলিয়া দিতে পারি কিন্তু তাহাতে সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না। কারণ বস্তুতঃ জীবনকে এরূপভাবে ভাগ করা যায় না; সেরূপ করিবার চেষ্টা করিলে জীবনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে; কেননা আমরা জগৎ-শক্তির সমগ্র বীর্য্য হইতে নিজদিগকে পৃথক করিয়া ফেলিব এবং পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতির অতি প্রয়োজনীয় এক অঙ্গকে বন্ধ্যা করিয়া তুলিব এবং তন্মধ্যস্থিত সেই শক্তিকে হারাইয়া ফেলিব জগৎসৃষ্টির কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যাহা অতি আবশ্যকীয়। এখানে প্রকৃতির মধ্যে প্রাণশক্তিই অপরিহার্য্য মধ্যবর্ত্তী কার্য্যকরী উপাদান, মানসিক ক্রিয়াকে প্রদীপ্ত অমূর্ত্ত আন্তর রূপায়ণ মাত্র যদি না রাখিতে চাই তবে মনের পক্ষে প্রাণের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন প্রয়োজন; চিৎপুরুষও প্রাণকে চায় এই বিশ্বে তাহার অভিব্যক্তির সম্ভাবনাসমূহকে বাহ্য রূপ ও শক্তি দিবার জন্য, স্থূল জড় আধারে অবতীর্ণ আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য। প্রাণ যদি চিদ্বস্তুর অন্যান্য ক্রিয়াধারাগুলিকে নিজের মধ্যবর্ত্তী স্থানীয় শক্তির সাহায্য দিতে অস্বীকার করে অথবা নিজেই যদি তাহাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে এখানে তাহার ক্রিয়ার সকল প্রভাব বা পরিণাম থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক নিষ্ক্রিয় বিবিক্ততা অথবা স্বর্ণাভ অক্ষমতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে; অথবা যদি কিছু কাজ হয়ও, তবে তাহা হইলে ফল এই হইবে যে আমাদের কর্ম্ম মাত্র আংশিকভাবে পরিস্ফুরিত হইবে এবং সে কর্ম্মও হইবে বিষয়োন্মুখ অপেক্ষা অধিকতর অন্তর্ম্মুখী, তাহারা হয়ত জীবনে কিছু পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হইবে কিন্তু জীবনকে পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করিবার শক্তি তাহাতে থাকিবে না। তথাপি যদি প্রাণ তাহার শক্তিচয়কে যেমন আছে তেমনি অশুদ্ধ অবস্থায় আত্মার কাছে লইয়া আসে তাহা হইলে হয়ত অধিকতর কুফল দেখা দিবে, কেননা সম্ভবতঃ তাহা প্রেম বা জ্ঞানের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকে একটা ক্ষুদ্রতর দূষিত গতিতে পরিণত করিবে অথবা তাহাদিগকে নিজের অধস্তন উন্মার্গগামী ক্রিয়াধারার সহায় করিয়া লইবে। সৃষ্টি সমর্থ আধ্যাত্মিক সিদ্ধিকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার পক্ষে প্রাণ অপরিহার্য্য বটে কিন্তু সে প্রাণ হওয়া চাই বন্ধনমুক্ত, রূপান্তরিত ও উন্নীত—সাধারণ মনোময় মানবপশুর বা দৈত্য দানবের অথবা এমন কি দিব্য ও অদিব্য ভাবের মিশ্রণেভরা প্রাণ নহে। জগৎত্যাগী বা

স্বর্গকামী অপর যোগমার্গ যাহাই করুক না কেন পূর্ণযোগে ইহাই হইল কঠিন কিন্তু অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম, জীবনের বহির্ম্মুখী কর্ম্মের সমস্যা সমাধান না করিয়া তাহার উপায় নাই, সেই কর্ম্মের মধ্যে প্রকৃতিসিদ্ধ যে দিব্যতত্ত্ব আছে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে এবং প্রেম ও জ্ঞানের দিব্য তত্ত্বের সঙ্গে তাহাকে চিরকালের জন্য সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে।

যতদিন জ্ঞান ও প্রেম এতটা পরিণত না হইয়া উঠে যাহাতে তাহারা প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত ও সংস্কৃত করিবার জন্য তাহাব উপর নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ অধিকার লাভ করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত জীবনের কর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা স্থগিত বাখিলেও সমস্যার কোন মীমাংসা হয় না, কেননা আমরা দেখিয়াছি যে প্রাণের যে বিকৃতি জ্ঞান ও প্রেমের মুক্তিদায়ী শক্তিকে ব্যাহত বা পঙ্গু করিয়া দেয় তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আমাদিগকে অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হয়। একবার যদি আমাদের চেতনা অতিমানস প্রকৃতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতে পারিত, বস্তুতঃ তাহা হইলেই এ সমস্ত অসামর্থ্য দূরীভূত হইত। কিন্তু এইখানে এক উভয়সঙ্কট আসিয়া পড়ে, একদিকে অসংস্কৃত প্রাণশক্তির বোঝা ঘাড়ে লইয়া অতিমানসের শিখরে আরোহণ করা অসম্ভব আবার অন্যদিকে যতদিন পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম ও অতিমানসভূমি হইতে অব্যর্থ জ্যোতি ও অজেয় শক্তি নামাইয়া আনা না যায় ততদিন প্রাণ-সংকল্পের আমূল সংস্কারসাধনও সমভাবেই অসম্ভব থাকিয়া যায়। অতিমানস চেতনা জ্ঞান, আনন্দ, অন্তরঙ্গ প্রেম ও একত্বের শুধু নয় ইহা সংকল্প এবং বল ও সামর্থ্যের এক তত্ত্বও বটে, আর যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যক্ত প্রকৃতিতে সংকল্প বীর্য্য ও সামর্থ্যের উপাদান ততটা পরিমাণে পরিণত সংস্কৃত ও উন্নীত হইয়া না উঠে যাহাতে তাহারা উর্দ্ধতন তত্ত্বকে সহজে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে ততদিন সে চেতনা নামিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু সংকল্প বীর্য্য ও সামর্থ্য প্রাণ-শক্তিরই স্বাভাবিক উপাদান; প্রাণ যে জ্ঞান ও প্রেমের প্রাধান্য অস্বীকার করিতে পারে ইহাই তাহার কারণ,—কেননা প্রাণের প্রবেগ ও প্রণোদনার এক শক্তি আছে অনেক অধিক বিচারহীন হঠকারী ও বিপদজনক কিছুর পরিতৃপ্তির দিকে, তথাপি পরিণামে তাহার নিজের নির্ভীক ও জ্বলন্ত আকৃতি লইয়া সে ভগবানের দিকে, পরাৎপর ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসীও হইতে পারে। প্রেম ও প্রজ্ঞাই শুধু ভগবানের বিভাব তাহা নহে, শক্তিও তাঁহারই এক বিভাব। মন যেমন জ্ঞানের জন্য অন্ধকারে হস্তদ্বারা খুঁজিয়া বেড়ায়, হৃদয় যেমন প্রেমলাভের জন্য চেষ্টা করে প্রাণও তেমনি ক্ষীণদৃষ্টি ও অসংকোচ এষণা লইয়া যতই ভুল-চুকের মধ্যে চলুক না কেন, শক্তি ও শক্তিজাত আধিপত্যই সে অনুসন্ধান করে।

নীতিবাদী অথবা ধর্ম্মনিষ্ঠ মন স্বভাবতঃই বিকৃতিকারক ও অনর্থদায়ক বলিয়া শক্তিকেই যে নিন্দা করে, তাহা গ্রহণ বা অনুসন্ধানযোগ্য নয় যে মনে করে ইহা একটা ভুল ; অধিকাংশক্ষেত্রে এ মতের আপাত সমর্থন থাকা সত্ত্বেও মূলতঃ ইহা এক অন্ধ যুক্তিহীন কুসংস্কার। ইহার বিকৃতি ও অপব্যবহার যতই হউক না কেন, শক্তি এক দিব্য বস্তু, দিব্য ভাবে ব্যবহারের জন্যই এখানে স্থান পাইয়াছে—আর বিকৃতি ও অপব্যবহার তো জ্ঞান ও প্রেমেরও আছে। শক্তি সংকল্প ও সামর্থ্যই ত সকল জগতের চালক, আর জ্ঞানশক্তি বা প্রেমশক্তিই হউক, প্রাণশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি অথবা শারীরশক্তিই হউক মূলতঃ তাহা সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক, প্রকৃতি বা স্বভাবে তাহা দিব্য বস্তু। অজ্ঞানতাবশতঃ পাশব মানব বা দানব প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া শক্তির যে অপব্যবহার হয় তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং তাহার স্থানে যাহা অনন্ত ও শাশ্বতের সহিত এক সুরে বাঁধা আন্তর চেতনার দ্বারা পরিচালিত তেমন এক মহত্তর স্বভাবগত—এমন কি তাহা আমাদের নিকট অতিপ্রাকৃত হইলেও—কার্য্যধারাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পূর্ণযোগ প্রাণকর্ম্মরাজিকে বর্জন করিয়া কেবল এক অন্তর্ম্মুখী অনুভূতি লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না ; প্রাণশক্তিকে ভগবানের দ্বারা স্পৃষ্ট ও পরিচালিত এক যোগশক্তির অংশ ও ক্রিয়াধারা করিয়া লইয়া তাহাকে বহিস্তরের রূপান্তরসাধনের জন্য অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে।

আধ্যাত্মিকভাবে প্রাণকর্ম্মরাজিকে ব্যবহার করিতে গেলে নানা বাধা বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের সকলের কারণ এই যে প্রাণৈষণা অবিদ্যার মধ্যে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অলীক এক প্রকার এক কামময় আত্মা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বসাইয়াছে সেই দিব্য স্ফুলিঙ্গের স্থানে যাহা আমাদের যথার্থ চৈত্যসত্তা। বর্ত্তমানে জীবনের সমস্ত বা অধিকাংশ কর্ম্মই এই কামময় আত্মাদ্বারা প্রেরিত বা কলুষিত হইয়া রহিয়াছে অথবা তদ্রূপ মনে হয় ; এমন কি ধর্ম্ম বা নীতি দ্বারা প্রণোদিত কর্ম্ম অথবা এমন কি যে সব কর্ম্ম নিঃস্বার্থতা জনহিত আত্মোৎসর্গ বা আত্মত্যাগের ছদ্মবেশ পরিয়া আসে, কাম-রাগরঞ্জিত সূত্র তাহাদের মধ্যেও সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে দেখা যায়। এই কামময় আত্মা একটা ভেদগত অহমিকাময় আত্মা তাহার সকল সহজাত প্রবৃত্তির লক্ষ্য পৃথকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা ; সে হয় খোলাখুলিভাবে অথবা অল্পবিস্তর উজ্জ্বল মুখোশের আড়ালে থাকিয়া নিজের বৃদ্ধি ও প্রসার, আপন অধিকার ও ভোগ নিজের বিজয় ও সাম্রাজ্যলাভের জন্যই সর্ব্বদা সবলে চাপ দেয়। যদি জীবন হইতে অশান্তি অসামঞ্জস্য ও বিকৃতির অভিশাপকে অপসারিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত আত্মাকে, চৈত্যপুরুষকে জীবন-তরীর কর্ণধারের

স্থানে বসাইতে হইবে এবং বাসনা ও অহমিকার অলীক আত্মাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে জীবনকে পর্য্যন্ত নিগৃহীত করিতে, তাহার সার্থকতার স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করিতে হইবে ; কেননা এই বাহ্য কামময় আত্মার পশ্চাতে আমাদেরই মধ্যে এক ধ্রুব আন্তর প্রাণসত্তা আছে যাহার বিলোপসাধন করিতে হইবে না, বরং যাহাকে বাহিরে আনিয়া সুস্পষ্ট ও জ্বলন্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং দিব্য প্রকৃতির শক্তিরূপে তাহার নিজস্ব প্রকৃত কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এই খাঁটি প্রাণসত্তাকে আমাদের মধ্যস্থ প্রকৃত অন্তরতম আত্মার শাসনাধীনে সুস্পষ্ট-ভাবে সম্মুখভাগে না আনিলে প্রাণশক্তির উদ্দেশ্যাবলির দিব্য সিদ্ধি সম্ভব হইবে না। এই সমস্ত উদ্দেশ্য মূলতঃ একই থাকিবে কিন্তু তাহাদের আন্তর প্রণোদনা ও বাহ্য প্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। দিব্য প্রাণশক্তিও হইয়া উঠিবে বৃদ্ধি ও প্রসারের এক সংকল্প, আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সামর্থ্য, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের অন্তর্য্যামী দিব্য পুরুষের, বহিশ্চর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিত্বের নহে ; আর সে বৃদ্ধি ও পরিণতি হইবে খাঁটি দিব্য ব্যক্তিত্বে, কেন্দ্র-গত সত্তাতে, নিগূঢ় অবিনাশী পুরুষে যাহার উন্মেষ ও প্রকাশ অহমিকাকে অধীন ও পরিশেষে বিনষ্ট করিয়াই শুধু সম্ভব হইতে পারে। ইহাই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য—সে উদ্দেশ্য বৃদ্ধি ও প্রসার বটে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে আত্মাপুরুষের বৃদ্ধি বা অধিকতর অভিব্যক্তি, মন প্রাণ ও দেহে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ; উদ্দেশ্য, এক পাওয়া বটে কিন্তু তাহা দিব্য পুরুষের দ্বারা সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অনুস্যূত দিব্যসত্তাকেই পাওয়া, অহংগত কামনার দ্বারা বস্তুকে বস্তুর নিজের জন্য পাওয়া নহে ; উদ্দেশ্য ভোগ বটে কিন্তু তাহা বিশ্বে দিব্য আনন্দেরই এক ভোগ ; উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিজয় ও সাম্রাজ্যলাভও বটে কিন্তু তাহা হইবে অন্ধকারের শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করা, জ্ঞান প্রেম ও দিব্য সংকল্পের দ্বারা অজ্ঞানের রাজ্য অধিকার করিয়া পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতির উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করা।

এই সমস্ত হইল প্রাণকর্ম্মরাজির দিব্যভাবে সম্পাদনের ও ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে তাহাদের রূপান্তর সাধনের বিধান, যাহা ত্রয়াত্মক যজ্ঞের তৃতীয় উপাদান, আর এই সমস্তই তাহাদের লক্ষ্য। যোগের উদ্দেশ্য প্রাণকে শুধু যুক্তি-বিচারশীল করিয়া তোলা নয় পরন্তু তাহার অতিমানসসিদ্ধি, তাহাকে শুধু নৈতিক ভূমিতে নয়, অধ্যাত্ম-ভূমিতে উন্নীত করা। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বাহ্য বিষয় ব্যবহার করা অথবা বহিরঙ্গ মনের প্রণোদনা অনুসরণ করা নয়

বরং তাহাদের গোপন দিব্য তত্ত্বের উপর প্রাণ ও তাহার কর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; কেননা শুধু সেই প্রতিষ্ঠাই আমাদের ঊর্দ্ধস্থ নিগূঢ় দিব্যশক্তির শাসন ও পরিচালনাধীনে তাহাকে স্থাপিত করিতে ও ভগবানের সাক্ষাৎ অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারে—যে অভিব্যক্তিতে সেই শাশ্বত অভিনেতার বর্ত্তমানের ন্যায় ছদ্মবেশ ও শ্রীভ্রষ্টকারী মুখোস আর থাকিবে না। ইহা চেতনারএক মূলগত আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন, মন ও বুদ্ধি দ্বারা সুকৌশলে পরিচালনা ও কার্য্যসাধনা করিবার পদ্ধতি হইতে পৃথক কিছু, কেবল তাহাই জীবনের বর্ত্তমান অবস্থাকে অন্য কিছুতে পরিবর্ত্তিত এবং যে দুঃখসন্তপ্ত ও অনিশ্চিত অবস্থায় আজ সে রহিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে।

★

তাহা হইলে জীবনের বাহ্য ঘটনাবলিকে সুকৌশলে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া শুধু নয় কিন্তু তাহার মূল তত্ত্বেরই রূপান্তর সাধন করিয়া পূর্ণযোগ ইহাকে প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ অবিদ্যাচ্ছন্ন ক্রিয়াবলি হইতে এক সুসমঞ্জস প্রোজ্জ্বল গতি-ধারায় পরিণত করিতে চায়। এই কেন্দ্রগত আন্তর বিপ্লব সাধন ও নবরূপ গঠনের জন্য তিনটি অবস্থা লাভ অবশ্য প্রয়োজনীয় ; তিনটির কোনটিই একাকী এ কার্য্যের জন্য যথেষ্ট নহে, কিন্তু তাহাদের ত্রিধা-মিলিত শক্তিতেই উত্তরণ সম্ভব এবং রূপান্তর, হাঁ পূর্ণ রূপান্তর, সাধিত হইতে পারে। কারণ প্রথমতঃ আমাদের বর্ত্তমান জীবন কামনারই এক গতিবৃত্তি, সে তাহার কেন্দ্রস্থলে এক কামময় আত্মাকে গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা প্রাণের সকল গতিকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখে এবং তাহাদিগকে নিজের অজ্ঞানাচ্ছন্ন অর্দ্ধালোকিত ও ব্যাহত চেষ্টার বিক্ষুব্ধ দুঃখময় বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া তোলে ; দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে বাসনাকে বর্জন এবং তৎস্থানে এক শুদ্ধতর ও দৃঢ়তর প্রযোজক শক্তিকে বসাইতে হইবে, দুঃখযন্ত্রণায় নির্য্যাতিত কামময় আত্মাকে দূর করিয়া দিয়া তাহার স্থানে বর্ত্তমানে আমাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন যথার্থ প্রাণময় সত্তার স্থৈর্য্য আনন্দ ও সামর্থ্যকে উন্মিষিত ও বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমা-দের জীবন বর্ত্তমানে যেভাবে রহিয়াছে তাহা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে অংশত প্রাণশক্তির আবেগ ও উত্তেজনা দ্বারা আর অংশতঃ এক মনের দ্বারা যাহা নিজেই প্রধানতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত প্রাণাবেগের ভৃত্য ও প্রশ্রয়দাতা কিন্তু আবার আংশিকভাবে তাহার উদ্বেগাকুল অনতিদীপ্ত বা অনুপযুক্ত চালক ও উপদেষ্টাও বটে ; দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিলে মন ও প্রাণাবেগকে শুধু যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিতে এবং জীবনযাত্রার পথে অন্তরতম চৈত্যপুরুষকে তাহাদের স্থানে নেতৃত্বের পদে বসাইতে হইবে এবং তাহাকেই দিব্য পরি-

চালনার নির্দ্দেশক করিয়া তুলিতে হইবে। সর্ব্বশেষে, বর্ত্তমান জীবন অহমিকার পরিতৃপ্তিসাধনেই প্রবৃত্ত আছে; এই অহমিকাকে দূর করিয়া তাহার স্থানে প্রকৃত অধ্যাত্ম-পুরুষকে মূল কেন্দ্রগত সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে আর জীবনকে ফিরাইতে হইবে এই পার্থিব সত্তাতে ভগবানকে সার্থক করিয়া তুলিবার দিকে; তাহাকে অনুভব করিতে হইবে যে এক দিব্যশক্তি তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে আর তাহাব নিজেকে সেই শক্তিরই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল ও অনুগত যন্ত্রে পবিণত হইতে হইবে।

রূপান্তরকারী এই তিনটি আন্তব গতিবৃত্তির প্রথমটির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা পুরাতন ও পবিচিত নহে; কেননা ইহা সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম হইযা আছে। গীতাব সুস্পষ্ট ভাষায় ইহার যে সুন্দবতম রূপ দেওয়া হইযাছে তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে কর্ম্মের প্রযোজকরূপে ফললাভেব কামনাকে পূর্ণরূপে পরিত্যাগ, বাসনাকেও একেবারে বর্জন এবং সম্যক্ রূপে পূর্ণ সমতার অর্জন আধ্যাত্মিক পুরুষেব স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাসনার নিবৃত্তি যে ঘটিয়াছে তাহার একমাত্র ধ্রুব ও অব্যর্থ্য লক্ষণ হইল এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সমতা, সর্ব্ববস্তুর প্রতি আত্মার সমভাব প্রতিষ্ঠা: হর্ষ ও বিষাদ, প্রিয় ও অপ্রিয়, জয় ও পরাজয়ে অবিচলতা: উচ্চ ও নীচ, শত্রু ও মিত্র, পাপী ও পুণ্যবান সকলের প্রতি সমদৃষ্টি: সর্ব্বভূতে পরম একের বহুমুখী প্রকাশ এবং সর্ব্ববস্তুতে দেহধারী চিৎপুরুষের নানা বিচিত্র খেলা অথবা মুখোশ পরা অবস্থার মধ্য দিয়া ধীবগতিতে তাঁহার ক্রমাভিব্যক্তি দর্শন। ইহা মনেব নিশ্চলতা, দূরে অবস্থান বা উদাসীনতা নহে, প্রাণের নীবব নিস্পন্দতাও নহে; যাহা কোন কিছুতে গতিশীল হইতে চায় না অথবা যে-কোন গতিবৃত্তি আসিয়া পড়ুক না কেন তাহা দ্বারা পরিচালিত হইতে সম্মতি দেয় দৈহিক চেতনার তেমন এক জড়তাও সে কাম্যবস্তু নহে—যদিও এই সমস্ত বস্তুকে কখন কখন আধ্যাত্মিকতার অবস্থা বলিয়া ভুল করা হয়; কিন্তু আমবা যাহা চাই তাহা হইল প্রকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত সাক্ষীপুরুষের মত এক উদার সর্ব্বাবগাহী অবিচল সার্ব্বভৌমতা। কেননা মনে হয় এখানে সব কিছুই অর্দ্ধ সুশৃঙ্খল অর্দ্ধবিশৃঙ্খল গতিশীল শক্তিরাজির রূপায়ণ, কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি যে তাহাদের পশ্চাতে আশ্রয়রূপে এক শান্তি নীববতা ও উদারতা রহিয়াছে যাহা অচল বা স্থির অথচ জড় বা অসাড় নহে; যাহা শক্তিহীন বা অক্ষম নহে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বশক্তিমান, যাহার মধ্যে এমন এক ঘনীভূত গতিহীন বীর্য্যধারা আছে যাহা বিশ্বের সকল গতি নিজের মধ্যে ধারণ করিতে সমর্থ। পশ্চাতে নিগূঢ় এই অধিষ্ঠান সব

কিছুতে সমভাবাপন্ন; তাহার অন্তর্নিহিত সামর্থ্যকে কোন কর্ম্মের জন্য মুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু সাক্ষীপুরুষে কোন প্রকার বাসনা দ্বারা কর্ম্ম গৃহীত বা আরব্ধ হইবে না; সেখানে এমন এক সত্য ক্রিয়া করে যাহা নিজে ক্রিয়া বা তাহার দৃশ্যমান রূপরাজি ও প্রেরণাবলির অতীত এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর, যাহা মন প্রাণশক্তি বা দেহেরও অতীত এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর—যদিও অব্যবহিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহা মনোময় প্রাণময় বা জড়ময় কোন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। যখন কামনাবাসনার এইভাবে মৃত্যু হয় এবং চেতনার সর্ব্বত্র এই স্থির সমতা ও উদারতা পরিব্যাপ্ত হয়, কেবল তখনই আমাদের মধ্যস্থিত প্রকৃত প্রাণময় সত্তা আবরণ হইতে বাহিরে আসেন এবং আপন প্রশান্ত সুতীব্র শক্তিমান স্বরূপ প্রকাশ করেন। কেননা ইহাই প্রাণময় পুরুষের যথার্থ স্বভাব, জীবনের মধ্যে ইনি দিব্যপুরুষের এক অভিক্ষেপ; শান্ত, সবল, জ্যোতির্ম্ময়, বহুবীর্য্যধারাযুক্ত, দিব্য ইচ্ছার অনুগত, অহমিকাশূন্য, তথাপি অথবা বরং তজ্জন্যই ইনি সকল কর্ম্ম, সকল মহৎ কৃত্য সাধন করিতে, উচ্চতম বা বৃহত্তম সকল দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ। যথার্থ প্রাণশক্তি তখন আত্মপ্রকাশ কবিবে, যাহা এই বিক্ষুব্ধ উৎপীড়িত বিভক্ত সদা ব্যতিব্যস্ত বাহ্য সামর্থ্য আর নহে বরং তাহা শান্তি বল ও আনন্দে পবিপূর্ণ মহান জ্যোতির্ম্ময় এক ভাগবত শক্তি, যাহা বিশাল প্রাণদেবতারূপে তাহার বহুদূরগামী বীর্যবন্ত পক্ষপুটে বিশ্বকে আবৃত ও আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে।

তথাপি বৃহৎশক্তি ও সমতার এই রূপান্তর পর্য্যাপ্ত নহে; কেননা যদিও ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে দিব্যজীবনের পথ খুলিয়া যাইতে পারে তবুও ইহা সে জীবনে নূতন কোন বিষয় প্রবর্ত্তনার অধিকার অথবা তাহার শাসনকার্য্য পরিচালনার শক্তি আমাদিগকে দিতে পারে না। এইখানে মুক্ত চৈত্যপুরুষের সান্নিধ্যের উপযোগিতা আসিয়া পড়ে; ইহা অবশ্য আমাদিগকে চরম নির্দ্দেশ ও পরম শাসনক্ষমতা প্রদান করে না—কারণ তাহা দেওয়া তাহার কাজ নহে—কিন্তু অজ্ঞান হইতে দিব্যজ্ঞানে উত্তরণের পথে ইহা বাহ্য ও আন্তর জীবন ও কর্ম্মকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে পরিচালনা করে; ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে দেখাইয়া দেয় সেই পথ ও প্রণালী এবং সেই সমস্ত সোপান যাহা আমাদিগকে এমন এক সার্থক আধ্যাত্মিক অবস্থায় লইয়া যায় যেখানে এক সক্রিয় পরম প্রেরণা দিব্যভাবাপন্ন প্রাণশক্তির ক্রিয়াবলিকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বর্ত্তমান আছে। ইহার জ্যোতির বিচ্ছুরণ প্রকৃতির অন্য সকল অংশকে আলোকিত করে, যে অংশগুলি তাহাদের নিজের বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত শক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচালনা লাভ করে নাই বলিয়া অজ্ঞানের আবর্ত্তের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ইহা মনে জাগা-

ইয়া তোলে ভাবনা ও প্রত্যক্ষের প্রকৃতিগত অনুভূতি, প্রাণে সঞ্চারিত করে সেই অব্যর্থ বোধ যাহা দ্বারা তাহার গতিবৃত্তি সকলের মধ্যে কোন্‌টা বিপথগামী হইয়াছে বা বিপথে লইয়া যাইতেছে আর কোন্‌টা মঙ্গলময় প্রেরণা হইতে প্রসূত হইয়াছে তাহা জানা যায় ; তখন প্রশান্ত দৈববাণীর মত একটা কিছু ভিতর হইতে আমাদের পদস্খলনের কারণাবলি আমাদিগকে দেখাইয়া ও যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তজ্জন্য সময়মত সাবধান করিয়া দেয় ; ইহা অভিজ্ঞতা ও বোধি হইতে নিষ্কাশিত করে আমাদের কর্ম্মের যথার্থ লক্ষ্য, যথার্থ উপায় ও নির্ভুল প্রণোদনার বিধান, যে বিধান কঠোর নহে কিন্তু নমনীয়। তখন একটা সংকল্পের সৃষ্টি হয় যাহা অনুসন্ধানরত ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় শ্লথগতিতে না ঘুরিয়া ববং উদীয়মান সত্যের সহিত সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস হইয়া উঠে। ভবিষ্যতে যে আলোক আসিবে তাহার দিকে, আত্মার একটা সত্য প্রেরণার দিকে, বস্তুর যথার্থ স্বরূপ, তাহার গতি ও লক্ষ্যের দিকে, চৈত্যসত্তার যে বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহার দিকে মানুষ দৃঢ়ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ায় ; একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভিমুখে, আন্তর স্পর্শ আন্তর দৃষ্টি এমন কি তাদাত্ম্য বা একত্ববোধজাত জ্ঞানের অভিমুখে সে সর্ব্বদা অগ্রসর হইয়া চলে এবং তাহাই মানসবিচারের বাহ্য তীব্রতা ও প্রাণশক্তির অতিব্যগ্র আগ্রহের স্থান অধিকার করিতে থাকে। জীবনের কর্ম্মাবলি আপনা হইতে যথাযথ হইয়া উঠে, বিশৃঙ্খলার রাজ্য হইতে মুক্তি পায়, যুক্তিবুদ্ধিদ্বারা আরোপিত কৃত্রিম বা বিধানগত ব্যবস্থা এবং বাসনার স্বেচ্ছাচারী শাসনের স্থানে অন্তর্দৃষ্টির পরিচালনা প্রতিষ্ঠিত করে এবং আত্মাপুরুষের গভীর ধারার মধ্যে প্রবেশ করে। সর্ব্বোপরি চৈত্যপুরুষ তাহার সকল কর্ম্মকে শাশ্বত ভগবানের চরণে উৎসর্গরূপে যজ্ঞের বিধান জীবনের উপর আরোপ করে। তখন জীবন হইয়া দাঁড়ায় জীবনের অতীত পরমবস্তুর আবাহন ; তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম কর্ম্মও অনন্তের বোধে বিভাবিত হইয়া উদার হইয়া উঠে।

অন্তরে এক সমতা যেমন বৃদ্ধি পাইতে, তৎসঙ্গে যাহা তাহাকে পালন করিতে হইবে এমন এক মহত্তর নির্দ্দেশের জন্য আমাদের যথার্থ প্রাণময় পুরুষ যে অপেক্ষা করিয়া আছে এই বোধ যত বাড়িতে এবং আমাদের সকল অঙ্গের মধ্যে চৈত্যপুরুষের আবাহন যেমন প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে তেমনই যে তৎস্বরূপকে আবাহন করা হইতেছে সেই বস্তু নিজেকে প্রকট করিতে আরম্ভ করে এবং জীবন ও তাহার সকল শক্তিকে অধিকার করিবার জন্য নামিয়া আসিতে এবং তাহার সান্নিধ্য ও লক্ষ্যের উচ্চতা, অন্তরঙ্গতা ও বিশালতা দিয়া তাহাদিগকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে থাকে। অধিকাংশের মধ্যে না হইলেও অনেকের

মধ্যে আন্তর সাম্য প্রতিষ্ঠিত এবং চৈত্যসত্তার প্রেরণা বা চালনা প্রকাশ্যভাবে দেখা দিবার পূর্ব্বেও সে তত্ত্ব নিজের কিছুটা অভিব্যক্ত করে। বাহ্য অজ্ঞানতার বিপুলতার দ্বারা প্রপীড়িত, মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল, গোপন চৈত্য উপাদানের এক আবাহন, উৎসুক ধ্যানের ও জ্ঞানান্বেষণের এক চাপ, হৃদয়ের এক আকূতি, অবিদ্যাচ্ছন্ন হইলেও সরল আবেগময় এক সংকল্প, যে প্রাচীর ঊর্দ্ধতন হইতে অধস্তন প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে, উপর হইতে আপতিত প্রবাহের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে। তখন দিব্য পুরুষের কিছুটা আত্মপ্রকাশ করিতে, অনন্ত হইতে জ্যোতি শক্তি আনন্দ ও প্রেমের কিছুটা নামিয়া আসিতে পারে। এই প্রকাশ নিমেষ কাল স্থায়ী একটা ক্ষণিক প্রভা বা জ্যোতির একটা চমক মাত্র হইতে পারে যাহা শীঘ্রই নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়া নেয়, কিন্তু আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে বৃদ্ধি পাইতে এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হইতেও পারে। বুঝিতে হইবে যে তখন এক দীর্ঘ ও অতিব্যাপক ক্রিয়াধারা আরম্ভ হইযাছে, যাহা কখনও উজ্জ্বল বা তীব্র কখনও বিলম্বিত ও অস্পষ্ট। সময় সময় এক দিব্যশক্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, সবলে টানিয়া লইয়া চলে অথবা উপদেশ দেয় ও জাগাইয়া তোলে; আবার কখনও বা সে শক্তি পটভূমিকার অন্তরালে নিজেকে গুটাইয়া আনে এবং মনে হয় যেন নিজে যেটুকু করিতে পারে তাহা করিবার জন্য সাধককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন বিকৃত কিম্বা শুধু অধস্তন ও অপূর্ণ, এ শক্তি সে সমস্তকে ভিতর হইতে বাহিরে টানিয়া আনে, হয়ত বা তাহাদের বৃদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দেয়, তাহাদের উপর ক্রিয়া করে, তাহাদের দোষ পরিশোধিত ও নিঃশেষিত করে, তাহাদের ফলে যে বিষম বিপদ ঘটিতে পারে তাহা দেখাইয়া দেয়; নিজেদের নিবৃত্তি ঘটাইতে বা রূপান্তর গ্রহণ করিতে অথবা অসার কিম্বা সংশোধনাযোগ্য বলিয়া সত্তা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে তাহাদিগকে বাধ্য করে। এ কাজ বাধাবিপত্তিশূন্য সরলভাবে সাধিত হইতে পারে না; ইহার মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয় দিন এবং রাত্রি, আলোক এবং অন্ধকার, শান্তি ও সংগঠন অথবা সংগ্রাম ও উৎক্ষেপ, নিত্য বর্দ্ধমান দিব্যচেতনার আবির্ভাব ও তিরোভাব, আশার উচচচূড়া এবং নিরাশার গভীর গহ্বর, প্রেমাস্পদের আলিঙ্গনের বিপুল আনন্দ এবং তাহার বিরহের তীব্র বেদনা; দেখা দেয় অভিভবকারী আক্রমণ, দুর্ব্বার প্রবঞ্চনা, প্রবল বিরোধ, শত্রুশক্তিরাজির অক্ষমতাসাধক বিদ্রূপ এবং দেবতা ও দেবদূতগণের সহায়তা আশ্বাস ও সহযোগিতা। জীবন-সমুদ্রের এক বৃহৎ ও দীর্ঘকালস্থায়ী আলোড়ন ও মন্থন চলিতে থাকে, যাহার

মধ্য হইতে অমৃত ও গরল এ উভয়ই প্রবলভাবে উঠিয়া আসিতে থাকে, আর এই ব্যবস্থা ততদিন চলিতে থাকে যতদিন সমস্ত প্রস্তুত না হয়, এবং যতদিন ক্রমবর্দ্ধনশীল দিব্য অবতরণ দেখিতে না পায় যে সত্তা ও প্রকৃতিতে তাহার পরিপূর্ণ শাসনের এবং সর্ব্বাবেষ্টনকারী সান্নিধ্যের উপযুক্ত অবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সত্তাতে সমতা চৈত্য আলোক ও সংকল্প যদি থাকে তাহা হইলে এই ক্রিয়াধারা যদিও পরিহার করা যায়না তথাপি তাহা অনেক পরিমাণে সহজ ও সুগম করিয়া তোলা যায়; তখন ইহার পথের নিকৃষ্টতম বাধাগুলি অপসারিত হইবে, রূপান্তরের পক্ষে সকল বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া এক আন্তর প্রশান্তি আনন্দ ও ভরসা প্রতিপদক্ষেপে সহায়তা করিবে, আশ্রয় দিবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান ভাগবতশক্তি প্রকৃতির পূর্ণ অনুমোদন পাইয়া বিরোধী-শক্তিরাজির সামর্থ্য শীঘ্র ক্ষয় ও সত্তা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। নিশ্চিত-ভাবে পরিচালনা ও রক্ষা করিবার এক শক্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে, কখনও সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া কখনও বা আবরণের অন্তরালে থাকিয়া ক্রিয়া করিবে; চরম বিজয়ের শক্তি সাধনার প্রারম্ভে এবং সুদীর্ঘ মধ্যবর্ত্তী অবস্থার মধ্যেও বর্ত্তমান থাকিবে। কেননা সাধক দিব্য চালক ও রক্ষকের অথবা পরমা-মাতৃশক্তির ক্রিয়াধারা সর্ব্বদা অনুভব করিবে; সে জানিবে সব কিছুই পরম মঙ্গলের জন্য ঘটিতেছে, জানিবে তাহার অগ্রগতি সুনিশ্চিত, বিজয় অবশ্যম্ভাবী। যাহা হউক না কেন এই সাধনাধারা এক ও অপরিহার্য্য; ইহাতে বাহ্য বা আন্তর সমগ্র প্রকৃতি সমগ্র জীবন গৃহীত হইবে, উর্দ্ধ হইতে এক দিব্যতর জীবনের চাপে এ প্রণালীর মধ্যস্থিত শক্তিরাজি ও তাহাদের গতিবৃত্তিসকল প্রকাশ পাইবে এবং সাধক তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে এবং তাহাদের রূপান্তর সাধন করিতে পারিবে, অবশেষে সকল কিছু মহত্তর আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা অধিকৃত এবং এক দিব্য কর্ম্ম ও দিব্য উদ্দেশ্যের যন্ত্রে পরিণত হইবে।

এই প্রণালীতে ইহার প্রাথমিক বাহ্য এক স্তরেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে আমরা আমাদের নিজের সম্বন্ধে, আমাদের বর্ত্তমান চেতন সত্তার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা শুধু এক প্রতিরূপস্থানীয় রূপায়ণ, এক বাহ্য ক্রিয়াধারা, এক বিরাট নিগূঢ় সত্তার সদা পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য পরিণাম মাত্র। আমাদের পরিদৃশ্যমান জীবন এবং সেই জীবনের ক্রিয়াবলি সার্থক অভিব্যক্তির একটা পর্য্যায় বা ধারা ছাড়া আর কিছু নহে, কিন্তু যাহা সে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা বাহিরের ক্ষেত্রে যাহা দেখা যায় তাহা নহে; আমাদের যথার্থ সত্তা আমাদের প্রতীয়মান বাহ্যরূপের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ বস্তু, অথচ আমরা এই প্রতীয়মান রূপকেই

আমাদের খাঁটি স্বরূপ মনে করি এবং চতুর্দ্দিকের জগতের কাছে ইহাকেই উপস্থাপিত করি। সম্মুখে অবস্থিত এই বহিশ্চর সত্তা নানা মানস-রূপায়ণ, প্রাণের গতিবৃত্তি ও দৈহিক ক্রিয়াবলির এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণ ; এই মিশ্রণকে তাহার উপাদান ও ক্রিয়াবলিতে চূড়ান্তভাবে বিশ্লেষণ করিলেও তাহার পূর্ণ রহস্য জানা যায় না। যখন আমরা ইহার পশ্চাতে, নিম্নে ও উর্দ্ধে অবস্থিত আমাদের সত্তার বৃহৎ গোপন প্রদেশসমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হই, কেবল তখনই ইহাকে জানিতে পারি ; বহিশ্চর সত্তাকে লইয়া যতই পূর্ণভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমরা নাড়াচাড়া এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করি না কেন তাহাতে আমরা ইহাকে যথার্থভাবে জানিতে অথবা প্রাণের উপর পরিপূর্ণ কার্য্যকরী প্রশাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হই না, ইহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যধারা বুঝিতে পারি না ; বস্তুতঃ এই অক্ষমতাই হইল প্রকৃত কারণ যাহার জন্য যুক্তিবুদ্ধি, নীতিবোধ এবং বাহিরের অন্য সকল ক্রিয়া মানবজাতির প্রাণকে শাসিত ও সংযত করিতে, তাহাকে পূর্ণতা ও মুক্তি দিতে সমর্থ হয় না। কারণ আমাদের শারীর চেতনার গভীরে তাহার অস্পষ্টতম স্তরেরও পশ্চাতে এক অবচেতন সত্তা এবং তাহার মধ্যে এমন এক গোপন ক্ষেত্র আছে যাহা সকল প্রকার বীজের প্রচ্ছন্ন আশ্রয় স্থান, আমরা যাহার ব্যাখ্যা দিতে পারি না এমন-ভাবে তাহারা বাহিরে আসিয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, আবার তাহার মধ্যে আমরা সর্ব্বদা নূতন বীজ ছড়াইয়া দিতেছি যাহা আমাদের অতীতকে প্রবর্দ্ধিত এবং ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে—এই অবচেতন সত্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহার গতিবৃত্তি ক্ষুদ্র বিষয়ে নিবদ্ধ, চঞ্চল এবং প্রায় কিম্ভূতকিমাকারভাবে অবযৌক্তিক (subrational) কিন্তু পার্থিব জীবনের উপর তাহার প্রভাব অতি বিশাল। আবার আমাদের মন প্রাণ ও চেতন দেহের পশ্চাতে আছে এক বৃহৎ অধিচেতনা (subliminal consciousness), আছে আন্তর মন আন্তর প্রাণ ও আন্তর সূক্ষ্মতর জড়ের বিস্তৃতক্ষেত্র, যাহা এক অন্তরতম চৈত্যসত্তার দ্বারা বিধৃত আর এই চৈত্যসত্তা আমাদের অন্য সকল অঙ্গের যোগসাধক আত্মা ; এই সমস্ত গোপনভূমিতে রহিয়াছে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বহু ব্যক্তিসত্তা যাহারা আমাদের ক্রমবিকাশশীল বহির্জীবনের উপাদানাবলি, চালকশক্তিরাজি ও প্রবেগসমূহ সরবরাহ করে। কেননা এখানে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক কেন্দ্রগত সত্তা এবং তৎসঙ্গে বহু অধস্তন ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে যাহারা আমাদের মূলসত্তার অভিব্যক্তির অতীত ইতিহাসে সৃষ্ট হইয়াছে অথবা এই বাহ্য জড়বিশ্বের মধ্যে তাহার বর্ত্তমান খেলায় যাহারা আশ্রয় স্বরূপ সেই সমস্ত আন্তর ভূমিতে তাহার আত্মপ্রকাশের ফলে তাহারা জাত হইয়াছে। বাহিরের এই

ক্ষেত্রে আমাদেব চারিদিকে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিয়াছি, আমাদের বাহ্যমন ও ইন্দ্রিয় সংস্পর্শের মধ্য দিয়া ইহাদের সহিত কিছু সংযোগ শুধু স্থাপন করিতে পারিতেছি, আবার এই মন এবং ইন্দ্রিয়ও আমাদের অতি অল্প অংশই জগতেরও নিকট এবং জগতের অতি অল্প কিছু আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়; কিন্তু এই সব আন্তর ক্ষেত্রে আমাদের এবং জগতের বাকি সব কিছুর মধ্যস্থিত দেওয়াল তত পুরু নহে, সহজেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়; সেখানে আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি—শুধু তাহাদের ফল হইতে অনুমান করিয়া নয় কিন্তু সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়া —নিগূঢ় বিশ্বশক্তিসমূহের, মানসশক্তিরাজির, প্রাণশক্তিচয়ের, সূক্ষ্ম জড়শক্তি সমূহের ক্রিয়া, যাহাদের দ্বারা বিশ্বগত ও আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা গঠিত হইয়াছে; আর যদি আমরা এ ব্যাপারে নিজেদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে এই যে সমস্ত বিশ্বশক্তি আমাদের উপর বা আমাদের চতুর্দ্দিকে আসিয়া আপতিত হয় তাহাদিগকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে আয়ত্তে আনিতে পারি অথবা অন্ততঃপক্ষে আমাদের ও অপরের উপর তাহাদের ক্রিয়াধারা, তাহাদের রূপায়ণ ও গতিবৃত্তিসমূহ প্রভূত পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। আবার আমাদের মানব-মনের অতীত এবং তাহার কাছে অতিচেতন এরূপ অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্র আছে গোপনে যথা হইতে নানা প্রভাব ও সংস্পর্শ নামিয়া আসে যাহারা এখানকার সব কিছু নিয়ন্ত্রণের মূল কারণ, আর তাহাদিগকে পূর্ণরূপে যদি নামাইয়া আনা যায় তাহা হইলে জড়বিশ্বের মধ্যস্থিত জীবনের গঠন ও বিধান পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ণযোগে যখন আমরা নিজেদিগকে ভগবৎশক্তির নিকট খুলিয়া ধরিতে পারি তখন সেই শক্তিই আমাদের উপর ক্রিয়া করিয়া এই সমস্ত অব্যক্ত জ্ঞান ও অনুভূতি রাজিকে আমাদের কাছে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের পরিণামগুলিকে আরও পূর্ণ করিয়া তোলে এবং আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির রূপান্তরের উপায় ও সোপানরূপে ব্যবহার করে। সেই সময় হইতে আমাদের জীবন আর সমুদ্রের উপরিতলে ভাসমান চলন্ত এক ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্র থাকে না, কিন্তু বিশ্বপ্রাণের সহিত পূর্ণরূপে মিশিয়া না গেলেও ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। আমাদের সত্তা, আমাদের অন্তরাত্মা উর্দ্ধে উঠিয়া উদার বিশ্বাত্মার সহিত এক প্রকার আন্তর একত্ব যে শুধু লাভ করে তাহা নহে, কিন্তু যাহা তাহারও অতীত তাহার সঙ্গেও এক সংস্পর্শে আসে, যদিও সে বিশ্বক্রিয়াকে তখনও জানে, চেনে এবং তাহা নিজের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হয়।

এইভাবে আমাদের বিভক্ত সত্তাকে পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়া যোগা-ভ্যন্তরস্থিত ভাগবতী শক্তি তাহার উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হয়; কেননা এই পূর্ণাঙ্গতাসাধনের উপরই মুক্তি পূর্ণতা ও প্রভুত্ব লাভ নির্ভর করে. কারণ বহিস্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি তরঙ্গের পক্ষে তাহার চতুর্দ্দিকে স্থিত বিরাট জীবনের উপর প্রকৃত কর্তৃত্ব করা তো অনেক দূরের কথা, সে তাহার নিজের গতি বৃত্তিই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। অনন্ত ও শাশ্বতের শক্তি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ক্রিয়া করে, আমাদের বর্ত্তমান মানসিক রূপায়ণগুলি ভাঙ্গিয়া দেয়, প্রত্যেক সীমার দেওয়াল চূর্ণ করিয়া প্রসার ও মুক্তি লইয়া আসে, আমা-দিগকে নবতর ও বৃহত্তর দৃষ্টির, ভাব ও কল্পনার এবং প্রত্যক্ষ ও সংবেদনের শক্তি সর্ব্বদা দান করে, জীবনের সম্মুখে নবতর ও বৃহত্তর লক্ষ্যসকল উপস্থিত করে. আত্মা ও তাহার যন্ত্রাবলিকে বর্দ্ধিত করে, তাহাদিগকে বর্দ্ধমান নূতন নূতন আকারে গড়িয়া তোলে, প্রতিটি অপূর্ণতাকে বিচার করিয়া দোষী সাব্যস্ত এবং বিনাশ করিবার জন্য পুরোভাগে আনিয়া উপস্থিত করে, বৃহত্তর এক পূর্ণতার দিকে খুলিয়া ধরে, অল্পকালের মধ্যে বহুজীবনের বা বহুযুগের কাজ সাধিত করে, যাহার ফলে আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা নবনব জন্ম নবনব দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে। এই ক্রিয়ার ধারাই হইল বিস্তারসাধন, তাই তাহা আমাদের চেতনাকে দেহের কারাগার হইতে মুক্ত করে আর তাহা তখন সমাধিতে বা সুষুপ্তির অবস্থায় অথবা এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও অন্য সকল জগতে কিম্বা এই জগতেরই অন্যান্য ভূমিতে প্রবেশ করিতে তথায় থাকিয়া ক্রিয়া করিতে অথবা সেখানকার অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। তখন তাহা চারিদিকে প্রসারিত হয়, বুঝিতে পারে যে দেহ তাহার একটা সামান্য অংশমাত্র, তাই যাহা পূর্ব্বে তাহার আধার ছিল তাহাই তাহার আধেয় হইয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করে; এইভাবে বিশ্বচৈতন্য লাভ করিয়া নিজেকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সমপরিমাণে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়। তাহা তখন জগৎলীলারত শক্তিচয়কে শুধু বাহির হইতে পর্য্যবেক্ষণ ও সংস্পর্শের দ্বারা নহে কিন্তু অন্তরে সাক্ষাৎভাবে জানিতে আরম্ভ করে, তাহাদের গতিবৃত্তি অনুভব করে, তাহাদের ক্রিয়াবলিকে পৃথক করিয়া দেখিতে এবং বৈজ্ঞানিক যেমন জড়শক্তির উপর ক্রিয়া করে ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, আবার আমাদের মনে প্রাণে ও দেহে তাহাদের কর্ম্ম ও তাহার ফল গ্রহণ বা বর্জন করিতে অথবা তাহাদিগকে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিতে, নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে এবং প্রকৃতির পূর্ব্বতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াধারার স্থানে নব নব বিশাল শক্তি ও গতি সৃষ্টি করিতে পারে। তখন আমরা বিশ্বমানসশক্তিরাজির ক্রিয়া-

ধারা বুঝিতে আরম্ভ করি, জানিতে আরম্ভ করি কেমন করিয়া আমাদের মনের সকল ভাবনা সেই ক্রিয়াধারা দ্বারাই সৃষ্ট হয়, ভিতর হইতে আমাদের অনুভূতি-সমূহের সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে, তাহাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত, অর্থ ব্যাপক ও আলোকিত করিয়া তুলিতে, আমাদের নিজের মন ও ক্রিয়ার প্রভু হইতে এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে স্থিত মনের গতিবৃত্তিসমূহকে রূপায়িত করিতে সক্ষম এবং তজ্জন্য সক্রিয় হইতে পারি। তখন আমরা বিশ্বপ্রাণ-শক্তিরাজির প্রবাহ ও কল্লোল অনুভব করিতে এবং নিজেদের অনুভূতি আবেগ অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিধান বুঝিতে আরম্ভ করি, স্বাধীনভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ প্রত্যাখ্যান অথবা নবরূপে সৃষ্টি করিতে এবং প্রাণশক্তির উচচতর ভূমিসকলের মধ্যে উঠিয়া যাইতে পারি। জড়ের দুর্ব্বোধ্য রহস্যও আমাদের কাছে তখন পরিস্ফুট হইতে থাকে, তাহার উপর মন প্রাণ এবং চেতনার অন্যোন্যক্রিয়া অনুসরণ করিতে, যন্ত্র ও পরিণামরূপে তাহার ক্রিয়া-ধারা অধিক হইতে অধিকরূপে আবিষ্কার করিতে থাকি, অবশেষে আমরা জড়ের শেষ রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া বুঝিতে পারি যে তাহা শুধু শক্তি বা বীর্য্যের নহে কিন্তু সংবৃত অবরুদ্ধ বা অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সীমাবদ্ধ চেতনার এক রূপ; তখন তাহার মুক্তির সম্ভাবনা এবং উচচতর শক্তিরাজির দিকে তাহার সাড়া দেওয়ার শক্তির নমনীয়তাও দেখিতে পাই, এবং তাহার সেই সকল সম্ভা-বনার সাক্ষাৎ পাই যাহারা আত্মাপুরুষের এক নিশ্চেতনপ্রায় প্রকাশ ও মূর্ত্তি না থাকিয়া তাঁহার সচেতন বিগ্রহ ও আত্মপ্রকাশ হইয়া উঠিতে পারে। এই সব এবং আরও অনেক কিছু ক্রমবর্দ্ধমানভাবে সম্ভব হইতে থাকিবে, যেমন আমাদের মধ্যে দিব্যশক্তির ক্রিয়াধারা বর্দ্ধিত হইবে এবং সে ক্রিয়াধারা আমা-দের তমসাচ্ছন্ন চেতনার নানা বাধা বা অসাড়তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধ-নিশ্চেতনা হইতে সচেতন বস্তুতে প্রগাঢ়রূপে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রয়ো-জনীয় বহু সংগ্রামের এবং একবার অগ্রসর হওয়া আবার কিছু হঠিয়া আসা আবার নবোদ্যমে প্রগতির পথে চলা এইরূপ বহু গতিবৃত্তির মধ্য দিয়া বৃহত্তর শুদ্ধি সত্য উচচতা ও বিস্তারের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইবে। সব কিছু নির্ভর করে আমাদের চৈত্যপুরুষের জাগরণের উপর, সেই দিব্যশক্তির দিকে আমাদের সাড়া বা প্রতিস্পন্দনের পূর্ণতার এবং তাহার নিকট আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মসমর্পণের উপর।

এই সমস্ত শুধু আমাদিগের এক মহত্তর আন্তর জীবন গড়িয়া তুলিতে এবং তাহার সহিত বাহ্যকর্ম্মের এক বৃহত্তর সম্ভাবনা আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু ইহা হইবে শুধু একটা পথমধ্যবর্ত্তী সিদ্ধি; পরিপূর্ণ রূপান্তর কেবল তখনই

আসিতে পারে যখন আমরা যজ্ঞ বা আমাদের আত্মনিবেদনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হইতে এবং দিব্য অতিমানস বিজ্ঞানের শক্তি জ্যোতি ও পরমানন্দের সহিত তাহার ক্রিয়াধারা জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। কারণ কেবল তখনই এই যে সকল শক্তি বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং জীবনে ও তাহার কর্ম্মে নিজেদিগকে অপূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছে তাহারা তাহাদের মূল একত্ব সামঞ্জস্য ও অখণ্ড সত্যে, প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে ও পরিপূর্ণ অর্থে উন্নীত হইবে। সেখানে জ্ঞান ও সংকল্প এক ও অভিন্ন, প্রেম ও শক্তি একই গতিবৃত্তিরূপে পরিণত; যে সকল দ্বন্দ্ব ও দ্বৈত এখানে আমাদিগকে প্রপীড়িত করে তাহারা তথায় সমন্বিত, একত্বে পর্য্যবসিত; সেখানে শুভ বা শিব পরিণত হইয়া পরম শিব হইয়া দাঁড়ায়, অশুভ বা অশিব ভ্রান্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পশ্চাতে স্থিত শিবের মধ্যে ফিরিয়া যায়; এক দিব্য পবিত্রতা এবং এক অব্যর্থ সত্য-ক্রিয়ার মধ্য দিয়া পাপ ও পুণ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়; সন্দেহজনক ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ এক দিব্য আনন্দের মধ্যে মিলাইয়া যায় যে আনন্দ শাশ্বত ধ্রুব নিত্যানন্দময় অধ্যাত্মস্বরূপের এক লীলা, পার্থিব দুঃখ মরিয়া আবিষ্কার করে এক আনন্দের সংস্পর্শকে যে আনন্দ তমসাচ্ছন্ন বিকৃতির জন্য এবং নিশ্চেতনার ইচ্ছাশক্তির তাহাকে গ্রহণ করিবার অসামর্থ্যের জন্য বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছিল। মনের পক্ষে এ সমস্ত বস্তু এক কল্পনা অথবা এক দুর্ব্বোধ্য রহস্য; কিন্তু চেতনা যেমন সীমিত মূর্ত্ত জড়-মন (matter-mind) হইতে মন বুদ্ধির অতীত প্রজ্ঞানভূমির উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রসারতার মধ্যস্থিত মুক্তি ও পূর্ণতার মধ্যে উঠিয়া যায় তেমনি এ সমস্ত স্পষ্ট ও অনুভূতির যোগ্য হইয়া উঠে; কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ সত্য ও স্বাভাবিক কেবল তখন হইতে পারিবে যখন অতিমানসই প্রকৃতির বিধান হইয়া দাঁড়াইবে।

তাহা হইলে জীবনের সার্থকতা ও সমর্থন, তাহার মুক্তি এবং দিব্যরূপ-প্রাপ্ত পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত জীবনে তাহাব রূপান্তর নির্ভর করে এই উত্তরণ-সিদ্ধির উপর, এই সমস্ত উচ্চতম ভূমি হইতে পরিপূর্ণ সক্রিয় শক্তির পার্থিব চেতনার মধ্যে অবতরণের সম্ভাবনার উপর।

যাহা এই সমস্ত আধ্যাত্মিক উপায় অবলম্বন করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হয় এবং প্রকৃতির এই পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর সাধনেব দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় এই ভাবে পরিকল্পিত বা ব্যবস্থিত সেই পূর্ণযোগের প্রকৃতিই আমাদের জীবনেব

সাধারণ ক্রিয়াধারার সঙ্গে সম্বন্ধ কি এবং যোগে তাহাদের স্থান কোথায় এই বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর স্বতঃই নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়।

বৈরাগ্যবশে বা গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া অথবা ভাবকের সাধনা সমাশ্রয় করিয়া কর্ম্ম ও জীবনকে ত্যাগ, সমাধি বা নিষ্ক্রিয়তায় একান্তভাবে অভিনিবেশ, প্রাণশক্তি ও তাহার ক্রিয়াধারার নিন্দাবাদ বা প্রত্যাখ্যান, পার্থিব প্রকৃতির মধ্যস্থিত অভিব্যক্তি বর্জন—এ সমস্তের কোনটিরই স্থান এ যোগে নাই, থাকিতে পারেনা। অবশ্য সাধকের পক্ষে কোন সময় নিজের মধ্যে প্রত্যাহৃত হইয়া আসা, নিজের আন্তর সত্তার মধ্যে ডুবিয়া থাকা, অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবনের হাঙ্গামা ও কোলাহল নিজের নিকট হইতে সরাইয়া রাখা প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু এ প্রয়োজন ততদিন থাকিবে যতদিন একটা আন্তর পরিবর্ত্তন সাধিত অথবা এমন কিছু লাভ না হইতেছে যাহা না হইলে জীবনের উপর সফলভাবে আরও কার্য্য করা দুরূহ বা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পূর্ণযোগে ইহা একটি মধ্যবর্ত্তীকালীন ঘটনা মাত্র, একটা স্বল্পকালিক প্রয়োজন অথবা প্রস্তুতির সুকৌশলোদ্ভাবিত একটা সাময়িক আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা, ইহা এ যোগের বিধান বা মূলনীতি হইতে পারে না।

ধর্ম্ম বা নীতির অথবা একত্রযোগে এ উভয়ের ভিত্তিতে মানবজীবনের সকল কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া ফেলা, শুধু ভজনপূজনের অথবা লোকহিত ও বদান্যতার কর্ম্মে নিবদ্ধ থাকাও পূর্ণযোগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কেবলমাত্র মনোময় কোন বিধান অথবা শুধু মন দ্বারা কিছু গ্রহণ বা বর্জনও এ সাধনার উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াধারার প্রতিকূল। সব কিছুকে আধ্যাত্মিকতার শিখরে তুলিয়া লইতে, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; শুধু এক অংশে নহে সমগ্র জীবনের মধ্যে যেমন অন্তরের পরিবর্ত্তন তেমনি বাহিরের রূপান্তর-সাধন এ উভয়কে সমগ্র জীবনের মধ্যে সবলে আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে, জীবনের শুধু এক অঙ্গে ইহাদিগকে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; যাহা কিছু এই পরিণতি স্বীকার অথবা তাহার সহায়তা করে তাহা গ্রহণ ও রক্ষণ করিতে হইবে, অন্যপক্ষে যাহা কিছু তাহা করিতে অসমর্থ তাহার অনুপযোগী অথবা রূপান্তরবিধায়ক গতিবৃত্তির অধীন হইতে অস্বীকৃত হয় সে সমস্তকে বর্জন করিতে হইবে। বস্তু বা জীবনের কোন রূপে কোন বিষয়ে বা ক্রিয়াতে আসক্ত থাকা চলিবে না, একদিকে যদি প্রয়োজন হয় তবে সব কিছু ত্যাগ করিতে হইবে, অন্যদিকে দিব্য জীবনের উপাদানরূপে ভগবান যাহা কিছু নির্ব্বাচিত করেন তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু যাহা এই গ্রহণ বা বর্জন করিবে তাহা আমাদের মন অথবা বাসনার প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী প্রাণময় ইচ্ছা নয়

অথবা নৈতিক বোধও নয়—গ্রহণ-বর্জন করিবে চৈত্যপুরুষের নির্বন্ধ, যোগের দিব্য দিশারীর আদেশ, উৰ্দ্ধতন আত্মাপুরুষের দিব্যদৃষ্টি, পরম প্রভুর জ্যোতির্ম্ময় পরিচালনা। আত্মার পথ মনোময় পথ নহে, মনোময় কোন বিধান বা মনোময় চেতনা সেখানে প্রেরক বা চালক হইতে পারে না।

সমভাবেই ইহা বলিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক ও মনোময় কিম্বা আধ্যাত্মিক ও প্রাণময় অথবা এই উভয়বিধ চেতনার এক সংমিশ্রণ বা এক আপোস-রফা কিম্বা বাহিরের জীবন যেমন আছে সেইরূপই রাখিয়া শুধু আন্তর জীবনের বিশোধন ও উন্নয়নসাধন করাও পূর্ণযোগের বিধান বা লক্ষ্য হইতে পারে না। সমগ্র জীবনই গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে; সব কিছুকে অতিমানসপ্রকৃতির মধ্যস্থিত অধ্যাত্ম সত্তার অংশ রূপ বা যথাযোগ্য অভিব্যক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ইহাই হইল জড়জগতে আধ্যাত্মিক পরিণামের সর্ব্বোচ্চ শিখর ও শ্রেষ্ঠ গতি; যেমন প্রাণময় পশুর মনোময় মানবে পরিণতি জীবনকে মৌলিক চেতনার প্রসারে এবং তাৎপর্য্যে সম্পূর্ণ অন্য বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি আমাদের এই জড়ভাবে বিভাবিত মনোময় সত্তার আধ্যাত্মিক ও অতিমানসসত্তাতে রূপান্তর—যাহা জড়ের শাসন হইতে মুক্ত হইবে কিন্তু জড়কে ব্যবহার করিবে এবং জীবনকে স্বীকার করিয়া চলিবে—বর্ত্তমানে অপূর্ণ সীমিত দোষত্রুটিভরা মানব-জীবনকে এমন কিছুতে পরিণত করিবে যাহা মূল চেতনাব প্রসারে ও তাৎপর্য্যে সম্পূর্ণ অন্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। জীবনের যে সমস্ত রূপ এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারিবে না তাহাদিগকে লয় পাইতে হইবে আর যাহা কিছু তাহা গ্রহণ ও বহন করিতে সমর্থ হইবে তাহা বাঁচিয়া থাকিবে এবং চিৎস্বরূপের রাজ্যে প্রবেশ করিবে। ক্রিয়াশীল এক দিব্যশক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে কি করিতে বা কি না করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবে, সাময়িকভাবে বা স্থায়ীরূপে কি স্বীকার করিয়া লইতে অথবা কি বর্জন করিতে হইবে তাহা স্থির করিবে। কেননা যদি সেই শক্তির স্থানে আমাদের কামনা বা অহমিকাকে না বসাই —যাহাতে না বসাই সেজন্য আমাদের অন্তরাত্মাকে সর্ব্বদা জাগ্রত ও সতর্ক থাকিতে, সর্ব্বদা দিব্য পরিচালনাতে সজাগ থাকিতে হইবে এবং ভিতরের ও বাহিরেব যে অদিব্য ভাব আমাদিগকে উন্মার্গগামী করে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে—তাহা হইলে সেই শক্তি একাই আমাদিগকে সার্থকতায় লইয়া যাইবার পক্ষে সক্ষম ও সুপ্রচুর হইবে; আর তাহা কোন্ পথে এবং কি উপায়ে ইহা সাধিত করিবে তাহা এত বিশাল এত অন্তর্ম্মুখী এত জটিল যে মনের পক্ষে সেখানে আদেশ দেওয়া ও পরিচালনা করা তো দূরের কথা

সে কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে পারাই তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অবশ্য এপথ শ্রমসাধ্য কঠিন ও বিপদসঙ্কুল কিন্তু অন্য কোন পথও তো নাই।

দুইটি বিধান আছে যাহা কাঠিন্য হ্রাস এবং বিপদ অপসারিত করিতে পারে। যাহা কিছু অহমিকা হইতে, প্রাণময় বাসনা হইতে, কেবলমাত্র মন ও তাহার ধৃষ্ট ও অক্ষম যুক্তিবুদ্ধি হইতে আসে, যাহা কিছু অজ্ঞানের এই সমস্ত প্রতিনিধিকে সহায়তা করে, তাহাদিগকে বর্জন করিতে হইবে। সাধককে অন্তরতম আত্মার বাণী, গুরুর নির্দ্দেশ, দিব্যপ্রভুর আদেশ, ভগবতী জননীর কর্ম্মধারাব কথা শুনিতে ও অনুসরণ করিতে হইবে। যে কেহ দেহের কামনা ও দুর্ব্বলতায়, বিক্ষুব্ধ অজ্ঞানেব মধ্যস্থিত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগে, বৃহত্তর জ্ঞানের দ্বারা যাহা নীরব ও আলোকিত হয় নাই সেইরূপ ব্যক্তিগত মনের নির্দ্দেশে আসক্ত থাকে সে প্রকৃত আন্তর বিধানের সন্ধান পাইতে পারে না, বরং সে দিব্য-সিদ্ধির পথে রাশিরাশি বাধাবিপত্তি জড় করে। আর যে সাধক এই সমস্ত পথ-ভোলানো অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃত্তিরাজির ক্রিয়া ধরিতে ও প্রত্যাখ্যান করিতে পারে এবং অন্তরের ও বাহিরের সত্য গুরুকে চিনিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে পারে সে-ই আধ্যাত্মিক বিধান খুঁজিয়া পায় এবং যোগেব লক্ষ্য ও গম্যস্থানে পৌঁছে।

চেতনার একটা আমূল ও সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তরই যে পূর্ণযোগের সমগ্র অর্থ শুধু তাহাই নয়, ইহাই হইল তাহার সমগ্র প্রণালী, যে প্রণালী নিত্য বর্দ্ধমান শক্তি লইয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা

জ্ঞানের যে ভিত্তির উপর কর্ম্মযোগীকে তাহার সকল কর্ম্ম ও সকল পরিণতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার অঙ্গসংস্থানের মধ্যপ্রস্তর বা প্রধান উপাদান হইল অভেদের একটা নিত্যবর্দ্ধমান বাস্তব অনুভূতি, একটি সর্ব্বব্যাপী একত্ব-বোধের জীবন্ত বোধ ; সকল সত্তা যে এক অবিভাজ্য সমগ্র বস্তু, ক্রমবর্দ্ধমান-ভাবে এই চেতনাতেই কর্ম্মযোগী বিচরণ করেন, তাহার সকল কর্ম্ম ও এই দিব্য অখণ্ড সমগ্রতার অঙ্গ বা অংশ। তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল আর সমগ্রের মধ্যস্থিত একজন বিবিক্ত ব্যক্তির অহংগত "স্বাধীন" ইচ্ছা দ্বারা সর্ব্বথা বা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত একটা পৃথক গতিবৃত্তিরূপে থাকিতে অথবা তদ্রূপ বোধ হইতে পারে না। আমাদের কর্ম্মাবলি এক অখণ্ড বিশ্বক্রিয়ার অঙ্গীভূত ; সেই সমগ্রতা হইতেই তাহারা উদ্ভূত হইয়াছে আবার তাহারই মধ্যে তাহারা যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে অথবা আরও যথার্থভাবে বলিতে গেলে তাহারা নিজেদিগকে সন্নিবিষ্ট করিতেছে, আর তাহাদের ফলাফল এমন সকল শক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যাহারা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। যেমন তাহার বিরাট সমগ্রতায় তেমনি তাহার প্রত্যেক খণ্ড ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে এই বিশ্ব-ক্রিয়া সেই পরম একেরই এক অবিভাজ্য গতিবৃত্তি যিনি বিশ্বের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধ-মানভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। মানুষ যে অনুপাতে তাহার নিজের ও বাহিরে এই পরম একের মধ্যে এবং জাগতিক গতির অভ্যন্তরস্থিত তাঁহারই শক্তিরাজির নিগূঢ় অলৌকিক ও সার্থক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে জাগরিত হইতে থাকে সেই অনুপাতে সেও তাহার নিজের ও সর্ব্ববস্তুর সত্য সম্বন্ধে ক্রমশঃ অধিক সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। আমাদের এবং আমাদের চতু-র্দ্দিকে অবস্থিত অন্যসকলের মধ্যেও এই ক্রিয়া এই গতিধারা, আমাদের বহি-শ্চর চেতনা বিশ্বক্রিয়ারাজির যে ক্ষুদ্র খণ্ড সম্বন্ধে শুধু সচেতন আছে কেবল তাহাতে নিবদ্ধ নহে ; ইহার ভিত্তিরূপে যাহা আমাদের মনের নিকট অধিচেতন বা অবচেতন সেইরূপ এক বিশাল পরিবেষ্টনকারী সত্তা ইহাকে ধারণ করিয়া

রহিয়াছে, আর যাহা আমাদের প্রকৃতির পক্ষে অতিচেতন তেমন এক বিরাট বিশ্বাতীত তত্ত্ব তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের অজানা এক সার্ব্ব-ভৌমতার মধ্য হইতে যেমন আমরা নিজেরা উন্মিষিত হইয়া উঠিয়াছি তেমনি তথা হইতে আমাদের ক্রিয়াও উত্থিত হইতেছে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাব ব্যক্তিগত মন ও মানস সংকল্প অথবা ব্যক্তিগত আবেগ বা কামনার শক্তির দ্বারা সে সার্ব্বভৌমের একটা আকৃতি আমরা গড়িয়া তুলি বটে কিন্তু বস্তুর প্রকৃত সত্য, ক্রিয়ার প্রকৃত বিধান এই সকল ব্যক্তিগত মানুষী রূপায়ণের অতীত। যাহা বিশ্বের গতিধারার অবিভাজ্য সমগ্রতাকে হিসাবের মধ্যে না আনে তেমন প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষের গড়া ক্রিয়ার তেমন প্রত্যেকটি বিধান বাহ্য কার্য্যক্ষেত্রে যতই উপভোগ্য হউক না কেন, আধ্যাত্মিক সত্যের চক্ষুতে এক অসম্পূর্ণ দৃষ্টি, অজ্ঞানের এক বিধান।

যখন আমরা এই ভাব বা ধারণার কতকটা আভাস পাইয়াছি, অথবা ইহাকে মনের এক জ্ঞান রূপে এবং তাহার ফলে অন্তরাত্মার এক দৃষ্টিভঙ্গী বা সংস্থিতি রূপে চেতনাতে স্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখনও আমাদের বাহ্য অঙ্গাবলিতে ও সক্রিয় প্রকৃতিতে এই সার্ব্বভৌম দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত মতামত, ব্যক্তিগত সংকল্প, ব্যক্তিগত আবেগ ও বাসনার দাবির হিসাব নিকাশ করা একটি খুবই কঠিন কার্য্য। আমরা তখনও এই অখণ্ড গতিবৃত্তিকে যেন নৈর্ব্বক্তিক উপাদানের এক স্তূপরূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে থাকি, যাহার ভিতর হইতে ব্যষ্টি অহংরূপী আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার দ্বারা নিজের ইচ্ছা ও মনের খেয়াল অনুসারে কিছু যেন কাটিয়া বাহির করিয়া লই। মানুষ স্বভাবতই এইভাবে তাহার পরিবেশকে দেখে, বস্তুতঃ কিন্তু এ ভাব অলীক, কেননা আমাদের অহমিকা ও তাহার সংকল্প বিশ্বশক্তি-রাজির সৃষ্টি ও তাহাদের খেলার পুতুল; আর যখন আমরা আমাদের অহমিকা হইতে নিজেদিগকে প্রত্যাহৃত করিয়া উক্ত শক্তিরাজির মধ্যে যিনি ক্রিয়া করেন সেই শাশ্বতের দিব্য জ্ঞান ও সংকল্পময় চেতনার মধ্যে প্রবেশ করি, কেবল তখনই উর্দ্ধের এক প্রকার প্রতিভূ হইয়া আমরা তাহাদের প্রভু হইতে সমর্থ হই। তথাপি যতদিন মানুষ তাহার ব্যষ্টিব্যক্তিত্বকে পোষণ করে এবং তাহাকে পূর্ণরূপে পরিণত করিয়া তুলিতে না পারে ততদিন এই ব্যক্তিগত মনোভাবই তাহার পক্ষে যথার্থ; কেননা এই মনোভাব ও প্রযোজকশক্তি ছাড়া সে তাহার অহমিকার মধ্যে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে পারে না, বিশ্বের অবচেতন অথবা অর্দ্ধচেতন সত্তাসমষ্টির মধ্য হইতে যথেষ্টভাবে পরিণত হইতে ও নিজেকে পৃথক করিয়া লইতে পারে না।

কিন্তু যখন পরিণতির পথে সংঘর্ষময় রাজসিক সাধনধারার ভেদভাবাপন্ন পরিণতির প্রয়োজন আর আমাদের নাই, যখন আমরা শিশু আত্মার ক্ষুদ্রতার প্রয়োজন হইতে মুক্ত হইয়া একত্ব ও সর্ব্বজনীনতার দিকে, বিশ্বচেতনার দিকে এবং তাহাও ছাড়াইয়া বিশ্বাতীত আত্মস্থিতির দিকে অগ্রসর হইতেছি তখনও আমাদের সমগ্র জীবনধারার উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কার হইতে এই অহং-গত চেতনার প্রভাব ও অধিকার ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে এক কঠিন কার্য্য। ইহা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেই হইবে, কেবল আমাদের ভাবনার ধারাতে নয় কিন্তু আমাদের আবেগ অনুভূতি ও ক্রিয়াধারাতেও স্বীকার করিতে হইবে যে এই গতিবৃত্তি এই বিশ্বক্রিয়াধারা সত্তার তেমন এক অসহায় নৈর্ব্ব্যক্তিক তরঙ্গ নয় যাহা কোন অহমিকার শক্তি ও নির্ব্বন্ধ অনুসারে সেই অহংএর ইচ্ছার বশ্যতা স্বীকার করিবে। ইহা এক বিশ্বপুরুষের গতিবিধি, যিনি নিজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, ভগবানের এক পদক্ষেপ, যিনি আপনার সদাবর্দ্ধনশীল ক্রিয়াশক্তির প্রভু। এই গতিধারা যেমন এক ও অখণ্ড তেমনি এ গতিবৃত্তির মধ্যে যিনি সদা অধিষ্ঠিত তিনিও এক অদ্বিতীয় ও অখণ্ড। তিনি যে কেবল সকল কর্ম্মফলের নিয়ন্তা তাহা নহে, সকল প্রারম্ভ সকল ক্রিয়া ও সকল প্রণালী তাঁহার বিশ্বশক্তির গতির উপর নির্ভর করে, জীবের উপর তাহাদের নির্ভরতা শুধু গৌণভাবে, কেবল তাহাদের বাহ্যরূপে।

কিন্তু তাহা হইলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ব্যষ্টি কর্ম্মীর স্থান কোথায়? শক্তি-শালী সক্রিয় প্রকৃতির মধ্যে এই অদ্বিতীয় বিশ্বপুরুষের এবং এই একমাত্র অখণ্ড গতিবৃত্তির সঙ্গে তাহার যথার্থ সম্বন্ধ কি? সে একটি কেন্দ্রমাত্র—অদ্বয় বিরাট ব্যক্তিচেতনার খণ্ড বিবিক্ত অভিব্যক্তির, এক সমগ্র অখণ্ড গতিধারার বিশেষ প্রকাশের এক কেন্দ্র; তাহার ব্যক্তিত্ব প্রবহমান ব্যক্তিসত্তার এক তরঙ্গে অদ্বয় বিশ্বপুরুষকে, বিশ্বাতীত শাশ্বত সত্তাকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু অজ্ঞানের মধ্যে এ প্রতিফলন সর্ব্বদাই ভঙ্গ ও বিকৃতরূপেই দেখা দেয়, কেননা আমাদের সচেতন জাগ্রত সত্তারূপী এই তরঙ্গের চূড়া দিব্যপুরুষের এক অপূর্ণ ও মিথ্যায় পরিণত সাদৃশ্য শুধু প্রতিফলিত করে। আমাদের সকল মতামত, আদর্শ, রূপায়ণ ও তত্ত্ব দিব্য পুরুষের চরম আত্মপ্রকাশের দিকে চলমান সার্ব্ব-ভৌম ও সদাবর্দ্ধমান অখণ্ড ক্রিয়াধারা ও বহুমুখী গতিবৃত্তির কিছুটার প্রতিরূপ এই ভগ্ন ও বিকৃতিকারক দর্পণে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা মাত্র। আমাদের মন যতটা পারে তাহার প্রতিরূপ প্রদর্শন করে কিন্তু সে প্রতিরূপ অতি অল্প পরিমাণেই মূল বস্তুর নিকটে আসে, মনের ভাবনাধারা যতই উদার হয় যতই আলোক ও শক্তিরমধ্যে বাড়িয়া উঠে ততই তাহার প্রতিরূপ প্রদর্শনের

এই অপ্রাচুর্য্য হ্রাস পাইতে থাকে বটে কিন্তু মূল বস্তুর আরও কাছে আসিলেও তাহা কখনই তাহার সত্যে এমন কি তাহার প্রকৃত এক আংশিক মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে পারে না। শুধু অখণ্ড বিশ্বের মধ্যে নয়, শুধু জীবন্ত ভাবনাশীল প্রাণীর সমষ্টিতেও নয়—কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টিব্যক্তির অন্তরাত্মায় দিব্য পরম রহস্যের এবং অনন্তের নিগূঢ় সত্যের কিছু বর্দ্ধমানভাবে প্রকট করিবার জন্য ভাগবত সংকল্প যুগযুগান্ত ধরিয়া ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। তাই সমগ্র বিশ্বের অন্তরে, ভূত সমষ্টির মধ্যে, প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার ভিতরে একটা বদ্ধমূল সহজ প্রতীতি বা বিশ্বাস আছে যে তাহা নিজে পূর্ণ হইয়া উঠিতে পাবে, বা উঠিবে, আর আছে ক্রমবর্দ্ধমান পূর্ণতর ও সুসমঞ্জসতব আত্ম-পরিণতির মধ্য দিয়া বস্তুর নিগূঢ় সত্যের অধিকতর নিকটে পৌঁছিবার এক অবিরাম প্রচেষ্টা ও গতি। এই প্রচেষ্টাই মানুষের গঠনশীল মনের কাছে জ্ঞান, অনুভূতি, চরিত্র, রসবোধ ও ক্রিয়ারূপে দেখা দেয়, দেখা দেয় সেই সমস্ত মান ও বিধান, নিয়ম ও আদর্শরূপে যাহাদিগকে বিশ্বধর্ম্মে রূপান্তরিত করিতে মানুষ প্রযত্নশীল হয়।

যদি আমরা আমাদের অধ্যাত্ম সত্তাতে স্বাধীন হইতে চাই, যদি আমরা একমাত্র আমাদের পরম সত্য ছাড়া আর কিছুর অধীন হইতে না চাই, তাহা হইলে এ ধারণা আমাদিগকে পরিহার করিতে হইবে যে আমাদের মানসিক ও নৈতিক বিধিবিধান দ্বারা অনন্তকে বন্ধন করা যায় অথবা আমাদের আজিকাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের মধ্যে পরম পবিত্র চরম শাশ্বত কোন বস্তু আছে। যতদিন প্রয়োজন আছে ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর সাময়িক আদর্শ গঠিত করিলে জাগতিক প্রগতির মধ্যে ভগবানকেই সেবা করা হইবে; কিন্তু কোন বিধান বা আদর্শকে চরম বা অমোঘ বলিয়া চিরকালের জন্য অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিলে তাঁহার চিরন্তন প্রবাহকে বাঁধ দিয়া আটক করিবার চেষ্টাই করা হইবে। একবার এই সত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ মানবাত্মা শিব ও অশিবের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবে। কেননা যাহা কিছু ব্যক্তিকে বা জগৎকে তাহাদের দিব্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে তাহাই শিব বা শুভ, আর যাহা কিছু সেই প্রগতিকে রুদ্ধ বা ব্যাহত করে তাহাই অশিব বা অশুভ। কিন্তু এই পূর্ণতা নিত্যবৃদ্ধিশীল, কালের ক্ষেত্রে তাহার ক্রম-

পরিণতি চলে। তাই শুভাশুভের আদর্শও অনিত্য, কালের গতিতে তাহার অর্থ ও মূল্যের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটে। এই যে-বস্তুকে আজ আমরা অশিব বলিতেছি এবং যাহার বর্ত্তমান রূপকে অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে তাহা একদিন ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত প্রগতির সহায়ক ও প্রয়োজনীয় ছিল। আবার আমরা অন্য যাহাকে অদ্য অশুভ বলিয়া দেখিতেছি সেই বস্তুটিই অন্য প্রকার রূপ ও বিন্যাসে হয়ত কোন ভবিষ্যৎ পূর্ণতার উপাদান হইয়া উঠিবে। আর আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে আমরা শুভ অশুভের এই বিভেদকেও অতিক্রম করিয়া যাই, কারণ তথায় এই যে সমস্ত বস্তুকে আমরা শুভ ও অশুভ বলি তাহাদের সকলের উদ্দেশ্য ও দিব্য উপযোগিতা আবিষ্কার করি। তখন, সকল বস্তুতে, যাহাকে শুভ বলি যেমন তাহাতে, ঠিক সেই পরিমাণে যাহাকে অশুভ বলি তাহাতে, যে অসত্য আছে তাহার মধ্যে যে বিকৃতি অন্ধকার ও অজ্ঞান আছে তাহা আমাদিগকে বর্জন করিতে হয়। কেননা তখন আমাদিগকে শুধু সত্য এবং ভগবানকেই মানিয়া লইতে হয় কিন্তু চিরন্তন গতিধারার মধ্যে অন্য কোন বিভেদ করিতে হয় না।

যাহারা কেবল একটা অটল অচল আদর্শ লইয়া কাজ করিতে এবং কেবল মানুষী মূল্যই অনুভব করিতে পারে, দিব্য মূল্যের অনুভূতি যাহাদের নাই, তাহাদের নিকট এই সত্য এক বিপজ্জনক বস্তুকে স্বীকার করিয়া লওয়া মনে হইতে পারে, তাহারা মনে করিতে পারে যে ইহা নীতির ভিত্তিকে চূর্ণ করিয়া সকল আচরণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে, এক মহাবিশৃঙ্খলা শুধু সৃষ্টি করিবে। অবশ্য যদি এরূপ হয় যে একদিকে এক শাশ্বত পরিবর্ত্তন-বিরহিত নীতি, অন্যদিকে নৈতিকতার একান্ত অভাব এই দুইএর মধ্যে একটিকে নির্ব্বাচন ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তাহা হইলে অজ্ঞানে অবস্থিত মানুষের পক্ষে সেই ফল দেখা দিতে পারে। কিন্তু মানুষের স্তরেও যদি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আলোক থাকে, যদি আমাদের এতটা নমনীয়তা থাকে যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে আচরণের কোন আদর্শ সাময়িক হইলেও সেই সময়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং যতদিন উৎকৃষ্টতর আদর্শ তাহার স্থান অধিকার না করে, ততদিন পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তদনুসারে চলিতেও হইবে, তাহা হইলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, এক অপূর্ণ অসহিষ্ণু ধর্ম্মের গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু আমরা হারাইও না। বরং তাহার স্থানে আমরা লাভ করি হৃদয়ের এক প্রশান্ততা, নিরবচ্ছিন্ন নৈতিক প্রগতির এক শক্তি, ভূতানুকম্পা, নানা সংঘর্ষেবিব্রত পতনশীল জীবরাজির সমষ্টিভূত এই জগতের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত সহানুভূতির সহিত প্রবেশের সামর্থ্য; আর চলতি

পথে জগৎকে সাহায্য করিবার সুষ্ঠুতর অধিকার ও শক্তি সেই ভূতানুকম্পাই আমাদিগকে প্রদান করে। অবশেষে যেখানে মানুষের ক্ষেত্র শেষ এবং দিব্য ক্ষেত্র আরম্ভ হয়, যেখানে মনোময় চেতনা অতিমানসচেতনার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং সান্ত দ্রুতবেগে নিজেকে অনন্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে সেখানে সকল অশিব এক বিশ্বাতীত পরম শিবের মধ্যে তিরোহিত হইয়া যায়, যে শিব চেতনার যে ভূমি স্পর্শ করে তাহাতেই সার্ব্বভৌম হইয়া উঠে।

তাহা হইলে ইহা স্থির হইল যে, এই যে সমস্ত আদর্শদ্বারা আমরা আমাদের আচার ব্যবহার শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে চাই তাহারা, প্রকৃতি যাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে সেই সার্ব্বভৌম আত্মোপলব্ধির পথে আমাদের ভ্রমপ্রমাদ বিজড়িত মনোময় প্রগতিকে আমাদেব নিজ চেতনার কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতি-বিম্বিত বা অঙ্কিত করিবাব জন্য অস্থায়ী ও অপূর্ণভাবে কৃত ক্রমবিবর্ত্তনশীল প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু আমাদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিবিধান এবং ক্ষণভঙ্গুর শুচিতা দ্বারা দিব্য অভিব্যক্তিকে বাঁধা যায় না, কেননা তাহার পশ্চাতে যে চেতনা রহিয়াছে তাহা এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর পক্ষে অতি বিরাট। আর একবার এই তথ্যকে ধরিতে পারিলে—সে তথ্য আমাদের যুক্তিবিচার যে চরম বস্তু, এ বোধের পক্ষে হতবুদ্ধিকর হইলেও—আমরা মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রগতির পথবর্ত্তী বিভিন্নস্তর-নিয়ন্ত্রণকারী আদর্শ-পরম্পরাকে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে বরং যথাযথস্থানে উৎকৃষ্টতররূপে স্থাপন করিতে সমর্থ হইব। তাহাদের মধ্যে যেগুনি সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বা ব্যাপক, এখানে বড় জোর তাহাদের উপর প্রসঙ্গক্রমে একবার দৃষ্টিপাত করিতে পারি। কেননা আমাদের জানা চাই তাহাদের কি সম্বন্ধ সেই অপর আধ্যাত্মিক ও অতিমানস ক্রিয়াধারার সঙ্গে, যাহা আমাদের সকল মনোময় আদর্শের অতীত, যাহা যোগসাধনার লক্ষ্য এবং ভগবানের ইচ্ছার কাছে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমর্পণ করিয়া যাহার দিকে সে সাধনা অগ্রসর হয়—আর এই সমর্পণের দ্বারা বৃহত্তর চেতনাতে অধিরোহণের মধ্য দিয়া ব্যষ্টিসসত্তার পক্ষে সক্রিয় শাশ্বত তত্ত্বের সহিত একপ্রকার একত্ব উপলব্ধি আরও শক্তিশালীভাবে সম্ভব হয়।

মানুষের জীবনে আচরণের চারিটি প্রধান আদর্শ ক্রমোর্দ্ধভাবে দেখা দেয়। প্রথম স্তরে থাকে তাহার ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ, বাদ বিচার ও কামনা-বাসনার অনুসরণ; দ্বিতীয়ে মানবসমষ্টির মঙ্গল সাধন ও তাহার বিধিবিধান;

তৃতীয়ে সর্ব্বোত্তম নৈতিক উৎকর্ষসাধন; পরিশেষে প্রকৃতির সর্ব্বোচচ দিব্য বিধানের উপলব্ধি।

মানুষ তাহার দীর্ঘ ক্রমবিকাশের পথে যাত্রারম্ভের সময় এই চারিটির কেবল প্রথম দুইটি দ্বারাই আলোকিত ও পরিচালিত হয়; কেননা এই দুইটিই তাহার জান্তব ও প্রাণময় সত্তার বিধান, আর দেহপ্রাণময় পশু-মানবরূপেই সে প্রগতির পথে প্রথমে অগ্রসর হয়। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত কার্য্য হইল মানবতার জাতিরূপের মধ্যে দিব্য পুরুষের বর্দ্ধমান এক প্রতিরূপ ফুটাইয়া তোলা, তাহার আন্তর ও বাহ্য প্রণালীব পুরু আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে প্রকৃতি তাহাব কর্ম্মের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যেব দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু জড় বা পশুভাবাপন্ন মানুষ তাহার জীবনের এই আন্তর লক্ষ্যেব সম্বন্ধে অজ্ঞ; সে জানে শুধু তাহার নিজেব অভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে, তাই তাহার নিকট কি চাওয়া হয় অথবা তাহাকে কি করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তাহার নিজের অভাবের বোধ এবং তাহার নিজের কামনার চাঞ্চল্য ও নির্দ্দেশ ছাড়া অন্য পরিচালকের সাক্ষাৎ অবশ্যম্ভাবীরূপে সে পায় না। সর্ব্বাগ্রে তাহার দেহ ও প্রাণের দাবি ও প্রয়োজন মিটানো এবং তাহার পব হৃদয়েব যে আবেগ অথবা মনের যে আকৃতি যে কল্পনা বা সক্রিয় ধারণা তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহাদের পরিতৃপ্তি সাধনই হইল প্রথম অবস্থায় তাহার আচবণের স্বাভাবিক বিধান। সাম্যবিধায়ক বা অভিভবকারী একমাত্র যে বস্তু এই নির্ব্বন্ধাতিশয়যুক্ত স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে তাহা হইল যে পরিবার সম্প্রদায় জাতি বা দলের সে অন্তর্ভুক্ত তাহার কল্পনা বা ধারণা তাহার প্রয়োজন ও বাসনা তাহার কাছে যে দাবি উপস্থিত করে তাহার তাড়না।

আবার দ্বিতীয় আদর্শের বিধানকে কার্য্যকরী করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না যদি মানুষ একলা তাহার নিজের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিত—আর তাহা শুধু সম্ভব হইত যদি জগতে ব্যক্তিগত উন্নতি ও পরিণতি সাধনই ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত। কিন্তু সমগ্র ও তাহার অংশরাজির মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই সর্ব্বসত্তাকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হয়, সমগ্রের যেমন প্রয়োজন তাহার প্রতি অঙ্গকে তেমনি প্রতি অঙ্গেরও প্রয়োজন সমগ্রকে, তাই সংঘ এবং তন্মধ্যস্থ সকল ব্যষ্টিব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় দর্শনের ভাষায় পৃথক পৃথক ব্যষ্টি সত্তা এবং সংঘগত সত্তা, ব্যষ্টি ও সমষ্টি এ উভয় রূপের মধ্য দিয়াই ভগবান সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ করেন। যে মানুষ তাহার বিবিক্ত সত্তার পরিণতি, তাহার পূর্ণতা

ও স্বাতন্ত্র্যকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, অপরাপর মানুষের সহযোগিতা ছাড়া সে তাহার নিজের ব্যক্তিগত অভাব অভিলাষও মিটাইতে পারে না ; সে নিজে একটি সমগ্র বস্তু তথাপি অপরকে বাদ দিলে সে অপূর্ণ। এই বাধ্যবাধকতার জন্য মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের বিধান সমষ্টির বিধানের অন্তর্গত, এরূপ হওয়ার কারণ এক স্থায়ী সংঘসত্তা তাহার নিজস্ব সমষ্টিগত মন ও প্রাণ লইয়া গঠিত হইয়াছে, ব্যষ্টির দেহগত মন ও প্রাণ তাহার মধ্যে অস্থায়ী একক রূপে তাহার অধীন হইয়াই রহিয়াছে। তথাপি ইহাও সত্য যে ব্যষ্টির মধ্যে একটা কিছু আছে যাহা অবিনাশী ও স্বাধীন, এই সংঘদেহে আবদ্ধ নহে, যে সংঘদেহ তাহার দেহগত সত্তার বিনাশের পরও বাঁচিয়া থাকে কিন্তু তাহার শাশ্বত আত্মাপুরুষের অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিতে পারে না অথবা তাহার নিজের বিধান দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না।

আপাতপ্রতীয়মান বৃহত্তর ও প্রভুত্বকারী এই বিধানও, যাহা সাধারণ ব্যষ্টি মানবের প্রাথমিক জীবনকে শাসিত করে সেই প্রাণিক ও পাশবতত্ত্বের এক বিস্তার ছাড়া আর কিছু নহে ; ইহা পশুর পাল বা দলের বিধান। ব্যষ্টিব্যক্তি তাহার নিজের জীবনকে অন্য কতকগুলি ব্যষ্টিব্যক্তির জীবনের সঙ্গে অংশতঃ এক মনে করে, যে সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে জন্মের বশে স্বেচ্ছায় অথবা ঘটনাচক্রে তাহার সাহচর্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। আর ব্যষ্টির নিজের অস্তিত্ব ও পরিতৃপ্তির জন্য যূথের অস্তিত্ব প্রয়োজন বলিয়া, প্রথম হইতে না হইলেও কালক্রমে, ব্যষ্টির জীবনে এক মুখ্য স্থান অধিকার করে সংঘের রক্ষণ, তাহার অভাবরাজির পরিপূরণ, তাহার সমষ্টিগত ধারণা ও বাসনার পরিতর্পণ, তাহার জীবনের নানা অভ্যাস ও আচরণের পরিপালন, যাহা না থাকিলে ব্যষ্টিব্যক্তি একত্রে আসিয়া মিলিতে পারে না। শুধু অন্য এক জনের অথবা কয়েক ব্যক্তির নয় পরন্তু সমগ্র সমাজের ধারণা ও অনুভূতির পরিতর্পণ, অভাব ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের পরিপালনের নিকট অবস্থার প্রয়োজন বশতঃই—কোন নৈতিক বা পরার্থপরতামূলক উদ্দেশ্যে নহে—ব্যক্তিগত ধারণা ও অনুভূতির পরিতর্পণ, ব্যক্তিগত অভাব ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের পরিপালনকে গৌণ স্থান দিতে হয়। সামাজিক প্রয়োজনই হইল সেই অস্পষ্ট মাতৃগর্ভ যাহা হইতে নীতিবোধ ও মানুষের নৈতিক প্রেরণা জাত হইয়াছে।

বস্তুতঃ ইহা জানা যায় নাই যে কোন আদিমকালে মানুষ একাকী অথবা কোন কোন পশুর মত কেবল নিজের সঙ্গিনীকে লইয়া বাস করিত। তাহার সম্বন্ধে যত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহার সব কিছুতেই দেখা

যায় যে মানুষ সামাজিক জীব, দেহে এবং প্রকৃতিতে কোন দিনই পৃথক ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে নাই। তাহার ব্যক্তিগত পরিণতির বিধান সর্ব্বদাই দলগত বিধানের অধীন রহিয়াছে; মনে হয় সমষ্টির মধ্যে এককরূপে চিরকালই সে জন্মিয়াছে, জীবন কাটাইয়াছে, গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যুক্তির ও স্বভাবের দিক হইতে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে বলিতে হয় যে মানুষের ব্যক্তিগত অভাব ও আকাঙ্ক্ষাই তাহার নিকট মুখ্য বিষয়, সামাজিক বিধিবিধান গৌণরূপে আসিয়াছে এবং বলপূর্ব্বক তাহাকে অধিকার করিয়াছে। মানুষের মধ্যে দুইটি পৃথক প্রবল প্রেরণা বা আবেগ রহিয়াছে—একটি ব্যষ্টি-গত অপরটি সমষ্টিগত, একটি ব্যষ্টিব্যক্তিজীবন অপরটি সামাজিক জীবন, একটি ব্যক্তিগত অপরটি সমাজগত আচরণের প্রযোজনা। এই দুই প্রকার প্রেরণা ও জীবনধারার বিরোধের সম্ভাবনা এবং তাহাদের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আবিষ্কারের চেষ্টা মানবসভ্যতার মূলেই রহিয়াছে, আর আজ যখন সে প্রাণময় পাশবজীবন অতিক্রম করিয়া গভীররূপে ব্যষ্টিভাবাপন্ন মনোময় ও আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে তখনও সে-বিরোধ ও সে সঙ্গতিসাধন প্রচেষ্টা অন্য মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে।

মানুষের দিব্য ভাবে উন্নয়ন ও পরিণতির পথে ব্যষ্টির পক্ষে তাহার বহিঃস্থিত সামাজিক বিধানের অস্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে প্রভূত পরিমাণে সহায় ও অন্তরায় এ উভয়ই হইয়াছে। ইহা সহায় তখন, যখন প্রারম্ভে মানুষ অপরিণত বুদ্ধি, আত্মসংযম ও আত্মআবিষ্কারে অক্ষম, কেননা তখন সমাজ-বিধান তাহার ব্যক্তিগত অহমিকা ছাড়া অন্য একটি শক্তিকে গড়িয়া তোলে যাহার মধ্য দিয়া তাহার পাশবিক দাবিদাওয়া কমাইতে স্বীকার করানো বা বাধ্য করা এবং তাহার অযৌক্তিক ও প্রায়শঃ উগ্র গতিবৃত্তিরাজিকে সংযত করা যাইতে পারে, এমন কি সময়ে সময়ে স্বল্পতর-ভাবে-ব্যক্তিগত অথচ বৃহত্তর এক অহমিকার মধ্যে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেও পারে। আবার এই সমাজ-বিধানই তাহার প্রগতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় যখন তাহার পরিণত আত্মসত্তা তাহার মানবত্বকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, কারণ এ বিধান একটা বাহ্য আদর্শ বাহির হইতে তাহার উপর আরোপ করিতে চাহিতেছে, আর তাহার নিজের পূর্ণতালাভের বিধানই এই যে তাহার অন্তরের মধ্য হইতে ক্রমবর্দ্ধমান স্বাধীনতার সঙ্গে সে পরিণত হইয়া উঠিবে, তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বকে দমন না করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে; যাহা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শিক্ষা দিবে ও সংযত রাখিবে এমন কোন আরোপিত বাহ্য বিধানের দ্বারা যে তাহা আর করিতে চাহিবে না,

করিবে নিজের অন্তরাত্মাদ্বারা যাহা পূর্ব্বতন সকল রূপের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার আলোক দ্বারা সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অধিকার ও রূপান্তরিত করিবে।

সমাজের দাবির সঙ্গে ব্যক্তির দাবির সংঘর্ষের ক্ষেত্রে দুইটি আদর্শ এবং দুইটি চরম সমাধান পরস্পরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। একটি হইল সমষ্টির দাবি, যে চায় ব্যষ্টি অল্পবিস্তর পূর্ণরূপে তাহার অধীন হইয়া চলুক, অথবা এমন কি সমাজের মধ্যে নিজের স্বাধীন সত্তা ডুবাইয়া দিক—ক্ষুদ্রতর বৃহত্তরের নিকট নিজেকে বলিদান বা উৎসর্গ করুক। এ আদর্শ অনুসারে ব্যষ্টিকে সমাজের অভাব ও প্রয়োজন নিজেরই অভাব ও প্রয়োজন, সমষ্টির বাসনা নিজের বাসনা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে; নিজের জন্য নয়, যে গোষ্ঠি কুল সম্প্রদায় বা জাতির সে অন্তর্ভুক্ত তাহার জন্যই তাহাকে বাঁচিতে হইবে। অপরপক্ষে ব্যষ্টির দিক হইতে আদর্শ ও চরম সমাধান এই যে সমাজ তাহার নিজের জন্য অথবা অন্যসকল কিছুকে বাদ দিয়া নিজের সমষ্টিগত উদ্দেশ্যের জন্য যে বর্ত্তমান থাকিবে তাহা নহে কিন্তু থাকিবে ব্যষ্টি ও তাহার পূর্ণতাসিদ্ধির জন্য, তাহার মধ্যস্থিত ব্যক্তিবর্গেব বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবন-প্রতিষ্ঠার জন্য। ব্যষ্টির সর্ব্বোত্তম সত্তার যথাসম্ভব প্রতিভূ হইয়া এবং তাহার আত্মোপলব্ধির সহায়তা করিয়া সমাজ তাহার সদস্যের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করিবে, নিজের অভ্যন্তরস্থিত ব্যষ্টিব্যক্তিবর্গের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুমোদন ও স্বীকৃতিতেই তাহার অস্তিত্ব রক্ষিত হইবে, তজ্জন্য তাহাকে আইন কানুন বা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ কবিতে হইবে না। এই দুই আদর্শের কোনটিব যথার্থ অনুগামী সমাজ জগতে কোথাও নাই, এরূপ একটি সমাজসৃষ্টি অতি কঠিন, কোনপ্রকারে সৃষ্ট হইলেও যতদিন ব্যষ্টি ব্যক্তি তাহার জীবনের প্রধান প্রযোজকশক্তিরূপে অহমিকাতে সংসক্ত থাকিবে ততদিন তাহার অনিশ্চিত অস্তিত্ব রক্ষা করা হইবে দুরূহতম ব্যাপার। সমাজের দ্বারা ব্যষ্টিব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নয় সাধারণভাবে শাসন ও পরিচালনই সহজতর উপায় এবং প্রথম হইতেই প্রকৃতি সহজাত সংস্কার বশে সেই পন্থাই গ্রহণ করিয়াছে আর কঠোর বিধিবিধান ও অবশ্য পালনীয় লোকাচারের সহায়তা লইয়া এবং আজিও যে মানুষ পরতন্ত্র ও অপরিণতবুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে সতর্কভাবে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই সাম্য বজায় রাখিয়াছে।

আদিম কালের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত জীবনকে সম্প্রদায়গত দৃঢ় ও অচল-

প্রতিষ্ঠ রীতিনীতি আচারব্যবহার ও বিধিবিধানের অধীন করিয়া রাখা হইয়াছিল ; ইহাই হইল মানুষের যূথগত জীবনের সেই প্রাচীন বিধান যাহা শাশ্বত হইতে চাহিয়াছে এবং অবিনাশী পুরুষের স্থায়ী অনুজ্ঞার ছদ্মবেশ পরিয়া নিজেকে সর্ব্বদাই জাহির করিয়া আসিয়াছে, বলিয়াছে "এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" 'ইহাই সনাতন ধর্ম্ম'। মানুষের মনে এ আদর্শ আজিও মরে নাই : মানবপ্রগতির সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ধারাও মানুষের আত্মাকে সমষ্টিজীবনের দাসত্বে বাঁধিয়া রাখিবার এই প্রাচীন পদ্ধতির বর্দ্ধিত ও জাঁকজমকপূর্ণ এক সংস্করণ ছাড়া অন্য কিছু নহে। এখানে পৃথিবীর বুকে বৃহত্তর সত্য ও মহত্তর জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে এক দুর্জয় বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, ব্যক্তিগত বাসনা ও স্বাধীনভাবে তাহার পরিতৃপ্তির চেষ্টা যতই অহংগত, আপাতরূপে যতই মিথ্যা ও বিকৃত হউক না কেন, তাহার অন্ধকারময় কোষাণু-সমূহের মধ্যে সমগ্রের জন্য প্রয়োজনীয় এক পরিণতির বীজ নিহিত রহিয়াছে ; তাহার অন্বেষণ ও পদস্খলনের পশ্চাতে এমন এক শক্তি আছে যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং দিব্য আদর্শের প্রতিরূপে রূপান্তরিত করিতে হইবে। সেই শক্তিকে প্রদীপ্ত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে দমিত করিলে কিম্বা একান্তভাবে সমাজের গুরুভার শকটকে টানিবার জন্য ব্যবহার করিলে চলিবে না। চরম পরিণতির জন্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ সংঘজীবনের পশ্চাতে অবস্থিত শক্তির মতই সমান প্রয়োজনীয় ; ব্যক্তিত্বকে গলা টিপিয়া মারিলে মানুষের মধ্যস্থিত দেবতাকে শ্বাসরোধ করিয়া নিধন করা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আর বর্ত্তমানে মানবজাতি যে সাম্যের অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়া সমাজকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা আর নাই বলিলেই চলে। বরং এ বিপদ সর্ব্বদাই রহিয়াছে যে সমাজের অতি বর্দ্ধিত চাপ ও অপ্রদীপ্ত গুরুভার ব্যষ্টি সত্তার স্বাধীন বিকাশকে দমিত অথবা অযথাভাবে নিরুৎসাহিত করিতে পারে। কেননা ব্যষ্টিমানবই অপেক্ষা-কৃত সহজে সচেতন ও জ্ঞানালোকদীপ্ত হইতে পারে, তাহার কাছে উপস্থিত প্রভাবের নিকট স্পষ্টভাবে উন্মুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত মানুষ আজিও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অর্দ্ধচেতন মাত্র রহিয়াছে, যে সমস্ত বিশ্বশক্তি দ্বারা সে শাসিত হয় তাহাদিগকে সে চিনে না, তাহাদের উপর তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

দমন ও গতিহীনতার এই বিপদের বিরুদ্ধে ব্যষ্টি প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া একা একজন মানুষের মধ্যে দেখা দিতে পারে—দুষ্কর্ম্মকারীর সহজাতবুদ্ধিচালিত সমাজদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া

নিঃসঙ্গ বিরক্ত সন্ন্যাসীর সমাজ-জীবনের পূর্ণ অস্বীকৃতি পর্য্যন্ত নানারূপে। এ প্রতিক্রিয়া আবার এমন রূপ নিতে পারে যাহাতে সমাজের ধারণার মধ্যেই একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গণচেতনার উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে যাহার ফলে ব্যষ্টি ও সমাজের দাবির মধ্যে একটা আপোষ রফা স্থাপিত হয়। কিন্তু আপোষ রফার অর্থ সমস্যার সমাধান নহে, ইহা বাধাবিপত্তিকে কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখে মাত্র এবং অবশেষে সমস্যার জটিলতাকে আরও বর্দ্ধিত এবং তাহার পরিণামসমূহকে বহুগুণিত করিয়া তোলে। যথার্থ সমাধান করিতে হইলে এই দুই পরস্পববিরোধী সহজাত প্রবৃত্তি হইতে অন্যতর ও বৃহত্তর এমন এক নূতন শক্তিশালী তত্ত্বের প্রস্ফুরণ প্রয়োজন যাহা যুগপৎ এ দুয়ের উপর প্রভুত্ববিস্তার এবং তাহাদের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ব্যক্তিগত বিধান স্বাভাবিকভাবে আচরণের যে আদর্শ বা মাপকাঠি গ্রহণ করে তাহা হইল আমাদের ব্যষ্টিব্যক্তির অভাব ও আকাঙ্ক্ষার, কামনা ও বাসনাব প্রপূরণ ; তেমনি সমষ্টিগত বিধান স্বাভাবিক-ভাবে যে উচ্চতর আদর্শ গ্রহণ করে তাহা হইল সমগ্র সমাজের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও বাসনার পরিতর্পণ। এই দুই বিধানের উপরে এক আদর্শ নৈতিক বিধানকে উদ্বিত হইতে হইয়াছে যাহা অভাবেব পরিপূবণ বা কামনার প্রতর্পণ নহে, বরং যাহা তাহাদিগকে সংযত করে এমন কি বলপূর্ব্বক দমিত বা লুপ্ত কবিয়া দেয়—আর ইহা করে এমন এক আদর্শ ব্যবস্থার প্রয়োজনে যাহা পাশব অথবা শুধু প্রাণ বা দেহগত ব্যাপার নহে কিন্তু মনোময়, যাহা আলোক ও জ্ঞানের, যথাযথবিধান ও গতিধারার এবং যথার্থ শৃঙ্খলার জন্য মনের যে অন্বে-ষণ ও প্রচেষ্টা তাহা দ্বারা সৃষ্ট বস্তু। যে মুহূর্ত্তে মানুষের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হইয়া উঠে তখনই সে প্রাণ ও জড়ের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া মনোময় জীবনের ভূমিতে উঠিতে আরম্ভ করে, প্রকৃতির তিনধাপযুক্ত উর্দ্ধা-রোহণের পথে প্রথম হইতে দ্বিতীয় ধাপে উত্তীর্ণ হয়। তখন মনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের এক উচ্চতর আলোক আসিয়া তাহার অভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্শ করে, মনের দাবি, সৌন্দর্য্যবোধ, বুদ্ধি ও ভাবাবেগের প্রেরণা দেহ ও প্রাণের দাবি অপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠে।

আচরণের স্বাভাবিক বিধান বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতে শক্তি, প্রেরণা ও কামনার এক সাম্য ও সামঞ্জস্যের দিকে অগ্রসর হয়, উচ্চতর নৈতিক বিধান

মনোময় ও নৈতিক প্রকৃতির পরিণতির দ্বারা একটা স্থির আন্তর আদর্শ বা মানের দিকে অগ্রসর হয় অথবা ইহাও বলা চলে যে তাহার চলিবার পথের লক্ষ্য ন্যায়-পরতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা, প্রেম, যথাযথযুক্তি, যথার্থ শক্তি, সৌন্দর্য্য, আলোক প্রভৃতি পরমগুণের এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আদর্শে পৌঁছা। সুতরাং মূলতঃ ইহা ব্যক্তিসত্তারই এক আদর্শ, সমষ্টিগত মনের সৃষ্টি নয়। ব্যষ্টিব্যক্তিই চিন্তাশীল ভাবুক, ব্যষ্টি-ব্যক্তিই এ আদর্শকে প্রকট ও রূপায়িত করিয়াছে, নৈলে ইহা অমূর্ত্ত অবস্থায় সমষ্টিমানবের অবচেতনার মধ্যে থাকিয়া যাইত। ব্যষ্টিব্যক্তি নৈতিকতার সাধকও বটে; যে আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সাধিত হয় তাহা বাহ্য বিধি-বিধানের অধীনতা স্বীকারের ফলে নয়, আন্তর আলোকের নির্দ্দেশের বলেই হয়, মূলতঃ তাহা এক ব্যক্তিগত প্রয়াস। তাহার ব্যক্তিগত আদর্শকে একটা চরম নৈতিক আদর্শের অনুবাদ বলিয়া খ্যাপন করিয়া চিন্তাশীল মনীষী তাহা যে শুধু নিজের উপর আরোপ করে তাহা নহে কিন্তু তাহার ভাবনা যাহাদের মধ্যে পৌঁছে ও অনুপ্রবিষ্ট হয় সেই সকল ব্যক্তিসত্তার উপরও আরোপিত করে। সাধারণ ব্যষ্টিব্যক্তিগণ যেমন তাহার সেই ধারণা অধিক হইতে অধিকতররূপে গ্রহণ করিতে থাকে তেমনি—তাহা কার্য্যে অপূর্ণভাবে প্রয়োগ করুক অথবা একেবারেই প্রয়োগ না করুক—সমাজও এই নূতন নির্দ্দেশ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। তখন সমাজ ধারণায় এ প্রভাব গ্রহণ করে এবং এই সকল উচ্চতর আদর্শের সংস্পর্শে আগত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নূতনরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, যদিও বিস্ময়কর কোন সফলতা সে যে লাভ করে তাহা নহে। কিন্তু সমাজের সহজাত প্রবৃত্তিই এই যে এ সমস্তকে অমোঘ বিধান, বাঁধাধরা আকার, যান্ত্রিক প্রথা, অবশ্যপালনীয় বাহ্য নির্দ্দেশরূপে সে নিজের মধ্যস্থিত সজীব ব্যক্তিবর্গের উপর সর্ব্বদা চাপাইয়া দেয়।

কারণ, ব্যষ্টিব্যক্তি যখন কতকটা স্বতন্ত্র হইয়াছে, যখন সে নিজে সচেতনভাবে উন্নতি ও পুষ্টিলাভে সমর্থ নৈতিক সত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন সে আন্তর জীবন সম্বন্ধে সজাগ এবং আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য উৎসুক হইয়াছে, তাহার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমাজ থাকে তাহার রীতিপদ্ধতিতে বহির্ম্মুখী, তাহার জীবনধারায় অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত জড়ভাবাপন্ন ও যান্ত্রিক, তখন বুদ্ধি ও আত্মোৎকর্ষের উপর ততটা ঝোঁক নাই যতটা আছে স্থিতিশীলতা ও আত্ম-রক্ষার উপর। আজ চিন্তা ও প্রগতিশীল ব্যষ্টিমানব সহজাত প্রবৃত্তিচালিত স্থিতিশীল সমাজের উপর যে বৃহত্তম বিজয় লাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার ভাবনা ও সংকল্পের দ্বারা অর্জিত সেই শক্তি যাহা সমাজকেও চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে, বাধ্য করিয়াছে সমবেত জীবনের ন্যায়পরতা ও

ধর্ম্মনিষ্ঠতা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও করুণার আদর্শের নিকট সমাজের নিজেকে খুলিয়া ধরিতে, তাহার বিবিধ প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য অন্ধ আচারের অপেক্ষা যুক্তিবিচারের বিধানের আশ্রয় লইতে এবং তাহার বিধিনিষেধের পশ্চাতে ব্যষ্টিব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক অনুমোদনের একটা উপাদান যে অন্ততঃ পক্ষে থাকা চাই ইহা স্বীকার করিতে। আজ সামাজিক মনের পক্ষে অন্ততঃ আদর্শরূপে স্বীকার করিয়া নেওয়া সম্ভব হইয়া উঠিতেছে যে তাহার জীবনধারার অনুমোদন শক্তিসামর্থ্য অপেক্ষা জ্ঞানালোকের নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কি তাহার শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্য নৈতিক উন্নতি ও পরিণতি, প্রতিহিংসা বা নিগ্রহ নয়। ভবিষ্যতে ভাবুক বা মনীষীর বৃহত্তম বিজয় সেই দিন আসিবে যে দিন সে ব্যষ্টি ব্যক্তির ও সমাজ বা সমষ্টির জীবনের সম্বন্ধ এবং তাহার মিলন ও স্থায়িত্ব উভয়েব মুক্ত স্বতন্ত্র সুসমঞ্জস সম্মতির উপর এবং একে স্বেচ্ছায় অপরের উপযোগী হওয়ার প্রচেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে, যে দিন উভয়ে মিলিয়া বাহ্য রূপ বা গঠনের অত্যাচার দ্বারা অন্তর-পুরুষকে সঙ্কুচিত করা অপেক্ষা ববং আন্তর সত্যের দ্বারা বহির্জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে।

কিন্তু এই যে সাফল্য লাভ হইয়াছে তাহাও বাস্তব সিদ্ধি অপেক্ষা বরং একটা সম্ভাব্যতা আনিয়া দিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বদাই একটা অসঙ্গতি একটা বিরোধ রহিয়াছে যেমন ব্যক্তিগত নৈতিক বিধান এবং তাহাব অভাব ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, তেমনি সমাজের জন্য স্বিরীকৃত নৈতিক আদর্শ এবং বর্ণ, গোষ্ঠী, ধর্ম্মসম্প্রদায়, সমাজ ও জাতির দেহ ও প্রাণগত নানা অভাব, বাসনা, আচার, সংস্কার, স্বার্থ ও রাগানুরাগ প্রভৃতির মধ্যে। নীতিবাদী বৃথাই একটা নিখুঁত আদর্শ গড়িয়া তোলেন এবং ফল যাহাই হউক না কেন তাহা পালন করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। তাহার কাছে ব্যক্তিগত অভাব আকাঙ্ক্ষা অবৈধ যদি তাহা নৈতিকবিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আর তাহার উপর সমাজবিধানের কোন দাবি বা অধিকার তিনি অস্বীকার করেন যদি তাহা তাহার বিবেক দ্বারা অনুমোদিত এবং তাহার ন্যায়ান্যায় বোধের বিরোধী হয়। ব্যক্তির পক্ষে তাহার চরম সমাধান এই যে প্রেম সত্য ও ন্যায়ের সহিত যাহার সঙ্গতি নাই ব্যক্তি তেমন কোন বাসনা বা দাবি পোষণ করিতে পারিবে না। সমাজ বা জাতির কাছে তাহার দাবি এই যে সত্য, ন্যায়পরতা, মানবতা ও সার্ব্বজনীন মঙ্গলের তুলনায় তাহার অন্য সব কিছুকে এমন কি তাহার নিরাপত্তা ও কাম্যতম বস্তুকে পর্য্যন্ত সে তুচ্ছ বোধ করিবে।

কোন ব্যক্তিই জলন্ত উৎসাহের মুহূর্ত্ত ছাড়া নীতিবাদের এই সমস্ত উচ্চ

শিখরে আরোহণ করে নাই, আজ পর্য্যন্ত এমন কোন সমাজ সৃষ্ট হয় নাই যাহা এই আদর্শ পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। মানুষের পরিণতি ও নৈতিক অবস্থা বর্ত্তমানে যেখানে পৌঁছিয়াছে তাহাতে কেহই হয়ত তাহা পারে না অথবা পারা উচিত নহে। প্রকৃতি ইহা করিতে দিবে না, প্রকৃতি জানে করিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। তাহার প্রথম কারণ আমাদের নৈতিক আদর্শরাজিই আত্মার শাশ্বত সত্যের প্রতিলিপি বা অভিব্যক্তি অপেক্ষা বরং অধিকাংশক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ অথবা বিকৃতভাবে উন্মিষিত, অবিদ্যাচ্ছন্ন ও খামখেয়ালি মনোগঠিত রূপায়ণ। মতাভিমানী নীতিবাদী আত্মাব্যঞ্জকভাবে কতকগুলি চরম আদর্শের সিদ্ধান্ত শুধু খাড়া করে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রত্যেক নৈতিক পদ্ধতি হয় প্রয়োগ করা ও কাজে লাগানো যায় না, না হয় যে চরম মানকে সে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ভান করে কখনই তাহাতে পৌঁছে না। একেত আমাদের নীতির পদ্ধতিতে একটা মিটমাট সাময়িক কৌশল বা জোড়াতালির ব্যাপার দেখা যায়, তাহার উপর সমাজ ও ব্যষ্টি এ উভয়ই তাহার মধ্যে আরও নিষ্ফলতাসাধক যে আপোষরফা আনিয়া দ্রুত হাজির করে তাহাকেও তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিবার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা হয়। আবার নীতিবাদ যদি শুধু সর্ব্বোত্তম প্রেম ন্যায়পরতা ও সাধুতাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিবার জন্য নির্ব্বন্ধতা জানায়, তখন তাহা মানুষের নাগালের এত উর্দ্ধে থাকে যে মানুষ তাহাকে মুখে মানিয়া লইলেও কাজের বেলায় অগ্রাহ্য করে। এমন কি মানবজীবনে এরূপ অনেক উপাদান আছে যাহারা নৈতিক বিধানের অধীনে আসিতে অস্বীকার করে অথচ তাহারা মানুষকে ছাড়িতে কিছুতেই রাজি হয় না। তাহার কারণ এই যে যেমন ব্যক্তিগত কামনা বাসনার বিধিবিধানের মধ্যে অনন্ত অখণ্ড বস্তুর এমন সকল অমূল্য উপাদান আছে যাহাদিগকে সর্ব্বগ্রাসী সমাজের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তেমনি ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মানুষ এ উভয়ের সহজ আবেগগুলির মধ্যে এরূপ অমূল্য উপাদান অনেক থাকিতে পারে যাহা আজ পর্য্যন্ত যে নৈতিক বিধান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া যায় অথচ যাহা চরম দিব্য উৎকর্ষের পূর্ণতা ও সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাহা ছাড়া বিভ্রান্ত ও অপূর্ণ মানুষ বর্ত্তমানে যখন নিরপেক্ষ প্রেম, নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষ যথার্থ বিচারবুদ্ধি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে চায় তখন সহজেই তাহারা পরস্পরের বিরোধী তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ন্যায়পরতা অনেক সময় যাহা চায় প্রেম তাহাকে ঘৃণা করে। যথার্থ যুক্তিবুদ্ধি প্রকৃতির

তথ্যাবলি এবং মানুষের নানা সম্বন্ধ ধীর ও স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া যখন একটা সন্তোষজনক বিধান বা আদর্শ খুঁজিয়া বাহির করিতে চায় তখন কতকটা লঘু না করিয়া নিছক প্রেম বা নিছক ন্যায়পরতার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বস্তুতঃ মানুষের নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা কার্য্যক্ষেত্রে সহজেই ঘোর অন্যায় হইয়া দাঁড়ায় ; কেননা তাহার মনের গঠন একদেশদর্শী ও অনমনীয়, সে মন একটা পক্ষপাতদুষ্ট আংশিক ও কঠোর পরিকল্পনা বা রূপায়ণ উপস্থিত করিয়া দাবি জানায় যে তাহা নিরপেক্ষ এবং সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর তাহার প্রয়োগের সময় বস্তুর সূক্ষ্মতর সত্য ও জীবনের নমনীয়তার কথা সে ভুলিয়া যায়। কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে আমাদের সকল আদর্শই নানাপ্রকার আপসরফা ও জোড়াতালির তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে অথবা তাহার গঠনের মধ্যে এই যে পক্ষপাতিত্ব ও অনমনীয়তা আছে তাহার জন্য ভ্রমে পতিত হয়। মানুষের মন একবার একদিকে আবার অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, নানাপ্রকার বিরোধী ও অসমঞ্জস দাবিদাওয়ার মধ্য দিয়া মানবজাতি আঁকাবাঁকা গতিতে অগ্রসর হয় ; আর সে যাহা চায় অথবা যাহা সে ঠিক বলিয়া মনে করে অথবা ঊর্দ্ধের উচ্চতম আলোক দেহধারী আত্মার কাছে যাহা দাবি করে তদপেক্ষা প্রকৃতি যাহা চায় মানুষ মোটের উপর বরং সহজাত প্রবৃত্তিবশে তাহাই করিয়া যায়, কিন্তু বহু দুঃখ কষ্ট ও অপচয়ের মধ্য দিয়া।

প্রকৃত তথ্য এই যে যখন আমরা নিরপেক্ষ নৈতিক গুণাবলির একটা প্রণালী বা মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছি, যখন আদর্শ বিধিবিধানকে অমোঘ ও অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি তখনও আমাদের পথ খোঁজা শেষ হয় নাই অথবা যথার্থ মুক্তিপ্রদ সত্যের সংস্পর্শলাভ করি নাই। ইহা অবশ্য নিঃসন্দেহ যে এই প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা আমাদের মধ্যস্থিত দেহ ও প্রাণগত মানবতার সীমা অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে আমাদিগকে সাহায্য করে, যে মানবজাতি জীবন্ত জড় মৃত্তিকাতে তাহার শিকড় প্রোথিত করিয়াছে এবং আজিও তাহাতে বাঁধা আছে তাহার ব্যক্তি ও সমষ্টিগত অভাব আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার এক তীব্র প্রেরণা ইহার জন্যই আমাদের মধ্যে আসিয়াছে, ইহাই আমাদের মধ্যস্থিত মনোময় ও নৈতিক সত্তাকে পরিণত করিয়া তুলিবার সহায়তার জন্য এক আস্পৃহা আমাদের মধ্যে জাগাইয়াছে ;

সুতরাং আমাদের পক্ষে উন্নয়নকারী এই নূতন উপাদান অর্জনের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল; ইহার ক্রিয়াধারা পার্থিব প্রকৃতির দুরূহ প্রগতির পথে এক বৃহৎ সোপানই নির্দ্দেশ করে। আরও কথা এই যে এই সমস্ত নৈতিক ধারণার অপ্রাচুর্য্যের পশ্চাতে এমন কিছু লুক্কায়িত আছে যাহা চরম সত্যের সহিত সংযুক্ত; এখানে শক্তি ও আলোকের এমন এক মৃদু ভাতি দেখা দেয় যাহা আমাদের পক্ষে আজিও অনধিগত দিব্য প্রকৃতির অংশ। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুর মনোময় ধারণা সে আলোক নয় আর তাহাদের নৈতিক রূপায়ণও সে শক্তি নয়। যে মন দিব্যপুরুষকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে না এ সমস্ত নৈতিক ধারণা তাহারই দ্বারা গঠিত প্রতিচ্ছবি মাত্র, আর তাহারা তাহাদের সুস্পষ্ট সূত্র বা বিধানাবলীর কারাগারে সে পুরুষকে বন্দী করিবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করে। আমাদের মনোময় ও নৈতিক সত্তার ঊর্দ্ধে রহিয়াছে এক মহত্তর আধ্যাত্মিক ও অতিমানস দিব্য সত্তা; কারণ যেখানে মনের সকল ভাবনাসূত্র সাক্ষাৎ আন্তর অনুভূতির এক দীপ্ত শুভ্র শিখাতে গলিয়া এক হইয়া যায় শুধু তেমন এক বৃহৎ আধ্যাত্মিক ভূমির মধ্য দিয়াই আমরা মন ও মনোময় সকল গঠন ও রূপায়ণকে অতিক্রম করিয়া অতিমানস সত্যাবলির বৃহত্তা ও স্বাধীনতাতে প্রবিষ্ট হইতে পারি। শুধু সেইখানেই আমরা দিব্যশক্তিরাজির সুসঙ্গতির সংস্পর্শে আসিতে পারি, যে শক্তিরাজি আমাদের মানসপটে বিকৃতরূপে উদিত হয় অথবা নৈতিক বিধানের বিরোধী বা দ্বিধাগ্রস্ত উপাদানের সহযোগে একটা অনৃত মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। যিনি যুগপৎ আমাদের গোপন উৎস ও আমাদের দেহ মন ও প্রাণের শেষ লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান সেই অতিমানস পুরুষের মধ্যে এবং কেবলমাত্র সেখানেই রূপান্তরিত দেহ ও প্রাণময় মানুষের সহিত প্রদীপ্ত মনোময় মানুষের একান্ত মিলন সম্ভবপর। কেবলমাত্র সেখানেই পরম এক দিব্যজ্ঞানের মধ্যে পরস্পরের সহিত একীভূত হইয়া নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা, প্রেম ও স্বাধিকারের অস্তিত্ব সম্ভবপর—কিন্তু তথায় তাহারা আমরা যাহা কল্পনা করি তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অন্য কিছু। একমাত্র সেখানেই হইতে পারে আমাদের বিবিধ অঙ্গের বিরোধ ও অসঙ্গতির সমাধান।

অন্য কথায়, যাহা আমাদের বাহ্য নিয়মকানুন ও মানুষী নৈতিক অনুশাসনের ঊর্দ্ধে এবং তাহাদের পরপারে অবস্থিত অথচ তাহাদের মধ্যস্থিত কিছু অস্পষ্টভাবে ও অজ্ঞানে যাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে, তেমন বৃহৎ প্রমুক্ত এক চেতনার এক বৃহত্তর সত্য, এক দিব্য বিধান বা আদর্শ রহিয়াছে, যাহার দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই উভয় প্রকারের অন্ধ ও স্থূল পদ্ধতিসমূহ প্রগতিশীল কিন্তু দ্বিধা-

গ্রস্ত সোপানাবলি মাত্র, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া পাশব জীবনের স্বাভাবিক বিধান হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর উন্নত আলোকে বা সর্ব্বজনীন বিধানে প্রবেশ করিতে সাধক চেষ্টা করে। নিজের গোপন পূর্ণতার দিকে অভিযাত্রী চিৎপুরুষই আমাদের অন্তরাত্মা বলিয়া সেই দিব্য আদর্শ হইবে আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির চরম আধ্যাত্মিক বিধান ও সত্য। আবার আমরা একদিকে জগতে সকলের সহিত সাধারণ সত্তা ও প্রকৃতিবিশিষ্ট দেহধারী সত্তা, অন্যদিকে জগদতীত পরমতত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে সমর্থ ব্যষ্টি আত্মা বলিয়া আমাদের এই পরম সত্যের এক দ্বৈত প্রকৃতি আছে। ইহা অবশ্য এমন এক বিধান ও সত্য যাহা আধ্যাত্মিক ভাবে বিভাবিত সমবেত জীবনের নিখুঁত গতি-বৃত্তি, সামঞ্জস্য ও ছন্দ আবিষ্কার করে এবং প্রকৃতির বহুবিচিত্র একত্বের মধ্যে প্রতি সত্তা ও সর্ব্বসত্তার সহিত আমাদের সম্বন্ধ পূর্ণভাবে নির্ণয় করে। আবার সেই একই সময়ে ইহা অবশ্যই এমন এক বিধান ও সত্য যাহা ব্যষ্টিব্যক্তির * আত্মা মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশের ছন্দ ও যথাযথ সোপানাবলি আমাদের নিকট প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যক্ত করিয়া দেয়। আর আমরা অনুভূতিতে দেখিতে পাই যে ক্রিয়ার এই পরম আলোক ও শক্তি তাহার উচ্চতম প্রকাশে একই সঙ্গে একদিকে একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান ও অন্যদিকে এক চরম স্বাধীনতার অভিব্যক্তি ; অলঙ্ঘনীয় বিধান কেননা ইহা এক অবিক্রিয় সত্য দ্বারা আমাদের অন্তর ও বাহিরের প্রতি গতিবৃত্তিকে শাসিত করিতেছে ; আবার তথাপি প্রতিমুহূর্ত্তে এবং প্রতিগতিবৃত্তিতে পরম পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা আমাদের সচেতন ও মুক্ত প্রকৃতির পরিপূর্ণ নমনীয়তাকে স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করিতেছে।

আদর্শ নীতিবাদী তাহার নিজের নৈতিক তথ্যাবলির মধ্যে, যাহা মনোময় ও নৈতিক সূত্রাবলির অন্তর্গত তেমন অধস্তন শক্তি ও উপাদানের মধ্যে এই পরম বিধান আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করে। আর তাহাদিগকে পোষিত ও সুব্যবস্থিত করিবার জন্য সে আচরণে এমন এক মৌলিক তত্ত্ব বাছিয়া নেয়, যাহা মূলতঃ অপূর্ণাঙ্গ ও ভ্রমসঙ্কুল, বুদ্ধি, উপযোগিতা, সুখবাদ, যুক্তিবিচার, বোধিভাবিত বিবেক অথবা অন্য কোন সাধারণ আদর্শ দ্বারা গঠিত। এ প্রকার সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। আমাদের আন্তর প্রকৃতি শাশ্বত পুরুষেরই ক্রমাভিব্যক্তি আর তাহা এরূপ জটিল ও বহুমুখী যে তাহাকে একমাত্র

* এইজন্য গীতা ধর্ম্ম শব্দে সাধারণ ধার্ম্মিকতা ও নীতিবাদের অধিক কিছু বুঝিয়াছে; ধর্ম্ম হইল আমাদের আত্মসত্তার স্বরূপভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম।

মনোময় বা নৈতিক কোন প্রবল তত্ত্ব দ্বারা বাঁধা যায় না। একমাত্র অতিমানস চেতনাই তাহার বিভিন্ন ও বিরোধী শক্তিচয়ের নিকট তাহাদের আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করিতে এবং তাহাদের বিরোধ ও অসঙ্গতিকে সুসঙ্গতিতে পরিণত করিতে পারে।

পরবর্ত্তীকালের ধর্ম্মাবলি আচার ব্যবহারের পরম সত্যের একটা জাতিরূপ (type) নির্দ্দিষ্ট করিতে, একটা প্রণালী গড়িয়া তুলিতে এবং অবতার বা মহাপুরুষের বাণীর মধ্য দিয়া ভাগবত বিধান ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই সমস্ত প্রণালী শুষ্ক নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় ও শক্তিশালী বটে তবু তাহারা বহুলাংশে ধর্ম্মের আবেগের দ্বারা পবিত্রীকৃত ও অতিমানব উৎস হইতে জাত বলিয়া টিকিট দেওয়া নৈতিক তত্ত্বের গৌরবোজ্জ্বল এক আদর্শ রূপ ছাড়া আর কিছু নহে। তাহাদের কোন কোনটি, যেমন অত্যন্ত কঠোর খৃষ্টীয় নীতি, প্রকৃতি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে কেননা তাহা নিখুঁত কিন্তু অসাধ্য এক বিধানকে সনির্ব্বন্ধভাবে চালাইতে চায়। অপরগুলিও ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে আপোষরফা মাত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং কালের গতিতে অবশেষে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। যথার্থ দিব্য বিধান এই সমস্ত মনোময় মেকি দ্রব্যের মত নৈতিক বিধিবিধানের এক অনড় প্রণালী হইতে পারে না, ইহাদের মত তাহা আমাদের জীবনের সকল গতিবৃত্তিকে একটা লোহার ছাঁচে ঢালাই করিতে চায় না। দিব্য বিধান জীবনের ও আত্মার সত্য, যাহা একটা মুক্ত জীবন্ত সাবলীল ভাব লইয়া আমাদের কর্ম্ম ও জীবনের জটিল ও বহুমুখী সকল ধারা গ্রহণ করিবে এবং প্রতিপদে নিজের শাশ্বত আলোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ দ্বারা তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। ইহা কোন বিধান ও সূত্র বা অনুশাসনরূপে কার্য্য করিবে না, বরং অনুপ্রবেশ ও আবেষ্টনকারী এক সচেতন সান্নিধ্যরূপে নিজের অব্যর্থ শক্তি ও জ্ঞান বলে আমাদের সকল ভাবনা ক্রিয়া সংবেদন ও সংকল্পের আবেগরাজিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে।

প্রাচীনতর ধর্ম্মসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাদের জ্ঞানীগণের শাসন, তাহাদের মনু বা কনফিউসিয়াসের বাণী, জটিল এক শাস্ত্র যাহার মধ্যে তাহারা সামাজিক নিয়মকানুন ও নৈতিকবিধিনিধানের সঙ্গে আমাদের উচচতম প্রকৃতির কতকগুলি শাশ্বত তত্ত্বের ঘোষণাকে একত্র করিয়া একত্ববিধায়ক একপ্রকার মিশ্রণ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। একই কারণে এই তিন বস্তুকে নিত্য সত্য বা সনাতন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি ক্রমপরিণতিশীল ও সাময়িকভাবে সত্য, মনের

দ্বারা গঠিত বস্তু, শাশ্বত সংকল্পের মানুষী ভাষার ব্যাখ্যা ; তৃতীয়টি কতকগুলি সামাজিক ও নৈতিক বিধানের সহিত যুক্ত ও তাহাদের অধীন হওয়াতে তাহাকে তাহাদেরই রূপরাজির ভাগ্যের ফলভাগী হইতে হইয়াছে। কালক্রমে শাস্ত্র লুপ্ত, প্রয়োগ বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠে, তখন তাহাকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয় অথবা অবশেষে একেবারেই ত্যাগ করিতে হয়, তাহা না হইলে ব্যষ্টি ও জাতির আত্মপরিণতির পথে তাহা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্র জনসমাজের জন্য একটা বাহ্য আদর্শ গড়িয়া তোলে ; কিন্তু তাহা ব্যক্তি-সত্তার আন্তর স্বভাবকে, তাহার অন্তরস্থ গোপন আধ্যাত্মিক শক্তির অনির্ণেয় উপাদানগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনে না। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকৃতি এই অবহেলা সহ্য করে না, তাহার দাবি সে কিছুতেই ছাড়ে না। তাহার বহির্ম্মুখী আবেগ ও উত্তেজনাগুলিকে অবাধ প্রশ্রয় দিলে তাহারা বিশৃঙ্খলা ও বিনাশের পথে লইয়া যায় বটে কিন্তু অটল যান্ত্রিক বিধানের দ্বারা আত্মার স্বাধীনতাকে নিগ্রহ ও দমন করিলে তাহার গতিপথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে অথবা এক আন্তর মৃত্যু দেখা দেয়। বাহির হইতে এইভাবে নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রিত না করিয়া মানুষকে স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করিতে হইবে তাহার নিজের উচ্চতম সত্তা বা আত্মাকে, আর এক শাশ্বত গতিবিধির সত্যই যে পরম বস্তু ইহা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ব্যষ্টিব্যক্তিই তাহার মনে সংকল্পে ও চৈত্যবোধে উচ্চতর নৈতিক বিধান আবিষ্কার করে এবং তাহার পর জাতি বা সমষ্টির মধ্যে তাহা প্রসার লাভ করে। আবার ব্যষ্টিব্যক্তিকে তাহার আত্মাতেই পরমবিধান আবিষ্কার করিতে হইবে। শুধু তাহার পরে, মনোময় ভাবনা দ্বারা নহে কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রভাবের মধ্য দিয়া তাহা অপরের মধ্যে প্রসারিত করা যাইতে পারে। একটা নৈতিক বিধান, এক নিয়ম বা আদর্শরূপে সেরূপ বহু লোকের উপর চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যাহারা চেতনার সেই স্তরে উঠিতে পারে নাই, অথবা যাহাদের মন সংকল্প ও চৈত্যবোধ তেমনভাবে পরিমার্জিত হয় নাই যাহাতে তাহাদের নিকট এ বিধান বা আদর্শ বাস্তব সত্য কিম্বা জীবন্ত শক্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইহাকে পালন না করিয়াও আদর্শরূপে শ্রদ্ধা করা যাইতে পারে। আবার ইহার আন্তর মর্ম্ম একেবারে না বুঝিলেও সাধারণতঃ ইহার বাহিরের দিকটা মানিয়া চলা যাইতে পারে। কিন্তু অতিমানস ও আধ্যাত্মিক জীবনকে এইভাবে যান্ত্রিক করিয়া নেওয়া বা এক মানস আদর্শে অথবা বাহ্য কোন আইন কানুনে পরিণত করা যায় না। এ জীবনের নিজস্ব বিশাল গতিধারাসমূহ আছে, কিন্তু সে সকলকে বাস্তব করিয়া লইতে হইবে, ব্যষ্টিচেতনায় তাহাদিগকে সক্রিয়

এক মহাশক্তির ক্রিয়াধারা এবং মন প্রাণ ও দেহের রূপান্তরে সক্ষম শাশ্বত এক সত্যের প্রতিলিপি বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। আর এইরূপে ইহা সত্য, অমোঘবীর্য্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অতিমানসচেতনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বজনীনভাবে প্রয়োগই হইল সেই একমাত্র শক্তি যাহা পৃথিবীর উচচতম প্রাণীগণের মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে পূর্ণতা আনয়ন করিতে পারে। যখন আমরা দিব্যচেতনা ও পরমসত্যের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে সমর্থ হইব কেবল তখনই চিন্ময় ভগবান বা সক্রিয় ব্রহ্মের কোন রূপ আমাদের পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করিয়া তাহার সংঘর্ষ পদস্খলন দুঃখতাপ ও অসত্যসকলকে পরম জ্যোতি শক্তি ও আনন্দের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিবে।

পরমের সহিত মানবাত্মার নিরন্তর সংস্পর্শের পরাকাষ্ঠা হইল সেই আত্মদান যাহাকে আমরা দিব্যসংকল্পের নিকট আত্মসমর্পণ এবং যিনি সর্ব্ব সেই পরম একের মধ্যে বিবিক্ত অহমিকার নিমজ্জন বলি। মানবাত্মার এক বিশাল সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব এবং সর্ব্বভূতের সহিত অখণ্ড একত্বই অতিমানস চেতনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি ও দৃঢ় বিধান। কেবলমাত্র সেই সর্ব্বময় ভাব ও একত্বের মধ্যে আমরা দেহধারী জীবের জীবনে দিব্য অভিব্যক্তির পরমবিধান খুঁজিয়া পাইতে পারি; কেবলমাত্র তাহারই মধ্যে আমাদের ব্যষ্টিপ্রকৃতির পরম গতি ও যথার্থ খেলা আবিষ্কার করিতে পারি। আবার কেবল তাহারই মধ্যে এই সমস্ত অধস্তন বিবাদ ও বিরোধ, অভিব্যক্ত সকল জীবনের খাঁটি সম্বন্ধের সর্ব্ব-জয়ী সুসঙ্গতিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে, যে জীব অদ্বয় পরমেশ্বরেরই অংশ ও অদ্বিতীয়া বিশ্বজননীর সন্তান।

আমাদের সকল আচরণ ও ক্রিয়া এক শক্তির গতিবিধির অঙ্গীভূত, যে শক্তি তাহার উৎপত্তিস্থানে গোপন সংকল্পে ও মর্ম্মে অনন্ত ও দিব্য, যদিও যে রূপে আমরা তাহাকে দেখি, বোধ হয় তাহা নিশ্চেতন বা অজ্ঞান, জড় প্রাণ ও মনো-ময় এবং সসীম; অথচ ইহাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত প্রকৃতির অন্ধকারের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে দিব্য ও অনন্তের কিছুটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ক্রিয়াশীল হইয়াছে। এই শক্তিই মানুষকে পরম জ্যোতির দিকে লইয়া চলিয়াছে যদিও এখনও অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য দিয়া। ইহা মানুষকে প্রথমে তাহার অভাব আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া পরিচালিত করে, তাহার পর মনোময় ও নৈতিক আদর্শের আলোকে কতকটা রূপান্তরিত ও দীপ্ত উদারতর অভাব ও আকাঙ্ক্ষার

মধ্য দিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ইহা এখন মানুষকে এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উন্নীত হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছে, যে উপলব্ধি এ সমস্ত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যায় অথচ ইহাদের মধ্যে স্বরূপে ও লক্ষ্যে যাহা কিছু দিব্যভাবে সত্য তাহাকে সার্থক ও সুসঙ্গত করিয়া তোলে। ইহা অভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে এক দিব্য সংকল্প ও আনন্দে, মনোময় ও নৈতিক আস্পৃহাকে তাহাদের পরপারে অবস্থিত সত্য ও পূর্ণতার শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ব্যষ্টি-প্রকৃতির ভেদগত কষ্টকর প্রচেষ্টার স্থানে, বিবিক্ত অহমিকার রাগানুরাগ ও সংঘর্ষবিরোধের স্থলে এ শক্তি আনিয়া দেয় আমাদের অন্তরস্থিত বিশ্বভাবে বিভাবিত পুরুষের বা আত্মার প্রশান্ত গভীর সুসঙ্গত ও আনন্দময় বিধান—সেই পুরুষের যিনি আমাদের কেন্দ্রগতসত্তা, সেই আত্মার যিনি পরমআত্মার এক অংশ। আমাদের এই প্রকৃত অন্তঃপুরুষ বিশ্বগত বলিয়াই নিজের পৃথক পরিতুষ্টি চায় না, চায় শুধু বর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃতির মধ্যে বাহ্য অভিব্যক্তিতে তাহার নিজস্ব খাটি স্বাভাবিক উচচতায় পৌঁছিতে, চায় আপন আন্তর দিব্যসত্তাকে প্রকট করিতে, চায় তাহার নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সেই বিশ্বাতীত আধ্যাত্মিক শক্তি ও সত্তাকে যাহা সকলের সহিত এক এবং যাহা প্রতিবস্তু ও প্রাণী, সকল সমষ্টি-গত ব্যক্তিত্ব ও শক্তিসমূহের সহিত করুণায় সম্বদ্ধ, অথচ যাহা সকলকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান এবং যাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির অহংবোধের দ্বারা আবদ্ধ বা অধস্তন প্রকৃতির অজ্ঞানাচছন্ন নিয়মনের দ্বারা সীমিত নহে। আমাদের সকল সন্ধান সকল প্রচেষ্টার সম্মুখে রহিয়াছে এই পরম সিদ্ধি, আর এই সিদ্ধিই আমাদিগকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছে যে আমাদের প্রকৃতির সকল উপাদানেরই এক পরিপূর্ণ সুসঙ্গতি ও রূপান্তর লাভ হইবে। শুদ্ধ সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ক্রিয়াধারা কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন ইহা সাধিত হইবে, যখন আমরা আমাদের অন্তরস্থ নিগূঢ় ভগবত্তার এই উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছিব।

পূর্ণ অতিমানস ক্রিয়া কোন একটা বিশিষ্ট তত্ত্ব বা নীতি অনুসরণ করিবে না অথবা কোন সীমিত বিধানের অনুবর্ত্তী হইবে না। ব্যক্তিগত অহমিকার অথবা সুগঠিত সংঘ-মনের কোন আদর্শকে মানিয়া চলিবার দায় তাহার নাই। সংসারের অসন্দিগ্ধচিত্ত কাজের লোক বা নিয়মনিষ্ঠ নীতিবাদী অথবা দেশ-প্রেমিক বা ভাবপ্রবণ জনহিতৈষী কিম্বা আদর্শবাদী দার্শনিক, যে কেহ হউক না কেন, ইহা তাহাদের কাহারও দাবির অনুরূপ হইয়া চলিবে না। উচচ-শিখর হইতে এক সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত সত্তা সংকল্প ও জ্ঞানের সমগ্রতার মধ্যে স্বতঃপ্রবাহিত এক ধারা ধরিয়া ইহা চলিবে, যুক্তিবুদ্ধি ও নৈতিক সংকল্প যাহা শুধু লাভ করিতে পারে এরূপ কোন আদর্শের বাদবিচার মাপজোক বা হিসাব

অনুসারে তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইবে না। ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে আমাদের অন্তরস্থিত দিব্যপুরুষের অভিব্যক্তি, লোকসংগ্রহ বা লোকসংস্থিতি, এবং ভবিষ্যতে যে মহাপ্রকাশ দেখা দিবে তাহার দিকে জগতের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি। এমন কি ইহাও ততটা তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে না যতটা হইবে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিধান এবং দিব্যসত্যের আলোক ও তাহার স্বয়ংক্রিয় প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ম্মের বোধিভাবিত নিয়ন্ত্রণ। প্রকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত এক সমগ্র সংকল্প ও জ্ঞান হইতে যেরূপে প্রকৃতির কর্ম্ম উৎসারিত হয় ইহার কর্ম্মধারাও সেইভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিবে কিন্তু সে সংকল্প ও সে জ্ঞান সচেতন পরাপ্রকৃতির আলোকে প্রদীপ্ত হইবে এবং এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রকৃতির অন্ধকারে আর আচ্ছন্ন থাকিবে না। সৃষ্টির মধ্যস্থিত দ্বৈত বা দ্বন্দ্বের দ্বারা সে কর্ম্ম আর বাঁধা পড়িবে না, পরন্তু তাহা হইবে চিৎপুরুষের নিরপেক্ষ আনন্দে পূর্ণ, মহান ও উদার। অজ্ঞানাচ্ছন্ন দুঃখযন্ত্রণাপ্রপীড়িত অহমিকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা ও ভ্রমপ্রমাদের স্থানে দিব্যশক্তি ও জ্ঞানের অনুপ্রাণিত ও আনন্দময় এক গতিবিধি আমাদিগকে পরিচালিত করিবে এবং চলিবার পথে বেগ সঞ্চার করিবে।

দিব্যপুরুষের হস্তক্ষেপের ফলে কোন অলৌকিকভাবে সকল মানবজাতি যদি অকস্মাৎ এই উচচভূমিতে উন্নীত হইয়া যায় তাহা হইলে লোকশ্রুতিতে যে প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিতেছে সেই স্বর্ণযুগ, সত্যযুগ বা ঋতযুগের মত একটা কিছু এই পৃথিবীর বুকে আমরা লাভ করিব। কেননা সত্যযুগের লক্ষণই এই যে এই পরম বিধান প্রত্যেক জীবের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সচেতনভাবে প্রকাশ পাইবে এবং পূর্ণ সঙ্গতি ও স্বাধীনতার মধ্যে নিজের কর্ম্ম করিবে। ভেদগত বিভাগ নয়, একত্ব ও সার্ব্বভৌমত্বই হইবে তখন মানবজাতির চেতনার ভিত্তি; তাহাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হইবে পূর্ণ ও অব্যাহত; সমতা হইবে শ্রেণীবিভাগের সহিত সুসমঞ্জস, ভেদের মধ্যেও পরিপূর্ণ; নিরপেক্ষ ন্যায় হইবে ধ্রুব নিশ্চিত কেননা বস্তুর সত্য এবং নিজের ও অপরের সত্যের সহিত সুসঙ্গত হইয়া সত্তার কর্ম্ম হইবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং সেইজন্যই সত্য ও যথার্থ ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত; যাহা এখন আর মনোময় নয় কিন্তু অতিমানস সেই যথার্থ যুক্তিবুদ্ধি কৃত্রিম আদর্শের অনুসরণ করিয়া আর তৃপ্ত হইবে না, সর্ব্ববস্তুর সহিত যথার্থ সম্বন্ধ তাহার নিকট এখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য নিশ্চিতরূপে সাধিত হইবে। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গত কলহ, এক জাতির সহিত অন্য জাতির সর্ব্বনাশকর যুদ্ধ ও সংঘর্ষ তখন অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে; দেহধারী সত্তাগণের অন্তর্নিহিত বিশ্বচেতনা একত্বের মধ্যে সুসঙ্গতভাবে বহুর প্রতিষ্ঠা করিবে।

মানবজাতির বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থায় ব্যক্তিকেই অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক হইয়া এই উচ্চ ভূমিতে উন্নীত হইতে হইবে। তাহার বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই তাহার কর্ম্মাবলিকে এরূপভাবে নির্দ্ধারিত ও রূপায়িত করিবে যাহাতে তাহারা সচেতনভাবে দিব্য সমষ্টিগত ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইবে। তাহার আন্তর অবস্থা, তাহার কর্ম্মের মূল উৎস একই থাকিবে; কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্মগুলি অজ্ঞানমুক্ত জগতের ক্রিয়াধারা যেরূপ হইবে তাহা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন হইতে পারে। তথাপি তাহার চেতনা ও তাহার আচার ব্যবহারের দিব্যযন্ত্র—এরূপ মুক্ত বস্তু সম্বন্ধে 'যন্ত্র' শব্দটি যদি ব্যবহার করা যায়—হইয়া উঠিবে পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে সেইরূপ, অর্থাৎ যাহাকে আমরা পাপ বলি সেই প্রাণজ অশুচিতা, কামনা-বাসনা ও অবৈধ আবেগ বা উত্তেজনার অধীনতা হইতে তাহারা হইবে মুক্ত; আর তাহারা আবদ্ধ হইবে না যাহাদিগকে আমরা পুণ্য বলি সেই নৈতিক সূত্রাবলি প্রণোদিত শাসনের দ্বারা; তাহারা হইবে মানসচেতনা হইতে বৃহত্তর এক চেতনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে নিশ্চিত শুদ্ধ ও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের প্রতিপদক্ষেপে চিৎপুরুষের জ্যোতি ও সত্যের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। যাহারা অতিমানস পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া যদি একটা সমাজ বা সংঘ গঠিত করা যায়, বস্তুতঃ তাহা হইলেই কিছু দিব্য সৃষ্টি রূপপরিগ্রহ করিতে, এক নূতন জগৎ নামিয়া আসিতে পারে, যাহা হইয়া দাঁড়াইবে এক নবীন স্বর্গ; তখন এখানে এই জগতে অপসৃয়মান এই পার্থিব অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে অতিমানসজ্যোতি প্রদীপ্ত এক অভিনব জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরম সংকল্প

আমাদের অন্তরপুরুষ প্রথমে অজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং তাহার পরে ক্রমশঃ অনন্তের শক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে মুক্তিলাভ করে, তাহার এই ক্রমিক অভিব্যক্তির আলোকে আমরা আরও সুন্দররূপে বুঝিতে পারি কর্ম্মযোগীর প্রতি গীতার সেই মহান ও শ্রেষ্ঠতম অনুশাসন—"সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আচরণের সকল তত্ত্ব, সকল বিধি ও বিধান বর্জন করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।" সকল আদর্শ ও নিয়মকানুন জড়ভূমি হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে আরোহণের পথে মানুষের অহমিকার প্রয়োজনের ভিত্তিতে গঠিত সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এই সমস্ত সাময়িক কৌশল আপেক্ষিকভাবে অবশ্যপালনীয় শুধু ততদিন থাকে যতদিন আমরা পরিবর্ত্তনের মধ্যবর্ত্তী স্তর-সমূহে পরিতুষ্ট হইয়া থাকি, দেহপ্রাণের জীবন লইয়া সন্তুষ্ট মনোবুদ্ধির গতি-বৃত্তিতে আসক্ত অথবা এমন কি আধ্যাত্মিক কিরণস্পর্শে ঈষদ্দীপ্ত মনোভূমি সকলে নিবদ্ধ থাকি। কিন্তু এই সব স্তরের ঊর্দ্ধে রহিয়াছে অসীম অতিমানস চেতনার অবারিত বিশালতা যেখানে গেলে সকলপ্রকার মনোগঠিত বিধি-বিধানের অবসান হয়। আমাদের মানসিক সীমাবন্ধন ও মানদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাতে ফেলিয়া সর্ব্ববস্তুর প্রভু এবং সকল প্রাণীর সখার হাতে নিজেদিগকে একবারে ছাড়িয়া দিবার বিশ্বাস ও সাহস যদি আমাদের না থাকে তবে শাশ্বত ও অনন্তের আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে পূর্ণ প্রবেশ সম্ভব হয় না। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ভয় বা কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অনন্ত পরাৎপর ব্রহ্ম-মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। বিধিবিধানের পরে আছে স্বাধীনতা; ব্যক্তিগত সমষ্টিগত বিশ্বগত সমস্ত আদর্শ ও মাপকাঠির পরে আছে একটা বৃহত্তর কিছু, আছে নৈর্ব্যক্তিক নমনীয়তা, দিব্য স্বাধীনতা, বিশ্বাতীত শক্তি ও সর্ব্বোচ্চ প্রণোদনা। কষ্টকর সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিবার পরে দেখা দেয় শিখর দেশের বিস্তৃত মালভূমি।

উর্দ্ধারোহণের পথে তিনটি স্তর দেখা যায়—সর্ব্বনিম্নে অভাব ও বাসনার তাড়নাধীন দেহগত জীবন ; মধ্যে উচ্চতর আবেগময় মননের ও চৈত্যসত্তার রাজত্ব, যেখানে অনুভূত হয় বৃহত্তর কল্যাণ অভীপ্সা অভিজ্ঞতা ও ভাবাবলি ; অবশেষে উচ্চ স্তরে প্রথমে দেখা দেয় একটা গভীরতর চৈত্য ও আধ্যাত্মিক অবস্থা, তাহার পর আসে শাশ্বত এক অতিমানস চেতনা যাহার মধ্যে আমাদের সকল অভীপ্সা সকল অনুসন্ধিৎসা তাহাদের গভীরতম অর্থ খুঁজিয়া পায়। দৈহিক জীবনের প্রথমে মুখ্য প্রণোদনা ও প্রধান পরিচালক শক্তিরূপে থাকে অভাব ও আকাঙ্ক্ষার প্রপূরণ এবং তাহার পরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলসাধন। মনোময় জীবনে মানুষ শাসিত হয় তাহার ভাব বা প্রত্যয় ও আদর্শ দ্বারা ; এই প্রত্যয়াবলি সত্যের বেশধারী অর্দ্ধালোক মাত্র এবং এই আদর্শরাজি বর্দ্ধমান কিন্তু তখনও অপূর্ণ বোধি ও অভিজ্ঞতার ফলে বা সাহায্যে মন দ্বারাই গঠিত বস্তু। যখনই মনোময় জীবনেব প্রভাব বাড়ে এবং শরীরের পাশব দাবি দাওয়া কমিয়া যায়, তখন মনোময় মানুষ অনুভব করে যে তাহার প্রত্যয় ও আদর্শের অনুরূপভাবে তাহার ব্যক্তিগত জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহার মনোময় প্রকৃতি সনির্ব্বন্ধভাবে তাহাকে প্রণোদিত করিতেছে এমন কি অবশেষে অস্পষ্টতর ও জটিলতর সমাজ-জীবনও এই সূক্ষ্ম-গঠনপ্রণালীর অধীনে নিজেকে স্থাপিত করিতে বাধ্য হয়। আধ্যাত্মিক জীবন অথবা মনের চেয়ে উচ্চতর কোন শক্তি প্রকাশ হইয়া যখন প্রকৃতিকে অধিকার করে তখন এই সমস্ত সীমিত পরিচালক শক্তি পশ্চাদপসরণ করিতে সঙ্কুচিত ও অন্তর্হিত হইতে থাকে। আধ্যাত্মিক বা বিজ্ঞানময় পুরুষ, দিব্যসত্তা, সর্ব্বগত পরম সত্যকেই আমাদের অন্তরের একমাত্র প্রভু করিতে হইবে এবং তাঁহাকে দিয়াই আমাদের প্রকৃতির বিধানের সম্ভবপর উচ্চতম উদারতম ব্যাপকতম ও সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকাশের মর্ম্ম অনুসারে স্বাধীনভাবে আমাদের শেষ পরিণতি ও পরিস্ফুরণ ঘটাইতে হইবে। অবশেষে আমাদের সেই প্রকৃতি পরিপূর্ণ সত্য এবং তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ক্রিয়া করে কেননা তখন তাহা শাশ্বতের প্রদীপ্ত শক্তির আদেশই শুধু পালন করে। ব্যক্তির তখন আর কিছু লাভ করিবার, কোন বাসনা পরিতৃপ্তির প্রয়োজন থাকে না ; সে তখন শাশ্বতের নৈর্ব্ব্যক্তিকতা অথবা সার্ব্বভৌম ব্যক্তিকতার এক অংশ হইয়া গিয়াছে। তখন জীবনের মধ্যে দিব্য পুরুষের প্রকাশ ও তাঁহার লীলা এবং দিব্যলক্ষ্যের দিকে বিশ্বের গতিবিধি অব্যাহত রাখা, পরিচালনা করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। মানসিক কোন ধারণা বা মতামতের মনোময় কোন গঠনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না ; কেননা তাহার

মন নীরব হইয়া গিয়াছে এবং শুধু দিব্য জ্ঞানের আলোক ও সত্যের এক প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার চিদাত্মার বিশালতার পক্ষে মনোময় আদর্শ অতি সংকীর্ণ বস্তু ; এ সময় অনন্তের মহাসমুদ্রই তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে।

সরল ও অকপটভাবে যে কেহ কর্ম্মমার্গে প্রবেশ করিতে চায় তাহাকে, যাহাতে অভাব ও আকাঙ্ক্ষাই আমাদের কর্ম্মের প্রধান বিধান সেই স্তর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতেই হইবে। কেননা যদি সে যোগের উচ্চ লক্ষ্যকে স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে যে সকল বাসনা তাহার সত্তাকে তখনও বিক্ষুব্ধ করিতেছে তাহাদিগকে নিজের নিকট হইতে লইয়া অন্তর্য্যামী ভগবানের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। তাঁহারই পরমশক্তি তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে যেমন সাধকের তেমনি সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধিত হইবে। সাধকের প্রত্যাখ্যান বা বর্জন যদি অকপট হয় তাহা হইলে আমরা বস্তুতঃ দেখিতে পাইব যে একবার এই আত্মসমর্পণ করিবার পরেও কিছু কালের জন্য অহংগত বাসনার পরিতর্পণ স্বভাবের পূর্ব্বেকার আবেগের বশে পুনরাবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইবে শুধু সঞ্চিত গতিবেগ ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া দেওয়ার জন্য, আর দেহধারী সত্তার যে অঙ্গকে শিক্ষা দেওয়া অতি দুরূহ তাহার সেই স্নায়ুগত প্রাণগত ও ভাবাবেগময় প্রকৃতিকে বাসনার প্রতিক্রিয়াদ্বারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ; কেননা এই প্রতিক্রিয়া জাত জ্বালাযন্ত্রণা ও চঞ্চলতার সহিত সাধক-জীবনের উচ্চতর শান্তি বা দিব্য আনন্দের অপরূপ প্রকাশের প্রশান্ত সময়ের তুলনায় তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা সে শিক্ষা করে যে, যে-সাধক মুক্তিকামী অথবা নিজের মূল ভাগবত প্রকৃতি লাভে অভীপ্সু তাহার পক্ষে অহংগত বাসনা তাহার আত্মার বিধান নয়। পরে এই সমস্ত আবেগের মধ্যস্থিত বাসনাময় উপাদান বাহিরে নিক্ষিপ্ত অথবা অবিরাম অস্বীকৃতি এবং রূপান্তরসাধন-প্রয়াসের চাপে স্থায়ীভাবে বিতাড়িত হইবে। যাহা সকল কর্ম্ম ও সকল কর্ম্মফলের মধ্যে এক সমান আনন্দ দ্বারা সমর্থিত, যাহা ঊর্দ্ধ্ব হইতে অনুপ্রাণিত বা আরোপিত, তাহাদের মধ্যস্থিত কর্ম্মের তেমন এক শুদ্ধ প্রকৃতি শুধু চরম পূর্ণতার সুসঙ্গতির মধ্যে রক্ষিত হইবে। স্নায়বিক সত্তার স্বাভাবিক বিধান ও অধিকার হইল কর্ম্ম করা ভোগ করা, কিন্তু ব্যক্তিগত বাসনার বশে কর্ম্ম ও ভোগের নির্ব্বাচন শুধু তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন

সংকল্প মাত্র, ইহা তাহার যথার্থ সংকল্প বা অধিকার নহে। নির্ব্বাচন করা কেবল মাত্র পরম ও সার্ব্বভৌম সংকল্পের কাজ ; মানুষের কর্ম্মকে রূপান্তরিত হইয়া সেই দিব্য সংকল্পের সক্রিয় ধারাতে পরিণত হইতে হইবে ; ভোগের স্থানে আনিতে হইবে এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক আনন্দের খেলা। সকল ব্যক্তিগত সংকল্প হয় উর্দ্ধ হইতে আগত বা নিয়োজিত এক প্রতিনিধি, না হয় অজ্ঞান অসুরের এক অবৈধ আত্মসাৎ।

আমাদের প্রগতিপথের দ্বিতীয় ধাপে সামাজিক বিধান হইল একটা উপায় যাহাতে আমাদের অহমিকা এক বৃহত্তর সমষ্টিগত অহংএর বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজেকে নিয়মন করা শিক্ষা করিতে পারে। এই বিধানের মধ্যে নীতিবোধ আদৌ না থাকিতে পারে ; প্রত্যেক সমাজ তাহার নিজের অভাবপূরণ বা বাস্তব হিতসাধন বলিয়া যাহা বুঝে ইহা শুধু তাহাই প্রকাশ করিতে পারে। অথবা ইহা সেই সমস্ত অভাব পূরণ বা সেই সকল হিতসাধনের এমন এক অভিব্যক্তি হইতে পারে যাহা একটা উচ্চতর নৈতিক বা আদর্শ বিধানের দ্বারা কতকটা পরিবর্ত্তিত অনুরঞ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু এখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই, সে সামাজিক কর্ত্তব্য, পারিবারিক বাধ্যবাধকতা, সম্প্রদায় বা জাতিগত দাবি হিসাবে ইহা ততদিন মানিতে বাধ্য যতদিন ইহার সহিত বৃহত্তর ঋত বা ন্যায়ের বিধান সম্বন্ধে তাহার বর্দ্ধিষ্ণু বোধের সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগের সাধককে ইহাও কর্ম্মের প্রভুর নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। এই সমর্পণ করিবার পর বাসনার মত তাহার সামাজিক প্রেরণা ও সামাজিক বিচারবুদ্ধিকেও ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া যাইবার জন্য শুধু ব্যবহার করিতে হইবে ; অথবা এরূপও হইতে পারে যে তাহারা ব্যবহৃত হইবে কর্ম্মে, আশা ও আস্পৃহায় সমগ্র মানবজাতির বা কোন মানবসমষ্টির সহিত সাময়িকভাবে তাহার অধস্তন মনোময় প্রকৃতিকে মিলিত ও একীভূত করিবার পক্ষে তাহাকে সমর্থ করিয়া তুলিবার যে প্রয়োজন তখনও রহিয়াছে তৎসাধনোদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই ক্ষণকালপরে তাহাদিগকে প্রত্যাহৃত করিয়া নিতে হইবে এবং তখন সত্তাতে একমাত্র দিব্য পরিশাসন বিদ্যমান থাকিবে। তখন সাধক ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিবে এবং শুধু দিব্যচেতনার মধ্য দিয়া—মনোময় প্রকৃতির মধ্য দিয়া নহে—অপরের সহিত একত্ব লাভ করিবে।

কেননা, মুক্ত হইবার পরেও সাধক জগতে থাকিবে এবং জগতে থাকিবার অর্থই কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা। কিন্তু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার অর্থ সাধারণভাবে জগন্মঙ্গলের জন্য অথবা আপন শ্রেণী বা জাতির জন্য কিম্বা

জগতে কোন নূতন সৃষ্টিকে উন্মিষিত ও পরিণত করিয়া তুলিবার জন্য অথবা অন্তরস্থ দিব্য সংকল্পের নির্দ্দেশপালনের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা। আর এই কর্ম্ম তাহাকে করিতে হইবে, যে পরিবেশে বা বিশিষ্ট সমাজে সে জন্মিয়াছে অথবা যাহার মধ্যে সে স্থাপিত হইয়াছে কিম্বা দিব্য নির্দ্দেশ তাহার জন্য যে বিশিষ্ট কাঠামো সৃষ্টি করিয়াছে বা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে তাহারই মধ্যে থাকিয়া। অতএব পূর্ণতা লাভের অবস্থাতে আমাদের মনোময় সত্তার মধ্যে এমন কিছু অবশিষ্ট রাখিলে চলিবে না যাহা, আমাদের যে জাতি বা সম্প্রদায়কে অথবা ভগবানের যে সমষ্টিগত আত্মপ্রকাশকে পরিচালনা সহায়তা অথবা সেবা করিবার জন্য আমরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি তাহার প্রতি সমবেদনার ও স্বাধীনভাবে তাহার সহিত তাদাত্ম্যলাভের সঙ্গে অসমঞ্জস, তাহার পথে অন্তরায় বা তাহার বিরোধী হইতে পারে। কিন্তু অবশেষে এই মুক্ত ও স্বতন্ত্র অভেদ ও একত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই ভগবানের সহিত তাদাত্ম্যবোধের মধ্য দিয়া, ব্যক্তিগত সমাজগত জাতিগত সম্প্রদায়গত বা ধর্ম্মমতগত কোন প্রকার অহমিকার দ্বারা শাসিত মানসিক বা নৈতিক মিলনের বন্ধন অথবা প্রাণগত সাহচর্য্যের মধ্য দিয়া নহে। যদি কোন সামাজিক বিধান মানিয়া চলিতে হয় তবে দেহ মনের প্রয়োজন, ব্যক্তিগত বা সর্ব্বজনীন স্বার্থ বা কুতুহল, কোনপ্রকার সুযোগসুবিধা লাভ, আবেষ্টনের কোন চাপ অথবা কোন কর্ত্তব্যবোধ তাহার হেতু হইবে না; সে-বিধান পালিত হইবে শুধু কর্ম্মের প্রভুর প্রীত্যর্থে, পালিত হইবে এইজন্য যে সেই বিধান নিয়ম বা সম্বন্ধ যে ভাবে আছে তাহা আন্তর জীবনের বাহ্য আকার রূপে তখনও রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তাহা ভঙ্গ করিয়া মানুষের মনকে বিক্ষুব্ধ করা উচিত নয়, ইহাই দিব্য সংকল্প বলিয়া জানা বা অনুভব করা গিয়াছে। অপরপক্ষে যদি কোন সমাজবিধান নিয়ম বা সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে হয় তাহাও বাসনার পরিতর্পণ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামতের তাড়নাতে করা চলিবে না; করিতে হইবে যেহেতু, যাহা চিৎপুরুষের বিধান প্রকাশ করে তেমন এক বৃহত্তর বিধি অনুভূত হইতেছে অথবা যেহেতু জানা গিয়াছে যে দিব্য সর্ব্বসংকল্পের অগ্রগতিতে জগতের উন্নতির পথে এক মুক্ততর ও বৃহত্তর জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত রূপরাজি ও আইনকানুনের পরিবর্ত্তন পরিবর্জন বা অতিক্রমণের একটা প্রসঙ্গ বা গতি আসিয়া পড়িয়াছে।

এখনও নৈতিক বিধান বা আদর্শের কথা রহিয়া গিয়াছে; যে সকল লোক নিজেদিগকে স্বাধীন বা বন্ধনমুক্ত ভাবে তাহাদের অনেকেও এ সমস্তকে চিরপবিত্র ও অননুভবনীয় মনে করে। কিন্তু সাধক সর্ব্বদা তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধের

দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া এ সমস্ত তাঁহারই চরণে ছাড়িয়া দিবে যাঁহাকে সকল আদর্শ অপূর্ণভাবে ও আংশিকরূপে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে; মানুষের নৈতিক গুণাবলি তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অসীম পূর্ণতার হাস্যোদ্দীপক এক বিকৃতিমাত্র, তাহাদের না আছে সমৃদ্ধি, না আছে নমনীয়তা। আমাদের স্নায়ুগত কামনা বাসনার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই পাপ ও অশিবের দাসত্ব হইতে আমাদের মুক্তি ঘটে; কেননা তাহা রজোগুণ সমুদ্ভূত অর্থাৎ প্রাণগত প্রণোদনা ও আবেগ অথবা আসক্তির তাড়না হইতে জাত; রজোগুণের রূপান্তর-প্রাপ্তির সহিত তাহা তিরোহিত হয়। কিন্তু সাধকের পক্ষে আচার বা অভ্যাসগত অথবা মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিম্বা এমন কি উচচ ও সুস্পষ্ট সাত্ত্বিক গুণগত স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিলেও চলিবে না, তাহার স্থানে মানুষ যাহাকে পুণ্য বলে সেই অপ্রধান অপর্য্যাপ্ত বস্তু অপেক্ষা গভীরতর এবং অধিকতরভাবে স্বরূপগত কিছুকে বসাইতে হইবে। ইংরাজিতে virtue (পুণ্য) শব্দটির মূল মর্ম্ম ছিল manhood (মানবত্ব); আর এই মানবত্ব নৈতিক মন ও তাহার দ্বারা গঠিত বস্তু হইতে অধিকতর বৃহৎ ও গভীর। কর্ম্মযোগের চরমসিদ্ধি আরও উচচতর ও গভীরতর এক অবস্থা যাহাকে হয়ত আত্মভাব বা আত্মস্বরূপতা (soulhood) বলা যাইতে পারে,—কেননা আত্মার তত্ত্ব মানবত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ; সে সিদ্ধি যখন আসিবে তখন এক পরম সত্য ও পরম প্রেমের কর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উৎসারিত আত্মস্বরূপতা মানবীয় পুণ্যের স্থান অধিকার করিবে। এই পরম সত্যকে ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে বাধ্য করা যায় না, অথবা এমন কি ভাবনা ও কল্পনাপরায়ণ বৃহত্তর যুক্তিবুদ্ধি মানুষের সীমিত মনে শুদ্ধ সত্য বলিয়া যাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তাহার সেই অধিকতর গৌরবময় সৌধরাজির মধ্যেও তাহাকে আবদ্ধ করা যায় না। আর এই পরম প্রেম মানবীয় আকর্ষণ সহানুভূতি ও করুণার অবিদ্যাচছন্ন ভাবাবেগ-তাড়িত গতিবৃত্তির সহিত একার্থবাচক হওয়া ত দূরের কথা এ উভয়ে যে অবশ্যম্ভাবীরূপে সুসমঞ্জস হইবে একথাও বলা চলে না। ক্ষুদ্র বিধিবিধান বৃহত্তর গতিবৃত্তিকে বাঁধিতে পারেনা; মনের আংশিক সিদ্ধি আত্মার পরম সার্থকতার উপর নিজের কোন সর্ত আরোপ করিতে, তাহার উপর কোন হুকুম চালাইতে পারে না।

প্রারম্ভে এই উচচতর প্রেম ও সত্য সাধকের আপন প্রকৃতির মূল বিধান ও ধারা অনুসারে তাহার মধ্যে নিজের গতিবৃত্তি সার্থক করিয়া তুলিবে। কেননা তাহাই দিব্যপ্রকৃতির বিশিষ্ট ভাব, পরাশক্তির বিশেষ রূপ, যাহার মধ্য

হইতে তাহার আত্মা লীলার ক্ষেত্রে প্রকট হইয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ এই বিধান বা ধারা দ্বারা তাহা সীমিত হয় নাই, কেননা আত্মা অসীম। তথাপি তাহার প্রকৃতির উপাদানরাজি সেই ছাপ বহন করিতেছে এবং সেই সমস্ত ধারা ধরিয়া স্বচ্ছন্দে পরিণত হইয়া উঠিতেছে অথবা প্রবল প্রভাবের শঙ্খাবর্ত-রেখা-চিহ্নিত পথে আবর্ত্তিত হইতেছে। সাধক দিব্য সত্যের গতিবৃত্তিকে প্রকট করিবে জ্ঞানী বা বীরকেশরী অথবা প্রেমিক ও রসিক কিম্বা কর্ম্মী ও সেবকের প্রকৃতি অনুসারে অথবা মূল গুণসকলের অন্য কোন সমবায়রূপে যাহা তাহার নিজস্ব আন্তর প্রেরণা হইতে আসিয়া সাধকের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। লোকে তাহার মধ্যে দেখিবে যে তাহার ক্রিয়াতে আত্মপ্রকৃতির এই স্বাধীন খেলা চলিতেছে, কোন নিম্নতর বিধান বা বহিরাগত কোন নিয়মের দ্বারা গঠিত রচিত ও নিয়ন্ত্রিত কোন মামুলি আচরণ নহে।

কিন্তু এতদপেক্ষাও এক উচ্চতর সিদ্ধি, এক আনন্ত্য আছে, যাহার মধ্যে পৌঁছিলে এই শেষ গণ্ডীও অতিক্রান্ত হইয়া যায়, কেননা সেখানে প্রকৃতি পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, তাহার সকল সীমারেখা লোপ পায়। সেখানে অন্তরাত্মা এক সীমাহীন মুক্ত ক্ষেত্রে বাস করে, কেননা সে নিজের অন্তর্নিহিত দিব্য ইচ্ছার অনুযায়ী সকল রূপ, সকল ছাঁচ ব্যবহার করে; কিন্তু এখন সে বাধা-বন্ধনশূন্য, যে শক্তি বা রূপ সে ব্যবহার করে তাহার কোনটি কোন প্রকারে তাহাকে বন্দী করিতে পারে না। কর্ম্মমার্গের ইহাই চূড়ান্ত অবস্থা, কর্ম্মের মধ্যে ইহাই অন্তরাত্মার মুক্তি। বস্তুতঃ তখন তাহার আর কোন কর্ম্ম নাই; কেননা তাহার সকল কর্ম্মই এখন পরাৎপরের এক ছন্দদোলায় পরিণত এবং অনন্তের মধ্য হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত এক সঙ্গীতের মত একমাত্র তাঁহা হইতে স্বাধীনভাবে পরিস্ফুরিত হয়।

তাহা হইলে এক পরম ও সার্ব্বভৌম দিব্য সঙ্কল্পের কাছে আমাদের সকল কর্ম্মের পরিপূর্ণ সমর্পণ, কোন প্রকার সর্ত্ত না করিয়া কোন আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সকল কর্ম্ম আমাদের অন্তরস্থ শাশ্বত কিছুর শাসন ও নিয়ন্ত্রণে তুলিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহাই আমাদের অহংগত প্রকৃতির সাধারণ কর্ম্মধারার স্থান অধিকার করিবে—ইহাই কর্ম্মযোগের ধারা ও লক্ষ্য। কিন্তু এই দিব্য পরম ইচ্ছা কি বস্তু, আমাদের বিভ্রান্ত যন্ত্রসমূহ এবং কারারুদ্ধ অন্ধ বুদ্ধি তাহাকে চিনিবে কি প্রকারে?

সাধারণতঃ আমরা নিজদিগকে ধারণা করি বিশ্বের মধ্যে এক বিবিক্ত অহং বলিয়া, যে অহং এক বিবিক্ত দেহ এবং বিবিক্ত মনোময় ও নৈতিক প্রকৃতিকে শাসিত ও পরিচালিত করে, পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহার নিজ নির্দ্ধারিত কর্ম্ম বাছিয়া লয়, যে নিজে স্বতন্ত্র এবং সেইজন্য নিজের কর্ম্মের একমাত্র দায়িত্ব বুদ্ধিযুক্ত প্রভু। যে মন নিজের গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে নাই সেই সাধারণ মনের পক্ষে কল্পনা করা সহজ নয় কিরূপে আমাদের মধ্যে এই আপাতপ্রতীয়মান অহমিকা ও তাহার রাজত্ব অপেক্ষা ধ্রুবতর গভীরতর এবং অধিকতর শক্তিশালী অন্য কিছু থাকিতে পারে, এমন কি যে মন বেশ চিন্তাশীল কিন্তু যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা নাই তাহার পক্ষেও ইহা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু যেমন আত্মজ্ঞান তেমনি ঘটনাবলীর প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথম সোপানই হইল আপাতপ্রতীয়মান বস্তু-সত্যের পশ্চাতে গিয়া, দৃশ্যমান বাহ্য জগৎ যাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে সেই ধ্রুব কিন্তু মুখোশাবৃত মূল সক্রিয় সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করা।

এই অহং বা আমিত্ব একটি স্থায়ী সত্য নয় আমাদের মূল কোন অঙ্গ তো নহেই ; ইহা প্রকৃতির একটি রূপায়ণ মাত্র, ইহা আমাদের সংবেদন ও যুক্তি-বিচারশীল মনের মধ্যে ভাবনা কেন্দ্রীকরণের এক মনোময় মূর্ত্তি, আমাদের প্রাণের অংশগুলির মধ্যে ইহা আবেগ অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়চেতনা কেন্দ্রীকরণের এক প্রাণময় মূর্ত্তি ; আমাদের শরীরের মধ্যে বস্তুকে ও বস্তুর বৃত্তি ও ক্রিয়া-ধারাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অন্নময়রূপে সচেতনভাবে গ্রহণ করিবার জন্য এক যন্ত্র বা মূর্ত্তি। আমরা অন্তরে যাহা কিছু তাহা অহং নহে তাহা আমাদের চৈতন্য, আমাদের অন্তরাত্মা বা চিৎসত্তা। আমরা বাহ্যপ্রয়োগে বা বাহিরের ক্ষেত্রে যাহা কিছু, যাহা কিছু আমরা করি—তাহাও অহং নহে তাহা প্রকৃতি। কার্য্যনির্ব্বাহক এক বিশ্বশক্তি আমাদিগকে গঠিত বা রূপায়িত করিয়া তোলে এবং এইভাবে গঠিত আমাদের স্বভাব পরিবেশ ও মননশক্তির এবং বিশ্বশক্তিরাজির ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপায়ণের মধ্য দিয়া আমাদের কর্ম্ম ও তাহার ফলসকল নির্দ্দেশ ও নির্দ্ধারিত করে। বস্তুতঃ আমরা ভাবি না, ইচ্ছা করি না, কর্ম্ম করি না, কিন্তু ভাবনা ও ইচ্ছা, আবেগ ও কর্ম্ম এ সকলই আমাদের মধ্যে ঘটে, আমাদের অহংবোধ আমাদের মধ্যে ঘটে, আর সেই অহংবোধ প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্ম্মাবলির এই এই প্রবাহকে আপনার চারিদিকে একত্র এবং নিজের উপর আরোপ করে। বিশ্বশক্তি বা প্রকৃতিই ভাবনাকে রূপ দেয় ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তোলে আবেগ ও প্রেরণাকে ফুটাইয়া তোলে। আমাদের দেহ মন ও অহমিকা

সেই সক্রিয় শক্তিসমুদ্রের এক তরঙ্গ, তাহারা সে শক্তিকে পরিশাসিত করে না, বরং তাহা দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধককে সত্য ও আত্মজ্ঞানের দিকে প্রগতির পথে এমন এক স্থানে আসিয়া অবশ্য পৌঁছিতে হইবে যেখানে জীবাত্মার প্রকৃত দর্শনের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং অহং ও তাহার কার্য্যাবলির এই সত্যের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিবে। তাহার দেহ প্রাণ ও মনোময় আমি যে তাহার কর্ম্মের কর্ত্তা ও নিয়ামক এই পূর্ব্বকল্পনা তখন সে পরিত্যাগ করিবে আর জানিবে ও বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিই আপনার নির্দ্দিষ্ট ভাব ও প্রণালীসমূহ অনুসরণ করিয়া তাহার নিজের এবং সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে একমাত্র একাই কর্ম্ম করিতেছে।

কিন্তু কোন্ বস্তু প্রকৃতির এই প্রণালীগুলিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছে? অথবা কে শক্তির গতিবৃত্তিকে উৎপাদিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে? পশ্চাতে এক চৈতন্য অথবা চৈতন্যময় এক সত্তা রহিয়াছে, যে প্রকৃতির সকল কর্ম্মের প্রভু সাক্ষী জ্ঞাতা ভোক্তা ধর্ত্তা ও অনুমন্তা; এই চৈতন্যই আত্মা বা পুরুষ। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে কর্ম্মের আকার দান করে; তাহার মধ্যে বা পশ্চাতে থাকিয়া পুরুষ সেই কর্ম্ম দেখে, সম্মতি দেয়, ভরণ ও ধারণ করে। প্রকৃতি আমাদের মনে ভাবনা রূপায়িত করিয়া তোলে; তাহার মধ্যে বা পশ্চাতে থাকিয়া পুরুষ সে ভাবনা ও তন্মধ্যস্থ সত্যকে জানে। প্রকৃতি কর্ম্মের ফল নিরূপিত করে, তাহার মধ্যে বা পশ্চাতে থাকিয়া পুরুষ সেই শুভাশুভ ফল ভোগ করে। প্রকৃতি মন ও দেহ গঠিত করে, তাহাদের উপর কাজ করে তাহাদিগকে পরিণত করে; পুরুষ সেই রূপায়ণ সেই পরিণতিকে ধারণ করিয়া থাকে এবং প্রকৃতির কর্ম্মের প্রত্যেক ধাপ অনুমোদন করে। যে ইচ্ছাশক্তি বস্তুতে ও মানুষে কাজ করে প্রকৃতি তাহাকে প্রয়োগ করে; কি করিতে হইবে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া পুরুষ সেই শক্তিকে কাজ করিতে দেয়, নিযুক্ত করে। এই পুরুষ আমাদের বহিশ্চর অহং নয়, অহংএর পশ্চাতে অবস্থিত নীরব আত্মা, শক্তির উৎস, জ্ঞানের উৎপাদক ও গ্রহীতা। আমাদের মনোময় অহং সেই আত্মার এই শক্তির এই জ্ঞানের এক মিথ্যা প্রতিচ্ছবি মাত্র। অতএব এই পুরুষ, এই আশ্রয় চৈতন্য, প্রকৃতির সকল কর্ম্মের আদি কারণ, গ্রহীতা ও ধর্ত্তা, কিন্তু সে নিজে কর্ম্মের কর্ত্তা নহে। সম্মুখে প্রকৃতি বা নৈসর্গিক শক্তি এবং তাহার পশ্চাতে পরাশক্তি চিৎশক্তি বা আত্মশক্তি, এ দুইকে লইলেই জগতের সকল কৃতকর্ম্মের হিসাব পাওয়া যায়; কেননা এই দুই শক্তিই জগন্মাতার বাহ্য ও আন্তর দুই মুখ বা দুই প্রকাশ; এই জগন্মাতা, এই প্রকৃতি-শক্তিই একা ও একমাত্র কর্ম্মকর্ত্রী।

পুরুষ এবং প্রকৃতি, চৈতন্যময়ী শক্তি এবং প্রকৃতির ধর্ত্তা ও ভর্ত্তা আত্মা যুগপৎ বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত এক শক্তি—কেননা পার্থক্যের মধ্যেও এই দুই এক ও অবিভাজ্য। কিন্তু ব্যষ্টিব্যক্তির অন্তরেও এমন কিছু আছে যাহা মনোময় অহমিকা নয়, যাহা এই বৃহত্তর সত্যবস্তুর সহিত মূলতঃ এক; ইহা সেই অদ্বয় পুরুষের এক শুদ্ধ প্রতিচ্ছবি বা অংশ; ইহাই অন্তরাত্মা, দেহধারী সত্তা বা পুরুষ, ব্যষ্টি আত্মা বা জীবাত্মা : এই সেই আত্মা যিনি মনে হয় যেন নিজের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত করিয়া বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত প্রকৃতির ব্যষ্টিভাবের এক খেলাকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন। গভীরতম সত্যে যিনি অনন্ত এক তিনিই আবার অনন্ত বহু; আমরা যে তাঁহার শুধু প্রতিচ্ছবি বা অংশ তাহা নহে, সেই তৎস্বরূপ ও আমরা একই বস্তু; আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যষ্টিসত্তা আমাদের অহমিকার মত আমাদেরই বিশ্বব্যাপিত্ব ও বিশ্বাতীতত্বকে প্রতিরোধ বা প্রতিষেধ করে না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের অন্তরাত্মা বা আত্মাপুরুষ প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টিভাব প্রকাশের সংকল্প করিয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে অহমিকার ধারণার সহিত জড়ীভূত হইতে দিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই অবিদ্যা দূর করিয়া দিতে হইবে, তাহাকে জানিতে হইবে যে সে পরমপুরুষ বা বিশ্বাত্মার এক প্রতিরূপ, এক অংশ বা এক রূপায়ণ; কেবলমাত্র বিশ্বক্রিয়াতে তাহার চৈতন্যের এক কেন্দ্র। কিন্তু আমাদের অহমিকা অথবা সাক্ষী ও জ্ঞাতার আশ্রয়ীভূত চেতনাও যেমন কর্ম্মের কর্ত্তা নহে তেমনি এই জীবপুরুষও কর্ত্তা নহে; পরন্তু চিরদিনই বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত পরাশক্তিই একমাত্র কর্ত্রী। কিন্তু এই শক্তির পশ্চাতে রহিয়াছেন অদ্বয় পরমপুরুষ যিনি ইহার মধ্য দিয়া পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বরশক্তি *

* ঈশ্বর-শক্তি ও পুরুষ-প্রকৃতি ঠিক একই বস্তু নয় : কেননা পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক তত্ত্ব কিন্তু ঈশ্বর ও শক্তি এ দুইএর একে অন্যের মধ্যে বর্ত্তমান। ঈশ্বর হইলেন সেই পুরুষ যাহার মধ্যে প্রকৃতি রহিয়াছেন এবং যিনি নিজের মধ্যস্থিত শক্তি দ্বারাই শাসন করেন। শক্তি হইতেছেন পুরুষের দ্বারা অধ্যুষিত ও উজ্জীবিত প্রকৃতি। এ শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছার বশে কর্ম্ম করেন—তবে সে ইচ্ছা তাহার নিজেরও ইচ্ছা—এবং তাহার গতিবৃত্তিতে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্য বহন করিয়া লইয়া চলেন। কর্ম্মযোগের সাধকের পক্ষে পুরুষ-প্রকৃতির উপলব্ধি তাহার প্রথম প্রয়োজন সাধন করে; কেননা সচেতন সত্তা ও তাহার শক্তির পার্থক্য এবং শক্তির ক্রিয়ার যন্ত্রের কাছে সত্তার বশ্যতা স্বীকার—এই দুই হইল আমাদের অজ্ঞান ও অপূর্ণতার নিমিত্তকারণ; এই উপলব্ধির দ্বারা জীব প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়া হইতে মুক্ত ও স্বাধীন হইতে এবং প্রথমে প্রকৃতির উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ঈশ্বর-শক্তি আছেন পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধের পশ্চাতে, তাহার অজ্ঞানের ক্রিয়ার আড়ালে, এবং সেই ক্রিয়াকে ক্রমবিকাশের কাজে লাগাইতেছেন। ঈশ্বর-শক্তির উপলব্ধি হইলে সাধক একটা উচ্চতর গতিবৃত্তি, দিব্য ক্রিয়াধারা এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির এক পূর্ণ একত্ব ও সুসঙ্গতির সহিত যোগস্থাপন করিতে পারে।

এই যুগলরূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন। পরমপুরুষ সক্রিয় হন শক্তিরূপে; সেই শক্তির জন্যই তিনি বিশ্বে সকল ক্রিয়ার একমাত্র আদি কারণ ও প্রভু।

ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে সাধককে সর্ব্বাগ্রে অহংগত কর্ম্মধারা হইতে পরাবর্ত্তিত হইয়া আসিতে এবং "অহং" যে কর্ম্ম করে এই বোধকে বর্জন করিতে হইবে তাহাকে দেখিতে ও অনুভব করিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া তাহার মনোময় ও শারীর যন্ত্রগুলির নমনীয় সচেতন বা অবচেতন অথবা কখনও কখনও অতি-চেতন স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়ারূপেই তাহার মধ্যে সব কিছু ঘটে। তাহার বহিশ্চর সত্তাতে একটা ব্যক্তিত্ব আছে যাহা নির্ব্বাচন ও ইচ্ছা করে, প্রতিকূল শক্তির বশ্যতা স্বীকার এবং তাহার সহিত সংগ্রাম করে, প্রকৃতিকে সমর্থন অথবা তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব নিজেই প্রকৃতি দ্বারা গঠিত এবং তাহার দ্বারা এমনভাবে শাসিত ও তাড়িত, নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্ধারিত হয় যে তাহা স্বাধীন হইতে পারে না। এই ব্যক্তিত্ব হইল প্রকৃতির মধ্যে আত্মার এক রূপায়ণ বা অভিব্যক্তি, ইহা আত্মার অপেক্ষা বরং প্রকৃতির এক আত্মা, তাহার প্রকৃতিগত ও ক্রিয়াধারাগত সত্তা, তাহার আধ্যাত্মিক ও শাশ্বত সত্তা নহে, ইহা অস্থায়ীভাবে গঠিত এক সত্তা, ধ্রুব ও অমর পুরুষ-সত্তা নহে। কিন্তু ইহাকে হইতে হইবে সেই ধ্রুব অমর পুরুষ। অন্তরে অবিক্ষুব্ধ ও প্রশান্ত থাকিবার শক্তি লাভ করিয়া তাহাকে সাক্ষীরূপে বহিশ্চর সক্রিয় ব্যক্তিত্ব হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইতে এবং নিজের প্রবণতা ও গতিবৃত্তির মধ্যে অন্ধভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া না পড়িয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার নিজের মধ্যে বিশ্বশক্তি রাজির খেলা দেখিতে ও বুঝিতে হইবে। এই-ভাবে শান্ত ও অনাসক্তভাবে নিজেকে অধ্যয়ন করিয়া নিজ প্রকৃতির সাক্ষী-রূপে অবস্থিত হইয়া সে উপলব্ধি করে যে সে স্বরূপতঃ সেই ব্যষ্টি অন্তরাত্মা যে প্রকৃতির ক্রিয়ারাজিকে পর্য্যবেক্ষণ করে, প্রশান্তভাবে তাহার ফলাফল গ্রহণ করে এবং তাহার কর্ম্মের আবেগ হয় অনুমোদন করে অথবা অনুমোদন প্রত্যাহৃত করিয়া লয়। বর্ত্তমানে এই অন্তরাত্মা বা পুরুষ, প্রকৃতির কার্য্যে সম্মতিদানশীল একজন দ্রষ্টা মাত্র, তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে; হয়ত

বা সত্তায় ক্রিয়া ও ক্রমপরিণতির উপর আপন প্রচ্ছন্ন চেতনার চাপ দিয়া সে কতকটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, কিন্তু প্রধানতঃ তাহার নিজের ক্ষমতাবলি অথবা তাহাদের এক অংশ বহিশ্চর ব্যক্তিসত্তার হাতে ন্যস্ত করিয়াছে—বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে ন্যস্ত করিয়াছে প্রকৃতির হাতে, কেননা এই বাহ্যসত্তা প্রকৃতির প্রভু নয় তাহার আজ্ঞাধীন, সে 'অনীশ'; কিন্তু একবার আবরণ উন্মোচিত হইলে এই পুরুষ তাহার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিকে যথার্থ কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে, আপন কর্ম্মের প্রভু হইতে, প্রকৃতির রূপান্তরসাধনে অব্যর্থ্যভাবে আদেশ দান করিতে পারে। যদিচ হয়ত অনেক দিন পর্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সাহচর্য্য ও পূর্ব্ব সঞ্চিত শক্তির বেগে পুরুষের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া প্রকৃতির অভ্যাসগত গতিবৃত্তি পূর্ব্বের মত চলে, এবং যদিও পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ পুরুষের অনুমত ক্রিয়াকে প্রকৃতি মানিয়া লইতে নির্ব্বন্ধসহকারে অস্বীকারে করে, তথাপি ব্যষ্টিপুরুষ আবিষ্কার করিবে যে অবশেষে তাহার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে এবং হয় বহু বাধা দিয়া ধীরে ধীরে, না হয় তাহার উপায় ও প্রবৃত্তি সকলের এক দ্রুত আপোষ ও ব্যবস্থা করিয়া লইয়া প্রকৃতি নিজেকে ও নিজের কার্য্যধারাকে তাহারই অন্তর্দ্দৃষ্টি ও সংকল্পের অনুযায়ীভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেছে। এইভাবে ব্যষ্টিপুরুষ দেখিতে পায় যে তাহার মানস পরিচালনা অথবা অহংগত সংকল্পের স্থানে এক আন্তর আধ্যাত্মিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহা তাহাকে তাহার মধ্য দিয়া ক্রিয়মান শক্তিরাজির প্রভু করিয়া দিয়াছে, আর সে তাহাদের অচেতন যন্ত্র অথবা যান্ত্রিক ভাবের দাস হইয়া নাই। তখন সে অনুভব করে যে তাহার উপরে ও চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন মহাশক্তি, জগন্মাতা এবং তাঁহার নিকট হইতে যাহা তাহার অন্তরতম আত্মা প্রয়োজন বোধ করে এবং পাইতে ইচ্ছা করে তাহার সমস্তই সে লাভ করিতে পারে—যদি শুধু তাঁহার কর্ম্মধারার প্রকৃত জ্ঞান তাহার থাকে আর যদি তাঁহার মধ্যস্থিত দিব্য ইচ্ছার কাছে সে যথার্থভাবে আত্মসমর্পণ করে। পরিশেষে সে নিজের ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরস্থিত সেই সর্ব্বোচচ সক্রিয় আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে, যিনি তাহার সকল দেখা সকল জানার উৎস তাহার সকল অনুমোদন সকল স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির আদি কারণ। ইনিই সেই প্রভু সেই পরমপুরুষ যিনি সর্ব্বের মধ্যে এক ও অদ্বয়তত্ত্ব, যিনি ঈশ্বরশক্তি, তাহার অন্তরাত্মা ইঁহারই এক অংশ, ইঁহার সত্তার এক সত্তা, ইঁহার শক্তির এক শক্তি। আমাদের প্রগতির বাকি অংশ নির্ভর করিবে, কর্ম্মের এই প্রভু কোন্ কোন্ ধারায় জগতের ও আমাদের মধ্যে তাঁহার সংকল্প অভিব্যক্ত

করিতেছেন এবং তাঁহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত শক্তির মধ্য দিয়া কি ভাবে কর্ম্মসম্পাদন করিতেছেন তাহার জ্ঞানের উপর।

ভগবান তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার মধ্যে, কি করিতে হইবে তাহা দেখিতে পান। এই দেখাই তাঁহার সংকল্প, তাঁহার সৃজনী-শক্তির একটা রূপ; আর যাহা তিনি দেখেন, তাঁহার সহিত যিনি এক ও অভিন্ন সেই সর্ব্বচৈতন্যময়ী জননী তাহা আপন সক্রিয় সত্তার মধ্যে গ্রহণ ও মূর্ত্ত করিয়া তোলেন; এবং ঈশ্বর-শক্তি রূপ যুগল তত্ত্বের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার যন্ত্ররূপী কার্য্যকরী প্রকৃতি-শক্তি (Nature-Force) তাহাকে কার্য্যে পরিণত করে। কিন্তু কি হইবে এবং তজ্জন্য কি করা যাইবে তাহার দিব্য দর্শন ভগবৎ-সত্তা হইতেই জাগিয়া উঠে, সেই দিব্য প্রভুর সত্তার চেতনা ও আনন্দের মধ্য হইতে সাক্ষাৎভাবে উৎসারিত হইয়া আসে—যেমন সূর্য্য হইতে আসে তাহার জ্যোতি। ইহা আমাদের মরমানবের দেখিবার প্রয়াস নয়, অতিকষ্টে প্রকৃতির ক্রিয়া ও প্রণোদনা অথবা তাহার ন্যায্য দাবির সত্যে পৌঁছনো নহে। যখন ব্যষ্টি আত্মা তাহার সত্তায় ও জ্ঞানে দিব্য প্রভুর সঙ্গে পূর্ণরূপে এক হইয়া যায় এবং আদ্যাশক্তি পরাৎপরা জননীর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে তখন, যাহার পরিণাম অবশ্যম্ভাবী তেমন এক ভাগবত সংকল্প উচচ দিব্যভাবে আমাদের মধ্যে জাগিয়া এবং প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়ার দ্বারা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। তখন ব্যষ্টি ব্যক্তির কোন বাসনা, কোন দায়িত্ব কোন প্রতিক্রিয়া আর থাকে না; সব কিছু ঘটে সেই অন্তর্যামী দিব্যপুরুষের অচঞ্চল শান্তি জ্যোতি ও শক্তির মধ্যে, যিনি আমাদিগকে আবেষ্টন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ণভাবে সেই একত্ব বা তাদাত্ম্যবোধ লাভ হইবার পূর্ব্বেও পরম ইচছার কিছুটা অবশ্যপালনীয় প্রেরণা ও ঈশ্বর-চালিত কর্ম্মরূপে আমাদের মধ্যে প্রকট হইতে পারে; তখন আমরা এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মনিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বশে কার্য্য করি কিন্তু তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্যের পূর্ণতর জ্ঞান প্রকাশ পায় শুধু তাহার পরে। অথবা অনুপ্রেরণা বা সম্বোধিরূপে কর্ম্মের প্রণোদনা বা প্রবেগ আসিতে পারে যাহা মন অপেক্ষা বরং হৃদয়ে ও দেহেই দেখা দেয়; তখন একটা কার্য্যকরী দৃষ্টি খুলিয়া যায় কিন্তু পূর্ণ ও যথাযথ জ্ঞানের প্রকাশ তখনও হয় না, আর যদি তাহা আদৌ আসে তবে আসে অনেক পরে। কিন্তু দিব্য-সংকল্প প্রদীপ্ত এক ও একমাত্র আদেশরূপে, অথবা কি করিতে হইবে তাহার এক সমগ্র প্রত্যয় কিম্বা নিরবচিছন্ন স্রোতোধারা রূপে আমাদের সংকল্প বা ভাবনার মধ্যে নামিয়া আসিতে পারে অথবা ঊর্দ্ধ হইতে তাহা

আসিতে পারে আমাদের অধস্তন অঙ্গগুলি যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে তাহার নির্দ্দেশরূপে। যতদিন যোগ অপূর্ণ রহিয়াছে ততদিন শুধু কিছু কাজ এভাবে করা যাইতে পারে; অথবা মাঝে মাঝে একটা বিশিষ্ট প্রদীপ্ত ও উন্নত অবস্থা যখন আসে শুধু তখনকার মত সাধারণভাবে সকল কাজই এরূপভাবে করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যোগ যখন পূর্ণ ও নিখুঁত হয় তখন সকল কর্ম্মের প্রকৃতিই এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ আমরা বর্দ্ধমান প্রগতির তিনটি ধাপ পৃথক করিয়া দেখিতে পারি :—প্রথম ধাপে ব্যক্তিগত ইচ্ছা কখন কখন বা অনেক সময় তাহার উর্দ্ধস্থিত এক পরম সংকল্প বা পরম চৈতন্যশক্তি দ্বারা উদ্দীপিত বা পরিচালিত হয়; দ্বিতীয় ধাপে সেই দিব্যসংকল্প নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্থান গ্রহণ করে; তৃতীয় ধাপে ব্যক্তিগত ইচ্ছা দিব্যশক্তি ও কর্ম্মের সঙ্গে এক হইয়া তাহার মধ্যে লীন হইয়া যায়। প্রথম স্তরে আমরা বুদ্ধি হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা পরিচালিত হই; এই অবস্থায় ইহাদিগকে দিব্য প্রেরণা ও চালনা চাহিতে বা তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় কিন্তু ইহারা সর্ব্বদা তাহা পায় না বা গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বিতীয় স্তরে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে মানুষী বুদ্ধির স্থান নেয় উচচ উজ্জ্বল বা বোধিদীপ্ত এক অধ্যাত্মমানস, মানুষের বহির্ম্মুখী হৃদয়ের স্থান অধিকার করে আন্তর চৈত্য হৃদয়; ইন্দ্রিয়ের স্থানে দেখা দেয় একটা পূত অহমিকাশূন্য প্রাণশক্তি। তৃতীয় স্তরে আমরা আধ্যাত্মিক মনকেও অতিক্রম করিয়া উঠিয়া যাই অতিমানস ভূমিতে।

এই তিন স্তরের সকলগুলিতেই মুক্ত ক্রিয়ার মূল স্বভাব একই—তিনেতেই প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়াধারা চলে পরমপুরুষের ইচ্ছাতে, তাঁহারই ভোগের জন্য, অহং-এর জন্য বা তাহার মধ্য দিয়া আর নহে। আরও উর্দ্ধের ভূমিতে ব্যষ্টি আত্মার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত এবং সচেতন প্রকৃতির মধ্যে সম্পাদিত এই ক্রিয়া, অনপেক্ষ ও সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষের সত্য হইয়া দাঁড়ায়—তাহা আর আমাদের মধ্যস্থিত নিম্নতর প্রকৃতির পতনশীল অজ্ঞানাচ্ছন্ন সর্ব্বভাবে বিকৃতি-সাধক শক্তির দ্বারা অর্দ্ধানুভূত খর্ব্ব কদাকারভাবে সম্পাদিত ব্যাপার থাকে না, কিন্তু তাহা নিষ্পন্ন হয় সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপা পরাৎপরা বিশ্বজননীর দ্বারা। জগৎপ্রভু আপনাকে এবং আপনার পরম জ্ঞান ও শাশ্বত চেতনাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রকৃতি-শক্তির মধ্যে লুকাইয়াছেন এবং ব্যষ্টি সত্তাকে সেই শক্তির সহযোগী অহংরূপে চালাইবাব সামর্থ্য প্রকৃতিকে দিয়াছেন; মহত্তর লক্ষ্যের অনুধাবন ও বিশুদ্ধতর জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষের অর্দ্ধদীপ্ত অপূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায়শই অপরা প্রকৃতির এই অধস্তন ক্রিয়াধারা চলিতে থাকে। পূর্ণতা

লাভের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় অথবা অতিমন্থর গতিতে ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, কেননা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতির অতীত ক্রিয়ার শক্তি, তাহার অতীত রূপায়ণরাজি, তাহার দীর্ঘকালব্যাপী অতীত সাহচর্য্যসমূহ ; যথার্থ উৰ্দ্ধারোহী সাফল্য কেবল তখনই আসিবে যখন একটা বৃহত্তর জ্ঞান বা শক্তি আমাদের অজ্ঞানের আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত সংকল্পকে গ্রহণ বা পরিচালন করিবে। কেননা আমাদের মানুষী ইচ্ছা এক বিপথে চালিত ও ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ কিরণ যাহা পরাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই অধস্তন ক্রিয়াধারার মধ্য হইতে উচ্চতর আলোক ও শুদ্ধতর শক্তির মধ্যে ধীরে ধীরে উন্মেষের সময়ে সিদ্ধিপথযাত্রীকে মরণছায়াময় উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিতে হয় ; এই ভয়ঙ্কর পথ নানা প্রকার পরীক্ষা, দুঃখ জ্বালাযন্ত্রণা, অন্ধকার, পদস্খলন, ভুলভ্রান্তি ও প্রচ্ছন্ন গর্ত্তে পরিপূর্ণ। এই কঠোর পরীক্ষাকে সংক্ষিপ্ত বা তাহার কষ্টকে লাঘব করিতে অথবা দিব্য আনন্দকে ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে চাহিলে প্রয়োজন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, অন্তর হইতে যে জ্ঞান স্বতঃস্ফুরিত হয় তাহার নিকট মনের ক্রমবর্দ্ধমান আত্ম-সমর্পণ, আর সর্ব্বোপরি চাই যথার্থ আস্পৃহা এবং অবিচলিত ও অকপট সাধনা। গীতা বলিয়াছে "হৃদয়কে নৈরাশ্যমুক্ত রাখিয়া নিরন্তর যোগাভ্যাস কর" ; কেননা যদিও সাধনার প্রারম্ভে আমাদিগকে আন্তর বিরোধ ও দুঃখকষ্টের তিক্ত বিষ বহুল পরিমাণে পান করিতে হয় তবু পরিশেষে সেই একই পাত্র হইতে আমরা অমর জীবনের পরমামৃত আস্বাদনের এবং শাশ্বত আনন্দের মধুময় সোমরসপানের পরম সৌভাগ্য লাভ করিব।

নবম অধ্যায়

সমতা ও অহমিকার বিনাশ

সর্ব্বাঙ্গীন আত্মোৎসর্গ, পরিপূর্ণ সমতা, অহমিকার সম্যক্ উচ্ছেদ, কর্ম্মের বর্ত্তমান অজ্ঞানাচ্ছন্ন ধারাগুলি হইতে আমাদের স্বভাবের মুক্তি ও রূপান্তর-সাধন, এই সোপানাবলি অবলম্বন করিয়া আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে ভগবদিচ্ছার নিকট সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে ও তাহাতে সফলকাম হইতে পারি—যে সমর্পণ হইবে প্রকৃতভাবে পরিপূর্ণরূপে ও নিঃশেষে আত্মদান। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের কর্ম্মের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি ও মনোভাব পূর্ণরূপে আনয়ন, তজ্জন্য প্রথমে চাই একটা নিত্যজাগ্রত সংকল্প, তাহাব পর আনা চাই তাহার জন্য সমগ্র সত্তার মজ্জাগত এক প্রয়োজনবোধ এবং সর্ব্বশেষে চাই যিনি আমাদের মধ্যে সর্ব্বভূতের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল ক্রিয়াধারার মধ্যে সদাবিরাজিত সেই প্রচ্ছন্ন পরমশক্তির নিকট উৎসর্গরূপে সকল কর্ম্ম করিবার এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত কিন্তু জীবন্ত ও সচেতন অভ্যাস, স্বতঃপ্রেরিত হইয়া সর্ব্বদা সেই দিকে ফিরিয়া থাকা। আমাদের জীবন এই যজ্ঞের বেদী, আমাদের কর্ম্মাবলি তাহার নৈবেদ্য, যে পরমদেবতাকে আমরা এ নৈবেদ্য অর্পণ করি তিনি হইতেছেন সেই বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত সত্তা ও শক্তি যাহাকে আমরা আজিও দেখি নাই বা জানি নাই কেবল তাহার একটা অনুভূতি, একটা আভাস মাত্র পাইয়াছি। এই আহুতি ও অত্মোৎসর্গের দুইটি দিক আছে, প্রথমে রহিয়াছে আমাদের কর্ম্ম এবং তারপর রহিয়াছে যে ভাব লইয়া কর্ম্ম করি সেই ভাব—আমরা যাহা কিছু দেখি, ভাবনা ও অনুভব করি তৎসকলের মধ্যে কর্ম্মের প্রভুর প্রতি পূজার ভাব।

করণীয় কর্ম্ম প্রথমে স্থির করিতে হয় আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে যত বেশী পরিমাণে জ্ঞানের আলোক দেখিতে পারা যায় তাহার সহায়তায়। কি করা উচিত তৎসম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহা এইভাবে স্থির হয়। আমাদের কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা বা মানবসঙ্গীগণের প্রতি আমাদের সমবেদনা বা সহানুভূতির দ্বারা অথবা অপরের বা জগতের মঙ্গলসাধনের ধারণার দ্বারা

নির্দ্ধারিত হউক কিম্বা আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানী যে ব্যক্তিকে আমরা মানব গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছি আমাদের পক্ষে যিনি সকল কর্ম্মের সেই প্রভুর প্রতিনিধি যে প্রভুকে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আজিও জানিতে পারি নাই, তাঁহার নির্দ্দেশের দ্বারা নির্ণীত হউক, সর্ব্বত্রই কর্ম্মের মূল নীতি এক। কর্ম্মযজ্ঞের যাহা সার বস্তু তাহা কর্ম্মের মধ্যে থাকা চাই, আর সে সারবস্তু হইল আমাদের কর্ম্মফলের সকল বাসনা সমর্পণ, সে পরিণামের জন্য আজিও যে কর্ম্ম করি তাহার প্রতি সকল আসক্তির পরিবর্জন। কেননা যতদিন ফলে আসক্ত হইয়া আমরা কর্ম্ম করি ততদিন আমাদের উৎসর্গ হইতেছে ভগবানের চরণে নয় নিজেদেরই অহমিকার কাছে। সে সময় আমরা অন্যরূপ ভাবিতে পারি কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনা মাত্র ; ভগবদ্‌ভাবের, কর্ত্তব্যবোধের, সঙ্গীদের প্রতি সমবেদনার, অপরের বা জগতের মঙ্গলসাধনেব, এমন কি প্রভুর আদেশপালনের ধারণার মুখোস পরিয়া আমাদের অহংগত পরিতৃপ্তি কিম্বা স্বেচ্ছাপূরণের চেষ্টা করিতেছি ; আমাদের প্রকৃতি হইতে সকল কামনার মূলোৎপাটনের যে দাবি আমাদের উপর আছে দৃশ্যতঃ যুক্তিপূর্ণ ছলনার বর্ম্মে তাহার আক্রমণ আমরা প্রতিরুদ্ধ করিতেছি।

যোগের এই স্তরে এমন কি তাহার সকল স্তরেই বাসনার এই রূপ, অহমিকার এই মূর্ত্তি হইল আমাদের শত্রু যাহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে সদাজাগ্রত, সর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকতে হইবে। যখন আমরা দেখিতে পাই যে সে শত্রু আমাদের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে এবং নানা ছদ্মবেশ ধারণ করিতেছে তখন আমাদের হতাশ্বাস হওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাহাতে তাহার সকল মুখোশ অপসারণ করিয়া তাহাকে ধরিতে পারি সে জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে এবং দৃঢ়চিত্তে তাহার প্রভাব দূর করিয়া দিতে হইবে। এই গতিবৃত্তি সম্বন্ধে এক প্রদীপ্ত বাক্য গীতার সংশয়চ্ছেদী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে "কর্ম্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ" 'শুধু কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাপি কোন অধিকার নাই'। কর্ম্মফলের একমাত্র অধিকারী তিনি যিনি সকল কর্ম্মের প্রভু। আমাদের একমাত্র করণীয়, শুধু প্রকৃত কর্ম্ম সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করিয়া সাফল্যকে প্রস্তুত করিয়া তোলা, এবং যদি সাফল্য লাভ হয় তবে তাহা দিব্য-প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া দেওয়া। তাহার পরে, যেমন আমরা কর্ম্মফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়াছি, তদ্রূপ কর্ম্মের প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করিতে হইবে ; যাহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে কোন কর্ম্ম তাহার গতিপথ বা তাহার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত করিতে পারি এমন কি প্রভুর সুস্পষ্ট আদেশ পাইলে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে পারি তজ্জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অন্যথায়

বুঝিতে হইবে যে আমরা কর্ম্ম তাঁহার জন্য করিতেছি না, করিতেছি কর্ম্মে নিজের পরিতৃপ্তি ও সুখ আছে অথবা সক্রিয় প্রকৃতির কর্ম্মে আমাদের প্রয়োজন আছে কিম্বা আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হইবে বলিয়া ; কিন্তু এ সমস্তই অহমিকার আবাস ও আশ্রয়স্থল। আমাদের সাধারণ জীবনধারাতে এ সমস্তের যতই প্রয়োজন থাকুক না কেন, আধ্যাত্মিক চেতনার পরিণতিতে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে তাহাদের দিব্য পরিপূরক বস্তুরাজিকে বসাইতে হইবে, এক অপৌরুষেয় ভগবদভিমুখী আনন্দ অনালোকিত প্রাণময় পরিতৃপ্তি ও সুখকে দূর করিবে বা তৎস্থান অধিকার করিবে, দিব্যশক্তির আনন্দময় এক পরিচালনা সক্রিয় নিম্নপ্রকৃতির চাঞ্চল্যের স্থানে অধিরূঢ় হইবে ; প্রবৃত্তিচরিতার্থতার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য আর থাকিবে না, তাহার স্থানে আসিবে মুক্ত আত্মা ও প্রদীপ্ত প্রকৃতির ক্রিয়ার স্বাভাবিক সক্রিয় সত্যের মধ্য দিয়া ভগবদিচ্ছার পরিপূরণ। পরিশেষে যেরূপে প্রথমে কর্ম্মফলের ও পরে কর্ম্মের আসক্তি হৃদয় হইতে অপসারণ করা হইয়াছে সেইভাবে আমরা যে কর্ম্মের কর্ত্তা এই ধারণা ও বোধের যে আসক্তি শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই যাইতে চাহে না তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে ; আমাদের অন্তরে ও উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত দিব্যশক্তিকে একমাত্র ও যথার্থ কর্ম্মকর্ত্রী বলিয়া জানিতে ও অনুভব করিতে হইবে।

কর্ম্মে ও তাহার ফলে আসক্তিত্যাগ, মনে ও আত্মাতে এক পরম সমতা লাভের দিকে অগ্রসরশীল এক গতিবৃত্তির প্রারম্ভ ; যদি চিৎস্বরূপের মধ্যে আমাদিগকে পূর্ণ হইয়া উঠিতে হয় তাহা হইলে এ গতিবৃত্তিকে সর্ব্বাবেষ্টনকারী হইতে হইবে। কেননা যিনি কর্ম্মের প্রভু তাঁহার পূজার জন্য আমাদের এবং সর্ব্ববস্তু ও সকল ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা এবং আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমতা এ আরাধনার চিহ্ন ; এই সাম্যবোধই হইল অন্তরাত্মার সেই ক্ষেত্র যেখানে যথার্থ উৎসর্গ ও প্রকৃত পূজা সাধিত হইতে পারে। ভগবান সর্ব্বভূতে সমভাবে রহিয়াছেন, আমাদের ও অপরের, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর, মিত্র ও শত্রুর, মানব ও পশুর, পুণ্যাত্মা ও পাপীর মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ করিলে চলিবে না। আমরা কাহাকেও ঘৃণা কাহাকেও অবজ্ঞা করিব না, কাহারও প্রতি আমাদের জুগুপ্সা থাকিবে না ; কেননা সকলের মধ্যেই আমাদের সেই অখণ্ড এককে দেখিতে হইবে যিনি আপন ইচ্ছার অনুরূপ ভাবে ব্যক্ত অথবা ছদ্মবেশে প্রকট হন। ইহাদের মধ্যে তিনি

যাহা হইতে চান, ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে কর্ম্ম করিতে চান, এবং তজ্জন্য যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বোধ করেন তদনুযায়ী তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার অনুরূপ ভাবে কাহারও মধ্যে তিনি স্বল্প প্রকট, কাহারও মধ্যে অধিকতর ভাবে অভিব্যক্ত, অন্য কাহারও মধ্যে প্রচ্ছন্ন, আবার কোথাও বা সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। সকলেই আমাদের আত্মা, এক অদ্বয় আত্মাই বহুরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। একটা স্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, বিরাগ ও বিপ্রকর্ষণ, অনুরাগ আসক্তি আকর্ষণ এবং বরণ ও সমাদর—এ সমস্তই স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য, প্রকৃতি আমাদিগের মধ্যে যাহা গড়িয়া তুলিতে চায় এগুলি তাহার সঙ্গে উপস্থিত থাকে অথবা সে গঠন এবং তাহার রক্ষণকার্য্যে সহায়তা করে। কিন্তু কর্ম্মযোগীর পক্ষে ইহারা পুরাতন অপ্রয়োজনীয় বস্তু, তাহার পথের বাধা, অজ্ঞানের এক প্রণালী, সে যোগমার্গে যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই এ সমস্ত তাহার প্রকৃতি হইতে খসিয়া পড়ে। শিশু-আত্মার পরিণতির জন্য এ সমস্তের প্রয়োজন আছে কিন্তু দিব্য সাধনাতে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার স্বভাব হইতে ইহারা দূর হইয়া যায়। যে দিব্য প্রকৃতিতে আমাদিগকে উন্নীত হইতে হইবে তাহাতে অতিদান্তা এমন কি সাংঘাতিক কঠোরতা থাকিতে পারে কিন্তু ঘৃণার কোন স্থান নাই, দিব্য শ্লেষের ভাব থাকিতে পারে কিন্তু অবজ্ঞার স্থান নাই, শান্ত স্পষ্ট-দর্শী শক্তিশালী প্রত্যাখ্যান থাকিতে পারে কিন্তু জুগুপ্সা বা দ্বেষের স্থান নাই। এমন কি আমাদিগকে যাহা ধ্বংস করিতে হইবে তাহার প্রতিও ঘৃণার ভাব পোষণ করা চলিবে না, আমরা যেন তাহার মধ্যেও শাশ্বত পুরুষের এক ছদ্ম ও ক্ষণিক গতিধারাকে চিনিয়া লইতে ভুল না করি।

যখন সর্ব্ববস্তুর মধ্য দিয়া একই আত্মার অভিব্যক্তি হইতেছে তখন সুরূপ ও কুরূপ, বিকলাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ, উদার ও অনুদার, সুখকর ও দুঃখদায়ক, শিব ও অশিব সমস্তের প্রতি আত্মার সমভাব রক্ষা করিতে হইবে। এখানেও কোন ঘৃণা অবজ্ঞা ও জুগুপ্সা থাকিবে না ; বরং তাহাদের স্থানে থাকিবে সেই সমদৃষ্টি যাহা সর্ব্ববস্তুকে তাহাদের যথার্থস্বভাব ও যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখিতে পাইবে। কারণ আমরা বুঝিতে পারিব যে, যে পরিবেশ সর্ব্ববস্তুর জন্য পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্পিত হইয়া আছে তাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রকৃতির বর্ত্তমান স্থিতি বা ক্রিয়াধারা বা পরিণতিতে যেরূপ করা সম্ভব সেইরূপে, যত উত্তমভাবে করিতে সমর্থ সেই ভাবে অথবা যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির হাত এড়াইবার তাহাদের সাধ্য নাই তাহাদিগকে রাখিয়া সে সকল বস্তুই প্রকট বা প্রচ্ছন্ন করে, ফুটাইয়া তোলে বা বিকৃত করে ভগবানের কোন সত্য বা তথ্যকে, কোন শক্তি বা সম্ভাবনাকে,

যাহাদের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব ক্রমবিকাশের পথে বর্ত্তমানের সর্ব্ববস্তুর সমগ্র সমষ্টির জন্য এবং জগতের চরম পরিণতির পূর্ণতার জন্য এই উভয়ত্রই আবশ্যক আছে। সেই সত্যকে আমাদের সন্ধান করিতে হইবে, অনিত্য অভিব্যক্তির পশ্চাতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; তাহা হইলে বাহ্যরূপের বা দৃশ্যমান অভিব্যক্তির ত্রুটিবিচ্যুতি বা বিকৃতির দ্বারা প্রতিহত না হইয়া আমরা আরাধনা করিতে পারিব সেই ভগবানকে যিনি তাঁহার মুখোশের পশ্চাতে চিরনির্ম্মল চিরশুদ্ধ চিরসুন্দর ও চিরপূর্ণই রহিয়াছেন। বস্তুতঃ সব কিছুরই রূপান্তর সাধন করিতে হইবে, কুরূপ বা অসুন্দরকে নয়, দিব্যসুন্দরকেই গ্রহণ করিতে হইবে, অপূর্ণতার মধ্যে নিরুদ্ধ থাকিলে চলিবে না, পূর্ণতালাভের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; পরম শিবকেই করিতে হইবে আমাদের জীবনের সার্ব্বভৌম লক্ষ্য, অনর্থ বা অশিবকে নয়। আমরা যাহা কিছু করি তাহা আধ্যাত্মিক বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারাই করিতে হইবে; দিব্য শিব দিব্য সুন্দর দিব্য পূর্ণতা দিব্য আনন্দকে আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে, তাহাদের অধস্তন মানুষী আদর্শকে নহে। যদি আমাদের মধ্যে সমত্ব না আসিয়া থাকে তবে তাহা হইল এক চিহ্ন যাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে অবিদ্যা এখনও আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে; সে ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃতভাবে কিছুই বুঝিতে পারিব না, বরং ইহাই সম্ভব যে আমরা পুরাতন অপূর্ণতা নষ্ট করিয়া তাহার স্থানে নূতন এক অপূর্ণতাকে সৃষ্টি করিব; কেননা আমরা দিব্য ইষ্টার্থের স্থানে মানুষী মন ও কামময় আত্মার মূল্যাবধারণকে স্থান দিয়াছি।

সমতার অর্থ একটা নবতর অজ্ঞানে ডুবিয়া অথবা নূতন করিয়া অন্ধ হইয়া যাওয়া নহে; তাহা নানা বর্ণের বহু বিচিত্র খেলা মুছিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে দৃষ্টির একটা ধূসরতা আনয়ন করে না বা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। জগতের মধ্যে বহু পার্থক্য, অভিব্যক্তিতে নানা বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আর এই বৈচিত্র্যের মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝিতে—আরও অনেক প্রকৃষ্টভাবে বুঝিতে পারিব, যখন আমাদের দৃষ্টি আর ভ্রান্ত এবং আংশিক প্রেম ও ঘৃণা, শ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা, রাগ ও দ্বেষ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিবে না। কিন্তু এই ভেদ বৈচিত্র্যের অন্তরালে আমরা সর্ব্বদা আমাদের অন্তর্যামী পূর্ণ ও অক্ষর এককে দেখিতে পাইব, আর আমরা জানিব ও অনুভব করিব, অথবা যদি তিনি আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকেন তাহা হইলে অন্ততঃ বিশ্বাস করিব যে তাহার প্রত্যেক বিশেষ রূপায়ণের পশ্চাতে এক বিজ্ঞ উদ্দেশ্য, এক দিব্য প্রয়োজন রহিয়াছে— যে রূপায়ণ আমাদের মানুষী আদর্শের কাছে সুসঙ্গত এবং পূর্ণ অথবা অমার্জিত এবং অসম্পূর্ণ কিম্বা এমন কি মিথ্যা এবং অশিব যাহাই মনে হউক না কেন।

আবার তেমনি আমাদের মনে ও আত্মাতে সকল ঘটনার প্রতি, তাহারা সুখ ও দুঃখ, জয় ও পরাজয়, মান ও অপমান, যশ ও অপযশ, সুদৈব ও দুর্দ্দৈব যে ভাবে বা যে রূপেই আসুক না কেন, আমরা একই সমত্ব রক্ষা করিব। কেননা প্রতি ঘটনাতেই আমরা সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রভুর এক ইচ্ছা, ভগবানের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশের এক ধাপ দেখিতে পাইব। যাহাদের দৃষ্টিসমর্থ আন্তর চক্ষু আছে তাহাদের নিকট যেমন সর্ব্বশক্তিতে, তাহাদের খেলা ও পরিণামে তেমনি সর্ব্ববস্তুতে ও সর্ব্বপ্রাণীতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সব কিছুই চলিয়াছে এক পরম অভিব্যক্তির দিকে ; দুঃখ ও দৈন্যের অথবা সুখ ও পরিতৃপ্তির প্রত্যেকটি অনুভূতি সমপরিমাণে এক সার্ব্বভৌম গতিধারার এক একটি প্রয়োজনীয় সংযোজক (**link**), যাহাকে বুঝিতে পারা ও মানিয়া নেওয়া মানুষের অবশ্য করণীয় কার্য্য। আমরা অসংস্কৃত ও অবিদ্যাচছন্ন সহজাত প্রবৃত্তির আবেগের বশেই তাহাকে নিন্দা বা তিরস্কার কিম্বা তাহার বিরুদ্ধাচারণ করি। অবশ্য অপরাপর বস্তুর মত বিশ্বনাট্যে বিদ্রোহের একটা স্থান একটা উপযোগিতা এমন কি একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, মানুষের গতিপথে তাহা সহায় হইয়া উঠিতেও পারে, তাহাদের যথাকালে ও যথাযথ স্তরে দিব্য পরিণতির জন্যই তাহা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ; তথাপি অবিদ্যাচছন্ন বিদ্রোহের গতিবৃত্তি আত্মার শৈশবাবস্থার অথবা অপরিণত যৌবন কালের ব্যাপার। সুপরিণত আত্মা নিন্দাবাদ বা দোষারোপ করে না, সে বুঝিতে ও জয় করিতে চেষ্টা করে ; সে চিৎকার বা ঝগড়া করে না কিন্তু মানিয়া লয় এবং উন্নতিসাধন ও পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়াস পায় ; সে অন্তরে বিদ্রোহী হয় না, আজ্ঞা পালনের জন্য সার্থকতা ও রূপান্তর সাধনের জন্য পরিশ্রম করে। অতএব আমরা আত্মার সমভাব লইয়া দিব্যপ্রভুর হাত হইতে সব কিছু গ্রহণ করিব। দিব্য বিজয় না আসা পর্য্যন্ত আমরা পথ বা পাথেয় রূপে শান্তভাবে যেমন সাফল্য তেমনি পরাজয় স্বীকার করিয়া লইব। যদি দিব্য বিধানানুসারে আমাদের কাছে আসে তবে তীক্ষ্ণতম দুঃখ তাপ ও বেদনাতে যেমন আমাদের দেহ মন ও আত্মা অবিচলিত থাকিবে তেমনি তীব্রতম হর্ষ সুখ বা পুলকেও অনভিভূত রহিবে। এইভাবে এক পরম সাম্যে স্থিত হইয়া চলিবার পথে সকল বস্তুকে সমান শান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়া আমরা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকিব, যতদিন আমরা উচচতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া সার্ব্বভৌম পরমানন্দে প্রবেশ করিতে না পারি।

দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া না গেলে এবং ধীর ভাবে আত্মসংযম করিতে না পারিলে এ সমতা আসিতে পারে না ; যতদিন কামনা প্রবল থাকে ততদিন চিত্তের নিস্তব্ধতা ও বাসনার সাময়িক অবসাদের সময় ছাড়া সমতা কিছুতেই আসিতে পারে না, আব সে সময়ও যাহা আসে খুব সম্ভব তাহা যথার্থ শান্ত ভাব বা সুনিশ্চিত আধ্যাত্মিক একত্ব ততটা নয় যতটা অসাড় উদাসীনতা অথবা কামনার নিজের নিকট হইতে প্রতিক্ষেপ মাত্র। তাহা ছাড়া এই আত্মসংযম বা আধ্যাত্মিক সমতাতে আত্মার এই পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাপ ও কাল আছে। সাধারণতঃ আমাদিগকে আরম্ভ করিতে হয় সহনশীলতা বা তিতিক্ষা অভ্যাসের একটা কাল লইয়া ; কেননা আমাদিগকে সকল সংস্পর্শের সম্মুখীন হইবার, তাহাদের আঘাত সহ্য করিবার, তাহাদিগকে গ্রহণ ও পরিপাক করিয়া লইবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের সত্তার প্রত্যেক তন্তুকে শিক্ষা দিতে হইবে যে যাহা-কিছু যন্ত্রণাদায়ক, যাহা কিছু বিপ্রকর্ষক তাহার নিকট হইতে সঙ্কুচিত হইলে বা সরিয়া গেলে অথবা যাহা কিছু আমাদিগকে সুখদেয় বা আকর্ষণ করে তাহার পশ্চাতে সাগ্রহে ধাবিত হইলে চলিবে না—বরং যাহাই আসুক তাহাকে মানিয়া লইতে, তাহার সম্মুখীন হইতে তাহাকে সহ্য ও জয় করিতে হইবে। আমাদিগকে এমন সবল হইতে হইবে যে সকল সংস্পর্শ বা সংঘাতই আমরা সহ্য করিতে সমর্থ হইব ; যাহা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও ব্যক্তিগত শুধু তাহা নয়, আমাদের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে এবং চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত জগৎ ও তাহাদের অধিবাসী আছে তাহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি বা বিরোধজাত যতপ্রকার সংস্পর্শ বা সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের সকলকে সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিতে হইবে। ধীর স্থির ভাবে আমরা সহ্য করিব আমাদের উপরে মানুষ, বস্তু বা শক্তিরাজির ক্রিয়া ও সংঘাতের বেগ, দেবতাগণের চাপ ও অসুরগণের আক্রমণ ; অন্তরাত্মার অনন্ত অভিজ্ঞতার পথে আমাদের সম্মুখে যাহা কিছু আসিবার সম্ভাবনা আছে সে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইতে এবং তাহাদিগকে আত্মার অবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহা হইল সমতালাভের প্রস্তুতির জন্য কঠোর তিতিক্ষার যুগ, তাহার প্রাথমিক কিন্তু তথাপি বীরত্বের যুগ। কিন্তু দেহ হৃদয় ও মনের এই সুদৃঢ় সহনশীলতাকে দিব্যসংকল্পের নিকট আধ্যাত্মিক আনুগত্যের এক দৃঢ় পোষিত বোধ দ্বারা সবলতর করিয়া তুলিতে হইবে ; জীবন্ত এই মাটির পিণ্ডটির পক্ষে শুধু একটা নির্ম্মম ও নির্ভীক স্বীকৃতির ভাব লইয়া নিজেকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, কিন্তু যে দিব্যহস্ত পূর্ণ করিবার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করিতেছে তাহার সংস্পর্শের নিকট, সকল দুঃখযন্ত্রণার

মধ্যেও, আপনাকে সজ্ঞানে উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। ঈশ্বর প্রেমিকের জ্ঞানময় বা ভক্তিপূর্ণ অথবা এমন কি ভাবপ্রবণ এক তিতিক্ষা থাকিতে পারে যাহা কেবলমাত্র অনালোকিত আত্মনির্ভরশীল সহনশীলতা হইতে শ্রেষ্ঠবস্তু, যেরূপ সহনশীলতার ফলে ভগবানের আধাররূপী সাধকের হৃদয় অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িতে পারে; কেননা পূর্ব্বোক্ত প্রকার তিতিক্ষা এমন এক শক্তি গড়িয়া তোলে যাহা জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয় বস্তু লাভে সমর্থ; ইহার অবিক্ষুব্ধ ভাব এমন একটা গভীর হৃদয়স্পর্শী প্রশান্তি যাহা সহজেই আনন্দে পরিণত হয়। উৎসর্গ ও সহনশীলতার এই স্তরের লাভ হইল আত্মার এমন এক শক্তি যাহা সকল সংস্পর্শ ও সকল সংঘাতেও সমত্ব রক্ষা করিতে পারে।

ইহার পর একটা সময় আসে যখন সাধক উর্দ্ধস্থিত এক নিরপেক্ষতা ও উদাসীনতা লাভ করে যাহাতে তাহার অন্তরাত্মা উল্লাসমত্ততা ও অবসাদ এই উভয় অবস্থা হইতে মুক্ত হয়, যেমন হর্ষের ব্যগ্রতা ও অধীবতার ফাঁদ তেমনি শোক ও দুর্দ্দশার যন্ত্রণার অন্ধকাবময় জাল এ উভয়কেই এড়াইয়া যায়। ইহা সকল বস্তু ব্যক্তি ও শক্তিকে, যেমন নিজের তেমনি অপরের সকল ভাবনা ও সংবেদন সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ক্রিয়াকে উর্দ্ধ হইতে এমন এক আত্মার দৃষ্টি দিয়া দেখা যে আত্মা সর্ব্বদা অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয় থাকে এবং এই সমস্ত দ্বারা বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ হয় না। এটি হইল সমতার জন্য প্রস্তুতির দার্শনিক যুগ, একটা মহান ও উদার গতিধারা। কিন্তু উদাসীনতা কর্ম্ম ও অনুভূতি হইতে অসাড়ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ানোতে পরিণত হইলে চলিবে না, ইহা যেন অবসাদজাত কর্ম্মবিমুখতা বিরাগ ও বিরক্তি, কামনার নিষ্ফলতা অথবা অতিভোগ-জনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিক্ষেপ, অথবা নিজের তীব্র আবেগময় লক্ষ্য হইতে সবলে প্রত্যাবর্ত্তিত অহমিকার প্রতিহত ও অতৃপ্ত অসন্তুষ্টি হইয়া না দাঁড়ায়। অন্তরাত্মার অপক্ক অবস্থায় এই সকল প্রতিক্ষেপ আসা অপরিহার্য্য, প্রবল কামনা দ্বারা চালিত প্রাণপ্রকৃতিকে নিরুৎসাহিত করিয়া ইহারা একপ্রকারে উন্নতি-পথে সহায় হইতে পারে বটে কিন্তু যে পূর্ণতায় পৌঁছিবার জন্য আমরা সাধনা করিতেছি ইহারা সে বস্তু নহে। যে নিরপেক্ষতা বা উদাসীনতা আমাদিগকে খুঁজিতে হইবে তাহা হইল সব কিছুর সংস্পর্শের উর্দ্ধে অবস্থিত আত্মার এক শ্রেষ্ঠতর প্রশান্তি, যেখানে বসিয়া এই আত্মা সব কিছু দেখে, গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু গ্রহণের দ্বারা অভিভূত বা প্রত্যাখ্যানের দ্বারা বিচলিত হয় না। এ অবস্থায় মানবাত্মা অনুভব করিতে আরম্ভ করে, যে নীরব স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা প্রকৃতির ক্রিয়াধারা হইতে পৃথক থাকিয়াও প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তাহার ক্রিয়াধারাকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছেন,

সে নিজে তাঁহার অতি নিকট, তাঁহার স্বজন, তাঁহার সহিত এক ; সে উপলব্ধি করিতে থাকে যে, যে নিষ্ক্রিয় শান্ত পরমসত্য বিশ্বের সকল গতি ও ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন সে তাঁহার অংশ বা তাঁহাতে নিমজ্জিত হইয়া আছে। এই উচ্চ সর্ব্বোত্তম ভাবে অবস্থিতির সময় অন্তরাত্মার লাভ হইল এমন এক অবিচলিত ও অবিকম্পিত প্রশান্তি যাহা জগদ্ব্যাপারের সুখদায়ক বীচিমালা অথবা ঝটিকাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গরাজি ইহাদের কোনটার দ্বারা বিচলিত হয় না।

আন্তর পরিবর্ত্তনের এই দুই স্তরের দ্বারা গতিরুদ্ধ অথবা তাহাদের কাহারও মধ্যে অবরুদ্ধ না হইয়া যদি তাহাদিগকে পার হইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা এমন এক বৃহত্তর দিব্য সমতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি যাহার আনয়ন করিবার সামর্থ্য আছে এক আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা, আনন্দের এক প্রশান্ত আবেগ, সব কিছু জানিতে সব কিছুকে অধিকার করিতে সমর্থ সিদ্ধ আত্মার এক উল্লাসময় সমতা, সর্ব্ববস্তু আলিঙ্গনকারী তাহার সত্তার এক তীব্র এবং অবিক্ষুব্ধ উদারতা ও পূর্ণতা। ইহাই হইল সমতার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভের সময়, আর ভগবান ও জগজ্জননীর চরণে সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণের আনন্দের মধ্য দিয়াই তথায় পৌঁছা যায়। কেননা শক্তি তখন দিব্য প্রভুত্বের রাজমুকুটে বিভূষিত, শান্তি গভীর হইয়া পরমানন্দে পরিণত হয়, দিব্য প্রশান্তি উন্নীত হইয়া দিব্য গতিবৃত্তিলাভের ক্ষেত্র রূপে গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই বৃহত্তর পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারিলে, যে অবস্থায় ঊর্দ্ধে আসীন অন্তরাত্মা নিম্নস্থিত রূপ ব্যক্তিত্ব গতিবৃত্তি ও শক্তিরাজির প্রবাহকে নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে নিরীক্ষণ করিতেছে সে অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রবল ও প্রশান্ত আনুগত্য এবং শক্তিশালী ও গভীর আত্মসমর্পণের এক নবতর ভাব ও বোধে পরিণত করিতে হইবে। এই আনুগত্য আর এক আগ্রহহীন স্বীকৃতি মাত্র হইবে না, তাহা হইয়া উঠিবে সানন্দে গ্রহণ ; কেননা সেখানে দুঃখযন্ত্রণা অথবা ভার বা ক্রুশ-বহনের কোন বোধ থাকিবে না ; প্রেম ও আনন্দ এবং আত্মদানের পরমোল্লাস হইবে সেই প্রোজ্জ্বল অবস্থার উপাদান। আর এই সমর্পণ যাহাকে আমরা অনুভব ও স্বীকার করি এবং যাহার আদেশ পালন করি সেই দিব্য সংকল্পের নিকট শুধু করিলে চলিবে না ; কিন্তু সে সমর্পণ হইবে সেই সংকল্পের মধ্যস্থিত যাহাকে তখন আমরা চিনি সেই দিব্য জ্ঞানের নিকট এবং যাহাকে উপলব্ধি করি এবং পরমানন্দে ভোগ করি সেই প্রেমের নিকট—যাহার সহিত আমরা পরম হর্ষে পূর্ণরূপে এক হইয়া যাইতে পারি আমাদের ও সর্ব্বের সেই পরমাত্মা ও পরমপুরুষের জ্ঞান ও প্রেমের নিকট। প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তির দার্শনিক সমতার

শেষ কথা হইল নিঃসঙ্গ এক শক্তি শান্তি ও নীরবতা ; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুভূতিতে অন্তরাত্মা নিজকৃত এই স্থিতি হইতেও নিজেকে মুক্ত করে এবং শাশ্বতের অনাদি ও অনন্ত অনুত্তমা সিদ্ধির সর্ব্বব্যাপী এক পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়। অবশেষে তখন আমরা সকল সংস্পর্শ পরমোল্লাসভরা এক সমতার সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থ হই ; কেননা সেই সংস্পর্শের মধ্যে আমরা অমর প্রেম ও আনন্দের স্পর্শ অনুভব করি, সেই পরম ও চরম উল্লাসের সাক্ষাৎ পাই যাহা চিরদিনই সর্ব্ববস্তুর অন্তরে লুক্কায়িত আছে। সমতাযুক্ত সার্ব্বভৌম সুখের এই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় দেখা দিবে আত্মার পরম প্রসাদ ও অপার দিব্য আনন্দের উন্মুক্ত তোরণ, যে আনন্দ আমাদের সকল বোধের অতীত এক পরম বস্তু।

বাসনার বিনাশ ও আত্মার সমতার বিজয়লাভের এই সাধনা তাহার পরম-পূর্ণতা ও সার্থকতাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমাদের সেই আধ্যাত্মিক গতি-বৃত্তিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে যাহার ফলে অহংবোধের বিলোপ সাধিত হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগীর পক্ষে এই পরিবর্ত্তনসাধনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান হইল কর্ত্তৃত্বাভিমান-ত্যাগ। কেননা যখন আমরা যজ্ঞেশ্বরের চরণে কর্ম্মফল ও ফলাকাঙক্ষা সমর্পণ করিয়া রাজসিক কামনার অহমিকার হাত হইতে মুক্ত হইয়াছি, এমন কি তখনও আমরা কর্ম্মীর অহংকার রক্ষা করিয়া চলিতে পারি। তখনও আমরা এই বোধের অধীন রহিয়াছি যে আমরা নিজেরাই আমাদের কর্ম্মের মূল উৎস, আমরাই তাহার অনুমন্তা। তখনও আমার "আমি" কর্ম্ম নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত করিতেছে, তখনও সেই "আমিই" তাহার দায়িত্বগ্রহণ এবং দোষ বা গুণ অনুভব করিতেছে। আমাদের যোগের মূল লক্ষ্য হইল এই ভেদগত অহংবোধকে একেবারেই অপসারণ করা। আমাদের মধ্যে যদি কিছুকালের জন্য অহমিকাকে কতকটা থাকিতে দেওয়া হয় তবে তাহা হইবে তাহার এমন এক রূপ যাহা নিজেকে এক প্রতিরূপ বলিয়াই জানে এবং যে মুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে চেতনার এক সত্য-কেন্দ্র অভিব্যক্ত বা গঠিত হইয়া উঠিবে সেই মুহূর্ত্তে সে সরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে। সেই সত্যকেন্দ্র হইবে অদ্বয় পরম চৈতন্যেরই এক জ্যোতির্ম্ময় রূপায়ণ এবং অদ্বয় সৎস্বরূপেরই এক বিশুদ্ধ প্রণালী ও যন্ত্র। ব্যষ্টি প্রকাশের ও বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া ইহাই ইহার পশ্চাতে স্থিত আমাদের

সত্য ব্যক্তিকে, কেন্দ্রগত শাশ্বত পুরুষকে, পরমপুরুষের এক দিব্য সত্তাকে পরাপ্রকৃতির এক শক্তি ও অংশকে * ক্রমশঃ প্রকাশ করে।

এখানেও এই যে গতিধারার দ্বারা অন্তরাত্মা তাহার অহংকাররূপ অন্ধকার-ময় আবরণটি খুলিয়া ফেলিয়া দেয় তাহার মধ্যেও অগ্রগতির সুস্পষ্ট বিভিন্ন স্তর আছে। কেননা শুধু কর্ম্মফলই যে ভগবানের তাহা নহে, আমাদের কর্ম্মকেও তাঁহারই হইতে হইবে; তিনি যেমন আমাদের কর্ম্মফলের তেমনি সমভাবেই আমাদের কর্ম্মেরও প্রকৃত অধীশ্বর। এ কথা আমাদিগকে ভাবনাময় মন দ্বারা শুধু বুঝিলে চলিবে না, আমাদের সমগ্র চেতনা ও সংকল্পে ইহাকে পূর্ণরূপে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। সাধককে ইহা শুধু ভাবনায় যে জানিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে কর্ম্মের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রণালীর সর্ব্বত্রই বাস্তব প্রত্যক্ষ ও গভীর অনুভূতি লইয়া বুঝিতে ও দেখিতে হইবে যে কর্ম্ম একেবারেই তাহার নিজের নহে, কিন্তু পরম সৎস্বরূপ হইতেই তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। একটা শক্তি একটা সান্নিধ্য একটা সংকল্প যে তাহার ব্যষ্টি-প্রকৃতির মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে এ সম্বন্ধে তাহাকে সর্ব্বদা সচেতন হইতে হইবে। কিন্তু সাধনধারার এই পরিবর্ত্তনের সময় এ-বিপদ আসিতে পারে যে সাধক নিজের ছদ্মবেশী বা উর্দ্ধে উন্নীত অহমিকা বা অন্য কোন অধস্তন শক্তিকে দিব্যপ্রভু বলিয়া ভুল করিতে এবং তাহার দাবিকে ভগবানের চরম আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। নিম্নপ্রকৃতির প্রায় সর্ব্বদা সংঘটিত এই অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা অভিভূত হইয়া উচ্চতর শক্তির কাছে তাহার তথাকথিত সমর্পণকে বিকৃত করিয়া তাহার হঠকারিতার, এমন কি তাহার কামনা বাসনার অসংযত অতি-প্রশ্রয় দিবার ছুতা ও ছলনা করিয়া তুলিতে পারে। সাধনার দাবি এই যে আমাদের সচেতন মনে এক অকপট সরলতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, আর শুধু তাহাই নহে, যাহা নানা প্রচ্ছন্ন গতিবৃত্তিতে ভরা আমাদের সেই অধিচেতন (subliminal) অংশে সে সরলতাকে বসানো তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কারণ সেখানেই বিশেষতঃ আমাদের প্রাণপ্রকৃতির মগ্নচৈতন্যে রহিয়াছে এক প্রতারক ও অভিনেতা, যাহাকে সংশোধন করা অতিদুরূহ ব্যাপার। সাধক তাহার কামনা-বিলোপের এবং সকল কর্ম্ম ও সকল ঘটনাতে অন্তরাত্মার সমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার সকল কর্ম্মের বোঝা ভগবানের চরণে পূর্ণরূপে নামাইয়া দিতে সমর্থ হইবে না।

* অংশ সনাতনঃ, পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা

প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে চলিতে হইবে অহমিকার প্রবঞ্চনারাজি এবং বিপথে চালনাকারী অন্ধকারের সেই সমস্ত শক্তির অতর্কিত আক্রমণের উপর সতর্ক ও সাবধান দৃষ্টি রাখিয়া, যাহারা আলোক ও সত্যের একমাত্র উৎস বলিয়া নিজেদিগকে চালাইতে চায় এবং সাধকের অন্তরাত্মাকে নিজেদের খপ্পরে টানিয়া আনিবার জন্য ছল করিয়া দিব্যমূর্ত্তির অনুরূপ সব মূর্ত্তি ধারণ করে।

সাধককে অবিলম্বে এক অগ্রবর্ত্তী ধাপে উত্তীর্ণ হইয়া নিজেকে সাক্ষীর স্থানে বসাইতে হইবে। প্রকৃতি হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইয়া, নৈর্ব্যক্তিক ও বীতরাগ হইয়া, কার্য্যসাধিকা প্রকৃতিশক্তি কি ভাবে তাহার মধ্যে কার্য্য করে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহার সে ক্রিয়াধারাকে বুঝিতে হইবে। এইভাবে পৃথক থাকিয়া তাহাকে বিশ্বশক্তিরাজির খেলা চিনিতে ও বুঝিতে হইবে, বুঝিতে হইবে প্রকৃতি আলোক ও অন্ধকার, দিব্য ও অদিব্য ভাব সহযোগে কিরূপে কর্ম্মের এক জাল বয়ন করিয়া চলিয়াছে আর খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে বিশ্বপ্রকৃতির সেই সমস্ত প্রচণ্ড শক্তি ও সত্তারাজিকে যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষকে ব্যবহার করিতেছে। গীতায় বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি তাহার তিন গুণের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে,—আলোক ও মঙ্গলের গুণ (সত্ত্ব), আবেগ ও কামনার গুণ (রজ) এবং অন্ধকার ও জড়তার গুণ (তম)। বিবেচক ও নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে সাধককে তাহার প্রকৃতির এই রাজ্য মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে, গুণত্রয় কিভাবে পৃথক থাকিয়া ও মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে তাহা পৃথক করিয়া বুঝিতে হইবে ; আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিশ্বশক্তির সূক্ষ্ম অদৃশ্য বা ছদ্মবেশী যে ক্রিয়াধারা নানা অলিগলির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহাকে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে ; সেই গোলকধাঁধার সকল জটিলতার রহস্য জানিতে হইবে। এই জ্ঞানের পথে যেমন সে অগ্রসর হইতে থাকিবে তেমনি প্রকৃতির অজ্ঞানাচ্ছন্ন যন্ত্র আর না থাকিয়া তাহার অনুমন্তা হইতে সমর্থ হইবে। প্রারম্ভে সাধকের বিভিন্ন অঙ্গের উপর ক্রিয়াশীল প্রকৃতি-শক্তি যাহাতে তাহার ক্রিয়াধারায় তাহার নিম্নতর গুণদ্বয়কে জয় করিয়া তাহাদিগকে আলোক ও মঙ্গলের গুণের (সত্ত্বগুণের) অধীন করিয়া লইতে পারে তজ্জন্য তাহাকে প্ররোচিত করিতে হইবে, তাহার পর আবার তাহাকে এমনভাবে আত্মদানের জন্য রাজি করাইতে হইবে যাহাতে এই তিন গুণই এক উচ্চতর শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হইতে, তাহাদের দিব্যরূপে পরিণত হইতে পারে—তমোগুণ পরম অবিকম্পিত প্রশান্তিতে, রজোগুণ শাশ্বত সক্রিয় দিব্য চিৎতপসে, সত্ত্বগুণ দিব্য জ্যোতি ও আনন্দে। আমাদের মধ্যস্থিত মনোময়

সত্তার দৃঢ়সংকল্পের দ্বারা তত্বতঃ এই শিক্ষা ও রূপান্তরের প্রথম অংশ সাধিত হইতে পারে ; কিন্তু ইহা পূর্ণরূপে সম্পাদন এবং পরবর্ত্তী রূপান্তর সাধন কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন আমাদের গভীরে অধিষ্ঠিত চৈত্যপুরুষ প্রকৃতির উপর তাহার আধিপত্য বৰ্দ্ধিত করিয়া মনোময় সত্তার শাসনের স্থানে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। যখন ইহা ঘটিবে তখন সাধক অভীপ্সা ও উদ্দেশ্য লইয়া প্রাথমিকভাবে এক বৰ্দ্ধমান আত্মত্যাগের জন্য যে শুধু প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু তখন গভীরতম বাস্তব আত্মত্যাগের সঙ্গে পরমপুরুষের ইচ্ছার নিকট তাহার কৰ্ম্ম পরিপূর্ণরূপে সমর্পণের সময় আসিয়াছে। তখন ক্রমশঃ প্রদীপ্ত এক আধ্যাত্মিক মন তাহার অপূর্ণ মানুষী মনোবুদ্ধির স্থান অধিকার করিবে, যাহা পরিশেষে অতিমানস সত্যজ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে ; বিভ্রান্ত ও অপূর্ণ ত্রিগুণের সহিত যুক্ত অজ্ঞানময় প্রকৃতি হইতে সাধক তখন আর ক্রিয়া করিবে না, ক্রিয়া করিবে আধ্যাত্মিক শান্তি আলোক শক্তি ও আনন্দের এক দিব্যতর প্রকৃতি হইতে। অজ্ঞান মন ও সংকল্পের সহিত তদপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞান আবেগময় হৃদয়ের তাড়না, প্রাণসত্তার কামনা বাসনা ও দেহের সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেরণা মিশিয়া যে মিশ্রবস্তু প্রস্তুত হয় তাহার নির্দ্দেশে আর সাধক ক্রিয়া করিবে না ; তাহার ক্রিয়া চলিবে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন এক সত্তা ও প্রকৃতির প্রণোদনায় এবং অবশেষে অতিমানস সত্যচেতনা ও তাহার পরাপ্রকৃতির দিব্যশক্তির পরিচালনায়।

এইভাবে প্রগতির শেষ ধাপগুলি সম্ভবপর হইয়া উঠে, তখন প্রকৃতির আবরণ সরিয়া যায় এবং সাধক সৰ্ব্বভূত-মহেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার কৰ্ম্মাবলি মিশিয়া যায় সেই পরাশক্তির ক্রিয়ার মধ্যে যাহা চিরশুদ্ধ সত্য পূর্ণ ও আনন্দময়। এই প্রকারে সে তাহার কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল অতিমানসী শক্তির কাছে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে এবং শাশ্বত মহাকৰ্ম্মীর সচেতন যন্ত্ররূপে শুধু ক্রিয়া করিতে পারে। সে আর কর্ম্মের অনুমন্তা থাকে না, বরং সে তাহার কর্ম্মের যন্ত্ররাজির মধ্যে দিব্য আদেশ গ্রহণ করে এবং দিব্যশক্তির আদেশপত্র হস্তে লইয়া তাহার অনুগামী হইয়া চলে। সে আর কৰ্ম্ম করে না, প্রকৃতির অতন্দ্র শক্তিই তাহার মধ্য দিয়া সকল কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতেছে ইহাই সে স্বীকার করিয়া লয়। তাহার নিজের মনের অভিপ্রায়-সিদ্ধি এবং নিজের আবেগময় বাসনার পরিতৃপ্তি সে আর চাহে না ; সে সব্বশক্তিমান এক দিব্য সংকল্পের আদেশপালন করে, সে সংকল্পের অংশভাগী হয়, যে সংকল্প এক সৰ্ব্বজ্ঞ দিব্য-জ্ঞান, এক রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক অগাধ ভাগবত প্রেম এবং সৎস্বরূপের শাশ্বত বিশাল ও অতল দিব্য আনন্দ-সমুদ্রের সঙ্গে এক ও অভিন্ন।

দশম অধ্যায়

প্রকৃতির গুণত্রয়

অন্তরাত্মাকে যদি তাহার সত্তায় ও তাহার কর্ম্মে স্বাধীন হইতে হয় তবে তাহাকে নিম্নতর প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্ম্মধারাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। সুসমঞ্জসভাবে এই বাস্তব বিশ্বপ্রকৃতিব বশ্যতা স্বীকার করিলে মানুষের দেহমন প্রাণরূপী স্বাভাবিক যন্ত্রাবলির সুষ্ঠু ও নিখুঁত ক্রিয়াশীলতা লাভ করা যায় কিন্তু তাহা অন্তরাত্মার আদর্শ নহে, বরং তাহাকে ভগবান ও তাঁহার শক্তির অধীন হইতে হইবে কিন্তু সে নিজে হইবে তাহাব প্রকৃতির প্রভু। পরমপুরুষের ইচ্ছার প্রতিভূ বা প্রণালী হইয়া সে নিজের অন্তর্দৃষ্টি অনুমোদন বা অস্বীকৃতি দ্বারা স্থির করিবে কিভাবে ব্যবহাব করিতে হইবে সেই শক্তি ভাণ্ডারকে, পরিবেশের অবস্থাকে ও সম্মিলিত গতির ছন্দকে যাহাদিগকে তাহার যন্ত্রাবলির, মন প্রাণ দেহের, ক্রিয়াসাধনের জন্য প্রকৃতি যোগাড় করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এই অধস্তন প্রকৃতিকে বশে আনয়ন করা যায় শুধু তাহার উর্দ্ধে উঠিয়া তথা হইতে তাহাকে ব্যবহার করিতে পারিলে। আর ইহা কেবল সম্ভব হইতে পারে তাহার শক্তি গুণ ও ক্রিয়াধারাবলিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হইলে; নহিলে আমরা তাহার অবস্থাসকলের দাসই থাকিয়া যাই এবং অসহায়ভাবে তাহার দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হই—আত্মাতে স্বতন্ত্র হইতে পারি না।

প্রকৃতির মূল গুণত্রয়ের ধারণা ভারতীয় প্রাচীন মনীষিগণেরই সৃষ্টি; তবে ইহার সত্য অবিলম্বে প্রতীয়মান হয় না এইজন্য যে সে সত্যের ধারণা বহুকালব্যাপী মানসপরীক্ষা ও গভীর আন্তর অভিজ্ঞতার ফলেই লব্ধ হইয়াছে। তাই দীর্ঘ মানস অভিজ্ঞতা, অন্তরঙ্গভাবে আত্মনিরীক্ষণ এবং প্রাকৃতিক শক্তি-রাজির বোধিভাবিত অনুভূতি ভিন্ন ইহাকে নির্ভুলভাবে ধরা বা দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা কঠিন। তথাপি কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে যাহা কর্ম্মমার্গের সাধককে তাহার নিজ প্রকৃতির সম্মিলিত ধারাগুলিকে বুঝিতে, বিশ্লেষণ করিতে এবং স্বীকৃতি বা বর্জন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করিবে। ভারতীয় গ্রন্থে এই ধারাগুলিকে 'গুণ' বলা হইয়াছে, তাহাদের

নাম দেওয়া হইয়াছে সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্ব হইল সাম্যের শক্তি, মঙ্গল ও সুসঙ্গতি, সুখ ও আলোক এই গুণগুলির মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ হয়; রজ হইল গতিবৃত্তির শক্তি, সংঘর্ষ ও প্রচেষ্টা, আবেগ ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া হয় তাহার প্রকাশ; তম নিশ্চেতনা ও জড়তার শক্তি তাহার প্রকাশে যে গুণাবলি দেখা দেয় তাহারা হইল অন্ধকার, অসামর্থ্য ও নিষ্ক্রিয়তা। এই গুণত্রয়বিভাগ সাধারণতঃ মনস্তাত্ত্বিক আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কিন্তু জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। নিম্নপ্রকৃতিতে প্রতি বস্তু প্রতি সত্তার মধ্যে এ ত্রিগুণ রহিয়াছে আর প্রকৃতির ক্রিয়াধারা ও সক্রিয় রূপ এই সমস্ত গুণপরতন্ত্র শক্তি-রাজির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।

সজীব বা নির্জীব, বস্তুর প্রত্যেকটি রূপ হইল গতিশীল প্রাকৃতিক শক্তি-রাজির এক সর্ব্বদা-রক্ষিত সাম্য, আর তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত অন্যান্য শক্তি ব্যূহের অনুকূল প্রতিকূল বা বিধ্বংসী সংস্পর্শ বা অভিঘাত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে। আমাদের নিজের মন প্রাণ ও দেহের প্রকৃতি এইরূপ এক গঠনক্ষম শক্তিব্যূহ ও সাম্য ছাড়া আর কিছু নহে। পরি-বেশ হইতে আগত সংঘাত ও সংস্পর্শ ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার গ্রহণ বিষয়ে গুণত্রয়ই গ্রহীতার প্রকৃতি এবং প্রতিস্পন্দনের স্বভাব নির্ণয় করিয়া দেয়। অসাড় ও অপটু হইয়া, আপতিত সংস্পর্শরাজির প্রতিস্পন্দনরূপে কোন সাড়া না দিয়া, আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়া, পরিপাক ও নিজের অঙ্গীভূত অথবা উপযোগী করিয়া লইতে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগকে সে ঘাড় পাতিয়া লইতে পারে, ইহাই হইল তমোগুণ, জড়তার রীতি। তামসিকতার লক্ষণচিহ্ন ও কলঙ্ককালিমা হইল দৃষ্টিশূন্যতা ও জ্ঞানহীনতা, অক্ষমতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা, জড়তা ও অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা ও যান্ত্রিক গতানুগতিকতা; আর মনের অসাড়তা, প্রাণের নিদ্রা ও আত্মার সুষুপ্তি। যদি অপর কোন উপাদানের সাহায্যে ইহাকে শোধন করা না যায়, তাহা হইলে নূতন কোন রূপ সৃষ্টি অথবা নূতন কোন সাম্য বা প্রগতির কোন শক্তিকে প্রবর্ত্তিত না করিয়া বর্ত্তমান রূপ বা প্রাকৃতিক সাম্যকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ছাড়া ইহার পরিণাম আর কিছু হইতে পারে না। এই অসাড় শক্তিহীনতার কেন্দ্রস্থানে আছে অজ্ঞানের তত্ত্ব; আর রহিয়াছে প্রণোদনাদায়ী বা আক্রমণকারী সংস্পর্শ, পারিপার্শ্বিক শক্তিরাজির ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা এবং নূতন অনুভূতির দিকে তাহাদের প্ররোচনাকে বুঝিবার, ধরিবার বা কাজে লাগাইবার অসামর্থ্য এবং অলস অনিচ্ছা।

পক্ষান্তরে প্রকৃতির সংস্পর্শে গ্রহীতা, প্রকৃতির শক্তিরাজির দ্বারা স্পৃষ্ট অনুপ্রাণিত অনুরুদ্ধ বা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের চাপে সাড়া দিতে অথবা

তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। প্রকৃতিই তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে, বাধা দিতে চেষ্টা করিতে, তাহার পরিবেশকে শাসন বা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে, তাহার নিজ সংকল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে, সংগ্রাম জয় ও নবসৃষ্টি করিতে অনুমতি ও উৎসাহ দেয় এবং উত্তেজিত করে। ইহাই রজোগুণের আবেগ ক্রিয়া ও কামনা বা তৃষ্ণার অবস্থা। সংঘর্ষ রূপান্তর ও নবসৃষ্টি, জয় ও পরাজয়, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য ইহারা সকলেই তাহার সন্তান; ইহারাই জীবনের সেই নানাবর্ণে রঞ্জিত গৃহনির্ম্মাণ করে যাহার মধ্যে সে অনন্দে বাস করে। কিন্তু ইহার জ্ঞান অপূর্ণ বা অনৃত এবং সে জ্ঞান তাহার অতিঅজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রয়াস, ভ্রম, নিরন্তর অসঙ্গতি আসক্তি ও ব্যর্থ কামনার ব্যথা, ক্ষতি ও অকৃতকার্য্যতার মনোবেদনা লইয়া আসে। রজোগুণের দান হইল সক্রিয় শক্তি ও বীর্য্য, ক্রিয়াশীলতা, সৃষ্টিক্রিয়া ও জয়ের সামর্থ্য; কিন্তু ইহা অবিদ্যার অর্দ্ধ আলোক বা ভ্রান্ত আলোকের মধ্যে বিচরণ করে এবং অসুর, রাক্ষস ও পিশাচের সংস্পর্শে উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। মানবমনের উদ্ধত অজ্ঞান এবং তাহার আত্মতৃপ্ত বিকৃতি ও ধৃষ্ট ভ্রান্তি, গর্ব্ব দম্ভ ও উচ্চাভিলাষ, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার, পাশব ক্রোধ ও হিংসা, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতা, কপটতা বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘৃণ্য নীচতা, কাম লোভ ও লুণ্ঠনপ্রবণতা, পরশ্রীকাতরতা ঈর্ষা ও অমিত কৃতঘ্নতা—এই যাহারা পার্থিব প্রকৃতিকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের সকলই প্রকৃতির এই অপরিহার্য্য কিন্তু সবল ও বিপজ্জনক ধারার স্বভাবজাত সন্ততি।

কিন্তু দেহধারী সত্তা প্রকৃতির এই দুই গুণের মধ্যেই নিরুদ্ধ নয়; ইহাদের অপেক্ষা উত্তম ও আলোকিত এক পন্থা আছে যাহাতে চলিলে আমরা পরিবেশ হইতে আগত সংঘাত ও বিশ্বশক্তিরাজির স্রোত যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে পারি। একটা সুস্পষ্ট ধারণা সমতা ও সাম্য লইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করা ও সাড়া দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাহার যথার্থবোধ ও সহানুভূতি থাকিবার ফলে প্রাকৃতিক সত্তার এই পন্থার এমন শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির প্রেরণা ও তাহার নানাধারার প্রচ্ছন্ন অর্থ বুঝিতে, তাহাদিগকে পরিচালিত ও পরিণত করিয়া তুলিতে পারে; ইহার মধ্যে এমন এক বুদ্ধি আছে যাহা প্রকৃতির ক্রিয়া-ধারাবলি ও তাহাদের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাদিগকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে এবং কাজে লাগাইতে পারে; ইহার এমন একটা স্বচ্ছ প্রতিক্রিয়াশক্তি আছে যাহা কখন অভিভূত হইয়া পড়ে না, কিন্তু সব কিছুকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে, সংশোধিত করিয়া লয়, সামঞ্জস্যে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহাকে নিষ্কাশিত করে। ইহাই

হইল সত্ত্বগুণ, প্রকৃতির সেই দিক যাহা আলোক ও সাম্যে পরিপূর্ণ, যাহার লক্ষ্য হইল মঙ্গল জ্ঞান আনন্দ ও সৌন্দর্য্য, সুখ যথাযথবোধ যথার্থ সমতা ও খাঁটি শৃঙ্খলা ; ইহার স্বভাব জ্ঞানের সুস্পষ্ট জ্যোতির সমৃদ্ধিতে এবং উজ্জ্বল ও গভীর সহানুভূতি ও নৈকট্যবোধে বিভূষিত। সাত্ত্বিক প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান বা মহৎকৃত্য হইল মার্জিত রুচি ও দীপ্তবুদ্ধি, সুনিয়ন্ত্রিত শক্তি, সমগ্র সত্তার সিদ্ধ সুসম্পন্ন সঙ্গতি ও সমতা।

কোন ব্যক্তি-জীবনই বিশ্বশক্তির এই ত্রিগুণের একটিমাত্র গুণের ছাঁচে পূর্ণরূপে ঢালাই করা হয় নাই ; সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে তিনটিই বর্ত্তমান আছে। এই গুণত্রয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ; নিয়তই ইহাদের একটি অপর দুইটির সঙ্গে মিলিত হইতেছে আবার পৃথক হইয়া পড়িতেছে, একের প্রভাব অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, প্রায়ই সংঘর্ষ শক্তিরাজির মল্লযুদ্ধ চলিতেছে, পরস্পরকে আয়ত্তে আনিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর পরিমাণে সাত্ত্বিক ভাব বা অবস্থা রহিয়াছে যদিও কোথাও তাহা এত ক্ষীণ যে তাহার অস্তিত্বের অনুভূতিই যেন হয় না ; সকলের মধ্যেই আছে আলোক স্বচ্ছতা ও সুখের কিছুনা-কিছু স্বচ্ছ প্রদেশ অথবা তাহাদের দিকে একটা অবিকশিত প্রবণতা ; আছে পরিবেশের সহিত সূক্ষ্ম সুন্দর কিছু মিলমিশ ও সহানুভূতি, আছে কিছু বুদ্ধি, সাম্য, যথাযথ মনন ও সংকল্প, যথাযথ অনুভূতি ও প্রেরণা, সদ্‌গুণ ও সুশৃঙ্খলা। সকলের মধ্যেই আছে রাজসিক ভাব ও তাহার প্রণোদনা, আছে বাসনা আবেগ ও উত্তেজনার পঙ্কিল ও মলিন অংশাবলি, আছে সংঘর্ষ ও বিকৃতি, মিথ্যা ও ভ্রান্তি, বৈষম্যযুক্ত সুখ ও দুঃখ তেমনি আবার আছে কর্ম্মের দিকে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ ও উদ্যম, সৃজন-ক্রিয়ার দিকে প্রবল ঝোক এবং আবেষ্টনের চাপে ও জীবনের উপর আপতিত অনুকূল ও প্রতিকূল সংঘাতে সবল বা নির্ভীক উদ্দীপ্ত অথবা ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া। আবার সকলেরই আছে তামসিক অবস্থাসমূহ, জীবনের চির অন্ধকার অংশগুলি, নিশ্চেতনার মুহূর্ত্তরাজি অথবা বিন্দুগুলি, অক্ষম সমর্পণ বা নির্জীবভাবে স্বীকারের বশে জাত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উৎসাহশূন্য দীর্ঘকালে অভ্যস্ত বা সাময়িকভাবে উপস্থিত ক্ষীণ ইচ্ছাবলি, আছে নিজস্ব স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা অথবা অবসাদ অনবধানতা ও আলস্যের বৃত্তি অজ্ঞান ও অসামর্থ্যের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পতন, উৎসাহহীনতা, ভয়, পরিবেশ মানুষ ঘটনা বা শক্তির সংঘাতের নিকট হইতে ভীরুজনসুলভ পশ্চাদাবর্ত্তন অথবা তাহাদের অধীনতা স্বীকার। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রকৃতিগত সামর্থ্যের কোন না কোন দিকে, মন বা স্বভাবের কোন না কোন অংশে সাত্ত্বিক, অন্য কোন দিকে বা অংশে রাজসিক

আবার তদ্ভিন্ন কোন দিকে বা ভাগে তামসিক। তাহার সাধারণ স্বভাব, মনের বিশিষ্ট ধরণ এবং কর্ম্মের রীতি অনুসারে মানুষের মধ্যে প্রায়শই এক বা অন্য যে গুণের প্রভাব বেশী দেখা যায় তদনুসারে তাহাকে সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক বলা হয়; কিন্তু অতি অল্পলোকই পাওয়া যাহাকে এ তিনের মধ্যে সর্ব্বদা এক প্রকারের বলা যাইতে পারে আর পূর্ণরূপে একইগুণে নিবদ্ধ লোক একজনও পাওয়া যায় না। জ্ঞানী সর্ব্বদা বা সর্ব্বথা জ্ঞানী নহেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিতেও জোড়াতালি দেওয়া থাকে; সাধুপুরুষ আপন অন্তরে অনেক অসাধুবৃত্তি দমিত বা লুক্কায়িত অবস্থায় রক্ষা করেন; অসাধু যে পুরাপুরিই অসদভাব পোষণ করে তাহাও নহে; মূর্খতম ব্যক্তিরও অনেক অপ্রকাশিত বা অব্যবহৃত ও অপরিণত সামর্থ্য থাকে; অতিভীরুর মধ্যেও বীরত্বের মুহূর্ত্ত বা শৌর্য্যের ধারা দৃষ্ট হয়, অতি বড় অসহায় ও দুর্ব্বলের প্রকৃতির মধ্যে বলের একটা প্রচ্ছন্ন অংশ থাকে। যে গুণ তাহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার দ্বারা দেহী জীবের আত্মস্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় না, তাহার আত্মা-পুরুষ এই জীবনে অথবা তাহার বর্ত্তমান সত্তাতে এবং তাহার পরিণতির এই মুহূর্ত্তের জন্য যে রূপায়ণ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার নিদর্শনমাত্র তাহার দ্বারা পাওয়া যায়।

সাধক যখন একবার তাহার মধ্যে বা তাহার উপরে ক্রিয়মাণ প্রকৃতির পশ্চাতে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় এবং কোনরূপ হস্তক্ষেপ সংশোধন দমন বা নিবারণ কোন প্রকার বাদ বিচার বা মীমাংসা না করিয়া প্রকৃতির খেলা যদি চলিতে দেয় এবং সেই ক্রিয়াপদ্ধতিকে যদি বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করে তাহা হইলে শীঘ্রই সে আবিষ্কার করে যে প্রকৃতির গুণাবলি আত্মনির্ভরশীল এবং একটি যন্ত্রকে একবার চালাইয়া দিলে যেমন তাহা আপন গঠন ও প্রচালকশক্তির বলে চলিতে থাকে তেমনি ভাবেই ক্রিয়া করে। শক্তি ও চালনা প্রকৃতি হইতেই আসে ব্যষ্টি ব্যক্তির নিকট হইতে নয়। তখন সে উপলব্ধি করে যে তাহার মনই তাহার কর্ম্মের কর্ত্তা এই যে ধারণা সে পোষণ করে তাহা কত ভ্রমাত্মক; তাহার মন তাহার সমগ্র সত্তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাহা প্রকৃতির এক সৃষ্টি, এক যন্ত্র। সে তখন দেখিতে পায় যে এই প্রকৃতি সর্ব্বক্ষণ নিজের ধারাতে তিনটি সাধারণ গুণকে পরিচালিত করিতেছে, যেমন একটি ক্ষুদ্র বালিকা তাহার পুতুল

লইয়া খেলা করে। তাহার অহমিকা সমস্ত সময়ই একটা যন্ত্র একটা খেলনা মাত্র ; তাহার স্বভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার নৈতিক গুণাবলি ও মানসিক শক্তিচয়, তাহার সৃষ্টি কর্ম্ম ও কীর্ত্তিকলাপ, তাহার ক্রোধ ও তিতিক্ষা, তাহার নিষ্ঠুরতা ও দয়া, তাহার রাগ ও দ্বেষ, তাহার পাপ ও পুণ্য, তাহার আলোক ও অন্ধকার, তাহার সুখের পুলক ও দুঃখের ব্যথা—এ সমস্তই প্রকৃতির খেলা, আর তাহার অন্তরাত্মা আকৃষ্ট পরাজিত ও বশীভূত হইয়া তাহাতে নিজের নিষ্ক্রিয় সম্মতি দিয়াছে। তথাপি প্রকৃতির বা তাহার শক্তির নির্দ্ধারণই সব কিছু নয়, তাহার আত্মারও এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে—এ আত্মা তাহার নিজের গোপন অন্তরাত্মা বা অন্তর পুরুষ, মন বা অহমিকা নয়, কেননা তাহারা স্বতন্ত্র সত্তা নহে, তাহারা প্রকৃতিরই অংশ। কারণ এই খেলায় আত্মাপুরুষের অনুমোদন প্রয়োজনীয়, এই আত্মা প্রভু ও অনুমন্তা রূপে অন্তরের নীরব সংকল্পের দ্বারা খেলার তত্ত্ব ও বিধান নির্ণয় করিতে, তাহার যোগাযোগের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, যদিও ভাবনা সংকল্প ক্রিয়া ও কর্ম্মপ্রেরণার মধ্য দিয়া কর্ম্মসম্পাদন প্রকৃতির করণীয়, তাহারই অধিকার ভুক্ত। পুরুষ প্রকৃতিকে কোন সঙ্গতি গড়িয়া তুলিতে আদেশ দিতে পারে, কিন্তু সে তাহার ক্রিয়াধারায় হস্তক্ষেপ করিয়া তাহা করে না, করে প্রকৃতির উপর এক সচেতন ইক্ষণ দ্বারা, প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ অথবা অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া সে ইক্ষণকে যথাযথ ধারণা, সক্রিয় প্রেরণা এবং সার্থক মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া তোলে।

যদি আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতিকে দিব্য চেতনার সামর্থ্য ও রূপে, তাহার শক্তিরাজির যন্ত্রে রূপান্তরিত করিতে চাই তাহা হইলে স্পষ্টতই অধস্তন গুণদ্বয়ের ক্রিয়া হইতে সরিয়া দাঁড়ান আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। তমোগুণ আমাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং দিব্য জ্ঞানের আলোককে আমাদের প্রকৃতির তমসাবৃত নির্জীব কোণগুলিতে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। দিব্য প্রেরণাতে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য, রূপান্তর সাধনের ক্ষমতা, অগ্রগমনের সংকল্প, মহত্তর শক্তির নিকট আপনাকে নমনীয় করিবার ইচ্ছা—এসমস্তকে তমোগুণ বিনষ্ট করে, তাহাদের শক্তি হরণ করে। রজোগুণ জ্ঞানকে বিকৃত করে, আমাদের যুক্তিবুদ্ধিকে অসত্যের প্রশ্রয়দাতা এবং অযথা গতিবৃত্তির সহায় করিয়া দেয়, আমাদের প্রাণশক্তি ও প্রেরণাবলির মধ্যে বিক্ষোভ আনয়ন করে, তাহাদিগকে সরল পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়, শরীরের স্বাস্থ্য ও সমতা বিপর্য্যস্ত করে। এই গুণ ঊর্দ্ধ হইতে জাত ধারণাবলি ও উচ্চে অবস্থিত গতিবৃত্তিরাজিকে অধিকার করিয়া তাহাদিগকে মিথ্যা ও অহমিকার সেবায় নিয়োজিত করে ; এমন কি দিব্য সত্য ও দিব্য প্রভাব যখন এই পার্থিব

ভূমিতে নামিয়া আসে তখন তাহারাও রজোগুণের দ্বারা অধিকৃত ও এইভাবে অযথাভাবে ব্যবহৃত হওয়ার হাত এড়াইতে পারে না। তমোগুণ অনালোকিত এবং রজোগুণ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গেলে দিব্য রূপান্তর বা দিব্য জীবন লাভ অসম্ভব।

মনে হইতে পারে যে অপর দুইটিকে বাদ দিয়া শুধু সত্বগুণকে আশ্রয় করিলে মুক্তির উপায় পাওয়া যাইতে পারে : কিন্তু মুশকিল এই যে কোন একটি গুণ তাহার অন্য দুই সঙ্গী ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়া একাকী দাঁড়াইতে পারে না। কামনা বাসনা ও আবেগের গুণকে সকল বিক্ষোভ পাপ দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ বলিয়া দেখিতে পাইয়া যদি তাহাকে দমিত ও বশীভূত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করি, তাহা হইলে রজোগুণ হ্রাস পায় বটে কিন্তু তমোগুণ মাথা খাড়া করিয়া উঠে। কেননা সক্রিয়তার তত্ত্ব যদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তামসিকতা তৎস্থান অধিকার করিয়া বসে। আলোকের তত্ত্ব এক স্থির শান্তি সুখ প্রেম যথাযথ মনোবৃত্তি আনিয়া দিতে পারে বটে কিন্তু রজোগুণ যদি না থাকে অথবা তাহাকে যদি পূর্ণ-রূপে দমিত করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে অন্তরাত্মার নিস্তব্ধতা নিষ্ক্রিয়তার স্থৈর্য্য হইয়া দাঁড়ায়, সক্রিয় রূপান্তরের দৃঢ় ভিত্তি হয় না। এ অবস্থায় আমাদের স্বভাব অফলপ্রসূ থাকিয়াই সৎ সৌম্য ও প্রশান্ত, যথাযথ চিন্তাশীল যথাযথ কর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারে। সক্রিয় অংশে আমাদের প্রকৃতি তখন হইয়া দাঁড়াইতে পারে সত্ত্ব-তামসিক, উদাসীন মলিন নির্বীর্য্য অথবা সৃষ্টিশক্তিহীন। তখন মানসিক ও নৈতিক অন্ধকার না থাকিতে পারে কিন্তু তেমনি কর্ম্মের উদ্দীপনা হ্রাস পাইতে পারে, কর্ম্মের পথে ইহা এক প্রতিরোধকারী সীমাবদ্ধতা, অন্য এক প্রকার অক্ষমতা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কেননা তমস্ একটা দ্বয়ীতত্ত্ব ; ইহা যেমন জড়তা দ্বারা রজোগুণের বিরোধিতা তেমনি সংকীর্ণতা অজ্ঞান ও অন্ধকার দ্বারা সত্ত্বগুণের প্রতিকূলতা করে এবং সত্তার মধ্যে সত্ত্ব ও রজের কোনটি যদি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে তবে তাহার স্থান অধিকার করিবার জন্য নিজেকে তথায় প্রবাহিত করিয়া দেয়।

আবার এই ভুল সংশোধন করিবার জন্য যদি আমরা রজোগুণকে ডাকিয়া আনি, তাহাকে সত্ত্বগুণের সহিত মিত্রতা স্থাপনের আদেশ প্রদান করি এবং তাহাদের মিলিত শক্তি দ্বারা অন্ধকারের তত্ত্ব অপসারণ করিতে প্রয়াস পাই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের কর্ম্মকে উর্দ্ধে তুলিয়াছি বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখি যে আমরা রাজসিক অধীরতা, আবেগ উত্তেজনা, নৈরাশ্য দুঃখ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি। এই সমস্ত গতিবৃত্তি

তাহাদের আপন লক্ষ্যে প্রকৃতিতে ও কর্ম্মে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইতে পারে কিন্তু যে শান্তি স্বাধীনতা শক্তি ও আত্মকর্ত্তৃত্বে আমরা পৌঁছিতে চাই ইহারা সে বস্তু নয়। যেখানে কামনা ও অহমিকা আশ্রয় লইয়াছে সেখানেই তাহাদের সঙ্গে আবেগ উত্তেজনা ও বিক্ষোভও আশ্রয় পাইয়াছে এবং তাহাদের জীবনের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আবার আমরা সত্ত্বগুণকে মুখ্যস্থান অপর দুইগুণকে গৌণ স্থান দিয়া তিন গুণের মধ্যে যদি একটা আপোষরফা করি তবে তাহাতে আমরা প্রকৃতির খেলার অধিকতর সংযত এক ক্রিয়াতে শুধু পৌঁছিব। তখন এক নূতন সাম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইব কিন্তু আত্মার স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্বের দেখা পাইব না অথবা তখনও সুদূরে এক আশা রূপে তাহাদের দর্শন মিলিবে।

মূলতঃ বিভিন্ন এক প্রকার গতিধারাকে গুণত্রয়ের হাত হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া তাহাদের উপরে টানিয়া তুলিতে হইবে। যে ভ্রান্তি প্রাকৃতিক ত্রিগুণের খেলা স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাকে দূর করিয়া দিতেই হইবে; কেননা, যতদিন তাহা মানিয়া লইতেছি ততদিন অন্তরাত্মা তাহাদের ক্রিয়াধারার মধ্যে বিজড়িত, তাহাদের বিধিবিধানের বশীভূত থাকিবে। যেমন রজ ও তম তেমনি সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, লৌহ-নিগড় ও দাসত্বের নিদর্শনস্বরূপ মিশ্র ধাতুর অলঙ্কারের সহিত স্বর্ণ শৃঙ্খলকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে গীতা আত্মনিয়মনের এক অভিনব পন্থার ব্যবস্থা করিয়াছে। গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতে নিজের মধ্যে প্রত্যাহৃত হইয়া প্রাকৃতিক শক্তির তরঙ্গরাজির উর্দ্ধে বসিয়া সাক্ষীরূপে এই অস্থির প্রবাহকে পর্য্যবেক্ষণ করাই হইল সে পন্থা; সে নিজে এমন একজন যে নিরীক্ষণ করিতেছে বটে কিন্তু নিরপেক্ষ ও উদাসীন ভাবে, সেই উর্ম্মিমালার নিজস্ব ভূমি হইতে উর্দ্ধে স্থিত তাহার আপন স্বাভাবিক আসনে উপবিষ্ট হইয়া। যেমন ভাবে তরঙ্গরাজি উঠিতেছে ও নামিতেছে সে সাক্ষী তাহা দেখে ও পর্য্যবেক্ষণ করে কিন্তু সে নিজে তাহাদিগকে গ্রহণ করে না কিম্বা তখনকার মত তাহাদের গতিধারায় কোন বাধাও দেয় না। প্রথমে চাই নৈর্ব্ব্যক্তিক স্বাক্ষীর স্বাধীনতা, তাহার পর প্রভুর, ঈশ্বরের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ আসিতে পারে।

অনাসক্তির এই প্রণালীর প্রথম সুবিধা এই যে সাধক ইহার দ্বারা নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতিকে বুঝিতে আরম্ভ করে। নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে তাহার দৃষ্টি অহমিকার দ্বারা একটুও ব্যাহত হয় না বলিয়া সে অজ্ঞানের গুণরাজির

খেলা পূর্ণরূপে দেখিতে এবং তাহার সকল শাখাপ্রশাখা সকল আবরণ ও সকল চাতুর্য্যের মধ্যে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে পারে—কেননা, সে খেলা নানাপ্রকার লুকোচুরি ও বঞ্চনা, ছদ্মবেশ ও ফাঁদ, বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনাতে ভরা। এ সময় সাধক দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা পাইয়া, সকল কর্ম্ম ও সকল অবস্থাকে গুণত্রয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলিয়া জানিয়া, তাহাদের সকল প্রণালী বা পদ্ধতি বুঝিতে পারিয়া, তাহাদের আক্রমণে আর অভিভূত হইয়া পড়িবে না, তাহাদের ফাঁদে অতর্কিতে আবদ্ধ অথবা তাহাদের ছদ্মবেশ দ্বারা আর প্রতারিত হইবে না। সেই সঙ্গে সে বুঝিতে পারিবে যে তাহার অহমিকা গুণত্রয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক কৌশল এবং তাহাদিগকে বজায় রাখিবার এক গ্রন্থি ছাড়া আর কিছু নয়; আর ইহা বুঝিতে পারিয়া সে অহংগত অধস্তন প্রকৃতির ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইবে। সে তখন সাধুসন্ত ভাবুক মনীষী ও পরহিতব্রতীর সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মুক্ত হইবে; স্বার্থসন্ধানী রাজসিক অহংকারের শাসন হইতে তাহার প্রাণময় আবেগ ও প্রেরণারাজিকে ছাড়াইয়া লইবে, সে আর স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত উগ্রকর্ম্মী অথবা কামনা বাসনার প্রশ্রয়প্রাপ্ত বন্দী অথবা তাহাদের ডিঙার উপর গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া দাঁড়টানায় রত কৃতদাস থাকিবে না; বুদ্ধিহীন জড়ভাবাপন্ন মানবজীবনের সাধারণ চক্রাবর্ত্তনে আসক্ত অবিদ্যাচ্ছন্ন অথবা নিষ্ক্রিয় সত্তার তামসিক অহংকারকে সে তখন জ্ঞানের আলোকে বিনষ্ট করিবে। আমাদের ব্যক্তিগত সকল ক্রিয়াতে অহং-বোধই যে মূল পাপ ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া সে আর রাজসিক বা সাত্ত্বিক অহংকারের মধ্যে আত্মসংশোধন ও আত্মমুক্তির উপায় খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইবে না, বরং সেজন্য প্রকৃতির যন্ত্রাবলি ও ক্রিয়ারাজিকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে শুধু কর্ম্মের অধীশ্বর ও তাঁহার পরাশক্তি ও পরমাপ্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইবে। যেখানে সকল সত্তা শুদ্ধ ও মুক্ত, কেবলমাত্র তথায় দিব্য সত্যের রাজত্ব সম্ভবপর।

এই প্রগতির প্রথম ধাপ হইল কতকটা অনাসক্ত হইয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের উপরে উঠা। অন্তরাত্মা তখন অন্তরে নিম্নতর প্রকৃতি হইতে পৃথক ও বিমুক্ত হইয়া পড়ে, তাহার বন্ধনপাশে বিজড়িত থাকে না, উদাসীনভাবে ঊর্দ্ধে আনন্দে সমাসীন হয়। প্রকৃতি তাহার পুরাতন অভ্যাসমত ত্রিগুণের চক্রাবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কাজ করিয়া চলে—কামনা বাসনা হর্ষ বিষাদ হৃদয়কে আক্রমণ করে, কর্ম্মের যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, আবার হৃদয়ে দেহে ও মনে আলোক ও শান্তি ফিরিয়া আসে; কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তন আর আত্মাকে স্পর্শ বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। অন্তরাত্মা অধস্তন

অঙ্গাবলির দুঃখতাপ ও কামনাবাসনাকে পর্য্যবেক্ষণ করে কিন্তু তাহাদের দ্বারা বিচলিত হয় না, তাহাদের হর্ষ ও প্রবল প্রচেষ্টায় শুধু হাস্য করে, জীবনের ব্যর্থতা ও অন্ধকার, হৃদয় ও স্নায়ুর উদ্দামতা ও দুর্ব্বলতা নিরীক্ষণ করে কিন্তু তাহাদের দ্বারা অভিভূত হয় না, আলোক ও সুখের পুনরাগমনের ফলে মনের উদ্ভাসনে ও স্বস্তিতে, আরামে ও শক্তির অনুভূতিতে আকৃষ্ট ও আসক্ত হয় না, এই সমস্তের কোন কিছুর মধ্যে সে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে না বরং ধীর স্থির হইয়া অবিচলিতভাবে অপেক্ষা করে উচ্চতর সংকল্পের নির্দ্দেশের এবং সম্বোধির বৃহত্তর ও জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানের আবির্ভাবের জন্য। সর্ব্বদা এইভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে অবশেষে সে তাহার সক্রিয় অঙ্গসকলেও প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিবোধ ও তাহাদের অপূর্ণ মূল্য ও সীমার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কেননা, তখন অধস্তন প্রকৃতি বর্দ্ধমানভাবে উচ্চতর শক্তির নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ অনুভব করিতে থাকে। প্রকৃতি পুরাতন যে অভ্যাস-গুলিতে সংসক্ত ছিল তাহারা আর অন্তরাত্মার অনুমোদন লাভ করে না এবং ধীরে ধীরে তাহাদের পুনরাবৃত্তি কমিতে থাকে পুনরাবর্ত্তনের শক্তি নষ্ট হয়। অবশেষে সে বুঝিতে পারে যে এক উচ্চতর ক্রিয়া করিবার, এক মহত্তর অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য আহ্বান তাহার কাছে আসিয়াছে ; আর যত ধীরে বা অনিচ্ছা-সত্ত্বে হউক, যতটা প্রাথমিক বা দীর্ঘকালস্থায়ী দুষ্প্রবৃত্তি ও পতনশীল অজ্ঞান লইয়া সে চলিতে আরম্ভ করুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে, ফিরিয়া দাঁড়াইতে এবং রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

তখন অন্তরাত্মা আর শুধু দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা নহে, তাহার নিশ্চল স্বাধীনতা প্রকৃতির সক্রিয় ও শক্তিশালী রূপান্তর দ্বারা রাজমুকুটে বিভূষিত হইয়াছে। আমাদের দেহ মন ও প্রাণ এই তিন যন্ত্রের উপর পরস্পর ক্রিয়াশীল তিনগুণের অবিরাম মিশ্রণ ও অসমক্রিয়াধারা স্বাভাবিকভাবে যে বিক্ষুব্ধ, বিশৃঙ্খল, অযথা ক্রিয়া ও গতিবিধি সৃষ্টি করিত তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। অন্য এক ক্রিয়াধারা সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে আরম্ভ বর্দ্ধিত ও পূর্ণ হইতেছে, যে ক্রিয়াধারা সত্যই আরও যথার্থ, আরও উজ্জ্বল, পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক দিব্য খেলার পক্ষে সাধারণ ও স্বাভাবিক, যদিও আমাদের বর্ত্তমান অপূর্ণ প্রকৃতির পক্ষে তাহা অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণ। তখন আমাদের পার্থিব মনকে যাহা সীমা-বদ্ধ করে সেই দেহ তামসিক জড়তাকে আর সমর্থন করিবে না যে জড়তার বশে সর্ব্বদাই একই অজ্ঞানাচ্ছন্ন গতিবৃত্তির পুনরাবৃত্তি চলে ; দেহ হইয়া উঠিবে এক উচ্চতর শক্তি ও জ্যোতির অপ্রতিরোধী ক্ষেত্র ও যন্ত্র, আত্মার শক্তির প্রতিটি দাবিতে তাহা সাড়া দিবে এবং অভিনব দিব্য অনুভূতির সকল তীব্রতা ও

বৈচিত্র্যকে ধারণ ও পোষণ করিবে। আমাদের সবল ও সক্রিয় প্রাণময় অঙ্গসমূহের আমাদের স্নায়ুগত ভাবাবেগময় ইন্দ্রিয়ানুভূতিশীল ও সংকল্পময় সত্তার শক্তির পরিসর বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদের মধ্যে এক অক্লান্ত কর্ম্ম ও আনন্দময় উপভোগের অনুভূতি প্রবেশাধিকার লাভ করিবে ; কিন্তু তাহারই সঙ্গে তাহারা এক উদার, আত্মস্থ, আত্মায় সমতাপ্রাপ্ত, শক্তিতে মহান, স্থৈর্য্যে দিব্য এক প্রশান্তির উপর দাঁড়াইতে শিখিবে, যাহা উৎফুল্ল বা উত্তেজিত, দুঃখতাপে ক্লিষ্ট, কামনা বাসনা ও আবেগের সনির্ব্বন্ধ তাড়নায় উৎপীড়িত অথবা আলস্য ও অক্ষমতা বশে হতোদ্যম হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা অনুভব ও বিচারশীল মন তাহার সাত্ত্বিক সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করিয়া এক স্বরূপগত জ্যোতি ও শক্তির কাছে নিজেকে উন্মীলিত করে। তখন এক অনন্ত জ্ঞান আমাদের কাছে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ক্ষেত্ররাজি উন্মুক্ত করিবে, যে জ্ঞান মানসরূপায়ণরাজি দ্বারা গঠিত অথবা মনের ধারণা ও মতামতের দ্বারা সীমিত নয়, যাহা ভ্রমপ্রমাদযুক্ত অনিশ্চিত যুক্তিতর্কের এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্র আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ধ্রুব ও প্রমাণসিদ্ধ সে-জ্ঞান সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ কবিতে সমর্থ, সব কিছু তাহার বোধগম্য ; তাহা এক অপার আনন্দ ও শান্তি, যাহা স্বজনী শক্তির ও সবল ক্রিয়ার বাধাগ্রস্ত কঠোর উদ্যমশীলতার হাত হইতে মুক্তির উপর নির্ভর করে না, যাহা ক্ষুদ্র সীমিত হর্ষসুখের কয়েকটি উপাদান দিয়া গঠিত নয় কিন্তু যাহা স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বগ্রাহী, যাহা প্রকৃতিকে অধিকার করিবার জন্য সংখ্যা ও বিস্তারে নিত্যবর্দ্ধমান প্রণালীরাজির মধ্য দিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ভূমিতে নিজেকে প্রবাহিত করিয়া দেয়। তখন মন প্রাণ ও দেহের ঊর্দ্ধস্থিত এক উৎস হইতে এক উচ্চতর শক্তি আনন্দ ও জ্ঞান নামিয়া আসিয়া এক দিব্যতর প্রতিরূপে পুনরায় প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে অধিকার করে।

এইখানে আমাদের নিম্নতর জীবনের তিন গুণের সকল অসঙ্গতি অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং দিব্য প্রকৃতির বৃহত্তর গুণত্রয় দেখা দিতে আরম্ভ করে। তখন তম বা জড়তার অন্ধকার আর থাকে না। তমের স্থানে আসে এক দিব্য প্রশান্তি ও স্থির শাশ্বত বিশ্রান্তি যাহার মধ্য হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের খেলা মুক্ত হইতে থাকে যেন তাহারা শান্ত সমাহিত একাগ্রতার পরম মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। রাজসিক গতি ও চঞ্চলতাও থাকে না, থাকে না বাসনা, থাকে না ক্রিয়া সৃষ্টি ও অধিকারের জন্য সুখ ও দুঃখে ভরা প্রচেষ্টা, বিক্ষুব্ধ উত্তেজনার বহুফলপ্রসূ বিশৃঙ্খলা। রজের স্থান অধিকার করে এক আত্মধৃত সামর্থ্য ও অসীম শক্তির খেলা, যাহা অতি ক্ষুব্ধ তীব্রতার মধ্যেও আত্মার অচঞ্চল সমতাকে বিকম্পিত, তাহার প্রশান্তির বিরাট গভীর আকাশপটে অথবা

তাহার দীপ্ত অতল গহ্বরে কোথাও কোন কলঙ্ক রেখাপাত করে না ; মনের গঠনশীল কোন আলোক আর সত্যকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিবার জন্য জাল ফেলে না, কোন অনিশ্চিত বা নিষ্ক্রিয় আরাম আসিয়া সত্তাকে অধিকার করে না। সত্ত্বের স্থানে দেখা দেয় এক জ্যোতি ও এক আধ্যাত্মিক আনন্দ যাহা অন্তরাত্মার অগাধ অনন্ত সত্তার সহিত অভিন্ন এবং নিগূঢ় সর্ব্বজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন মহিমা হইতে সাক্ষাৎভাবে উদ্ভূত এক অপরোক্ষ ধ্রুব জ্ঞানে পরিপূরিত। ইহাই সেই বৃহত্তর চেতনা যাহাতে আমাদের অধস্তন চেতনাকে রূপান্তরিত করিতে হইবে, ইহাই সেই মহত্তর জ্যোতির্ম্ময়ী পরাপ্রকৃতি আমাদের এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রকৃতিকে এবং তাহার গুণত্রয়ের অস্থির সমতাহীন ক্রিয়াধারাকে যাহাতে পরিণত করিতে হইবে। প্রথমে আমরা গুণত্রয়ের কবল হইতে মুক্ত হই, হই অনাসক্ত অবিক্ষুব্ধ (গীতার ভাষায়) 'নিস্ত্রৈগুণ্য' ; কিন্তু ইহা হইল আমাদের অন্তরপুরুষের, আত্মার, চিৎপুরুষের স্বরূপে বা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, যে পুরুষ স্বতন্ত্র প্রশান্ত ও অচঞ্চল থাকিয়া প্রকৃতির অজ্ঞানাচ্ছন্ন শক্তির মধ্যে তাহার গতিবিধি সাক্ষীরূপে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই ভিত্তির উপর প্রকৃতির পক্ষে তাহার গতিবৃত্তিকে যদি মুক্ত হইতে দিতে হয়, তাহা হইলে এক জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্তি ও নীরবতার মধ্যে তাহার কর্ম্মচেষ্টাকে বিরত করিয়া দিতে হইবে, তখন সেই প্রশান্তি ও নীরবতার মধ্যে আবশ্যকীয় সকল কর্ম্ম, মনোময় অথবা প্রাণময় সত্তার কোন সচেতন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কর্ম্মে কোন অংশগ্রহণ ও প্রবর্ত্তন ব্যতীতই নিষ্পন্ন হইবে, তাহাতে ভাবনার অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা প্রাণময় অঙ্গের বিন্দুমাত্র আবর্ত্ত থাকিবে না ; তাহা নিষ্পন্ন হইবে এক নৈর্ব্ব্যক্তিক বিশ্বগত বা বিশ্বাতীত মহাশক্তির সূচনা প্রেরণা ও ক্রিয়ার বশে। এক বিশ্বমন বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্ববস্তু অথবা যাহা আমাদের নিজের ব্যক্তিসত্তা বা তাহার দ্বারা গঠিত প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তেমন এক শুদ্ধ জগদতীত আত্মশক্তি ও আনন্দই ক্রিয়া করিবে। এই মুক্ত ও স্বতন্ত্র অবস্থা কর্ম্মযোগে আসিতে পারে, অহমিকা কামনা ও ব্যক্তিগত কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা বর্জনের এবং বিশ্বাত্মা বা বিশ্বশক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়া ; জ্ঞানযোগে আসিতে পারে ভাবনার নিবৃত্তি ও মনের নীরবতার এবং বিশ্বচেতনা, বিশ্বপুরুষ, বিশ্বশক্তি বা পরমসত্যের নিকট সমগ্র সত্তার আত্মোন্মীলনের দ্বারা ; তেমনি ভক্তিযোগে আসিতে পারে সর্ব্বানন্দময়কে আমাদের সত্তার পরম পূজ্য প্রভু জানিয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের ও সমগ্র প্রকৃতির সমর্পণের মাধ্যমে। কিন্তু চরম পরিবর্ত্তন আসে এতদপেক্ষা অস্তিবাচক ও সক্রিয় শক্তিশালী এক অতিক্রমণের ফলে ; একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ত্রিগুণাতীত অবস্থায় ধর্ম্মান্তর বা রূপান্তর আছে যাহাতে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক

সক্রিয়তায় আমরা অংশ গ্রহণ করি ; কেননা অধস্তন অসম গুণত্রয় তখন পরিণত হয় একটা সুসম ত্রিগুণে—শাশ্বত প্রশান্তি শক্তি ও আলোকে, অথবা দিব্য প্রকৃতির স্থিরতা গতিশীলতা ও জ্যোতিতে।

অহংগত সংকল্প নির্ব্বাচন ও ক্রিয়া নিবৃত্ত এবং আমাদের সীমিত বুদ্ধি-বৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে এই পরমসুসঙ্গতি আসিতে পারে না। ব্যষ্টি অহংএর প্রয়াসকে থামিয়া যাইতে হইবে, মনকে নীরব হইতে হইবে, বাসনাগত সংকল্পকে কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা হইতে বিরত হইতে হইবে। আমাদের ব্যক্তিত্বকে তাহার উৎসের সহিত মিলিত হইতে হইবে এবং সমস্ত ভাবনা সমস্ত প্রণোদনা শুধু ঊৰ্দ্ধ হইতেই আসিবে। আমাদের ক্রিয়ারাজির নিগূঢ় প্রভু ধীরে ধীরে আমাদের নিকট প্রকট হইবেন, তাঁহার পরম জ্ঞান ও সংকল্পের নিরাপদ ক্ষেত্র হইতে দিব্য শক্তিকে কর্ম্মের অনুমতি দিবেন অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ পূত উন্নত প্রকৃতিকে তাঁহার যন্ত্র করিয়া লইয়া আমাদের মধ্যে সকল ক্রিয়া করিবেন ; ব্যষ্টি-ব্যক্তিকেন্দ্র শুধু তাঁহার কর্ম্মাবলিকে এখানে ধারণ করিবে, তাহাদের গ্রহীতা ও প্রণালী হইবে, তাঁহার শক্তিকে প্রতিফলিত করিবে, এবং তাঁহার জ্যোতি আনন্দ ও সামর্থ্যের দীপ্তিমান অংশভাগী হইবে। তখন ব্যষ্টিব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করিবে না, নিম্নতর প্রকৃতিব কোন প্রতিক্রিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে না। প্রকৃতির গুণত্রয়কে অতিক্রম করা হইল এই পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ এবং তাহাদের রূপান্তর সে দিকের প্রথম নিশ্চিত পদক্ষেপ যাহার দ্বারা কর্ম্মযোগ পন্থা আমাদের অন্ধকার মানবপ্রকৃতির সংকীর্ণ গুহা পার হইয়া ঊৰ্দ্ধস্থিত দিব্য সত্য ও আনন্দের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে উঠিয়া যাইবে।

একাদশ অধ্যায়

কর্ম্মের প্রভু

যিনি আমাদের কর্ম্মের প্রভু ও পরিচালক তিনি অদ্বয় সর্ব্বব্যাপী ও পরাৎপর, শাশ্বত ও অনন্ত। তিনিই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বিশ্বাতীত পরমব্রহ্ম, আমাদের উর্দ্ধে অবস্থিত অব্যক্ত অপ্রকট অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব আবার তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা সর্ব্বলোকের প্রভু, সকল জগতের অতীত, দিব্য জ্যোতি ও দিব্য দিশারী, সর্ব্বস্থন্দর ও সর্ব্বানন্দ, পরম প্রেমাস্পদ ও পরম প্রেমিক; তিনিই বিশ্বপুরুষ এবং আমাদের চতুষ্পার্শ্বের এই সৃজনী শক্তি, আবার তিনিই আমাদের সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামী। যেখানে যাহা কিছু আছে সবই তিনি, আবার সব কিছুকে অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছেন তিনি; যদিও আমরা জানিনা তথাপি আমরা সকলে তাঁহারই সত্তার সত্তা, শক্তির শক্তি, তাঁহা হইতে লব্ধ এক চেতনায় সচেতন; এমন কি আমাদের মরণশীল সত্তাও তাঁহারই সদ্‌বস্তু হইতে জাত এবং আমাদের অন্তরে রহিয়াছে অমর এক তত্ত্ব যাহা তাঁহার শাশ্বত জ্যোতি ও আনন্দের একটি স্ফুলিঙ্গ। জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম বা অপর যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া হউক না কেন আমাদের সত্তার এই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করা এবং এখানে বা অন্যত্র ইহাকে সার্থক করিয়া তোলাই সকল যোগসাধনার লক্ষ্য।

কিন্তু তাঁহার দিকে সত্যদর্শী চক্ষুর নির্ভুল দৃষ্টিতে দেখিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে, কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে, আর যদি আমরা তাঁহার সত্য প্রতিরূপে নিজদিগকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে

চাই তাহা হইলে আমাদিগকে আরও কঠোর সাধনা করিতে আরও দীর্ঘপথে চলিতে হইবে। কর্ম্মের প্রভু সাধকের কাছে সহসা নিজেকে অভিব্যক্ত করেন না। তাঁহার শক্তি সর্ব্বদা আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া ক্রিয়া করে কিন্তু তাহা তখনই শুধু প্রকট হয় যখন আমরা কর্ম্মের কর্তৃত্বাভিমান বর্জন বা ত্যাগ করি, এবং যে পরিমাণে সেই ত্যাগ অধিক হইতে অধিকতররূপে বাস্তব হইয়া উঠিতে থাকে সেই পরিমাণে সে শক্তির সাক্ষাৎ গতি বৃদ্ধি পায়। যখন তাঁহার দিব্য শক্তির নিকট আমাদের আত্মসমর্পণ চরম পূর্ণতায় পৌঁছিবে কেবল তখনই আমরা তাঁহার পরম সান্নিধ্যে বাস করিবার অধিকার লাভ করিব; আর কেবল তখনই আমরা দেখিতে পাইব যে আমাদের কর্ম্ম সহজ স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণভাবে দিব্য ইচ্ছার ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং প্রকৃতির যে কোন ভূমিতে অপরাপর সকল সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবার পথে যেমন নানা স্তর ও সোপান আছে তেমনি এই পূর্ণতায় পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকেও নানা স্তর ও ধাপেব মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আমাদের দৃষ্টিপথে পূর্ণ মহিমার ছবি ধীবে ধীবে কিম্বা অকস্মাৎ একবার বা বহুবার দেখা দিতে পারে; কিন্তু যতদিন ভিত্তি পরিপূর্ণভাবে সুদৃঢ় হয় নাই ততদিন সে দর্শন সে অনুভূতি হইবে সংক্ষিপ্ত ও কেন্দ্রীভূত, স্থায়ী ও সর্ব্বব্যাপক হইবে না, তাহার চির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না। দিব্য অভিব্যক্তির পূর্ণমহিমা ও অসীম সমৃদ্ধি আরো পরে দেখা দিবে এবং ক্রমশঃ তাহাদের শক্তি ও তাৎপর্য্য প্রকাশ করিবে। অথবা হয়ত এমনও হইতে পাবে যে আমাদের প্রকৃতির শিখরদেশগুলিতে স্থির ও স্থায়ী দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিম্নতর অঙ্গ-সমূহের পূর্ণরূপে সাড়া দেওয়ার শক্তি শুধু ধীরে ধীরে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে। সকল যোগেই প্রথম প্রয়োজন হইল শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস এবং ধৈর্য্য। হৃদয়ের যে জ্বলন্ত আগ্রহ, নির্ব্বন্ধাতিশয়পূর্ণ ইচ্ছার যে প্রচণ্ডতা ঝটিকার বেগে সজোরে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে চায় তাহারা ভীষণ প্রতিক্রিয়া বা প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়া পড়িতে পারে, যদি তাহারা তাহাদের জ্বলন্ত উৎসাহের আশ্রয় স্বরূপ এই সমস্ত দীনতর ও শিষ্টতর সহচরগণের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করে; আর সুদীর্ঘ ও সুকঠিন এই পূর্ণযোগে সর্ব্বাঙ্গীণ নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্য্য অপরিহার্য্য বা একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু।

হৃদয় ও মন এ উভয়ের অধৈর্য্যের এবং আমাদের রাজসিক প্রকৃতির উৎসুক কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত সংকল্পের জন্য, যোগের দুর্গম ও সংকীর্ণ পথে এই নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা লাভ করা অথবা ইহাদিগকে লইয়া সাধনা করা অতি কঠিন ব্যাপার। মানুষের প্রাণময় প্রকৃতি নিজ কর্ম্মের ফল লাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, এবং

যদি মনে হয় যে ফল পাওয়া যাইবে না অথবা পাইতে বহু বিলম্ব হইবে তাহা হইলে সে তাহার আদর্শ ও তাহার পরিচালনা এ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বসে। কারণ তাহার মন সর্ব্বদা পদার্থের বাহ্যরূপ দেখিয়াই বিচার করে, ইহাই হইল তাহার মজ্জাগত অভ্যাস কেননা যুক্তিবুদ্ধিকে সে অত্যধিকরূপে বিশ্বাস করে। যখন আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করি অথবা অন্ধকারের মধ্যে যখন আমাদের পদস্খলন ও পতন হয়, যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলাম যখন তাহা পরিবর্জন করিতে চাই, তখন আমাদের হৃদয়ে ভগবানকে দোষী সাব্যস্ত করা অপেক্ষা সহজ আর কিছুই নাই। কারণ আমরা তখন বলি "আমি পরমপুরুষকে বিশ্বাস করিয়াছি তথাপি দুঃখ পাপ ও ভ্রান্তির হাতে অন্যায়রূপে সমর্পিত হইয়াছি।" অথবা বলি "একটা আদর্শের জন্য আমি সমগ্র জীবন পণ করিয়াছি কিন্তু দেখিতেছি কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা সে আদর্শের বিরোধিতা ও তাহাকে হতোদ্যম করিতেছে। ইহাপেক্ষা অন্যলোকের মত নিজের সসীমতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভূমিতে বিচরণ করা অনেক ভাল ছিল।" এইরূপ অবস্থায়—আবার কখন কখন এ অবস্থা বহুবার আসে এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়—মানুষ তাহার সকল উচ্চতর অনুভূতির কথা ভুলিয়া যায় তাহার হৃদয় কেন্দ্রীভূত হয় নিজের তিক্ত-বিরক্তির উপর। এই সমস্ত অন্ধকারময় অবস্থায় সাধকের স্থায়ী অধঃপতন এবং দিব্যকর্ম্ম হইতে ফিরিয়া দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়।

যদি কেহ স্থিরচিত্তে দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রবলতম বিরোধী চাপেও তাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা বজায় থাকিবে; এমন কি যদি তাহা লুক্কায়িত অথবা দৃশ্যতঃ পরাভূত হইয়াছে মনেও হয় তথাপি প্রথম সুযোগেই তাহা পুনরায় প্রকট হইয়া উঠিবে। কেননা হীনতম অধঃ-পতন সত্ত্বেও এবং দীর্ঘতম কালব্যাপী ব্যর্থতার মধ্যেও হৃদয় অথবা বুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চতর কিছু তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে। কিন্তু এই ভাবের দ্বিধাসঙ্কোচ বা মেঘাচ্ছন্নতা অভিজ্ঞ সাধকেরও প্রগতির বেগ মন্দীভূত করিয়া দেয় আর প্রবর্ত্ত সাধকের পক্ষে তাহা অত্যন্ত বিপদজনক। সুতরাং পথের অতীব দুরূহতার কথা প্রথম হইতেই বুঝিয়া ও মানিয়া লওয়া প্রয়োজন, আর প্রয়োজন উপলব্ধি করা যে এমন এক সবল বিশ্বাস আমাদের চাই যাহা মনের নিকট অন্ধ বলিয়া বোধ হইলেও আমাদের বিচার বুদ্ধির অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞানী। কেননা এই বিশ্বাস উর্দ্ধ হইতে প্রাপ্ত এক অবলম্বন; যাহা বুদ্ধি ও তাহার স্বীকৃত

তথ্যরাজিকে অতিক্রম করিয়া যায় ইহা তেমন এক নিগূঢ় আলোকের প্রোজ্জ্বল ছায়া ; যাহা দৃশ্যমান সাক্ষাৎ ঘটনাবলির প্রভাবের অধীন নয় ইহা তেমন এক প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের সার বস্তু। অধ্যবসায় সহকৃত আমাদের শ্রদ্ধা তাহার কর্ম্মে সমর্থিত ও উর্দ্ধে উন্নীত হইবে এবং পরিশেষে দিব্যজ্ঞানের আত্মপ্রকাশে রূপান্তরিত হইবে। আমাদিগকে সর্ব্বদা গীতার এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে হইবে "হতাশা ও অবসাদ হইতে বিমুক্ত হৃদয়ে নিরন্তর যোগযুক্ত হইতে হইবে।" সংশয়ী বুদ্ধিকে সর্ব্বদা দিব্যপ্রভুর এই আশ্বাসবাণী শুনাইতে হইবে "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ" আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। অবশেষে আমাদের শ্রদ্ধা অটল হইবে, কেননা আমরা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইব এবং সর্ব্বদা তাঁহার দিব্য সান্নিধ্য অনুভব করিব।

আমাদের কর্ম্মের প্রভু যখন আমাদের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিতেছেন তখনও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই প্রকৃতির মধ্য দিয়াই কাজ করেন, খামখেয়ালের বশে কিছু করেন না। আমাদের এই অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে আমাদের পূর্ণতার উপাদানরাজি ; কিন্তু রহিয়াছে বিশৃঙ্খল, বিকৃত ও স্থানভ্রষ্ট যেমন তেমন এলোমেলোভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে একত্রে স্তূপাকারে। ধৈর্য্যসহকারে এই সমস্ত উপাদানকে পূর্ণ বিশোধিত সুবিন্যস্ত পুণর্গঠিত ও রূপান্তরিত করিতে হইবে, ইহাদের কোন কিছুকে কাটিয়া বাদ দিলে, বিকৃত ও ধ্বংস করিলে, শুধু বলপ্রয়োগ বা অস্বীকৃতি দ্বারা মুছিয়া ফেলিলে চলিবে না। এই বিশ্ব ও বিশ্বের সকল অধিবাসী তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই অভিব্যক্তি, তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর সহিত তিনি কি ভাবে ব্যবহার করেন আমাদের সংকীর্ণ ও অজ্ঞান মন তাহা বুঝিতে পারে না—যদি না সে নিস্তব্ধ ও নীরব হইয়া দিব্য জ্ঞানের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করিতে পারে। আমাদের ভুলভ্রান্তির মধ্যেই সত্যের এক উপাদান আছে যাহা অন্ধকারে অনুসন্ধানরত আমাদের বুদ্ধির কাছে নিজের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। মানুষের বুদ্ধি ভ্রমকে এবং তাহার সহিত সত্যকে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া তৎস্থানে অন্য এক অর্দ্ধসত্য ও অর্দ্ধভ্রমকে বসায় ; পরম দিব্য জ্ঞান আমাদের এই সমস্ত ভুলভ্রান্তি চলিতে দেন যতদিন আমরা প্রত্যেকটি অসত্য আচরণের পশ্চাতে রক্ষিত প্রচ্ছন্ন

সত্যে পৌঁছিতে না পারি। আমাদের পাপ কর্ম্মরাজি এক সন্ধানরত শক্তির ভ্রান্তপদক্ষেপ, যাহার যথার্থ লক্ষ্য পূর্ণতা, পাপ নয়; তাহা চাহিতেছে এমন এক বস্তু যাহাকে আমরা দিব্যপুণ্য বলিতে পারি। অনেক সময় তাহারা এমন এক গুণের আবরণমাত্র, যে গুণকে এই কুৎসিত ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত ও রূপান্তরিত করিতে হইবে; নহিলে নিখুঁত বিশ্ব-বিধানের মধ্যে তাহারা স্থান পাইতে বা স্থান পাইলেও দীর্ঘকাল থাকিতে পারিত না। আমাদের কর্ম্মের প্রভু ভ্রান্ত হন না, তিনি নির্ব্বিকার সাক্ষীমাত্র নহেন, নিরর্থক অমঙ্গলের বিলাসেও আসক্ত নহেন। তিনি আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি ও আমাদের পুণ্য এ উভয় হইতে অধিকতর প্রাজ্ঞ।

আমাদের প্রকৃতি কেবল যে তাহার সংকল্পে ভ্রান্ত, জ্ঞানে অবিদ্যাচ্ছন্ন তাহা নহে কিন্তু শক্তিতেও দুর্ব্বল; কিন্তু দিব্যশক্তি রহিয়াছে এবং তাহাই আমাদিগকে পরিচালিত করিবে যদি আমরা তাঁহার প্রতি আস্থাবান হই এবং আমাদের ক্ষমতা ও অপূর্ণতা উভয়কেই দিব্য কর্ম্ম সাধনে প্রয়োগ করি। যদি আমাদের অব্যবহিত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই ব্যর্থতা তাঁহার অভিপ্রেত; অনেক সময় আমাদের ব্যর্থতা অথবা কুফল লাভই অধুনালব্ধ পূর্ণ সার্থকতা হইতে ধ্রুবতর লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃষ্টতর পন্থা। আজ যদি আমরা দুঃখভোগ কবি তবে তাহার কারণ এই যে আমাদের মধ্যের কিছুকে আনন্দের একটা অসাধারণ প্রকাশ-সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। আজ যদি আমাদের পদস্খলন হয় তবে অবশেষে যাহাতে আরও পূর্ণভাবে চলিবার গোপন রহস্য শিখিতে পাবি তজ্জন্যেই তাহা ঘটিতেছে। এমন কি শান্তি, শুদ্ধি ও পূর্ণতা লাভের জন্যও যেন আমরা ভীষণ ব্যস্ত হইয়া না পড়ি। শান্তি আমাদের পাইতে হইবে কিন্তু তাহা শূন্য বা বিধ্বস্ত প্রকৃতির শান্তি নয়, অথবা যাহা চঞ্চল হইতে অক্ষম, আমাদের নিহত বা বিকলাঙ্গ সামর্থ্যরাজির তেমন শান্তি নয়; চঞ্চল হইতে অক্ষম কেননা তাহাদের তীব্রতা তেজ ও শক্তি আমরাই কাড়িয়া লইয়াছি। শুদ্ধি আমাদের লক্ষ্য হইবে বটে, তবে তাহা শূন্যতার শুদ্ধি অথবা তৃণৌষধিবিহীন হিমশীতল প্রদেশের শুদ্ধি নয়। পূর্ণতা আমাদের অর্জন করিতে হইবে কিন্তু সে পূর্ণতা নয়, যাহার অস্তিত্ব নিজেকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া অথবা অনন্তের অবিরাম আত্ম-বিস্তারশীলতাকে যথেচ্ছভাবে একেবারে বদ্ধ করিয়া দিয়া শুধু বজায় রাখা যায়। দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তর আমাদের লক্ষ্য; কিন্তু সে দিব্য-প্রকৃতি আধ্যাত্মিক, কোন মানসিক ও নৈতিক অবস্থা নয়; বুদ্ধি দ্বারা তাহা অর্জন এমন কি কল্পনা করাও অতি দুরূহ। আমাদের কর্ম্মের আমাদের

কর্ম্মের প্রভু

যোগের প্রভুই শুধু জানেন যে কি করিতে হইবে, আমাদের অবশ্যকরণীয় হইল তাঁহাকে তাঁহার আপন ধারাতে আপন প্রণালীতে কর্ম্ম করিতে দেওয়া।

অজ্ঞানের গতিবিধি মূলতঃ অহংগত আর যতদিন আমরা ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করি এবং আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতির অর্দ্ধ আলোকে অর্দ্ধশক্তি লইয়া কর্ম্ম করি ততদিন আমাদের পক্ষে অহংকারকে বর্জন করা অপেক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার আর কিছু নাই। কর্ম্মপ্রণোদনা ত্যাগ করিয়া অহংকে অনশনে অবসন্ন করা অথবা ব্যক্তিত্বের সকল গতিবৃত্তি আমাদের সত্তার মধ্য হইতে কাটিয়া দূরে নিক্ষেপের দ্বারা তাহাকে হত্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রশান্তির ভাব-সমাধিতে বা দিব্যপ্রেমের পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া অহমিকাকে আত্ম-বিস্মৃতির ক্ষেত্রে তুলিয়া দেওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আমাদের কঠিনতর সমস্যা হইল প্রকৃত ব্যক্তিপুরুষকে মুক্ত করা এবং দিব্য মানবত্ব লাভ করা যে মানবত্ব হইবে দিব্যশক্তির বিশুদ্ধ আধার ও দিব্য ক্রিয়ার পরিপূর্ণ যন্ত্র। এজন্য দৃঢ়ভাবে একটির পর একটি পদক্ষেপ করিতে হইবে : সর্ব্বতো-ভাবে বাধার পর বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে হইবে। কেবলমাত্র দিব্য জ্ঞান ও শক্তি আমাদের জন্য এ কাজ করিতে পারে এবং করিয়াও দিবে যদি আমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করি, অবিরাম সাহস ও ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার ক্রিয়াধারাবলিতে সম্মতি দান এবং অনুসরণ করি।

এই দীর্ঘপথের প্রথম ধাপ হইল আমাদের ও জগতের অন্তরে অধিষ্ঠিত ভগবানের চরণে আমাদের সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা ; এই উৎসর্গ হৃদয় ও মনের এক বিশেষ ভাব বা ভঙ্গী যাহার সূত্রপাত করা তত কঠিন নহে, কিন্তু তাহাকে পূর্ণরূপে ঐকান্তিক ও সর্ব্বব্যাপী করিয়া তোলা অতি দুরূহ। দ্বিতীয় ধাপ আমাদের কর্ম্মের ফলে আসক্তিত্যাগ, কেননা আমাদের উৎসর্গের একমাত্র প্রকৃত অবশ্যম্ভাবী এবং পরম বাঞ্ছিত ফল—আর একমাত্র যাহার প্রয়োজন আমাদের আছে—হইল আমাদের মধ্যে দিব্য অধিষ্ঠান এবং দিব্য চৈতন্য ও শক্তির উপলব্ধি ; আবার এইটি লাভ হইলে বাকি সব কিছু পাওয়া যাইবে। এই ধাপের অর্থ আমাদের প্রাণময় সত্তার অহংগত সংকল্পের, আমাদের কামময় আত্মা ও কামময় প্রকৃতির রূপান্তর, আর ইহা প্রথম ধাপ অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন। তৃতীয় ধাপ হইল কর্ম্মীর কেন্দ্রগত অহমিকা এমন কি অহংবোধের বিলোপসাধন ; সকল রূপান্তরের মধ্যে এই ধাপই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ এবং প্রথম দুইটি ধাপ গৃহীত না হইলে ইহাতে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না ; কিন্তু প্রথম দুইটি ধাপও সিদ্ধ হয় না যদি তৃতীয়টি

আসিয়া এই গতিবৃত্তিকে সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুলিয়া না দেয় অহমিকাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কামনার মূলোচ্ছেদ যদি না করে। যখন তাহার প্রকৃতি হইতে সংকীর্ণ অহংবোধের মূল উৎপাটিত হইবে কেবল তখনই সাধক তাহার প্রকৃত ব্যক্তিপুরুষকে জানিতে পারিবে যে পুরুষ ভগবানের এক অংশ ও শক্তিরূপে সর্ব্বদা আমাদের উর্দ্ধে অবস্থিত আছে; আর তখনই সে দিব্য শক্তির সংকল্প ছাড়া কর্ম্মের অন্য সকল প্রবর্ত্তক শক্তিকে বর্জন করিতে সমর্থ হইবে।

এই শেষ পূর্ণাঙ্গতাবিধায়ক গতিবৃত্তিতেও স্তরপরম্পরা আছে; কেননা ইহা অবিলম্বে সাধন করা যায় না, বহুকালব্যাপী সাধনোপায়সকলের দ্বারা এ অবস্থার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে ইহাতে পৌঁছা যায়। প্রথমে এই মনোভাব আসা চাই যে আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা নই, দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করা চাই যে আমরা বিশ্বশক্তির এক যন্ত্রমাত্র। প্রথমে বোধ হইতে পারে যে এক শক্তি নয়, বহু বিশ্বশক্তি আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে; আবার এই শক্তিরাজি অহমিকার পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইতে পারে; এই দৃষ্টি মনকে মুক্ত করিতে পারে কিন্তু আমাদের প্রকৃতির বাকি অংশগুলির মুক্তিসাধন করিতে পারে না। এমন কি যখন আমরা সবকিছু একই বিশ্বশক্তির ক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে পারি এবং যখন তাহার পশ্চাতে ভগবানের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে সচেতন হই, তখনও বন্ধনমুক্ত না হইতে পারি। কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার চলিয়া গেলেও যন্ত্রের অহমিকা তাহার স্থান অধিকার করিতে অথবা ছদ্মবেশে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। জগতের জীবন এই প্রকার অহমিকার দৃষ্টান্তে পূর্ণ, আর তাহা অন্যপ্রকার অহংবোধ হইতে অনেক বেশী শক্তিমান ও অভিনিবেশকর হইতে পারে; যোগেও এই একই বিপদ রহিয়াছে। একজন লোক হয়ত জননেতা হইয়াছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন সমবায় বা সংঘের প্রধান ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইছে এবং তাহার নিজের অহংগত শক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া পরিজ্ঞাত কোন শক্তিতে শক্তিমান বলিয়া হয়ত অনুভব করিতেছে; একটা নিয়তি একটা অপার রহস্যময় সংকল্প বা একটা ভাস্বর জ্যোতি যে তাহার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে সে সম্বন্ধে হয়ত সচেতন হইয়াছে; তাহার ভাবনায় তাহার ক্রিয়ায় তাহার সৃষ্টিশীল প্রতিভার অসাধারণ ফলগুলি দেখা দিতেছে। হয়ত বিরাট ধ্বংস-ক্রিয়া

দ্বারা সে মানবজাতির পথ পরিষ্কার অথবা বিশাল সংগঠনের দ্বারা তাহার প্রগতি-পথে একটা সাময়িক বিশ্রাম স্থান নির্ম্মাণ করিতেছে। হয়ত সে দুষ্কৃতের দণ্ডদাতা অথবা আলোক ও আরোগ্য বিধাতা, সুকুমার স্রষ্টা বা জ্ঞানের অগ্রদূত। অথবা যদি তাহার কর্ম্ম ও তাহার পরিণাম ক্ষুদ্রতর ধরণের হয় যদি তাহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয় তবুও তাহার এই দৃঢ় বোধ থাকিতে পারে যে সে নিজে একটি যন্ত্র, তাহার নিজের বিশিষ্ট জীবনব্রত এবং বিশিষ্ট কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত। এইরূপ যাহাদের ভবিতব্যতা, এইরূপ যাহাদের শক্তি, তাহারা সহজেই বিশ্বাস ও ঘোষণা করে যে তাহারা ভগবানের বা নিয়তির হাতের যন্ত্র; কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যেও এমন এক তীব্রতর অতিস্ফীত অহমিকা প্রবেশ বা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে সাধারণ মানুষ যাহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে সাহস করে না বা অন্তরে স্থান দেওয়ার শক্তি রাখে না। এই প্রকার মানুষেরা যদি প্রায়শই ভগবানের কথা বলে তবে তাহা নিজেদের এক প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিবার জন্যই বলে, যে-প্রতিমূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অথবা তাহাদের প্রকৃতির এক বিশাল ছায়া ছাড়া আর কিছু নহে : ইহা সেই বস্তুরই প্রতিমূর্ত্তি যাহা তাহাদের নিজ স্বভাবের অনুরূপ সংকল্প ভাবনা গুণ ও শক্তির পরিপোষক এবং যাহাতে মানুষই দেবত্ব আরোপ করিয়াছে। নিজের অহমিকার এই অতিবর্দ্ধিত প্রতিরূপকে তাহারা প্রভু বলিয়া সেবা করে। যোগের পথে ইহা প্রায়ই ঘটে যখন সবল কিন্তু স্থূল প্রাণপ্রকৃতি বা মন সহজেই উচচগৌরবে সমাসীন হইয়া দুরাকাঙক্ষা দম্ভ বা নিজে বড় হইবার বাসনাকে আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে এবং কর্ম্মপ্রণোদনার বিশুদ্ধি নষ্ট করিতে দেয়, তাহাদের ও তাহাদের প্রকৃত সত্তার মধ্যে এক অতিস্ফীত অহমিকা আসিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল দিব্য বা অদিব্য যে বৃহত্তর অদৃশ্যশক্তি সম্বন্ধে তাহারা অস্পষ্ট বা অতিস্পষ্টভাবে সচেতন হয় তাহার সামর্থ্য নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই অধিকার করে। আমাদের অপেক্ষা এক বৃহত্তর শক্তি আছে এবং আমরা তাহা দ্বারা পরিচালিত হইতেছি শুধু এই মনোময় অনুভূতি বা প্রাণময় বোধ অহমিকার কবল হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না।

আমাদের মধ্যে বা উর্দ্ধে এক বৃহত্তর শক্তি আছে এবং আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে এই অনুভূতি এই বোধ এক ভ্রান্তি অথবা গৌরবের বশে জাত এক উন্মাদনা নহে। যাহারা এইরূপ ভাবে দেখে ও অনুভব করে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি অধিক, তাহারা সীমিত দেহগত বুদ্ধিকে

ছাড়াইয়া একপদ অগ্রসর হইয়াছে বটে কিন্তু তাহারাও পূর্ণদৃষ্টিশক্তি অথবা সাক্ষাৎ উপলব্ধি লাভ করে নাই। কেননা, তাহারা মনে স্পষ্টদর্শী নয়, আত্মাতেও সচেতন নয়, আত্মার আধ্যাত্মিক ধাতু অপেক্ষা তাহাদের প্রাণময় অঙ্গনিচয়ে তাহারা অধিকতর জাগ্রত হইয়াছে; এইজন্য তাহারা ভগবানের সচেতন যন্ত্র হইতে কিম্বা দিব্য প্রভুর সম্মুখে আসিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের ভ্রমশীল অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্য দিয়াই তাহারা পরিচালিত হয়। ভগবত্তার যেটুকু বড়জোর তাহারা দেখে তাহা নিয়তি অথবা এক বিশ্বশক্তি; নতুবা সীমিত কোন দেবতাকে ভগবান নামে অভিহিত করে অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার এই করে যে যাহা তাহাদের আবৃত করিয়া রাখে তেমন কোন আসুরিক বা অতিমানুষিক শক্তিকে সেই নাম দেয়। এমন কি কোন কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতাও ভগবানকে সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের দেবতা অথবা ভীতিজনক ও শাস্তিদাতা এক শক্তি অথবা সাত্ত্বিক প্রেম দয়া ও পুণ্যের এক মানুষী প্রতিমূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন, মনে হয় যেন তাহারা শাশ্বত অদ্বয় তত্ত্বের দর্শন পান নাই। তাহারা তাঁহাকে যে মূর্ত্তিরূপে খাড়া করিয়াছেন ভগবান তাহা স্বীকার করিয়া নেন এবং সেই মাধ্যমের মধ্য দিয়া তাহাদের সঙ্গে তাঁহার কর্ম্ম করেন। কিন্তু অদ্বয় শক্তি তাহাদের অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে হইলেও অপরের অপেক্ষায় তীব্রতররূপে কাজ করে ইহা অনুভব করে বলিয়া অহংকার তত্ত্বের প্রণোদনাও তাহাদের মধ্যে অন্য অপেক্ষা তীব্রতর হইতে পারে। একটা উন্নীত রাজসিক বা সাত্ত্বিক অহমিকা তখনও তাহাদিগকে অধিকার করিয়া থাকে এবং তাহাদের ও পূর্ণাঙ্গ সত্যের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। এসময় যদিও সত্য ও পূর্ণ উপলব্ধি বহুদূরে রহিয়াছে তথাপি এটুকু লাভ একেবারে নগণ্য নয় কেননা এখানেই সেই উপলব্ধির সূত্রপাত। যাহারা মানুষী বন্ধন কতকটা ভঙ্গ করিয়াছে কিন্তু শুদ্ধি এবং জ্ঞান এখনও পায় নাই তাহাদের পক্ষে আরও অনেক নিকৃষ্ট পরিণতি দেখা দিতে পারে, কেননা তাহারা যন্ত্র হইলেও দিব্যযন্ত্র হইয়া উঠে নাই; অধিকাংশ সময় তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে ভগবানের নাম নিয়া তাঁহার ছদ্মমুখোস গুলিকে, তিমিরাবগুণ্ঠিত দিব্যের বিপরীত বস্তু নিচয়কে অন্ধকারের শক্তি রাজিকে সেবা করে।

আমাদের প্রকৃতি বিশ্বশক্তির আধার হইবে বটে কিন্তু তাহার নিম্নতর ভাবে অথবা তাহার রাজসিক বা সাত্ত্বিক গতিবৃত্তিতে নয়; তাহা বিশ্বশক্তির সংকল্পের অনুগামী হইবে বটে কিন্তু বৃহত্তর মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের আলোকে। যন্ত্রের মনোভাবে কোনপ্রকার অহমিকা থাকিলে চলিবে না, চলিবে না তখনও যখন আমাদের মধ্যস্থিত শক্তির মহত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হই। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-

সারে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশ্বশক্তির এক যন্ত্র, এবং আন্তর সান্নিধ্যের কথা বাদ দিলে একের এবং অন্যের কর্ম্মে একপ্রকাব যন্ত্রের সঙ্গে অন্যপ্রকার যন্ত্রের মূলতঃ এমন কোন পার্থক্য নাই, যাহার জন্য কর্ম্মী মূর্খের মত অহংগত গর্ব্ব পোষণ করিতে পারে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের বোধ পরমপুরুষের কৃপা ; দিব্যশক্তির প্রাণপ্রবাহ যেদিকে ইচ্ছা বহিয়া যায়, আজ একজনকে আগামীকল্য আর একজনকে তাহার বাণী বা সামর্থ্যে ভরপুর করিয়া তোলে। কুম্ভকার যদি একটি কুম্ভকে অপর একটি হইতে অধিকতর পূর্ণ করিয়া গড়ে তবে তাহার কৃতিত্ব কুম্ভের নয়, কুম্ভকারের। আমাদেব মনোভাব যেন এরূপ না হয় 'ইহা আমার ক্ষমতা' অথবা 'আমার মধ্যেই ভগবানের শক্তি দেখ' ; বরং এইরূপ হওয়া চাই 'এক দিব্য শক্তি আমার এই দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে আর সেই একমাত্র শক্তিই সকল মানুষ ও পশু, সকল উদ্ভিদ ও ধাতু-সকল সজীব সচেতন পদার্থ ও প্রতীয়মান নিশ্চেতন নির্জীব বস্তুর মধ্যে কাজ করিতেছে। এই উদার দৃষ্টি আমরা যেন লাভ করি যে, যিনি পরম এক তিনিই সকলের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন এবং সমগ্র জগৎ সমানভাবে তাঁহার দিব্য কর্ম্মের যন্ত্র এবং ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র, আর যদি আমরা ইহা পরিপূর্ণরূপে অনুভব করি তবে তাহা সমস্ত রাজসিক অহমিকা দূর করিবার সহায় হইবে ; এমন কি সাত্ত্বিক অহংবোধও আমাদের প্রকৃতি হইতে অপসৃত হইতে আরম্ভ হইবে।

এই প্রকারের অহমিকাকে দূর কবিতে পারিলে আমরা প্রকৃত যন্ত্ররূপে ক্রিয়া করিতে পারিব এবং তাহাই পূর্ণ কর্ম্মযোগের মূলবস্তু। কেননা যতদিন আমরা যান্ত্রিক অহমিকাকে পোষণ করিতেছি ততদিন আমরা ভগবানের সচেতন যন্ত্র বলিয়া নিজের কাছে নিজে ভান করিতে পারি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন দিব্যশক্তিকে আমাদের নিজেদের বাসনার চরিতার্থতা অথবা নিজেদের অহং-গত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যন্ত্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি যখন অহমিকা আমাদের বশে আসিয়াছে কিন্তু একেবারে দূরীভূত হয় নাই, তখন আমরা বস্তুতঃ দিব্য কর্ম্মের চলমান যন্ত্র (engine) হইতে পারি, কিন্তু আমরা হইয়া দাঁড়াই এক অপূর্ণ যন্ত্র এবং আমাদের মনের ভ্রান্তি প্রাণের বিকৃতি এবং জড় প্রকৃতির অক্ষমতার জন্য কর্ম্মধারাকে পথভ্রষ্ট অথবা ব্যাহত করিয়া ফেলি। যদি এই অহমিকা অপসারিত হয় শুধু তাহা হইলেই আমরা যে কেবল তাহার শুধু শুদ্ধ যন্ত্র হইব এবং যে দিব্য হস্ত আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে তাহার প্রতি গতিতে সচেতনভাবে যে সম্মতি দিতে পারিব তাহা শুধু নহে, কিন্তু আমরা আমাদের প্রকৃত প্রকৃতিকে জানিব। জানিব যে আমরা

অদ্বয় শাশ্বত অনন্তের চিন্ময় অংশ, যাহাকে পরা ভাগবতী শক্তি আপন কাজের জন্য নিজের মধ্যেই প্রসারিত ও স্থাপিত করিয়াছেন।

দিব্য শক্তির কাছে আমাদের যান্ত্রিক অহমিকাকে সমর্পণ করিবার পর আমাদিগকে তদপেক্ষা এক বৃহত্তর সোপানে আরূঢ় হইতে হইবে। যে অদ্বয় বিশ্বশক্তি আমাদিগকে এবং সর্ব্বপ্রাণীক মন প্রাণ ও জড়ের ভূমিতে পরিচালিত করিতেছে শুধু তাহাকে জানা যথেষ্ট নহে; কেননা ইহা হইল অপরা প্রকৃতি এবং যদিও দিব্যজ্ঞান আলোক ও শক্তি সেখানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং অজ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে, যদিও তাহারা তাহার আবরণ অংশতঃ ছিন্ন করিয়া তাহাদের স্বরূপ প্রকৃতির কিছুটা অভিব্যক্ত করিতে অথবা ঊর্দ্ধ হইতে অবতরণ করিয়া এই সমস্ত অধস্তন ক্রিয়াবলিকে উন্নীত করিতে পারে, তথাপি এমন কি আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত মন প্রাণ ক্রিয়া ও দৈহিক চেতনাতে পরম একের উপলব্ধি লাভ করিবার পরও আমাদের সক্রিয় প্রত্যঙ্গগুলিতে একটা অপূর্ণতা থাকিয়া যাইতে পারে। তখনও পরাশক্তির ক্রিয়ার প্রতিস্পন্দনে আমাদের মধ্যে ভ্রান্তি ও স্খলন দেখা দিতে, দিব্য পুরুষের মুখের উপর একটা আবরণ থাকিয়া যাইতে, অজ্ঞানের একটা মিশ্রণ নিয়ত বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যাহা এই নিম্নতর প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে সেই দিব্য শক্তির নিকট তাহার সত্যের দিকে যখন আমরা নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারিব কেবল তখনই আমরা সেই পরাশক্তির ও পরমজ্ঞানের প্রকৃত পূর্ণ যন্ত্র হইতে সমর্থ হইব।

কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য শুধু মুক্তি নহে, পূর্ণতাও তাহার লক্ষ্য। ভগবান আমাদের প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী ভাবে ক্রিয়া করেন; যদি আমাদের প্রকৃতি অপূর্ণ হয় তাহা হইলে সে কাজও হইবে অপূর্ণ ও শুদ্ধ ক্রিয়া হইবে না। এমন কি বিষম ভ্রান্তি, অসত্য, নৈতিক দুর্ব্বলতা, অপর্য্যাপ্ত, বিক্ষেপকর প্রভাবরাজির ফলে সে কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইতেও পারে। তখনও আমাদের মধ্যে ভগবানের কাজ চলিবে কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতার অনুযায়ী ভাবে, তাহার মূল উৎসের শক্তি ও বিশুদ্ধির অনুপাতে নহে। আমাদের যোগ যদি পূর্ণ সার্ব্বভৌম যোগ না হইত, আমরা যদি অন্তরাত্মার মুক্তি অথবা প্রকৃতি হইতে পৃথক নিশ্চল পুরুষরূপে স্থিতি শুধু চাহিতাম তাহা হইলে ক্রিয়ার ক্ষেত্রের এই

অপূর্ণতাতে কিছু যাইত আসিত না। শান্ত স্থির অবিক্ষুব্ধ থাকিয়া উল্লসিত বা অবসন্ন হইয়া না পড়িয়া পূর্ণতা বা অপূর্ণতা, দোষ বা গুণ, পাপ বা পুণ্য ইহাদের কোনটা আমাদের নিজস্ব বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়া, এই দ্বন্দ্বের মিশ্রণকে প্রকৃতির ত্রিগুণের নিজস্ব ক্ষেত্রের খেলা হইতে জাত বলিয়া অনুভব করিয়া আমরা আত্মাপুরুষের নীরবতার মধ্যে সরিয়া গিয়া প্রকৃতির ক্রিয়ার শুদ্ধ অনাসক্ত সাক্ষীরূপে শুধু অবস্থিত হইতে পারিতাম। কিন্তু সার্ব্বভৌম সিদ্ধির পথে ইহা একটি সোপানমাত্র হইতে পারে, আমাদের শেষ বিশ্রাম স্থান বা চরম গম্যস্থান নহে। কেননা আত্মা বা পুরুষের নিশ্চল স্থিতিতে নয় প্রকৃতির সকল গতিবৃত্তিতেও ভগবানের উপলব্ধি লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। আর এ উপলব্ধি পূর্ণরূপে পাওয়া যাইবে না যতদিন আমরা প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেক গতিধারাতে, কর্ম্মের প্রত্যেক মূর্ত্তিতে, আমাদের সঙ্কল্পের প্রত্যেক আবর্ত্তনে, প্রত্যেক ভাবনা অনুভূতি ও আবেগে ভগবানের অধিষ্ঠান ও তাঁহার শক্তি অনুভব না করিব। অবশ্য ইহা বলা চলে যে এক অর্থে অজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যেও আমরা সে অনুভব পাইতে পাবি। কিন্তু তাহা দিব্য সান্নিধ্য ও শক্তির এক ছদ্মবেশ, এক খর্ব্ব ও নিম্নতর রূপ। আমাদের দাবি এতদপেক্ষা বৃহত্তর ; আমরা চাই যে দিব্য সত্যের মধ্যে আত্মসচেতন ইচ্ছাময়ের শাশ্বত আলোক ও শক্তির মধ্যে আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত নিত্যবস্তুর পরম উদারতার মধ্যে আমাদের প্রকৃতি হইবে ভগবানেরই এক দিব্যশক্তি।

অহমিকার আবরণ উন্মোচিত হইবার পরে যাহারা আমাদের দেহ প্রাণ মনকে পরিচালিত করে আমাদের প্রকৃতির সেই অধস্তন গুণাবলীর অবগুণ্ঠনও অপসারিত করিতে হইবে। অহমিকার সীমা যেমনই বিলীন হইয়া যাইতে থাকে তেমনি আমরা দেখিতে পাই কি ভাবে এই আবরণ গঠিত হইয়াছে আর তখন আমাদের ভিতরে বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়াধারাকে ধরিতে এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বা পশ্চাতে বিশ্বপুরুষের সান্নিধ্য এবং বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের সকল শক্তি প্রকাশ প্রণালী ও ক্রিয়াধারা অনুভব করিতে পারি। দেখিতে পাই যে যন্ত্রের প্রভু এই সকল ক্রিয়াধারার পশ্চাতে আছেন এমন কি কর্ম্মের মধ্যেও তাঁহার স্পর্শ এবং নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক এক বৃহৎ প্রভাবের চাপ রহিয়াছে। তখন আমরা অহমিকার বা তাহার শক্তির সেবা আর করি না, বিশ্বের প্রভু ও তাঁহার ক্রমবিকাশশীল আবেগ ও প্রেরণার বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করি। প্রতিপদে আমরা সংস্কৃত শ্লোকের ভাষায় বলি "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" 'হে প্রভু হৃষীকেশ আমার হৃদয়ে স্থিত হইয়া যাহাতে আমাকে নিযুক্ত কর আমি তাহাই করি।' কিন্তু তথাপি এই ক্রিয়া অত্যন্ত

পৃথক দুই প্রকারের হইতে পারে—একটা শুধু আলোকিত, অপরটি মহত্তর পরা প্রকৃতিতে উন্নীত ও রূপান্তরিত। কারণ আমরা আমাদের প্রকৃতি ও তাহার অহংগত ভ্রান্তি দ্বারা 'যন্ত্রারূঢ়বৎ' আবর্ত্তিত হইয়া সেই প্রকৃতি যে পথ গ্রহণ ও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে সেই পথে চলিতে থাকিতে পারি ; শুধু বর্ত্তমানে যন্ত্রের কর্ম্ম কৌশল এবং যাহাকে আমরা জগতের পশ্চাতে অবস্থিত বলিয়া এখন অনুভব করিতেছি কর্ম্মের সেই প্রভু তাঁহার বিশ্বব্যাপারের উদ্দেশ্য সে যন্ত্রকে কিরূপে কাজে লাগাইতেছেন তাহা পূর্ণরূপে বুঝিয়া চলি। অনেক মহাযোগা আধ্যাত্মিকতা দ্বারা বিভাবিত মনের ভূমিতে বস্তুতঃ এত দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে যে ইহাই শুধু করিতে হইবে তাহা নহে, কেননা বৃহত্তর এক অতিমানস সম্ভাবনা আছে। অধ্যাত্ম মানসক্ষেত্রের উপরে উঠিয়া পরাজননীর আদি দিব্য সত্যশক্তির সাক্ষাৎ ও জাগ্রত সান্নিধ্যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে কর্ম্ম করাও সম্ভব। আমাদের গতি সেই জননীর গতিধারার সহিত একীভূত ও তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া আমাদের সংকল্পকে তাঁহারই সংকল্পের সহিত এক ও অভিন্ন করিয়া, আমাদের সামর্থ্যকে তাঁহারই সামর্থ্যের মধ্যে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত তাঁহারই ক্রিয়াধারাকে পরম জ্ঞান-শক্তির মধ্যে ভগবানের দিব্য প্রকাশরূপে অনুভব করিব ; আর আমরা তখন জানিব ও বুঝিব যে রূপান্তরিত মন, প্রাণ ও দেহ তাহাদের উপরি-স্থিত এক পরম জ্যোতি ও শক্তির শুধু প্রণালী বা বাহন মাত্র, যে জ্যোতি ও শক্তির পদক্ষেপ অভ্রান্ত কেননা তাহা তাহার জ্ঞানে বিশ্বাতীত অখণ্ড ও পূর্ণ। আমরা এই জ্যোতি ও শক্তির যে শুধু গ্রহীতা বাহন বা যন্ত্র হইব তাহা নহে কিন্তু এক পরম উন্নত নিত্য অনুভূতির মধ্যে তাহার অংশীভূত হইয়া যাইব।

এই শেষ সিদ্ধিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেও, কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাঁহার পরম জ্যোতির্ম্ময় শিখরে না হইলেও তাঁহার চরম উদারতার মধ্যে আমরা ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারি ; কেননা তখন আমরা আর শুধু প্রকৃতি ও তাহার গুণত্রয়কে যে অনুভব করিতেছি তাহা নহে কিন্তু আমাদের দৈহিক গতিবিধিতে, প্রাণ ও স্নায়ুযন্ত্রের প্রতি ক্রিয়াতে, মনের ভাবনাতে আমরা দেহ মন প্রাণ অপেক্ষা বৃহত্তর এক শক্তির সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছি, যে শক্তি আমাদের সসীম যন্ত্রাবলীকে অধিকার করিয়া তাহাদের সকল গতি ও ক্রিয়া পরিচালিত করিতেছে। তখন আর আমাদের বোধ হয় না যে আমরাই চলিতেছি ভাবিতেছি বা অনুভব করিতেছি, আমরা বোধ করি যে সেই তত্ত্বই আমাদের মধ্যে চলিতেছে ভাবিতেছে এবং অনুভব করিতেছে। এই যে শক্তিকে আমরা অনুভব করিতেছি তাহা হইল ভগবানের বিশ্বশক্তি, যাহা প্রকট

বা প্রচ্ছন্নভাবে সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া করিতেছে অথবা বিশ্বের সকল সত্তাকে তাঁহার নিজ সামর্থ্য ব্যবহার করিবার অনুমতি দিতেছে। এই একমাত্র শক্তিই বর্ত্তমান আছে এবং একমাত্র ইহাই ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ক্রিয়া সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। কেননা এই শক্তিই হইল দেহে বল রূপে অধিষ্ঠিত স্বয়ং ভগবান, কর্ম্মশক্তি ভাবনা ও জ্ঞানশক্তি, প্রভুত্ব ও ভোগের শক্তি, প্রেমের শক্তি—সকল শক্তিই সেই এক বস্তু। যিনি নিজেই এই অদ্বয় শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন এবং এই শক্তির মধ্য দিয়া সব কিছু অধিকার ও ভোগ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন, সকল সত্তা ও সকল ঘটনারূপে সম্ভূত হইয়া উঠিতেছেন, কর্ম্মের সেই প্রভুর সম্বন্ধে সকল বস্তুতে, যেমন নিজেদের তেমনি অপর সকলের মধ্যে সদা সচেতন হইয়া আমরা কর্ম্মযোগের মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে দিব্য মিলনে পৌঁছিব এবং কর্ম্মের মধ্যে সেই সার্থকতা দ্বারা অন্যে যাহা পরম ভক্তি বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার সমস্তই লাভ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু সম্মুখে উত্তরণের আরও একধাপ আছে যাহা আমাদিগকে ডাক দিতেছে; তাহা হইল বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ হইতে উপরে উঠিয়া বিশ্বাতীত দিব্যপুরুষের সহিত তাদাত্ম্যলাভ। আমাদের কর্ম্মের ও আমাদের সত্তার প্রভু এখানে এ জগতে শুধু আমাদের অন্তরস্থ পরম দেবতা নহেন, তিনি কেবল বিশ্বপুরুষ বা কোন প্রকার বিশ্বশক্তিও নহেন। এক ধরণের সর্ব্বেশ্বরবাদী (Pantheist) আমাদিগকে যে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে জগৎ ও ভগবান এক ও অভিন্ন বস্তু, তাহা সত্য নহে। জগৎ ভগবান হইতে নিঃসৃত এক বস্তু; জগতের মধ্যে যাহা অভিব্যক্ত হইতেছে কিন্তু তাহা দ্বারা সীমিত হয় নাই এমন কিছুর উপরই তাঁহার অস্তিত্ব নির্ভর করে; ভগবান যে কেবল এইখানেই আছেন তাহা নহে; তাঁহার একটা পরাৎপর শাশ্বত বিশ্বাতীত স্থিতিও আছে। আমাদের ব্যষ্টি-সত্তাও তাঁহার আধ্যাত্মিক অংশে বিশ্বসত্তার রূপায়ণ নহে; আমাদের অহমিকা মন প্রাণ ও দেহ তাহা হইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের অবিনাশী অন্তরাত্মা, অবিকারী পুরুষ আসিয়াছে পরাৎপর তত্ত্ব হইতে।

যিনি আমাদের সত্তার আদি কারণ, আমাদের কর্ম্মাবলির উৎস ও প্রভু তিনি এক পরাৎপর তত্ত্ব, যিনি সমগ্র বিশ্ব ও সমগ্র প্রকৃতির অতীত হইয়াও বিশ্ব ও প্রকৃতিকে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, যিনি নিজের কিছুটা লইয়া তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আজিও যাহা হইয়া উঠে নাই সেইরূপে

তাহাকে গঠিত করিতেছেন। কিন্তু বিশ্বাতীত চেতনার আসন ঊর্দ্ধে দিব্য পরমসতের তৎস্বরূপতার মধ্যে অবস্থিত—আবার সেখানেই রহিয়াছে শাশ্বতের পরাশক্তি, চরম সত্য ও পরম আনন্দ ; আমাদের মনন শক্তি যাহার কোন ধারণা করিতে পারে না, আমাদের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি আধ্যাত্মিকতা বিভাবিত মনে ও হৃদয়ে যাহার শুধু এক খর্ব্ব প্রতিবিম্ব, এক অস্পষ্ট ছায়া, তদুৎপন্ন একটা ক্ষীণ আভাস। আর সেই তৎস্বরূপ হইতে নিয়ত বিচ্ছুরিত হইতেছে আলোক শক্তি আনন্দ ও সত্যের একপ্রকার এক সুবর্ণময় জ্যোতির্মণ্ডল যাহাকে এক অতিমানস এক মহাবিজ্ঞান (gnosis) বলা হয়, প্রাচীন রহস্যবিদ সাধকগণ যাহাকে এক দিব্য ঋতচিৎ বলিতেন যাহার সঙ্গে অবিদ্যা পরিচালিত অধস্তন চৈতন্যময় এই জগতের এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, আর একমাত্র যাহা এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহার জন্য তাহা বিশ্লিষ্ট ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া এক নির্ঋতি বা মহাবিশৃঙ্খলায় পরিণত হইতেছে না। আজ আমরা যাহাকে বিজ্ঞান (gnosis) বোধি বা ঊর্দ্ধ হইতে উদ্ভাসন বলিয়া তৃপ্ত হই তাহা জ্বলন্ত শিখাবিস্তারী এই পরিপূর্ণ উৎস, এই অতিমানস হইতে আগত ক্ষীণতর কিরণমালা মাত্র ; মানুষের সর্ব্বোচ্চ বুদ্ধি এবং এই ভাস্বর উৎসের মধ্যে উচ্চতম মন বা অধিমানসের ক্রমোর্দ্ধগামী নানা স্তর আছে এবং তথায় পৌঁছিবার অথবা তাহার জ্যোতি ও মহিমাকে এখানে নামাইয়া আনিবার পূর্ব্বে আমাদের তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে। তথাপি সে আরোহণ, সে বিজয় লাভ যতই দুরূহ হউক না কেন তাহাই মানবাত্মার নিয়তি, আর সেই জ্যোতির্ম্ময় অবতরণ বা দিব্য সত্যকে নামাইয়া আনাই পার্থিব প্রকৃতির কষ্টসাধ্য পরিণতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ; এই উদ্দিষ্ট উত্তরণই পরিণতিধারার অস্তিত্বের কারণ আমাদের প্রগতির চরম অবস্থা এবং আমাদের জাগতিক জীবনের নিগূঢ় মর্ম্ম। কেননা, যদিও পরাৎপর দিব্যবস্তু পুরুষোত্তমরূপে এখানে আমাদের রহস্যময় জীবনের হৃদ্দেশে গোপনে অবস্থিত রহিয়াছেন তথাপি তিনি তাঁহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবসম্পন্ন বিশ্বব্যাপী যোগমায়ার বহু আবরণ ও ছদ্মবেশে সমাবৃত আছেন ; এই পার্থিব দেহে মানবাত্মার শুধু ঊর্দ্ধারোহণ ও বিজয়লাভের ফলে এই সকল ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িতে এবং সক্রিয় পরম সত্য, সৃষ্টিশীল বিভ্রমের জনক জটপাকানো অর্দ্ধসত্যের এই জাল বিদূরিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে ; আর এই অর্দ্ধসত্য এই বিকাশমান জ্ঞান মূলতঃ হইল সেই বস্তু যাহা নিমজ্জিত হইয়া জড়ের নিশ্চেতনাতে পরিণত হইয়াছিল আবার ধীরে ধীরে আংশিকভাবে নিজের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এই কার্য্যকরী অবিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কারণ এখানে এই জগতে যদিও জীবনের পশ্চাতে গোপনে বিজ্ঞানঘন শক্তি রহিয়াছে কিন্তু তাহা ক্রিয়া করিতেছে না, ক্রিয়া করিতেছে জ্ঞান-অজ্ঞানের এক ইন্দ্রজাল, দুর্জ্ঞেয় অথচ আপাতপ্রতীয়মান এক যান্ত্রিক অধিমানস মায়া। এখানে ভগবান আমাদের নিকট এক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতীয়মান হন, সম নিষ্ক্রিয় ও নৈর্ব্যক্তিক এক সাক্ষী-আত্মারূপে স্থির অচঞ্চল অনুমন্তা এক পুরুষরূপে, যিনি গুণ অথবা দেশ বা কালের দ্বারা আবদ্ধ নহেন, যিনি নিরপেক্ষভাবে আশ্রয় দেন বা অনুমোদন করেন সেই সকল ক্রিয়া ও শক্তির খেলাকে, পরম সংকল্প (**transcendent will**) এই বিশ্বে নিজদিগকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য যাহাদিগকে একদা অনুমতি দিয়াছে এবং নিয়োগ করিযাছে। মনে হয় যেন এই সাক্ষী-পুরুষ সর্ব্বভূতের মধ্যস্থিত এই অচল আত্মা কিছুই ইচ্ছা করেন না, কিছুই নির্দ্ধারিত করেন না ; তথাপি আমরা বুঝিতে পারি যে তাহার এই নিষ্ক্রিয়তা, তাহার এই নীরব অধিষ্ঠানই সর্ব্ববস্তুকে তাহাদের অজ্ঞানের মধ্যেও বাধ্য করিয়া এক দিব্য লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছে, ভেদের মধ্য দিয়া আজিও অনধিগত এক একত্বের দিকে আকৃষ্ট কবিয়া লইতেছে। তথাপি অব্যর্থ দিব্য পরম সংকল্প যে তথায় আছে তাহা মনে হয় না, মনে হয় এক বিরাট বিস্তৃত বিশ্বশক্তি অথবা এক যান্ত্রিক কার্য্যকরী প্রণালী বা প্রকৃতিমাত্র আছে। বিশ্বাত্মার এই একটা দিক ; তাঁহারই অপব দিক সর্ব্বব্যাপী ভগবান-রূপে তিনি নিজেকে উপস্থিত করেন যিনি সত্তায় এক ও অদ্বিতীয়, ব্যক্তিত্ব ও শক্তিতে বহু ; যখন আমরা তাঁহার বিশ্বশক্তির চেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট হই তখন যিনি আমাদের মধ্যে অনন্ত গুণ সংকল্প ও ক্রিয়ার, বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের ও এক অথচ অসংখ্য আনন্দের বোধ জাগাইয়া তোলেন ; কেননা তাঁহার মধ্য দিয়া আমরা সর্ব্বভূতের সঙ্গে শুধু তাহাদের স্বরূপ সত্তাতে নয় পরন্তু তাহাদের ক্রিয়ার খেলায়ও এক হইয়া যাই, আমরা নিজদিগকে যেমন সর্ব্বের মধ্যে তেমনি সর্ব্বকে নিজেদের মধ্যে দেখি ; সকল জ্ঞান ভাবনা ও সংবেদন এক অদ্বয় মন ও হৃদয়ের গতিবৃত্তিরূপে, সকল ক্রিয়া ও শক্তিকে এক অদ্বয় সংকল্প শক্তির গতিধারারূপে, সকল জড়বস্তু ও রূপ এক অদ্বয় দেহের নানা কণিকা বা অবয়বরূপে, সকল ব্যক্তিত্বকে এক মহা ব্যক্তিপুরুষের অভিক্ষেপ রূপে, সকল অহমিকাকে এক ও অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ধ্রুব অহংএর বিকৃতি বলিয়া অনুভব করি। তাঁহার মধ্যে আমরা আর তখন পৃথক সত্তারূপে থাকি না, আমাদের সক্রিয় অহংকে তখন সার্ব্বভৌম গতির মধ্যে হারাইয়া ফেলি—যেমন হারাইয়া ফেলি এক সার্ব্বভৌম শান্তির মধ্যে আমাদের নিষ্ক্রিয় স্থিতিশীল অহংকে, যিনি নির্গুণ এবং চির নিঃসঙ্গ ও উদাসীন সেই সাক্ষী-পুরুষের মধ্যে।

তথাপি কূটস্থ দিব্য নীরবতা এবং সর্ব্বালিঙ্গনকারী দিব্য ক্রিয়া ভগবানের এই দুই বিভাবের মধ্যে একটা বিরোধ থাকিয়া যায়, যে বিরোধ আমাদের মধ্যে এক উচ্চ অবস্থায় এক প্রকারে আমরা মিটাইতে পারি আর আমাদের মনে হইতে পারে যে পূর্ণরূপেই বুঝি মিটিয়া গেল কিন্তু তখনও পূর্ণরূপে মিটে না, কেননা তাহা পূর্ণরূপে রূপান্তর ও বিজয়লাভ করিতে পারে না। একটা সার্ব্বভৌম শান্তি আলোক শক্তি ও আনন্দ আমরা পাই বটে, কিন্তু তাহার এই কার্য্যকরী প্রকাশে তাহা ঋতচিৎ বা দিব্য বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি নয়, তথাপি যদিও ইহাতে আমরা অপরূপভাবে মুক্ত উন্নত ও আলোকিত হই তবু এ অবস্থা শুধু বিশ্বপুরুষের বর্ত্তমান আত্মপ্রকাশের ভিত্তিমাত্র, বিশ্বাতীত ভাবের অবতরণ ঘটিলে অবিদ্যার দুর্ব্বোধ্য প্রতীকচয় এবং প্রচ্ছন্ন রহস্যরাজি যেরূপ রূপান্তরিত হইয়া যায় ইহা দ্বারা তাহা ঘটে না। তখন আমরা মুক্ত হই বটে কিন্তু পার্থিব চেতনার বন্ধন ঘুচে না; শুধু আরও অগ্রসর হইয়া জগদতীত রাজ্যে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ ঘটিলে বিরোধ পূর্ণরূপে মিটিতে, রূপান্তর সাধিত হইতে এবং পূর্ণমুক্তি আসিতে পারে।

কারণ কর্ম্মের প্রভুর তৃতীয় আর একটি অতি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত বিভাব আছে, যাহা তাঁহার সর্ব্বোত্তম গুহ্যরহস্য ও পরম আনন্দের চাবিকাঠি; কেননা তিনি একদিকে নিগূঢ় বিশ্বাতীত ভাবের রহস্য, এবং অন্যদিকে বিশ্বগতি বা ক্রিয়ার দুর্ব্বোধ্য প্রকাশ এই উভয় হইতে এক ব্যষ্টি দিব্যশক্তিকে মুক্ত করেন, যাহা এই দুই-এর মধ্যে মধ্যস্থতা এবং ইহাদের এক হইতে অপরে আমাদের যাওয়ার পথে সেতুর কাজ করিতে পারে। এই বিভাবে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত দিব্য পুরুষ নিজে আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন ব্যক্তিসত্তার অনুরূপ হন এবং আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত এক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, যুগপৎ আমাদের পরম আত্মারূপে আমাদের সহিত একীভূত এবং তথাপি এই বৃহৎ বিশ্বলীলায় বিভিন্ন অথচ অতি অন্তরঙ্গরূপে আমাদের প্রভু ও সখা, প্রেমিক ও গুরু, পিতা ও মাতা এবং খেলার সাথী হন; আবার তিনিই তো বন্ধু ও শত্রু, সহায় ও বিরোধীর ছদ্মবেশ ধরিয়া, যাহা আমাদিগকে প্রভাবিত করে সেই সকল সম্বন্ধ ও সমস্ত কর্ম্মধারার মধ্যে আমাদিগকে আমাদের পূর্ণতা ও মুক্তির দিকে এতাবৎকাল পরিচালিত করিয়া লইয়া আসিতেছেন। এই অধিকতর ব্যক্তিভাবাপন্ন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ বিশ্বাতীত উপলব্ধির কিছু সম্ভাবনার মধ্যে আমাদিগকে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া হয়; কেননা তাঁহার মধ্যে আমরা পরম একের সাক্ষাৎ পাই, সাক্ষাৎ পাই কেবল মুক্ত নিস্তব্ধতা ও শান্তির মধ্যে নয়

অথবা শুধু আমাদের কর্ম্মের নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় নিবেদনের দ্বারা নহে অথবা যে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও শক্তি আমাদিগকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং পরিচালিত করিতেছে কেবল তাহার সহিত মিলনের পরম রহস্যের ভিতর দিয়াও নহে ; বরং যে দিব্য প্রেম ও দিব্য আনন্দের পরমোল্লাস নীরব সাক্ষী-পুরুষ এবং সক্রিয় বিশ্বশক্তি এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে বৃহত্তর পরম আনন্দঘন রহস্যের এক প্রত্যক্ষসিদ্ধ অলৌকিক ভাবি লক্ষ্যের উপলব্ধির দিকে ছুটিয়া চলে তাহার দ্বারা। কারণ, অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের (Absolute) দিকে লইয়া যায় যে জ্ঞান কিম্বা জাগতিক প্রণালী ও পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকারণ পরম জ্ঞাতা ও প্রভুর নিকট তুলিয়া লয় যে কর্ম্ম এ উভয়ে ততটা নহে, যতটা আমাদের অতি অন্তরঙ্গ অথচ আজিও অতি তমসাচ্ছন্ন এই বস্তু তাহার আবেগময় আবরণের অন্তরালে আমাদের জন্য প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষা করিতেছে পরাৎপর পরমেশ্বরের গভীর পরমসুখকর রহস্য এবং তাহার পরিপূর্ণ সত্তার এক চরম প্রত্যক্ষসিদ্ধতা (positiveness) তাহার একান্ত ঘনীভূত পরম কল্যাণ ও রহস্যময় পরম আনন্দ।

কিন্তু ভগবানের সহিত ব্যষ্টি ব্যক্তির সম্বন্ধ সর্ব্বদা অথবা প্রথম হইতেই একটা বিশালতম প্রসারতা অথবা একটা উচ্চতম আত্ম-অতিক্রমণ কার্য্যকরীরূপে আনয়ন করে না। প্রথম দিকে এই ভগবানকে আমাদের সত্তার একান্ত সান্নিধ্যে অথবা আমাদের অন্তরে অনুস্যূত বলিয়া পূর্ণরূপে আমরা অনুভব করিতে পারি শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও অনুভূতির গণ্ডীর মধ্যে, অনুভব করিতে পারি আমাদের নেতা ও প্রভুরূপে, দিশারী ও গুরুরূপে, সখা ও প্রেমিকরূপে অথবা এরূপ এক আত্মা, শক্তি বা সান্নিধ্যরূপে যাহা আমাদের উর্দ্ধমুখী এবং বহির্বিস্তারশীল গতিবৃত্তিকে তাঁহার অন্তরঙ্গ সত্যের দ্বারা সংগঠিত ও উন্নীত করিতেছে, যে সত্য আমাদের হৃদয়েই বাস করিতেছে অথবা আমাদের উচ্চতম বুদ্ধিরও উপর হইতে আমাদের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এখানে যে কাজে তাহা অভিনিবিষ্ট তাহা হইল আমাদের ব্যক্তিগত ক্রমপরিণতি, একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিরক্ষণ, যাহাতে থাকে আমাদের আনন্দ ও সার্থকতা এবং যাহাতে হয় আমাদের প্রকৃতিকে তাঁহার দিব্য প্রতিমূর্ত্তিরূপে সংগঠন আর তাহাই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও পূর্ণতা। মনে হয় যেন বাহিরের জগৎ আমাদের পরিণতির এক ক্ষেত্ররূপেই শুধু বর্ত্তমান আছে, আমাদের সত্তার স্তর-পরম্পরার জন্য উপাদানরাজি অথবা সহায়কারী এবং বিরোধী শক্তিসমূহের আয়োজন বা সরবরাহ করাই তাহার কার্য্য। সেই জগতে আমরা যাহা করি তাহা ভগবানেরই কাজ, এমন কি যখন সে কাজ কোন সাময়িক সর্ব্বজনীন

লক্ষ্যের জন্য করা হয় তখনও আমাদের কাছে তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের ও জগতের মধ্যে অনুস্যূত এই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধকে বাহিরে সক্রিয় রূপ দেওয়া অথবা ভিতরে শক্তিমান করিয়া তোলা। অনেক সাধক ইহা অপেক্ষা বেশী আর কিছু চাহেন না অথবা ইহাই চাহেন যে এ জগতের পরপারে দিব্যধামসমূহে গিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিকতার এই পরম পরিস্ফুরণ চলিতে থাকুক ও সার্থকতা লাভ করুক; চাহেন তাহার পূর্ণতা, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের কোন শাশ্বত আবাস ভূমিতে ভগবানের সহিত মিলন পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী হউক। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধক ইহাতেও তৃপ্ত হইতে পারে না; পৃথক ব্যক্তিগত সিদ্ধি যতই সুতীব্র ও সুন্দর হউক না কেন তাহাই তাহার সমগ্র লক্ষ্য বা তাহার সমগ্র সত্তা বা জীবন হইতে পারে না। এমন একটা সময় আসা চাই যখন ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তার মধ্যে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিবে; আমাদের আধ্যাত্মিক, মনোময়, প্রাণময় এমন কি অন্নময় এক কথায় আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব সর্ব্বজনীন হইয়া যাইবে; তখন দেখা যাইবে যে তাহা বিশ্বশক্তি ও বিশ্বপুরুষেরই এক শক্তি অথবা যখন ব্যক্তিচেতনা নিজের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধমুখে বিশ্বাতীতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং চারিদিকে অনন্তের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে তখন সে চেতনার মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় প্রসারতা আসিয়া পড়িবে তাহার মধ্যে বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

যে যোগ আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত মনোময় ভূমিতে পূর্ণরূপে বাস করে তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত বা অন্তর্ভব (Immanent), বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত, ভগবানের এই তিন মূল বিভাব পৃথক পৃথক উপলব্ধিরূপে দেখা দিতে পারে এমন কি সচরাচর দিয়া থাকে। মনে হয় যেন ইহাদের প্রত্যেকটি একাই সাধকের আকৃতি পূরণ করিতে পারে। অন্তর হৃদয়ের জ্যোতিরুদ্ভাসিত গোপন মণিকোঠাতে সাধক ব্যষ্টি ভগবানের সহিত নিভৃতে থাকিয়া তাহার প্রেমাস্পদের প্রতিরূপে নিজের সত্তাকে গড়িয়া তুলিতে এবং নিজের পতিত প্রকৃতির মধ্য হইতে উঠিয়া আত্মাপুরুষের কোন দিব্যধামে তাঁহার সহিত বাস করিতে পারে। বিশ্বের বিরাট বিশালতার মধ্যে নির্ম্মুক্ত হইয়া অহমিকার বন্ধন ছেদন করিয়া তাহার ব্যষ্টিসত্তা বিশ্বশক্তির ক্রিয়াধারার একটি বিন্দু বা একটি কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে; তখন শান্ত, পাশমুক্ত, সার্ব্বভৌম বস্তুর মধ্যে মৃত্যুহীন হইয়া অপার দেশ ও কালের

মধ্যে অসীম প্রসারতা লাভ করিয়াও সাক্ষী-আত্মার মধ্যে নিশ্চলভাবে থাকিয়া সাধক এই জগতের মধ্যে কালাতীতের পরম মুক্তি উপভোগ করিতে পারে। আবার এক অনির্ব্বচনীয় বিশ্বাতীত তত্ত্বের দিকে একাগ্র হইয়া, নিজের ব্যক্তিত্বকে বর্জন করিয়া বিশ্বক্রিয়ার সকল প্রচেষ্টা ও দুঃখকষ্টকে নিজের মধ্য হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে অবর্ণনীয় এক নির্ব্বাণের মধ্যে পলায়ন করিতে, যাহার সহিত কোন কিছুর সম্বন্ধ বা যোগাযোগ নাই তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য সব কিছুর প্রতি অসহিষ্ণু এক পরমানন্দে সব কিছুকে মুছিয়া ফেলিতে পারে।

কিন্তু পূর্ণযোগের উদার পবিপূর্ণতা যে চায় সে এই তিন উপলব্ধির কোনটিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। ব্যক্তিগত মুক্তি তাহার নিকট যথেষ্ট নহে; কেননা সে দেখিতে পায় যে এমন এক বিশ্বচৈতন্যে সে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে নিজের উদারতা ও বিশালতায় যাহা সসীম ব্যক্তিগত সিদ্ধির সংকীর্ণতর তীব্রতাকে বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, আর সে চৈতন্যের ডাক অলঙ্ঘনীয়; এই বিশাল ডাকে বাধ্য হইয়া তাহাকে সকল সীমার বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিতেই এবং সমগ্র বিশ্বকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া উৰ্দ্ধেও, পরমপুরুষ হইতে এই জীব-জগতে অবতীর্ণ এক সক্রিয় পরম সিদ্ধি আত্ম-প্রকাশের জন্য সনির্ব্বন্ধভাবে তাহার উপর চাপ দিতেছে; আর বিশ্বচেতনাকে একপ্রকারভাবে বেষ্টন ও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেই সেই সিদ্ধি সেই সমৃদ্ধি ও সমারোহ—যাহা আজিও নিজেকে ঢালিয়া দেয় নাই—এখানে অভিব্যক্তির মধ্যে মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু বিশ্বচৈতন্যও প্রচুর নহে, কেননা তাহা দিব্য পরমসত্যের সবানী নহে, নিজে পূর্ণাঙ্গ নহে। ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে এক দিব্য রহস্য আছে যাহা সাধককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; এখানে কালের ক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তভাবে প্রকাশিত হইবার জন্য বিশ্বাতীতের রূপগ্রহণের এক নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। বিশ্বচেতনায় উচচতম জ্ঞানের শেষ-প্রান্তে এক ফাঁক এক অসম সমীকরণ (unequal equation) থাকিয়া যায়, সে চেতনা মুক্তি দিতে পারে কিন্তু যে শক্তি আপাতদৃষ্টিতে এক সীমিত জ্ঞান ব্যবহার করিতেছে অথবা বহিশ্চর এক অজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখিয়াছে তাহার দ্বারা এ কার্য্য সাধন করিতে পারে না। তাহা সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু যাহা সৃষ্টি করে তাহা হয় এক অপূর্ণতা না হয় সসীম, অচিরস্থায়ী এবং শৃঙ্খলিত এক পূর্ণতা। তখন একদিকে রহিয়া যায় এক স্বতন্ত্র নিষ্ক্রিয় সাক্ষীপুরুষ, আর অন্য প্রান্তে থাকে এক বদ্ধ কর্ম্ম-কর্ত্রী, কর্ম্মের সকল উপায়

যাহাকে দেওয়া হয় নাই। মনে হয় সঙ্গী অথচ পরস্পরবিরোধী এই দুই বস্তুর সামঞ্জস্যবিধান এখনও যাহা আমাদের ঊর্দ্ধস্থিত তেমন এক অপ্রকট তত্ত্বের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য ধৃত সংরক্ষিত ও স্থগিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও সত্য যে চরম কোন বিশ্বাতীত তত্ত্বের মধ্যে শুধু পলাইয়া গেলে ব্যক্তিত্ব অপূর্ণ এবং বিশ্বক্রিয়া ব্যথ ও নিরথক থাকিয়া যায়, পূর্ণযোগের সাধক তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে না। সে অনুভব করে যে নিত্য-সত্য বস্তু এক শক্তিও বটে যাহার যেমন শাশ্বত স্থিতি তেমনি সৃষ্টি-সামর্থ্যও আছে; ইহা শুধু ভ্রমময় বা অজ্ঞান অভিব্যক্তির শক্তি নহে। শাশ্বত সত্য-বস্তু কালের ক্ষেত্রে নিজের সত্য সকলকে প্রকট করিতে পাবে, তাহা শুধু নিশ্চেতনা ও অজ্ঞানে নয় জ্ঞানেও সৃষ্টি করিতে সক্ষম। দিব্যের অবতরণের সম্ভাবনা দিব্যে উত্তরণের সম্ভাবনা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে: ভবিষ্যৎ-পূর্ণতা এবং বর্ত্তমান মুক্তি এই উভয়কে নামাইয়া আনিবার আশা সত্য সত্যই আছে। যেমন সাধকের জ্ঞানের প্রসারতা বাড়িতে থাকে, তেমনিই তাহার কাছে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে যে এই জন্যই কর্ম্মের প্রভু এই অন্ধকারের মধ্যে তাহার দিব্য অগ্নির এক স্ফুলিঙ্গ অন্তরাত্মারূপে তাহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন যাহাতে সেই স্ফুলিঙ্গ তথায় চিরশাশ্বত আলোকের এক কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে।

বিশ্বাতীত বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত এই তিন শক্তি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে; ত্রয়ী-তত্ত্বরাজির এইটিই প্রথম। চেতনার উন্মীলনেও এই তিনটি হইল মূল বিভাব এবং যদি আমরা সত্তার সমগ্র সত্যকে অনুভব করিতে চাই তাহা হইলে তাহাদের কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না। ব্যক্তিত্বের মধ্য হইতে আমরা এক বিশালতর মুক্ততর বিশ্বচেতনার মধ্যে জাগিয়া উঠি; কিন্তু বিশ্বচেতনা এবং তাহার রূপ ও শক্তির জটিলতার মধ্য দিয়াও এক বৃহত্তরভাবে নিজেকে অতিক্রম করিয়া কেবল-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এক অসীম চৈতন্যের মধ্যে উন্মিষিত হইতে হইবে। আর তথাপি এই উত্তরণে আমরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই বিলোপসাধন করি না, কিন্তু যাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি বলিয়া মনে হয় তাহাকে লইয়া চলি এবং রূপান্তরিত করি; কেননা ঊর্দ্ধে এমন একটা ভূমি আছে যেখানে এই তিন তত্ত্ব শাশ্বতভাবে পরস্পরের মধ্যে বাস করে, সেই শিখরদেশে তাহাদের সুসঙ্গত একত্বের বন্ধনে তাহারা পরমানন্দে মিলিত হইয়া আছে। কিন্তু এই শিখর উচ্চতম ও বৃহত্তম অধ্যাত্মমানসেরও উপরে অবস্থিত, যদিও তাহার কিছু প্রতিফলন সেখানেও অনুভব করা যাইতে

পারে ; সে অবস্থা লাভ বা তথায় বাস করিতে হইলে মনের পক্ষে নিজেকে অতিক্রম করিয়া অতিমানসের বিজ্ঞানময় জ্যোতি শক্তি ও ধাতুতে রূপান্তরিত হইতে হইবে। এই নিম্নতর খর্ব্ব চেতনাতে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে ; যথানুক্রমে বা যথাযোগ্য শ্রেণীতে সমাবেশ তখন সম্ভব হইতে পারে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিগলিত ও পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া যুগপৎ সকলের সার্থকতা সাধিত হইবে না। কোনপ্রকার উচচতর সিদ্ধিলাভের জন্য মনের উপরে উঠা একান্ত আবশ্যক। নয়ত চাই এক উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহার ফলস্বরূপ স্বয়ম্ভূ সত্যের এক সক্রিয় অবতরণ, যে সত্য প্রাণ ও জড়ের অভি-ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতেই মনের ঊর্দ্ধে আত্মজ্যোতির মধ্যে শাশ্বতকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে।

কেননা মনই সদসদাত্মিকা মায়া ; সত্য এবং মিথ্যা সৎ ও অসৎ এই উভয়কে বিজড়িত করিয়া এক ক্ষেত্র আছে, সেই দ্ব্যর্থবোধক ক্ষেত্রে মন যেন রাজত্ব করিতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিজের রাজত্বেও তাহা এক খর্ব্ব চেতনা, শাশ্বত অনন্তের মূল সৃষ্টিশীলা মহাশক্তির অংশ নহে। যদিও মন তাহার সত্তাতে স্বরূপসত্যের কিছুটা প্রতিফলিত করিতে পারে তথাপি তাহার মধ্যে সত্যের সক্রিয় শক্তি ও ক্রিয়া সর্ব্বদাই ভগ্ন ও বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন বড় জোর বিভক্ত অংশগুলিকে জোড়া দিতে অথবা একটা একত্ব যে আছে তাহা শুধু অনুমান করিতে পারে ; মনের সত্য একটা অর্দ্ধসত্যমাত্র অথবা তাহা একটা হেঁয়ালী বা ধাঁধার অংশ। মানস জ্ঞান সর্ব্বদাই আংশিক ও আপেক্ষিক, কোন নিশ্চয় সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার শক্তি তাহার নাই, তাহার বহির্গমনশীল ক্রিয়া ও সৃষ্টির পথে পদে পদে তাহা আরও অধিক বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে অথবা শুধু সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অপূর্ণভাবে জোড়াতালি দিয়া সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কিছুতে পৌঁছে। এই ক্ষীণতর চেতনার মধ্যেও মনোময় আত্মারূপে ভগবান ব্যক্ত হন, যেমন তিনি প্রাণে প্রাণময় আত্মারূপে বিচরণ করেন অথবা যেমন জড়ে আরও অস্পষ্টভাবে অন্নময় আত্মারূপে বাস করেন ; কিন্তু এখানে তাঁহার পরিপূর্ণ সক্রিয় প্রকাশ হয় না, এখানে শাশ্বতের পূর্ণ তাদাত্ম্য-জ্ঞানরাজি জাগে না। যখন আমরা সীমারেখা পার হইয়া যেখানে দিব্যসত্য আগন্তুক নয় আপন জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সেই বৃহত্তর জ্যোতির্ম্ময় চেতনা ও আত্ম-সচেতন সদ্‌বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিব কেবল তখনই তাঁহার সত্তায়, শক্তি ও ক্রিয়াধারায় অবিনাশী পূর্ণাঙ্গ সত্যের মধ্যে আমাদের সত্তার প্রভু আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবেন। আর কেবল সেখানেই

আমাদের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মরাজি তাঁহার অব্যর্থ অতিমানস লক্ষ্যের নিখুঁত গতিধারা হইয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু ইহা তো হইল এক দীর্ঘ ও দুরূহ অভিযানের শেষ কথা ; তবে কর্ম্মের প্রভু যোগপথারূঢ় সাধকের সহিত মিলিত হইতে এবং তাঁহার গোপন অথবা অর্দ্ধপ্রকট হস্ত তাহার এবং তাহার অন্তরজীবন ও কর্ম্মের উপর স্থাপিত করিতে ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন না। নিশ্চেতনার ঘন আবরণের অন্তরালে, প্রাণশক্তির মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রতীক দেবতা ও মূর্ত্তির মধ্য দিয়া মনের নিকট পরিদৃশ্যমান হইয়া তিনি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও গ্রহীতা-রূপে পূর্ব্ব হইতেই জগতের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। এরূপ হইতে পারে যে এই সমস্ত ছদ্মবেশ ধরিয়াই পূর্ণাঙ্গ যোগপন্থার জন্য নির্দ্দিষ্ট অন্তরাত্মার সহিত তিনি প্রথমে সম্মিলিত হন। অথবা এমন কি আরও দুর্ভেদ্য মুখোশে নিজেকে আবৃত করিয়া তিনি আমাদের কল্পনার পথে এক আদর্শরূপে উদিত হইতে পারেন অথবা আমাদের মনের কাছে প্রেম, মঙ্গল, সৌন্দর্য্য বা জ্ঞানের বস্তু-নিরপেক্ষ এক শক্তিরূপে দেখা দিতে পারেন ; আবার ইহাও হইতে পারে যে যখন আমরা যোগপথের দিকে ফিরি তখন মহামানবের ছদ্মবেশে অথবা সব কিছুর অভ্যন্তরস্থিত যে সংকল্প জগৎকে অন্ধকার, মিথ্যা, মৃত্যু ও দুঃখ, অজ্ঞানের এই চতুষ্পাদের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে সেই সংকল্পের প্রচ্ছন্নরূপে আমাদের নিকট আসিতে পারেন। তাহারপর, যখন আমরা পথে প্রবিষ্ট হইয়াছি তিনি তাঁহার বিরাট শক্তিমান ও মুক্তিপ্রদ নৈর্ব্যক্তিকতা দ্বারা আমাদিগকে পরিবেষ্টন করেন অথবা ব্যক্তিরূপী ভগবানের আকার ও বিগ্রহ লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে চতুর্দ্দিকে আমরা অনুভব করি যে এক শক্তি আমাদিগকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতেছে, রক্ষা করিতেছে, পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে ; আমরা শুনিতে পাই এক বানী যাহা আমাদের পথ দেখাইতেছে ; বুঝিতে পারি আমা-দের অপেক্ষা বৃহত্তর এক চেতন-সংকল্প আমাদিগকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ; এক অলঙ্ঘনীয় শক্তি আমাদের ভাবনা কর্ম্ম এমন কি আমাদের দেহ পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছে ; এক নিত্যবর্দ্ধমান মহাচৈতন্য আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতেছে, একটা জীবন্ত জ্ঞানের জ্যোতি আমাদের অন্তরের সব কিছুকে উদ্ভাসিত করিতেছে অথবা এক পরম আনন্দ আমাদিগকে

অধিকার করিবার জন্য আমাদিগের উপরে আপতিত হইতেছে : একটা বিরাট বাস্তব ও অপ্রতিরোধ্য সামর্থ্য উর্দ্ধ হইতে আমাদের উপর চাপ দিতেছে, নিজেকে একেবারে আমাদের প্রকৃতির উপাদানরাজির মধ্যে প্রবাহিত করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইতেছে ; তথায় আসীন রহিয়াছে এক শান্তি, এক আলোক, এক পরম কল্যাণ, এক শক্তি, এক মহত্ব। অথবা তথায় রহিয়াছে কত সব ব্যক্তিগত সম্বন্ধ যাহা জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, প্রেমের মতই মধুর, আকাশের মতই সর্ব্বব্যাপক, অগাধ সমুদ্রের মতই গভীর। আমাদের পাশে চলিয়াছেন এক পরম সখা ; হৃদয়ের গোপন মণিকোঠায় আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন এক মহাপ্রেমিক ; আমাদের কর্ম্ম ও অগ্নিপরীক্ষায় এক পরম প্রভুই আমাদের পথ দেখাইতেছেন ; বিশ্বস্রষ্টা আমাদিগকে তাঁহার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন, আমরা শাশ্বত মহাজননীর ক্রোড়েই রহিয়াছি। এই যে সমস্ত অধিকতর সহজবোধ্য বিভাবের মধ্য দিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরম প্রভু আমাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেছেন তাহা সত্য, শুধু সহায়কর প্রতীক বা উপকারী মানস কল্পনা নয় ; কিন্তু যতই আমরা যোগের পথে অগ্রসর হইতে থাকি ততই আমাদের অনুভূতি হইতে তাহাদের অপূর্ণ প্রাথমিক রূপায়ণরাজি সরিয়া যায় এবং তৎস্থানে তাহাদের পশ্চাতে স্থিত অখণ্ড সত্যের বৃহত্তর দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে থাকে। প্রতিপদে তাহাদের শুধু মন দিয়া গড়া মুখোশ খসিয়া পড়ে, তাহারা এক বৃহত্তর গভীরতর ঘনিষ্ঠতর অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠে। অবশেষে অতিমানস ভূমির সীমান্তে এই সমস্ত পবম দেবতার পবিত্র মূর্ত্তি একত্রে মিলিত হইয়া যায়, তাহারা কেহই বিলুপ্ত হয না, সকলে মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়। এই পথে দিব্য বিভাবরাজিকে পরে অপসারিত করা হইবে বলিয়া শুধু যে প্রকাশিত করা হইয়াছে তাহা নহে ; আধ্যাত্মিকতার পথে ক্ষণিক সুবিধা অথবা ভ্রমপূর্ণ চেতনার সহিত একটা আপোষ রফা করিবার জন্য এ সমস্ত বিভাব দেখা দেয় নাই অথবা যাহার সঙ্গে কোন যোগস্থাপন করা যায় না পরম ব্রহ্মের সেই অতিচেতনা হইতে রহস্যজনকভাবে আমাদের উপর অভিক্ষিপ্ত কোন স্বপ্নমূর্ত্তি তাহারা নয় ; পক্ষান্তরে যে পরম সত্য হইতে তাহারা আসিয়াছে যতই তাহারা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহাদের নিজেদের চরম স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

কেননা এখনও যাহা আমাদের নিকট অতিচেতন সেই পরাৎপর তত্ত্ব যেমন এক শক্তি তেমনিই এক সত্তা। এই বিশ্বাতীত অতিমানস তত্ত্ব অদ্ভুত এক শূন্য নয়, কিন্তু এক অবর্ণনীয় বস্তু, যে সব মূলবস্তু তাহা হইতে জাত হইয়াছে তাহারা চিরদিনই তাহার মধ্যে বর্ত্তমান আছে ; ইহাই সে সমস্তকে তথায়

তাহাদের পরম নিত্য সত্যের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক চরম অবস্থাতে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যাহা এখানে এক অসন্তোষজনক হেঁয়ালী সৃষ্টি করে, মায়াময় এক রহস্য উৎপাদন করে সেই ন্যূনতা বিভাগ ও অবনতি আমাদের উত্তরণের পথে আপনা হইতেই হ্রাস পায় এবং অবশেষে খসিয়া পড়ে, আর দিব্য শক্তিরাজি তাহাদের প্রকৃত রূপ ধারণ করে, যে পরমসত্য এখানে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহারই বিভাবরূপে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে পরিদৃশ্যমান হয়। নিজের সংবৃতি ও জড়তা, নিশ্চেতনার মধ্যস্থিত গোপনতা হইতে এক দিব্য অন্তরাত্মা এখানে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের কর্ম্মের অধীশ্বর ভ্রমরাজির প্রভু নহেন, তিনি পরম সত্য বস্তু, যিনি অজ্ঞানরূপ গুটি-পোকার মধ্য হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া নিজের স্বপ্রকাশ সত্যরাজিকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, যে গুটির গর্ভে ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে নিদ্রাগত রাখিতে হইয়াছিল। কেননা অতিমানসে উত্তরণ আমাদের বর্ত্তমান সত্তার একেবারে বাহিরে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্বন্ধশূন্য এক অবস্থা নহে। ইহা এক বৃহত্তর জ্যোতি যাহা হইতে এই সব কিছু অন্তরাত্মার এক অভিযানের জন্য আসিয়া নিশ্চেতনার মধ্যে পতিত হইয়াছে এবং আবার তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে এবং যতদিন সে অভিযান চলিতেছে ততদিন আমাদের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিবার অপেক্ষায় ইহা আমাদের মনের ঊর্দ্ধে অতিচেতন অবস্থায় রহিয়াছে। অতঃপর ইহা নিজের আবরণ উন্মুক্ত করিবে এবং সেই উন্মোচনের ফলে আমাদের সত্তা এবং আমাদের কর্ম্মের সকল তাৎপর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশ করিবে; কেননা ইহা ভগবানকেই ব্যক্ত করিবে এবং জগতে তাঁহার পূর্ণতর অভিব্যক্তি সেই গোপন তাৎপর্য্যকে মুক্ত ও সিদ্ধ করিয়া তুলিবে।

সেই প্রকাশে বিশ্বাতীত ভগবান পরম সত্তারূপে, যাহা কিছু আছে তাহাদের সকলের আদি কারণ বা পূর্ণ উৎসরূপে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে আমাদের জ্ঞানে ফুটিয়া উঠিবেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমভাবেই তাঁহাকে দেখিব কর্ম্ম ও সৃষ্টির প্রভুরূপে যিনি তাঁহার নিজের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে নিজেকে প্রবাহিত করিয়া দিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। বিশ্বচেতনা ও তাহার ক্রিয়া এক বিরাট কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া আর বোধ হইবে না, মনে হইবে তাঁহার অভিব্যক্তির এক ক্ষেত্র বলিয়া; সেখানে ভগবানকে দেখা যাইবে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপুরুষ রূপে, যিনি বিশ্বাতীত তত্ত্ব হইতেই সব কিছু গ্রহণ করেন এবং যাহা রূপরাজির মধ্যে অবতরণ করে তাহাকে পরিণত করিয়া তোলেন—যে রূপরাজি বর্ত্তমানে অস্বচ্ছ ছদ্মবেশ অথবা ব্যর্থতাজনক অর্দ্ধস্বচ্ছ আবরণমাত্র হইয়া রহিয়াছে কিন্তু যাহা একদিন

পূর্ণস্বচ্ছ দিব্য অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ব্যষ্টিচেতনা তাহার যথার্থ বোধ ও ক্রিয়া পুনঃপ্রাপ্ত হইবে ; কেননা সে চেতনা পরম পুরুষের মধ্য হইতে বিনির্গত অন্তরাত্মার এক রূপ এবং বর্ত্তমান প্রতীয়মান অবস্থা সত্ত্বেও তাহা এক মূল কেন্দ্র বা নীহারিকা (**nucleus or nebula**) যাহার মধ্যে কালের ক্ষেত্রে জড়ের মধ্যে দিব্য অকাল ও অরূপ ভগবানকে বিজয়ীরূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য দিব্য মাতৃশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে কর্ম্মের প্রভুব সংকল্প এবং সকল কর্ম্মের চরম তাৎপর্য্যরূপে ইহাই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিবে আর একমাত্র ইহাই বিশ্ববিসৃষ্টিকে এবং জগতে আমাদের নিজের কর্ম্মকে এক আলোক ও অর্থ-দান করে। ইহার উপলব্ধি এবং কার্য্যতঃ সেজন্য চেষ্টা করাই পূর্ণযোগে দিব্য কর্ম্মমার্গের সমগ্র গানের ধূয়া, সমগ্র মূলবস্তু।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিব্য কর্ম্ম

কর্ম্মমার্গে আরূঢ় সাধকের পক্ষে একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়াছে; যখন তাহার কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে অথবা যখন সাধনা শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে তখন মুক্তির পর আত্মার পক্ষে কোন কর্ম্ম কি অবশিষ্ট থাকিবে, যদি থাকে তবে কোন্ কর্ম্ম এবং কি উদ্দেশ্যে কৃত হইবে? তাহার প্রকৃতিতে তখন সমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অথবা সমতাই তাহার সমগ্র প্রকৃতিকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; অহংজ্ঞান, ব্যাপক অহংবোধ, অহংগত সকল অনুভূতি ও প্রণোদনা এবং তাহার দুরাগ্রহ ও বাসনা হইতে চরম মুক্তি সে লাভ করিয়াছে। শুধু ভাবনা ও হৃদয়ে নয় পরন্তু সত্তার বিভিন্ন সকল অঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন দেখা দিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গীণ বিশুদ্ধি অথবা ত্রিগুণাতীত অবস্থা সুসমঞ্জসভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধকের অন্তরাত্মা তাহার কর্ম্মের প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছে তাঁহার সান্নিধ্যে বাস করিতেছে বা সজ্ঞানে তাঁহার সত্তার অন্তর্ভুক্ত অথবা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে কিম্বা তাঁহাকে হৃদয়ে বা ঊর্দ্ধ্বে অনুভব এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে। সে নিজের প্রকৃত সত্তাকে চিনিয়াছে এবং অজ্ঞানের আবরণ ফেলিয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যস্থিত কর্ম্মীর এখন আর করণীয় কাজ কি রহিল? যদি থাকে, তাহার লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, আর কোন্ প্রকার মনোভাব লইয়া সে কর্ম্ম করা যাইবে?

ভারতে, এ প্রশ্নের এক উত্তরের সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত আছি; সে উত্তর এই যে তখন কোন কর্ম্মই আর করিবার নাই, কেননা বাকী আছে শুধু নীরব নিষ্ক্রিয়তা। যখন অন্তরাত্মা পরমপুরুষের নিত্য সান্নিধ্যে বাস করিতে পারে অথবা যখন সে পরম তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তখন

আমাদের এই জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য—যদি জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে তাহা বলা যায় তবে—তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। মানুষ যখন আত্ম-বিভাজনের ও অজ্ঞানের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে তখন তাহার অন্য দুর্দ্দশা, কর্ম্মের অভিশাপ হইতেও মুক্ত হইয়াছে। তাহার নিকট তখন সকল কর্ম্ম পরম অবস্থা হইতে পতন, অজ্ঞানে প্রত্যাবর্ত্তন। জীবন সম্বন্ধে এই মনোভাব আমাদের প্রাণপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত একটি ভ্রম হইতে আসে, যে ভ্রম বলে যে তিনটি অথবা তাহাদের কোন একটি নিম্নতর প্রণোদনা, যথা অভাব-অনটন, অস্থির সহজাত বৃত্তি এবং আবেগ বা বাসনাই শুধু কর্ম্মের আদেশ দিতে পারে। যখন সহজাত বৃত্তি বা আবেগ নীরব হইয়া গিয়াছে, বাসনার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে তখন আর কর্ম্মের স্থান কোথায়? কতকটা যান্ত্রিক কর্ম্মের প্রয়োজন মাত্র থাকিতে পারে, অন্য কোন কর্ম্ম থাকিবে না, আবার তাহাও দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে বিলয় হইয়া যাইবে। কিন্তু অবশেষে এরূপ ঘটিলেও, যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ কর্ম্ম থাকিবেই। শুধু মনের ভাবনাও একটা কর্ম্ম অথবা যখন কোন ভাবনা নাই তখন শুধু বাঁচিয়া থাকাও একটা কর্ম্ম এবং অনেক ফল বা পরিণামের কারণ। জগতে সকল সত্তা সকল জীবনই হইল কর্ম্ম শক্তি ও সামর্থ্য, শুধু তাহার অস্তিত্বের জন্যই সমগ্রতার মধ্যে এক সক্রিয় ফল উৎপাদিত করে এমন কি মৃত্তিকাপিণ্ডের জড়তা, নির্ব্বাণে প্রবেশ-উন্মুখ অচঞ্চল বুদ্ধদেবের নীরবতাও পরিণামহীন কিছুতেই বলা যায় না। কর্ম্মের রীতি পদ্ধতি, যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় অথবা যে যন্ত্র নিজেই ক্রিয়া করে এবং কর্ম্মীর মনোভাব ও জ্ঞান, এ সমস্ত বিষয়ে শুধু প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে। কারণ প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষই কর্ম্ম করে না; অনন্তের নিকট হইতে যে শক্তি তাহার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য প্রকৃতিই তাহার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে। একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইল এই কথা জানা এবং বাসনা ও ব্যক্তিগত কর্ম্ম-প্রেরণার ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির প্রভুর সান্নিধ্যে এবং তাহার সত্তার মধ্যে বাস করা। ইহাই হইল প্রকৃত মুক্তি, শারীর ক্রিয়ার বর্জন নয়; কেননা ইহাতে কর্ম্মের বন্ধন তৎক্ষণাৎ খসিয়া পড়ে। একজন মানুষ নীরব ও গতিহীন হইয়া চিরকাল বসিয়া থাকিতে পারে কিন্তু তথাপি পশু বা কীটপতঙ্গের মত সমানভাবেই অজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু সে যদি এই বৃহত্তর চেতনাকে নিজের মধ্যে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে সমস্ত জগতের সকল কর্ম্ম তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেলেও সে অচঞ্চল, পরম শান্তি ও স্থৈর্য্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। জগতে

আমাদিগকে কর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে প্রথমতঃ আমাদের আত্মপরিণতি ও আত্মসার্থকতার উপায় হিসাবে ; কিন্তু যখন আমরা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর দিব্য আত্মপূর্ণতায় পৌঁছিয়া যাইব তখনও কর্ম্ম থাকিবে জগতে ভাগবত উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্তরূপে, বৃহত্তর সার্ব্বভৌম আত্মার জন্য, প্রতি জীব যাহার এক অংশ যে অংশ তাহার সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে বিশ্বাতীত তত্ত্ব হইতে।

এক অর্থে বলা যায় যে মানুষ তাহার যোগ-সাধনাতে একটা বিশেষ উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিলে তাহার কর্ম্মের অবসান হয় ; কেননা তখন কর্ম্মের ব্যক্তিগত প্রয়োজন আর থাকে না, সে নিজে যে কর্ম্ম করিতেছে এ বোধও থাকে না ; কিন্তু তাহা বলিয়া তখন কর্ম্ম হইতে পলায়নের অথবা আনন্দময় জড়তার মধ্যে আশ্রয় লইবার কোন প্রয়োজনও নাই। কেননা তখন সে কর্ম্ম করে, যেমন ভগবান কর্ম্ম করেন, কোন অবশ্যকৃত্য প্রয়োজন এবং কোন অজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য না হইয়া। এমন কি কর্ম্ম করিয়াও আদৌ সে কর্ম্ম করে না ; তাহার কোন ব্যক্তিগত প্রবর্ত্তনা বা প্রযোজনা নাই। দিব্যশক্তিই তাহার প্রকৃতির মধ্য দিয়া কর্ম্ম করেন ; সে নিজে যাহার এক অংশ, যাহার সংকল্পের সহিত তাহার সংকল্প এক হইয়া গিয়াছে তাহার সামর্থ্য যাহারই সামর্থ্য, তেমন এক পরাশক্তি তাহার যন্ত্রাবলি বা করণসমূহকে অধিকার করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাহার কর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। তাহার অন্তরস্থ চিৎপুরুষই এই কর্ম্মের ধর্ত্তা, ভর্ত্তা ও সাক্ষী ; তিনিই সজ্ঞানে এই কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন কিন্তু তাহা বলিয়া কর্ম্মের কোন আসক্তি বা প্রয়োজনে সংসক্ত হইয়া পড়েন না বা কর্ম্মফলের বাসনা দ্বারা বদ্ধ হন না, কোন গতিবৃত্তি বা আবেগের তিনি অধীন হইয়া পড়েন না।

বাসনা ব্যতীত কর্ম্ম অসম্ভব বা অন্ততঃ পক্ষে অর্থশূন্য, সাধারণতঃ ইহাই মনে করা হয় কিন্তু ইহা একটা ভুল। এরূপ কথিত আছে যে কামনার অবসান ঘটিলে কর্ম্মেরও অবসান হইবে। অবশ্য যাহা সব কিছুকে খণ্ডিত করিয়া সীমা ও সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধিতে চায় সেই মন সহজভাবে ব্যাপক অন্য সকল সিদ্ধান্তের মতই এ সিদ্ধান্তের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। বিশ্বের অধিকাংশ কার্য্যই বাসনার কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ ব্যতীতই নিষ্পন্ন হয়, প্রকৃতির স্থির প্রয়োজন এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিধানের চালনাতেই কার্য্য সাধিত হয়। এমন কি মানুষও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিঘাত, বোধি বা সহজাত প্রবৃত্তির বশে অথবা স্বাভাবিক প্রয়োজন ও শক্তিরাজির বিধানের পরিচালনায় সর্ব্বদা নানা কার্য্য করে যাহার মধ্যে মনের কোন পরিকল্পনা, প্রাণের কোন সচেতন সংকল্পের তাড়না

অথবা আবেগময় বাসনার কোন স্থান থাকে না। মানুষ অনেক সময় তাহার ইচ্ছা বা বাসনার বিরুদ্ধেও কাজ করে ; কোন প্রয়োজনে কাহারও দ্বারা বাধ্য হইয়া, কোন অভিঘাতের তাড়নায়, তাহার মধ্যে যে শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য উদ্‌গত হইয়া উঠিতেছে তাহার বশে, অথবা কোন উচ্চতর তত্ত্বের সচেতন প্রণোদনায়—এই রূপ নানা কারণে কর্ম্ম চলিতে পারে। তাহার মধ্যবর্ত্তীকালীন উদ্দেশ্যগুলির প্রয়োজনে এক প্রকার রাজসিক কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতি সজীব সত্তাসমূহের প্রাণে অতিরিক্ত এক প্রলোভন রূপে বাসনাকে এক প্রধান স্থান দিয়াছে; কিন্তু ইহা তাহার কার্য্যের একমাত্র অথবা এমন কি প্রধান যন্ত্র নয়। যতক্ষণ ইহা টিকিয়া থাকে ততক্ষণ ইহার বৃহৎ উপযোগিতা আছে ; ইহা আমাদিগকে জড়তা কাটাইয়া উঠিবার পক্ষে সহায়তা অথবা যাহা অন্যথায় কর্ম্মকে ব্যাহত করিত তেমন অনেক তামসিক শক্তির বিরোধিতা করে। কিন্তু যে সাধক কর্ম্মমার্গে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন তিনি মধ্যবর্ত্তী কালের সেই অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন যেখানে বাসনা এক সহায়কারী যন্ত্র ছিল। তাঁহার কাজের জন্য বাসনার তাড়না আর অপরিহার্য্য নয়, বরং তাহা একটা ভীষণ বাধা এবং পতন, অক্ষমতা ও ব্যর্থতার জননী। অপরে বাধ্য হইয়া ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রণোদনার অধীনতা স্বীকার করিতে পারে কিন্তু সাধককে এক নৈর্ব্যক্তিক অথবা সার্ব্বভৌম মন লইয়া অথবা অনন্ত শাশ্বত পুরুষের এক অংশ বা যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করিতে শিখিতে হইবে। এক স্থির উদাসীনতা ও হৃষ্ট নিরপেক্ষতা রক্ষা করা অথবা দিব্য শক্তিতে তাঁহার যে কোন আদিষ্ট কর্ম্মে সানন্দে সাড়া দেওয়া—ইহাই হইবে সুচারুভাবে কর্ম্মসাধনের, করিবার মত কর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত। বাসনা অথবা আসক্তি দ্বারা আর সে তাড়িত হইবে না, তাহাকে পরিচালিত করিবে দিব্য শান্তির মধ্যে বিচরণশীল এক সংকল্প, জগদতীত জ্যোতিঃক্ষেত্র হইতে আগত এক জ্ঞান, যাহা পরম আনন্দ হইতে অবতীর্ণ এক শক্তি তেমন এক হর্ষোৎফুল্ল প্রণোদনা।

যোগের অনেকটা পরিণত অবস্থায় পৌঁছিলে ব্যক্তিগত বাদবিচারের দিক দিয়া সাধক কি করিবে বা না করিবে সে বিষয়ে সে উপদাসীন হইয়া পড়ে ; এমন কি সে আদৌ কোন কর্ম্ম করিবে কি না তাহাও তাহার ব্যক্তিগত নির্ব্বাচন

বা সুখের দ্বারা স্থির হয় না। যে কাজ পরম সত্যের সহিত সুসমঞ্জস অথবা ভগবান তাহার প্রকৃতির মধ্য দিয়া যে কাজ করিতে বা করাইতে চান সর্ব্বদা সে শুধু তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা হইতে লোকে কোন কোন সময় একটা ভুল সিদ্ধান্ত করে যে আধ্যাত্মিক মানুষ ঈশ্বর বা নিয়তি দ্বারা কিম্বা পূর্ব্ব কর্ম্মবশে জীবনের যে ক্ষেত্রে স্থাপিত, জন্ম অথবা ঘটনার দ্বারা যে পরিবার, সম্প্রদায়, বর্ণ, জাতি ও বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে অতিক্রম অথবা বৃহৎ কোন পার্থিব লক্ষ্যের অনুসরণ করিবে না এমন কি হয়ত সেদিকে কোন চেষ্টা করাও তাহার পক্ষে উচিত হইবে না। যখন প্রকৃতপক্ষে তাহার করণীয় কোন কর্ম্ম নাই, যখন তাহার কাছে কর্ম্মের ব্যবহার—তা যে কর্ম্মই হউক না কেন,—রহিয়াছে শুধু ততদিন যতদিন সে মুক্তিলাভের জন্য দেহের মধ্যে আছে, আর মুক্তি অধিগত হইলে যখন তাহার কর্ম্ম হইল পরম পুরুষের সংকল্প শুধু মানিয়া চলা এবং তিনি যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করা, তখন প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষেত্র তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। একবার মুক্ত হইলে, নিয়তি ও ঘটনাবশে তাহার জন্য যে ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহাকে তন্মধ্যে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, যতদিন সেই পরম মুহূর্ত্ত না আসে যখন সে অনন্তের মধ্যে অবশেষে বিলীন হইয়া যাইতে পারিবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের বা কোন বৃহৎ পার্থিব লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করা অর্থ কর্ম্মের ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া, এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা যে পার্থিব জীবনের বোধগম্য কোন লক্ষ্য আছে তাহার মধ্যে অনুধাবনযোগ্য কোন বস্তু আছে। এরূপ সিদ্ধান্তে আমাদের সম্মুখে বৃহৎ সেই মায়াবাদ পুনরায় আসিয়া দাঁড়ায় যাহা কার্য্যতঃ জগতের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্বের এক অস্বীকৃতি, অস্বীকৃতি তখনও যখন শুধু ধারণায় তাহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ভগবান এখানে, এই জগতেই রহিয়াছেন, শুধু নিশ্চল স্থিতিরূপে নয় কিন্তু গতিরূপেও, শুধু আধ্যাত্মিক সত্তা ও অধিষ্ঠানরূপে নয় কিন্তু শক্তি, বীর্য্য ও তেজরূপেও—তাই এজগতে দিব্যকর্ম্ম সম্ভবপর।

কর্ম্মযোগীর উপর তাহার বিধানরূপে কোন সংকীর্ণ তত্ত্ব, তাহার কার্য্যক্ষেত্ররূপে কোন সীমাবদ্ধ কর্ম্ম আরোপ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত সত্য যে মুক্তি বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে অগ্রসর হইবার পথে মানুষের কল্পনায় ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, প্রয়োগে সংকীর্ণ হউক বা উদার হউক, প্রত্যেক প্রকার কর্ম্মই সমানভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার এ পর্য্যন্তও সত্য যে মুক্তির

পর মানুষ যে কোন আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিতে পারে, যে কোন প্রকার কর্ম্ম করিতে পারে এবং সেইখানে সেই কর্ম্মে ভাগবত সত্তায় আপন সত্তাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। চিৎপুরুষের দ্বারা সে যে ভাবে পরিচালিত হয় তদনুসারে তাহার জন্মগত এবং অবস্থাগত পরিবেশের মধ্যেই সে থাকিতে পারে অথবা সেই পরিবেষ্টনকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সে তেমন এক অবাধিত কর্ম্মের মধ্যে বাহির হইয়া আসিতে পারে যাহা তাহার সমুন্নত চেতনা ও উচ্চতর জ্ঞানের যোগ্য দেহ বা ক্ষেত্র হইয়া উঠে। লোকের বহির্ম্মুখী দৃষ্টিতে অন্তরে মুক্ত সাধকের বাহ্য কর্ম্মে কোন প্রতীয়মান পার্থক্য ধরা না পড়িতে পারে; অথবা পক্ষান্তরে অন্তরস্থ সেই স্বাধীনতা ও আনন্ত্য বাহিরে এরূপ প্রবল ও নূতন সক্রিয় কর্ম্মধারার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে যে এই অভিনব শক্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; যদি তাহার অন্তর্যামী পরমপুরুষের সেইরূপ ইচ্ছা হয় তাহা হইলে মুক্ত আত্মা তাহার পুরাতন মানুষী পরিবেশের মধ্যে সূক্ষ্ম ও সীমিত ক্রিয়া লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে এবং তাহার বাহ্য আকৃতির কোন পরিবর্ত্তন করিতে না চাহিতে পারে; কিন্তু আবার এরূপ কর্ম্ম করিবার জন্যও তাহার ডাক পড়িতে পারে যাহা তাহার নিজের বাহ্য জীবনের রূপ ও কর্ম্মক্ষেত্রকে শুধু পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে তাহা নহে কিন্তু তাহার পরিবেশের কোন কিছুকে অপরিবর্ত্তিত বা অক্ষুণ্ন রাখিবে না সব কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, সব কিছুর রূপান্তরসাধন করিবে, এক নূতন জগৎ ও জীবন সৃষ্টি করিবে।

একটি প্রচলিত ধারণা আমাদের প্রতীতি জন্মাইতে চায় যে ব্যষ্টি অন্তরাত্মার পক্ষে জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে দৈহিক পুনর্জন্মের বন্ধনবিমোচনই মুক্তির একমাত্র লক্ষ্য। যদি একবার এই মুক্তি লাভ হয় তাহা হইলে এখানে ও অন্যত্র আত্মার আর কোন করণীয় কর্ম্ম থাকে না অথবা শুধু সেইটুকু কর্ম্ম মাত্র থাকে যাহা তাহার শরীর যাত্রার জন্য অথবা প্রাক্তন জন্মসমূহের যে ফলগুলি পূর্ণ হয় নাই তাহার জন্য শুধু প্রয়োজন। এইটুকুও যোগাগ্নির দ্বারা শীঘ্রই দগ্ধ বা ক্ষয় হইয়া যাইবে যখন মুক্ত আত্মা দেহ হইতে প্রয়াণ করিবে। পুনর্জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তির এই লক্ষ্য ভারতীয় মনে বহুদিন হইতে অন্তরাত্মার উচ্চতম কাম্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে স্বর্গসুখ ভোগ অনেক ধর্ম্মে ভক্তগণের নিকট দিব্য প্রলোভনের বস্তু হইয়া রহিয়াছে

তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মেও যে যুগে বৈদিক স্তোত্রের ব্যাখ্যা স্থূল ও বাহ্যভাবে করা হইত এবং তাহাই প্রধান ধর্ম্মমত বলিয়া স্বীকৃত হইত সে যুগে স্বর্গসুখভোগের প্রাথমিক ও নিম্নতম এই প্রেরণা গৃহীত হইত; এবং পরবর্ত্তীকালে ভারতের দ্বৈতবাদীরাও তাহাদের চরম আধ্যাত্মিক প্রণোদনার অংশরূপে এ প্রেরণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ, দেহ ও মনের সসীমতা হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার শাশ্বত শান্তি, বিশ্রান্তি ও নীরবতার মধ্যে প্রবেশ করা স্বর্গে মানসিক আনন্দ বা চিরকাল দেহের সুখ স্বস্তি ভোগ করা অপেক্ষা অনেক বেশী কাম্যবস্তু, কিন্তু সব দিক হইতে দেখিলে তাহাও একটা প্রলোভন; তাহার মধ্যে পার্থিব বিষয়ে মনের যে অবসাদের, প্রাণসত্তার জন্মান্তরের অভিযান হইতে যে সঙ্কোচের নির্ব্বন্ধ দেখিতে পাই তাহাতে দুর্ব্বলতার একটা সুর বাজে—তাহা আমাদের পরম প্রণোদনা হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের বাসনা, যত উচ্চরূপই তাহার দেওয়া হউক না কেন, অহমিকার এক পরিণাম; ইহার মূলে রহিয়াছে আমাদের নিজের পৃথক ব্যক্তিত্বের ধারণা এবং তাহার ব্যক্তিগত সুখ ও শুভের কামনা, জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে তাহার মুক্তির আকাঙক্ষা এবং সম্ভূতির দুঃখ-তাপ বিলোপ করিবার প্রার্থনা, এবং এই সমস্তকেই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য করিয়া তোলা। আমাদের জীবন হইতে অহমিকার এই ভিত্তিকে পরিপূর্ণরূপে দূর করিয়া দিতে হইলে আমাদিগকে ব্যক্তিগত মুক্তির বাসনাকেও অবশ্যই অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইবে। যদি আমরা ভগবানকে চাই তবে ভগবানকে শুধু তাঁহারই জন্য চাওয়া হইতে হইবে; অপর কিছুর জন্য নয়, কেননা তাহাই আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠতম আবাহন, চিৎপুরুষের গভীরতম সত্য। মুক্তির অনুসরণ, আত্মার স্বাতন্ত্র্যের অনুধাবন, আমাদের উচ্চতম ধ্রুবসত্তার উপলব্ধির প্রয়াস, ভগবানের সহিত মিলনের আকূতি,—এ সমস্তই সমর্থন যোগ্য; কেননা কেবল তাহাই আমাদের সত্তার সর্ব্বোচ্চ বিধান, কেননা তাহা হইল আমাদের মধ্যে যাহা অধস্তন উচ্চতমের দিকে তাহার আকর্ষণ, কেননা তাহাই আমাদের মধ্যস্থিত দিব্য সংকল্প। ইহাই হইল একমাত্র ধ্রুবতম কারণ আর এই কারণই যথেষ্ট; আর সমস্ত উদ্দেশ্যই সত্তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বস্তু, ক্ষুদ্র বা আকস্মিক সত্য, প্রয়োজনীয় ছোট ছোট প্রলোভন, আর যে মুহূর্ত্তে তাহাদের উপযোগিতা শেষ হইয়া যাইবে এবং পরম পুরুষ ও সর্ব্বভূতের সহিত একত্ববোধ আমাদের স্বাভাবিক চেতনা এবং সেই অবস্থার পরমানন্দ আমাদের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল হইয়া উঠিবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা অন্তরাত্মার পক্ষে অবশ্য পরিবর্জনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে ব্যক্তিগত মুক্তির এই বাসনা অন্য একটি আকর্ষণের নিকট পরাভূত হইয়া পড়ে, যে আকর্ষণও আমাদের প্রকৃতির উচ্চতর পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং যাহা মুক্ত আত্মার অবশ্যকরণীয় ক্রিয়াবলীর মূল প্রকৃতির আভাস দেয়। অমিতাভ বুদ্ধের মহান উপাখ্যানে আমরা ইহার নির্দ্দেশ পাই; নির্ব্বাণের দ্বারদেশে পৌঁছিয়া তাঁহার আত্মা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে যতদিন পর্য্যন্ত একটি জীবও দুঃখকষ্ট ও অজ্ঞানের মধ্যে মগ্ন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহা কিছুতেই দ্বার-দেহলী পার হইয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের এক মহান শ্লোকের মধ্যে ঐ একই মর্ম্ম রহিয়াছে:—"অষ্টসিদ্ধির সঙ্গে আমি পরম অবস্থা চাইনা, চাইনা পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি; আমি যেন সকল জীবের দুঃখ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি, সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন তাহাদিগকে জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পারি।" এই ভাবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া মহা বেদান্তবাদী স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে এই বিখ্যাত বাক্য লিখিয়াছিলেন "আমি মুক্তির সকল কামনা বর্জন করিয়াছি। আমি যেন বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাশি রাশি দুঃখ-ভোগ করিতে পারি, যাহাতে একমাত্র যে ভগবান আছেন তাঁহার পূজা করিতে পারি, একমাত্র ভগবান যাঁহাকে আমি বিশ্বাস করি, যিনি সকল ব্যষ্টি আত্মার সমষ্টি—সর্ব্বোপরি যিনি আমার দুষ্ট ভগবান, আমার দুঃখী ভগবান সকল জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যস্থ আমার দরিদ্র ভগবান, যিনি আমার আরাধনার বিশিষ্ট বস্তু। অর্চনা কর তাঁহাকে যিনি উচ্চ ও নীচ, পুণ্যবান ও পাপাত্মা, দেবতা ও কৃমিকীট; অর্চনা কর তাহাকে যাঁহাকে দেখা যায়, জানা যায়, যিনি বাস্তব সত্য, যিনি সর্ব্বব্যাপী; আর সব বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেল। অর্চনা কর তাহাকে যাঁহার পূর্ব্বজন্ম নাই পরজন্ম নাই যাঁহার মৃত্যু নাই, যাওয়া আসা নাই, যাঁহার মধ্যে আমরা চিরদিন ছিলাম, চিরদিন থাকিব; তাহাকে অর্চনা কর আর বাকি সব মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেল।"

এই শেষ দুইটি বাক্যের মধ্যে সমস্ত বিষয়টির সার কথা রহিয়াছে। যেমন প্রকৃত সন্ন্যাসের অর্থ বাহ্যভাবে শুধু সমাজ ও পরিবার ত্যাগ নয় তেমনি যথার্থ মোক্ষলাভ বা পুনর্জ্জন্মের শৃঙ্খল হইতে যথার্থ মুক্তি মানে পার্থিব জীবন বর্জন নয় অথবা আধ্যাত্মিক আত্মবিলোপ দ্বারা ব্যষ্টি সত্তার পলায়ন নয়; যথার্থ মুক্তি হইল অন্তরে ভগবানের সহিত তাদাত্ম্যবোধ লাভ করা, যে ভগবানের মধ্যে অতীত জীবন এবং ভবিষ্যৎ জন্মের সীমাবন্ধন নাই, তৎস্থানে আছে শুধু অজাত আত্মার শাশ্বত অস্তিত্ব। যে মানুষ আন্তর মুক্তি লাভ করিয়াছে সে গীতার ভাষায় কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করিতেছে না; কেননা স্বীয় প্রভুর পরিচালনাধীনে

থাকিয়া প্রকৃতিই তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। ঠিক তেমনই যদিও সহস্রবার দেহধারণ করে তথাপি সে জন্মের শৃঙ্খল অথবা জীবনের যান্ত্রিক চক্র হইতে মুক্ত, কেননা সে বাস করে অজ ও অমর চিৎ স্বরূপের মধ্যে, দেহগত জীবনে নয়। অতএব পুনর্জন্মের হাত হইতে পলায়নে আসক্তি হইল অন্যতম এক বিগ্রহ যাহাকে, আর যে কেহ রাখুক না কেন, পূর্ণযোগের সাধককে ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেই হইবে। কেননা তাহার যোগ ব্যষ্টি অন্তরাত্মার পক্ষে সমগ্র জগতের পরপারস্থিত সর্ব্বাতীতের উপলব্ধির মধ্যে শুধু সীমিত নয়; তাহার যোগের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিশ্বগত আত্মার, যিনি সকল ব্যষ্টি আত্মার সমষ্টি তাঁহার উপলব্ধিও অন্তর্ভুক্ত আছে, তাই সে শুধু নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির এবং পলায়নের গতিবৃত্তির মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ করিতে পারে না। বিশ্বের সকল সীমাবন্ধন অতিক্রম করিলেও সে ভগবৎ সত্তাতে সকলের সহিত একীভূত; তখনও বিশ্বে তাহার পক্ষে এক দিব্য কর্ম্ম রহিয়াছে।

কোন মনগড়া নিয়ম বা মানুষী আদর্শ দ্বারা সে কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইতে পারে না; কেননা সে সাধকের চেতনা মানুষী বিধিবিধান ও সীমাবন্ধন অতিক্রম করিয়া দিব্য স্বাতন্ত্র্যে বাহ্য ও অনিত্য বস্তুর শাসন হইতে অপসৃত হইয়া, অন্তরেও শাশ্বতের আত্মনিয়মনের মধ্যে সসীম রূপায়ণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, অনন্তের অবাধ আত্ম-বিশেষণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গীতা বলিয়াছে "যে ভাবেই সে থাকুক বা কাজ করুক না কেন সত্যই সে রহিয়াছে ও কাজ করিতেছে 'আমার' (ভগবানের) মধ্যে।" মানুষী বুদ্ধি যে সমস্ত নিয়ম কানুন খাড়া করে মুক্ত আত্মার পক্ষে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না, মনোময় সংস্কার ও পূর্ব্বগঠিত ধারণা যে বাহ্য ন্যায়ান্যায়ের মাপকাঠি ও ব্যবহারের কষ্টিপাথর গ্রহণ করে তাহা দ্বারা সেরূপ পুরুষের বিচার করা চলে না, তিনি এই সকল ভ্রমপ্রবণ বিচারালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করুন অথবা পূর্ণরূপে গৃহস্থ জীবন যাপন করুন, মানুষ যাহাকে পুণ্য কর্ম্ম বলে সেইরূপ ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হউন অথবা বহুমুখী জাগতিক কর্ম্মাবলিতে রত থাকুন, তিনি বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করের মত মানুষকে পরিচালিত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করুন অথবা জনকের মত রাজ্য শাসন করুন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের মত রাজনীতিবিশারদ ও সেনানায়ক হইয়া জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়ান—তাহাতে

কিছু যায় আসে না। তিনি কি ভোজন ও পান করেন, কি তাঁহার অভ্যাস, কোন কর্ম্ম তিনি করেন, তাহাতে তাঁহার সফলতা অথবা বিফলতা যাহাই আসুক, তাঁহার কর্ম্ম গঠনমূলক অথবা ধ্বংসকর যাহাই হউক, তিনি পুরাতন বিধি ব্যবস্থার রক্ষা বা সংস্কার অথবা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করুন, তাঁহার সঙ্গীসাথীগণ লোকের সানন্দ সম্মানের পাত্র হউক অথবা মানুষের উচ্চতর ন্যায়ান্যায় বোধে তাহারা সমাজ পরিত্যক্ত এবং ভ্রষ্টচরিত্র হউক তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের প্রশংসা ও সমর্থন করুক অথবা কুপথে পরিচালক, ধর্ম্ম নীতি ও সমাজের ক্ষেত্রে উন্মার্গগামীতার প্ররোচক রূপে দেখুক না কেন—এ সকলের কোন কিছুতেই তাঁহার যায় আসে না। তিনি মানুষের বিচার দ্বারা শাসিত অথবা অজ্ঞানী প্রণীত বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত হন না; তিনি এক আন্তর বাণীর নির্দ্দেশ মানিয়া চলেন, এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হন। তাঁহার যথার্থ জীবন তাঁহার অন্তরে, আর ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থ বিবরণ যে তিনি বাস করেন বিচরণ করেন কর্ম্ম করেন ভগবানের মধ্যে, দিব্য তত্ত্বের মধ্যে, অনন্তের মধ্যে।

কিন্তু যদিও কোন বাহ্য বিধান তাঁহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করে না, তবু যাহা বাহ্য নয় এমন এক বিধান তিনি মানিয়া চলেন; কোন ব্যক্তিগত কামনা বা লক্ষ্য তাঁহাকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে না কিন্তু প্রথমে তাহা হইবে জগতের মধ্যে এক সচেতন দিব্য ক্রিয়ার অংশ এবং অবশেষে তাহা আত্মনিয়ন্ত্রিত হওয়াতে সুনিয়ন্ত্রিত দিব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। গীতা বলে যে মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম বাসনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না বরং তাহার উদ্দেশ্য হইবে লোক সংগ্রহ, নির্দ্ধারিত পথে জগতের শাসন, পরিচালনা, প্রণোদনা ও সংরক্ষণ। এই নির্দ্দেশের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে জগৎ একটা মায়া বা ভ্রম এবং অধিকাংশ লোক মুক্তির অনুপযুক্ত হওয়াতে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই জগতে থাকিতে হইবে, এইজন্য মুক্ত পুরুষের বাহ্যতঃ এমনভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে ইতর সাধারণ সমাজবিধি-নির্দ্দিষ্ট প্রথামূলক কার্য্যে আসক্ত থাকিতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে ইহা নগণ্য ও ক্ষুদ্র এক বিধান হইয়া দাঁড়ায়, এবং যাহাদের হৃদয় মহৎ ও উদার তাহারা ইহাকে বর্জন করিয়া বরং অমিতাভ বুদ্ধের দিব্য প্রতিজ্ঞা, ভাগবতের সুমহান প্রার্থনা, বিবেকানন্দের আবেগময় অভীপ্সার অনুসরণ করিবে। কিন্তু যদি আমরা এই মত স্বীকার করিয়া লই যে এ জগৎ প্রকৃতির একটা দিব্য ভাবে পরিচালিত গতিধারা যাহা মানুষের মধ্য হইতে প্রকট হইয়া ভগবদভিমুখে চলিয়াছে, আর ইহা যদি সেই কর্ম্ম হয় গীতার ভগবান যাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে যদিও তাঁহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য

কিছুই নাই তথাপি তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, তাহা হইলে এই মহান নির্দ্দেশের একটা গভীর ও ধ্রুব অর্থ পওয়া যায়। এই দিব্য কর্ম্মে যোগদান করা, ঈশ্বরের জন্যই জগতে বাস করা হইবে কর্ম্মযোগীর বিধান; ভগবানের জন্যই সংসারে থাকা অতএব এমনভাবে কর্ম্ম করা, যাহাতে তিনিই উত্তরোত্তর পূর্ণতররূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন এবং জগৎ তাহার অন্ধকারময় তীর্থযাত্রাপথে যে দিক দিয়াই হউক অগ্রসর হইয়া যাইতে এবং ক্রমশঃ দিব্য আদর্শের অধিকতর নিকটে পৌঁছিতে পারে।

এই কর্ম্ম তিনি কিভাবে কোন বিশিষ্ট পন্থায় সাধিত করিবেন তাহা কোন সাধারণ নিয়মে স্থির করা যায় না। অন্তর হইতেই সে নিয়ম গড়িয়া উঠিবে বা নিজেকেই সুপ্রকট করিবে; কিভাবে গড়িয়া উঠিবে তাহার মীমাংসা রহিয়াছে ভগবান ও আমাদের আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মা ও কর্ম্মের যন্ত্ররূপী ব্যষ্টি-সত্তার সম্বন্ধের মধ্যে; এমন কি মুক্তির পূর্ব্বেও যখন আমরা অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে সচেতন হই তখন হইতেই তাঁহার নিকট কর্ম্মের অনুমতি বা অনুমোদন পাওয়া, অধ্যাত্মভাবে নির্দ্ধারিত নির্ব্বাচন জানা যায়। যে কর্ম্ম করণীয় তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অন্তর হইতেই আসা চাই। যাহা মুক্ত পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য বলা যাইতে পারে তেমন কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম, কর্ম্মের তেমন কোন বিধান বা রূপ, অথবা বাহ্য ভাবে নির্দ্ধারিত বা অবশ্য করণীয় তেমন কোন পন্থা নাই। গীতায় এই করণীয় কর্ম্মের কথা প্রকাশ করিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার অর্থ এই করা হইয়াছে যে ফলে অনাসক্ত হইয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে যে ধারণার সাক্ষাৎ পাই তাহা ইউরোপীয় সংস্কৃতি জাত, তাহা আধ্যাত্মিক অপেক্ষা বরং নৈতিক, গভীর অন্তর্ম্মুখী অপেক্ষা বরং বহির্ম্মুখী বস্তু। কর্ত্তব্য বলিয়া সেরূপ কোন সাধারণ বস্তু নাই; আমাদের শুধু নানা কর্ত্তব্য আছে যাহাদের মধ্যে অনেক সময় পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, আর সে সমস্ত নির্দ্ধারিত হয় আমাদের পরিবেশ, সামাজিক সম্বন্ধ ও জীবনে আমাদের বাহ্য পদ ও পদবী দ্বারা। অপরিণত নৈতিক প্রকৃতির শিক্ষার জন্য এবং স্বার্থপরতা ও কামনা বাসনা দ্বারা পরি-চালিত কর্ম্মের প্রতিকূল আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এ সমস্তের যথেষ্ট মূল্য আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যতদিন সাধক আন্তর আলোক পায় নাই ততদিন যে সর্ব্বোত্তম আলোক তাহার আছে তাহার পরিচালনায়ই তাহাকে চলিতে হইবে, ততদিন তাহাকে যে সমস্ত আদর্শ সাময়িক ভাবে নিজের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে হইবে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম নৈতিক তত্ত্ব এবং সাধারণ কোন হেতু বা উদ্দেশ্য তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সে যাহা হউক, কর্ত্তব্য

•কর্ম্ম বাহ্য বস্তু, অন্তরাত্মার কোন উপাদান নহে এবং এই পথে তাহা চরম আদর্শ হইতে পারে না। সৈনিকের কর্ত্তব্য ডাক পড়িলে যুদ্ধ করা, এমন কি প্রয়োজন হইলে নিজের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের উপর গুলি বর্ষণ করা ; কিন্তু এই ভাবের অথবা ইহার অনুরূপ কোন আদর্শ যোগসিদ্ধ পুরুষের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায়না। অপর পক্ষে হৃদয়ে প্রেম ও করুণা পোষণ করা আমাদের সত্তার উচ্চতম সত্যের নির্দ্দেশ মানিয়া চলা, ভগবানের আদেশ পালন করা এ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে ; প্রকৃতি যখন ভগবানের দিকে উঠিয়া যাইতেছে এগুলি তখন সেই প্রকৃতির বিধান, অধ্যাত্ম অবস্থা হইতে প্রবহমান কর্ম্ম, আত্মার পরম সত্য। মুক্ত কর্ম্মীর কর্ম্ম হইবে অন্তরাত্মা হইতে নিঃসৃত তেমনি এক প্রবাহ ; ভগবানের সঙ্গে তাহার আধ্যাত্মিক মিলনের স্বাভাবিক ফলেই এ স্রোত তাহার নিকট বা তাহার মধ্য হইতে আসিবে ; মানস ভাবনা ও সংকল্প, বাস্তব ক্ষেত্রের যুক্তি বিচার অথবা সামাজিক বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৈতিক উন্নতি বিধায়ক কোন গঠিত বস্তু হইতে সে প্রবাহ উৎপন্ন হইবে না। সাধারণ জীবনে ব্যক্তি সমাজ বা ঐতিহ্যগত বাঁধাধরা নিয়ম, মান বা আদর্শই মানুষকে পরিচালিত করে ; কিন্তু একবার অধ্যাত্ম পথে যাত্রা আরম্ভ হইলে তাহার স্থানে আসিয়া পড়িবে এক আন্তর ও বাহ্য বিধান অথবা এক জীবনধারা যাহা আমাদের আত্মনিয়মন মুক্তি ও সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন—এমন এক জীবনধারা যাহা আমরা যে পথ অনুসরণ করিতেছি তাহার পক্ষে উপযুক্ত অথবা যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচালক প্রভু বা গুরুর দ্বারা নির্দ্ধারিত অথবা যাহা আমাদের অন্তরের দিব্য দিশারীর দ্বারা আদিষ্ট। কিন্তু অন্তরাত্মার আনন্ত্য ও মোক্ষের চরম অবস্থায় সকল বাহ্য আদর্শ বর্জিত হয় এবং তাহার স্থানে অবশিষ্ট থাকে শুধু আমাদের সহিত অখণ্ড মিলনে মিলিত ভগবানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সর্ব্বাঙ্গীণ এক আজ্ঞাধীনতা এবং এমন এক কর্ম্মধারা যাহা আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ আধ্যাত্মিক সত্য আপনা হইতেই সার্থক করিয়া তোলে। •

স্বভাব দ্বারা নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত কার্য্যই হইবে আমাদের কর্ম্মের বিধান, গীতার এই নির্দ্দেশকে উপরিউক্ত গভীরতর অর্থেই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্বভাব নিশ্চয়ই মানুষের বাহ্য মেজাজ বা চরিত্র বা

অভ্যাসগত প্রণোদনা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই কিন্তু সংস্কৃত 'স্ব-ভাব' শব্দের আক্ষরিক অর্থে যাহা বুঝায় গীতা সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে—এ শব্দ দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রকৃতি আমাদের অন্তরাত্মার দিব্য উপাদানকে বুঝিয়াছে। এই মূল হইতে যাহা কিছু জাত হয় এই উৎস হইতে যাহা কিছু প্রবাহিত হয় তাহা গভীর, সারভূত, যথার্থ বস্তু,—বাকী সব মতামত আবেগ অভ্যাস কামনা, কেবল সত্তার বহিস্তরের রূপায়ণ বা তাহার ক্ষণিক খেয়াল অথবা এরূপও হইতে পারে যে তাহা বাহির হইতে আগত বা আরোপিত বস্তু। ইহাদের স্থান ও রূপ পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু এই মূল তত্ত্ব যেমনকার তেমনিই থাকে। আমাদের মধ্যে প্রকৃতি কার্য্যসাধনের জন্য যে রূপ পরিগ্রহ করে আমরা তাহা নহি অথবা তাহা আমাদের নিত্য শাশ্বত এবং যথার্থ প্রতিরূপ-প্রদর্শক মূর্ত্তি নয়; আমাদের যথার্থ স্বরূপ হইল আমাদের অন্তরস্থ অধ্যাত্ম সত্তা—আর আমাদের অন্তরাত্মারূপে যে সম্ভূতি তাহা এই সত্তার অন্তর্গত—ইহা বিশ্বে নিত্যকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে।

অবশ্য আমাদের সত্তায় এই প্রকৃত আন্তর বিধানকে আমরা সহজে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না; যতদিন আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধি অহমিকার কালিমা হইতে মুক্ত না হইতেছে ততদিন এ বিধানকে আবরণের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বাহ্য ও ক্ষণিক ধারণা আবেগ বাসনা এবং পরিবেশ হইতে আগত সকল প্রকার ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলি; অথবা আমাদের অনিত্য মনপ্রাণদেহগত ব্যক্তিত্বের নানা মূর্ত্তি পরিস্ফুট করিয়া তুলি—যে ব্যক্তিত্ব কৃত্রিম, অনুভব বা পরীক্ষামূলক, চলমান ও রচিত এক সত্তা, আমাদের সত্তা ও নিম্নতর বিশ্বপ্রকৃতির চাপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে। যে পরিমাণে আমরা পরিশোধিত হইতে থাকিব সেই পরিমাণে আমাদের খাঁটি অন্তরপুরুষ নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকট করিবে; আর তত অল্প পরিমাণে আমাদের সংকল্প বহিরাগত ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশের মধ্যে বিজড়িত অথবা আমাদের নিজেদের বাহ্য মনের রূপায়নে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অহমিকা বর্জিত হইলে স্বভাবের বিশুদ্ধি আসিলে কর্ম্ম আসিবে অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ হইতে, চিৎপুরুষের গভীরতা ও সমুন্নত শিখর প্রদেশ হইতে; অথবা আমাদের কর্ম্মধারা প্রকাশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে ভগবানের দ্বারা যিনি চিরদিন আমাদের হৃদয়ের অন্তরে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। যোগীর প্রতি গীতার চরম ও পরম বাণী এই যে তাহাকে বিশ্বাস ও ক্রিয়ায় সকল প্রকার প্রথাসম্মত রীতিনীতি, আচরণের সকল প্রকার নির্দ্ধারিত বাহ্য নিয়ম, বাহিরের বহিশ্চর প্রকৃতির

দ্বারা সৃষ্ট সকল রূপায়ণ, গীতার ভাষায় 'সর্ব্বধর্ম্ম' পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। যে জন কামনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে, সর্ব্ব ভূতের সহিত এক হইয়া গিয়াছে অনন্ত সত্য ও শুদ্ধির মধ্যে বাস করিতেছে, নিজের অন্তর-চেতনার গভীরতম প্রদেশ হইতে কর্ম্ম করিতেছে, তাহার নিজের অমর দিব্য উচ্চতম আত্মা দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হইতেছে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইবে অন্তরের শক্তিদ্বারা, আমাদের সকলের মধ্যস্থিত স্বরূপ সত্তা ও প্রকৃতির মধ্য দিয়া যে মূল সত্তা জ্ঞানে সংগ্রামে কর্ম্মে প্রেমে সেবায় সর্ব্বদাই দিব্য, যাহা সতত জগতে ভগবানকে সার্থক করিতে, কালের মধ্যে শাশ্বতকে অভিব্যক্ত করিতে চাহিতেছে।

ভগবানের সঙ্গে সম্মিলিত আমাদের চিন্ময় আত্মার আলোক ও শক্তি হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বতন্ত্র ও অভ্রান্তভাবে জাত দিব্য কর্ম্মই এই পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মযোগের চরম অবস্থা। আমরা যে মুক্তি চাই তাহার যথার্থতম কারণ এই নয় যে তাহাতে আমরা জাগতিক জ্বালা যন্ত্রণাব হাত হইতে ব্যক্তিগতভাবে পরিত্রাণ পাইব যদিও আমাদিগকে সে মুক্তিও দেওয়া হইবে, চাই তাহার কারণ এই যে তাহাতে আমরা ভগবানের সহিত, শাশ্বত পরমপুরুষের সহিত অখণ্ড একত্বে যুক্ত হইতে পারিব। আমরা যে পূর্ণতা, যে সর্ব্বোত্তম অবস্থা, যে শুচিতা জ্ঞান শক্তি প্রেম ও সামর্থ্য চাই তাহার কারণ এই নয় যে তাহাতে আমরা ব্যক্তিগতভাবে দিব্য প্রকৃতি ভোগ করিতে বা দেবতাদের মত হইতে পারিব—যদিও সে ভোগ আমাদের ভাগ্যে জুটিবে, কিন্তু পরম কারণ এই যে মুক্তি ও পূর্ণতা আমাদের অন্তরে স্থিত ভাগবত সংকল্প, প্রকৃতির মধ্যস্থিত আমাদের সত্তার উচ্চতম সত্য, জগতে প্রগতিশীল অভিব্যক্তির সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত লক্ষ্য। মুক্ত, পূর্ণ ও আনন্দময় দিব্য প্রকৃতিকে জগতে প্রকট হইতে হইলে প্রথমে ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে তাহাকে অভিব্যক্ত হইতে হইবে। এমন কি অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থাতেও ব্যষ্টিব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বভৌম তত্ত্বের মধ্যে এবং সর্ব্বজনীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই বাস করিতেছে; কেননা যখন সে অহংগত বাসনা ও লক্ষ্যের অনুসরণ করিতেছে তখনও সে তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্মের মধ্য দিয়া জগতে প্রকৃতিরই কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে সেই প্রকৃতির দ্বারাই বাধ্য হইতেছে; কিন্তু একাজ সে সেই ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য লইয়া সচেতন ভাবে করিতেছে না তাই নিখুঁতভাবে তাহা সাধিত হইতেছে না, তাহার কর্ম্ম প্রকৃতির অর্দ্ধ উন্মিষিত ও অর্দ্ধচেতন স্থূল ও অপূর্ণ গতির সাহায্য মাত্র করিতেছে। অহমিকার কবল হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সহিত মিলিত

হওয়া যেমন তাহার মুক্তি তেমনি তাহার ব্যষ্টিসত্তার চরম পরিণতি; এইভাবে মুক্ত শুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া ব্যষ্টিসত্তা—যে স্বরূপতঃ দিব্য আত্মা—বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত দিব্য সত্তার মধ্যে তাঁহার জন্য এবং জগতে তাঁহার দিব্য ইচ্ছা জাগ্রতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে পরিপূরণের জন্য বাস করে; আর ইহাই প্রথম হইতে সংকল্পিত ও নিরূপিত ছিল।

জ্ঞানমার্গে আমরা এমন এক স্থানে পৌঁছিতে পারি যথা হইতে আমরা ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব ও বিশ্ব এ উভয়ই পার হইয়া সকল ভাবনা সংকল্প ও কর্ম্ম, প্রকৃতির সকল ব্যাপার হইতে পলায়ন করিয়া শাশ্বত বস্তুতে অভিনিবিষ্ট এবং তাহার মধ্যে গৃহীত, জগদতীত তত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারি; ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে ইহা বাধ্যতামূলক না হইলেও আমাদের অন্তরাত্মা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে, আমাদের অন্তরপুরুষ এই পথ অনুসরণ করিতে পারে। ভক্তিযোগে ভক্তি ও আনন্দের তীব্রতার মধ্য দিয়া আমরা পরম প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইতে একমাত্র তাঁহাতে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যের পরমোল্লাসের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার সহিত একই পরম সুখময় নিত্য ধামে চিরতরে বাস করিতে পারি; তখন তাহাই আমাদের সত্তার প্রণোদনা আত্মার নির্ব্বাচন হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মমার্গে আর একটা দৃষ্টি খুলিয়া যায়; কেননা সেই পথে অগ্রসর হইয়া শাশ্বতের সহিত প্রকৃতির বিধান ও শক্তিতে এক হইয়া আমরা মুক্তি ও পূর্ণতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি; যেমন আমাদের সংকল্পে ও সক্রিয় আত্মাতে তেমনি আমাদের নিশ্চল অধ্যাত্ম সত্তাতে আমরা তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিতে পারি; এই মিলনের স্বাভাবিক পরিণতিই হইবে কর্ম্মের দিব্য পন্থা; আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে দিব্য জীবন যাপন তাঁহার আত্মাভিব্যক্তিরই এক মূর্ত্তি। পূর্ণযোগে এই তিন সাধন পন্থা আর পরস্পর হইতে পৃথক থাকে না তাহাদের সাক্ষাৎ ও সংযোগ ঘটে অথবা ইহাদের এক হইতে অপর পথ নির্গত হয়; আত্মার উপর মননের দেওয়া আবরণ দূর করিয়া দিয়া আমরা বিশ্বাতীত তত্ত্বের মধ্যের বাস করি, হৃদয়ের ভক্তি দ্বারা পরম প্রেম ও আনন্দের অখণ্ড একত্বে প্রবেশ করি, আর আমাদের সকল শক্তি উন্নীত হইয়া এক মহাশক্তিতে মিলিয়া যায়, আমাদের সংকল্প ও কর্ম্ম অদ্বয় তত্ত্বের সংকল্প ও শক্তির নিকট সমর্পিত হইয়া দিব্য প্রকৃতির সক্রিয় পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়*

অতিমানস এবং কর্ম্মযোগ

এক উচচতর আধ্যাত্মিক চেতনায় এবং এক বৃহত্তর দিব্য জীবনে অখণ্ড সত্তার আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ণযোগের সমগ্র এবং চরম লক্ষ্যের একটি অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ। অবশ্যরূপে ইহা চাই যে আমাদের সংকল্প এবং কর্ম্মের সকল অংশ, আমাদের জ্ঞানের সকল অঙ্গ, আমাদের চিন্তাশীল আবেগময় ও প্রাণময় সত্তা, আমাদের সমগ্র আত্মা এবং প্রকৃতি, ভগবানকেই খুঁজিবে, অনন্তের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং নিত্যবস্তুর সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান প্রকৃতি সীমিত, বিভক্ত এবং সমতাশূন্য—তাহার যে অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী একাগ্রচিত্তে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হওয়া এবং নিজ প্রকৃতির উপযোগী কোন নির্দ্দিষ্ট প্রগতির ধারা অনুসরণ করিয়া চলা তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ; অতি কদাচিৎ দু এক জন এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যিনি একেবারে সোজাসুজি দিব্য অনন্তের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সমর্থ। সেইজন্য কাহারও কাহারও পক্ষে নিজেদের মধ্যে আত্মার শাশ্বত সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রারম্ভের আদি বিন্দু-রূপে ভাবনায় অভিনিবেশ বা ধ্যান অথবা মনের একাগ্রতাসাধনকে বাছিয়া নেওয়া আবশ্যক; অন্য কেহ কেহ অধিকতর সহজভাবে হৃদয়ে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়া লইয়া তথায় শাশ্বত দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন; আবার অন্য কেহ কেহ আছেন যাহাদের মধ্যে গতি এবং ক্রিয়ার খেলাই প্রবল, এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিতে নিজেদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কর্ম্মের মধ্য দিয়া নিজ সত্তার প্রসারতাসাধন করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। যিনি পরমাত্মা এবং সব কিছুর উৎস, তাহার আনন্ত্যে সর্ব্ব সংকল্প সমর্পণ দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, সকল কর্ম্মে অন্তরস্থিত গোপন দিব্যপুরুষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া অথবা যিনি সকল বিশ্ব কর্ম্মের অধীশ্বর, ভাবনা অনুভূতি ও ক্রিয়ার

* গ্রন্থকার যে কার্য্যের আরও বিস্তারসাধন করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিয়া যান নাই এ অধ্যায়টি তাহার এক অংশ।

সকল শক্তির প্রভু ও নিয়ন্তারূপে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া সত্তার এই প্রসারতা দ্বারা অহংশূন্য এবং সার্ব্বভৌম হইয়া কর্ম্ম দ্বারা সাধক আধ্যাত্মিক স্থিতির এক প্রাথমিক পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যাত্রারম্ভ যে বিন্দু হইতেই হউক না কেন প্রত্যেকের পথকে উন্মুক্ত স্থানে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক বিশালতর রাজ্যে পৌঁছিতে হইবে ; অবশেষে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ভাবাবেগ ও সক্রিয় কর্ম্ম সংকল্পের এক সমগ্রতার, সত্তা ও সমস্ত প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। অতিমানস চেতনায়, অতিমানস জীবনে এই পূর্ণাঙ্গ সাধনা চরম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ; তথায় জ্ঞান, সংকল্প, ভাবাবেগ, আত্মা ও সক্রিয় প্রকৃতির পূর্ণতা ইহাদের প্রত্যেকে তাহার নিজস্ব চরম অবস্থায় উন্নীত হয়, সকলই পরস্পরের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে স্থাপিত, মিলিত এবং মিশ্রিত হয়, এক দিব্য পরিপূর্ণতা এবং এক দিব্য পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছে। কেননা অতিমানস হইল এক ঋতচিৎ বা সত্যচেতনা, যাহার মধ্যে দিব্য সত্য পূর্ণ প্রকাশিত ; অবিদ্যাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাহাকে আর কার্য্য করিতে হয় না ; অতিমানস, সত্তার স্থিতির এক চরম সত্য, আবার যে সত্তা স্বয়ম্ভূ এবং পূর্ণ, তাহার শক্তি এবং ক্রিয়ার সত্যের মধ্যে তাহা সক্রিয় হয়। তাহার প্রত্যেক গতিবৃত্তি দিব্যপুরুষের স্বয়ংপ্রজ্ঞ সত্যের গতিবৃত্তি, প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সহিত পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে বিধৃত। এমন কি এই সত্যচেতনাতে অতি সীমাবদ্ধ এবং সান্ত ক্রিয়াও শাশ্বত ও অনন্তেরই একটা গতি এবং শাশ্বত ও অনন্তের মধ্যে নিত্য অনুস্যূত চরম ও পরম পূর্ণতারই অংশভাগী। অতিমানস সত্যে উত্তরণ যে কেবল আমাদের চিন্ময় এবং মৌলিক চেতনাকে সেই উর্দ্ধভূমিতে উত্তীর্ণ করে তাহা নয়—কিন্তু আমাদের সমগ্র সত্তায়, প্রকৃতির সকল অংশে সেই আলোক এবং সত্যকে নামাইয়া আনে। সব কিছু তখন দিব্য সত্যের অংশে পরিণত হয়, সেই পরম মিলন এবং একত্বলাভের উপাদান ও উপায় হইয়া উঠে ; সুতরাং এই আরোহণ এবং অবরোহনকে যোগের এক চরম উদ্দেশ্য হইতেই হইবে।

আমাদের সত্তার এবং সর্ব্বসত্তার দিব্য সত্যের সঙ্গে মিলনই যোগের একমাত্র মৌলিক উদ্দেশ্য, এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে অতিমানসকেই লাভ করিবার জন্যে আমরা যোগের পথ গ্রহণ করি নাই, ভগবানের জন্যই যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; অতিমানসের নিজস্ব আনন্দ এবং পূর্ণতার জন্য আমরা তাহাকে খুঁজিনা, আমরা চাই ভগবানের সহিত মিলনকে পূর্ণ ও চরম করিয়া তুলিতে, চাই সে মিলনকে লাভ ও অনুভব করিয়া সম্ভবপর সকল উপায়ে আমাদের সত্তার সর্ব্বত্র, তাহার উচ্চতম

আতিশয্যে এবং বৃহত্তম প্রসারতায় আমাদের প্রকৃতির প্রতিক্ষেত্রে, প্রতি বাঁকে, প্রত্যেক গলি ঘুঁজিতে এবং প্রত্যেক নিভৃত স্থানে তাঁহাকে সক্রিয় করিতে। ইহা ভাবনা করা ভুল—যদিও তেমনভাবে ভাবিতে অনেকেই স্বভাবতঃ উন্মুখ—যে অতিমানস-যোগের উদ্দেশ্য অতিমানবতার, এক দিব্য শক্তি এবং মহত্বের বিশাল ঐশ্বর্য্য লাভ করা, এক অতিবর্দ্ধিত ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বকে আত্মসম্পূর্ণতা দান করা। এ ধারণা মিথ্যা এবং বিপজ্জনক—বিপজ্জনক কেননা আমাদের প্রাণময় রাজসিক মনে ইহা দম্ভ, দর্প এবং দুরাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারে এবং যদি তাহাদিগকে পরাভূত অথবা অতিক্রম করিয়া না যাওয়া যায় তবে তাহারা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক অধঃপতনে লইয়া যাইবে; মিথ্যা, কেননা ইহা অহংগত এক ধারণা এবং অহংকে দূর করাই অতিমানস রূপান্তরের প্রথম সর্ত্ত বা আদিম বিধান। ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কর্ম্ম-তৎপর লোকের সবল এবং সক্রিয় প্রকৃতির পক্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক, সে প্রকৃতির লোক শক্তির অনুসরণ করিতে গিয়া সহজেই বিপথগামী হইতে পারে। অতিমানস রূপান্তরের ফলে অপরিহার্যরূপে শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, পূর্ণ ক্রিয়ার ইহা একটি প্রয়োজনীয় বিধান; কিন্তু যাহা আসে তাহা দিব্য শক্তি, তাহা প্রকৃতি ও জীবনকে গ্রহণ করে—যে মহাশক্তি পরম এক চিন্ময় ব্যষ্টি সত্তার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করেন তাঁহার শক্তি—তাহা প্রকৃত ব্যষ্টিশক্তির অতিবর্দ্ধন বা ভেদভাবাপন্ন মনঃপ্রাণময় অহংএর পরিপূর্ণতার চরম মুকুট-মণি নহে। আত্মসম্পূর্ত্তি যোগের এক সিদ্ধি বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য প্রাকৃত ব্যষ্টিসত্তাকে বৃহৎ করিয়া তোলা নহে। যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য চিন্ময়ভাবে পূর্ণতা, স্বাধর্ম্ম্য মুক্তি লাভ করা; প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং দিব্যচেতনা ও প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া। বাকী সব কিছু উপাদানভূত খুঁটিনাটি এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপার। অহংকেন্দ্রিক আবেগ, উচচাভিলাষ, শক্তিলাভ ও বড় হওয়ার লালসা, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রণোদনা, এই বৃহত্তর চেতনার পক্ষে বিজাতীয়; অতিমানস রূপান্তরের দূর কোন সম্ভাবনার পক্ষেও এ সমস্ত অনতিক্রমণীয় বাধা হইয়া দাঁড়ায়। বৃহত্তর সত্তাকে পাইতে হইলে মানুষকে তাহার অধস্তন সত্তা ছাড়িতেই হইবে। ভগবানের সহিত মিলনই হইবে তাহার সত্তার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, এমন কি তাহার আত্মসত্তা এবং সর্ব্বসত্তার সত্যের আবিষ্কার, সেই সত্যে এবং তাহার বৃহত্তর চেতনার মধ্যে জীবনযাপন এবং প্রকৃতির পূর্ণতাসাধন সেই গতি বা প্রেরণার স্বাভাবিক ফল মাত্র। এই গতির পরিপূর্ণ সিদ্ধির পক্ষে এ সমস্ত অপরিহার্য্য বিধান বা অবস্থা বটে কিন্তু তাহারা সকলেই মূল কেন্দ্রগত উদ্দেশ্যের অংশ কেবল এই জন্য যে

পরিণতির পথে তাহাদের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং তাহারা তাহার এক প্রধান ফল।

ইহাও নিশ্চিত মনে রাখিতে হইবে যে অতিমানস রূপান্তর দুরূহ ও সুদূর, তাহা সাধন-পথের চরম সোপান; তাহাকে পরিদৃশ্যমান বীথিকার অতি দূরে অবস্থিত শেষপ্রান্ত মনে করিতে হইবে; ইহাকে প্রাথমিক উদ্দেশ্য, চক্ষুর সম্মুখে নিয়ত বর্ত্তমান লক্ষ্য অথবা অবিলম্বে লভ্য বিষয় করিয়া তোলা যায় না এবং প্রথমে সে চেষ্টা করাও উচিত নহে। কেননা অনেক দুঃসাধ্য আত্মজয় এবং আত্মাতিক্রম-সাধনার শেষে প্রকৃতির দুরূহ আত্মপরিণামের অনেক দীর্ঘ ও অতি ক্লেশজনক নানা স্তর পার হইয়া যাওয়ার পরে শুধু এ অবস্থা লাভের সম্ভাবনা আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে পারে। মানুষকে আন্তর যৌগিক চেতনা প্রথমে লাভ করিতেই হইবে, এবং বস্তু সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা, স্বাভাবিক গতিবৃত্তি ও জীবনের প্রচলিত প্রণোদনা বা অভিপ্রায় সকলের স্থানে সেই চেতনাকে বসাইতেই হইবে; আমাদের সত্তার বর্ত্তমান সমগ্র গঠনের মধ্যে এক বিপ্লব আনিতেই হইবে। তাহার পর আমাদিগকে আরও গভীরে যাইতে হইবে, আমাদের গোপন চৈত্যসত্তাকে আবিষ্কার করিতে হইবে এবং তাহার আলোকে ও তাহার পরিচালনায় আমাদের অন্তর ও বাহিরের সকল অঙ্গকে চৈত্যভাবে বিভাবিত করিয়া তুলিতে এবং আমাদের মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় প্রকৃতির মুখ ফিরাইয়া আমাদের মন প্রাণ ও দেহের সকল ক্রিয়া, সকল অবস্থা এবং সকল গতিকে অন্তরাত্মার সচেতন যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর অথবা সেই সঙ্গে দিব্য আলোক শক্তি পবিত্রতা জ্ঞান স্বাধীনতা এবং উদারতা নামাইয়া আনিয়া তদ্দ্বারা আমাদের সমগ্র সত্তাকে আধ্যাত্মিক ভাবময় করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যক্তিগত মনপ্রাণ এবং দৈহিক সত্তার সীমা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রয়োজন; প্রয়োজন অহংকে বিলয় করা, বিশ্ব-চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়া, আত্মাকে উপলব্ধি করা, অধ্যাত্মভাবে বিভাবিত সার্ব্বভৌম মন ও হৃদয়, প্রাণশক্তি ও দৈহিক চেতনা লাভ করা। কেবল তখনই অতিমানস চেতনায় পৌঁছিবার পন্থা উন্মুক্ত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তখনও ঊর্দ্ধ্বগমনের পথ দুরারোহ থাকিয়া যায়—তাহার প্রত্যেকটি সোপান একটি পৃথক ক্লেশকর সাধনলভ্য সিদ্ধি। দ্রুতবেগে ঘনীভূতরূপে সত্তার সচেতন পরিণতিই যোগ; যান্ত্রিক প্রকৃতির পক্ষে যাহা সাধন করিতে সহস্র সহস্র বৎসর অথবা বহুশত জীবনকাল লাগিয়া যায়, যোগের ফলে এক জীবনে তাহা সিদ্ধ করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যোগের পথে এত দ্রুত চলা সম্ভব হইলেও পরিণতিকে বহু স্তরের মধ্য দিয়া চলিতেই হয়; এমন কি তাহার দ্রুততম

এবং অতি ঘনীভূত গতিও সকল স্তব বা সোপানকে গলাধঃকরণ করিয়া নিঃশেষ করিতে অথবা স্বাভাবিক পদ্ধতিকে উল্টাইয়া দিতে এবং যাহা শেষ তাহাকে প্রারম্ভের অতি নিকটে লইয়া আসিতে পারে না। অতিব্যস্ত অবিবেচক এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন, অত্যুৎসুক শক্তি সহজেই এ প্রয়োজন বিস্মৃত হয়; সে মন ও শক্তি অতিমানসকে অতিনিকট বা ব্যবধানরহিত লক্ষ্য কবিযা সম্মুখের দিকে অতি দ্রুত ছুটিয়া চলে এবং তাহাকে অনন্তের মধ্যস্থিত উচচতম স্থান হইতে আকর্ষী দিয়া টানিয়া নীচে নামাইয়া আনিবার আশা করে। ইহা কেবল যে এক অসম্ভব আশা তাহা নহে কিন্তু বিপদসঙ্কুলও বটে। কেননা প্রাণের এই বাসনা সহজেই অন্ধকাবময় ও প্রচণ্ড প্রাণশক্তি সকলেব ক্রিয়াধারা ডাকিয়া আনিতে পারে যাহারা তাহাব অসম্ভব লালসাব দ্রুত পরিপূবণের প্রতিশ্রুতি তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত কবে, তাহাব ফলে অনেক প্রকার আত্মবঞ্চনাব মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার, অন্ধকারেব শক্তিসকলেব, মিথ্যাব ও প্রলোভনেব কাছে আত্মসমর্পণ করিবাব সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। তখন অতিপ্রাকৃত শক্তিব অনুসন্ধান ও অনুসবণ করিতে, দিব্য প্রকৃতি হইতে দূবে সবিযা গিয়া আসুরিক প্রকৃতিব দিকে চলিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এক মারাত্মক আত্মস্ফীতি, বর্দ্ধিত অহংএর এক অস্বাভাবিক, অমানুষী এবং অদিব্য বৃহত্তাকপে দেখা দেয়। সত্তা নিজে যদি ক্ষুদ্র হয়, তাহার প্রকৃতিতে যদি দৌর্ব্বল্য এবং অসামর্থ্য থাকে তবে সেখানে বৃহদাকারে এই ঘোব বিপদ দেখা দেয় না বটে কিন্তু সেখানে এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ফল আসিতে পাবে যে সাম্য নষ্ট হয়, মন বিচলিত হইয়া পড়ে এবং যুক্তিহীনতার মধ্যে ডুবিয়া যায়, অথবা প্রাণে বিকৃতি দেখা দেয় যাহার ফলে নৈতিক স্খলন ঘটে বা সে পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রকৃতির কোন প্রকার রুগ্ন অনৈসর্গিকতার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহা সে যোগ নহে যাহাতে আত্মসম্পূর্ত্তি অথবা অধ্যাত্ম সিদ্ধিব উপায়রূপে কোন প্রকার অনৈসর্গিকতা—এমন কি তাহা উচচ অনৈ-সর্গিকতা হইলেও—প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে; এমন কি যখন কেহ যুক্তির অতীত অসাধারণ অনুভূতিতে প্রবিষ্ট হয় তখনও তাহার সাম্যকে বিক্ষুব্ধ হইতে দেওয়া উচিত নয়। চেতনার সর্ব্বোচচ শিখর হইতে ভিত্তি-ভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহাকে দৃঢ় রাখিতে হইবে অনুভবশীল চেতনাতে স্থির সাম্য, পর্যবেক্ষণের সময় অবিচলিত স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা, উন্নত ও বিশোধিত এক প্রকার সহজ বুদ্ধি, আত্মসমালোচনার এক অব্যর্থ শক্তি; যথাযথভাবে বস্তু-সকলের মধ্যে সূক্ষ্মভেদ দর্শন ও তাহাদিগকে যথাক্রমে বা যথাস্থানে সন্নিবেশের সামর্থ্য এবং দৃঢ় অন্তর্দৃষ্টি রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে; তথ্যের উপর সদ্বি-বেচনা-প্রসূত দৃঢ় অধিকার এবং উচচ আধ্যাত্মিকতাদ্বারা অনুপ্রাণিত প্রত্যক্ষ

বা ব্যবহারিক জ্ঞান তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। অযৌক্তিক বা অবযৌক্তিক হইয়া কেহই সাধারণ প্রকৃতি হইতে পরাপ্রকৃতিতে পৌঁছিতে পারে না, যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়াই যুক্তিবিচারের অতীত বৃহত্তর উচ্চজ্ঞানের আলোকে যাইতে হয়। যুক্তি বুদ্ধির পরপারস্থিত এই আলোক যুক্তিবিচারের মধ্যে নামিয়া আসে এবং যেমন তাহার সীমাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে থাকে তেমনি তাহাকে উচ্চ-তর স্তরে লইয়া যায়; যুক্তিবিচারের বিনাশ ঘটে না বরং তাহা রূপান্তরিত হইয়া নিজের খাঁটি অসীম আত্মাতে, পরাপ্রকৃতির সেই শক্তিতে পরিণত হয় যাহা সবকিছু যথাক্রমে ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে।

আর একটি ভুল সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, যাহার দিকে আমাদের মননের একটা সহজ প্রবণতা আছে; এ ভুল হইল কোন উচ্চতর মধ্যবর্ত্তী চেতনা অথবা এমন কি অতিপ্রাকৃত যে কোন চেতনাকে অতিমানস বলিয়া গ্রহণ করা। অতিমানসে পৌঁছিবার জন্য মানব-মনের সাধারণ গতিবৃত্তির উপরে যাওয়াই পর্য্যাপ্ত নহে, বৃহত্তর এক আলোক, বৃহত্তর এক শক্তি, বৃহত্তর এক আনন্দ লাভ করা অথবা যাহাতে মানব-সত্তার সাধারণ সীমা পার হইয়া যাওয়া যায় তেমন জ্ঞানের দৃষ্টির ও কার্য্যকরী ইচ্ছার সামর্থ্যকে ফোটাইয়া তোলাও সেজন্য যথেষ্ট নহে। সকল আলোক আত্মার আলোক নহে, সকল আলোক যে অতিমানস আলোক নহে ইহা আরও বেশী করিয়া বলা চলে; মন প্রাণ এবং দেহের নিজস্ব অনেক আলোক আছে যাহা আজিও গোপন রহিয়াছে, যে আলোকরাজি বহুল পরি-মাণে প্রেরণাদায়ক, উন্নয়নকারী, শিক্ষাপ্রদ এবং শক্তিশালীভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে। আবরণ ভেদ করিয়া বিশ্বচেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও চেতনা এবং শক্তির প্রবল বিবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। আন্তর মন, আন্তর প্রাণ এবং অন্তর্দ্দেহের অধিচেতনার কোন ক্ষেত্রে উন্মীলিত হইতে পারিলে এমন অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তি, জ্ঞান বা অনুভূতি মুক্ত হইতে পারে যাহা অশিক্ষিত মন চিন্ময় প্রকাশ বা প্রেরণা অথবা বোধির উন্মেষ বলিয়া সহজেই ভুল করিতে পারে। ঊর্দ্ধস্থ উচ্চতর মনোময় সত্তার বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে উন্মিষিত হইয়া উঠিতে পারিলে, তথা হইতে বহুল পরিমাণে আলোক ও শক্তিকে নামাইয়া আনা এবং বোধিভাবিত মন এবং প্রাণশক্তির তীব্র ক্রিয়াধারা সৃষ্টি করা যায় অথবা এই সকল ভূমিতে আরোহণের ফলে খাঁটি এক আলোকের —কিন্তু তখনও তাহা অপূর্ণ—অবতরণ সম্ভব করা যায় তাহা সহজেই মিশ্রিত হইয়া পড়িতে পারে; যে আলোক মূলতঃ আধ্যাত্মিক যদিও যখন তাহা নিম্ন-প্রকৃতির মধ্যে নামিয়া আসে তখন তাহার ক্রিয়াশীল ধর্ম্মে তাহা আর সর্ব্বদা

আধ্যাত্মিক থাকে না। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুর কোনটাই অতিমানস আলোক বা অতিমানস শক্তি নহে; সে আলোক এবং শক্তিকে দেখা এবং উপলব্ধি করা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন আমরা মনোময় সত্তার শিখরে পৌঁছিয়াছি, অধিমানসে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি, আধ্যাত্মিক জীবনের এক উচ্চতর এবং বৃহত্তর পরার্দ্ধের উপকণ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছি। যাহা ধীরে ধীরে এক অর্দ্ধজ্ঞানের দিকে জাগরিত হইতেছে সেই অবিদ্যা, অচেতনা, অন্ধকারময় আদি নিশ্চেতনা জড় প্রকৃতির ভিত্তি; তাহারা আমাদের মন এবং প্রাণের সকল শক্তিকে চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং প্রবলভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই উচ্চতর পরার্দ্ধে তাহারা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়; কেননা তথায় অবিমিশ্র এবং অবিকৃত সত্য-চেতনা সমগ্র সত্তার উপাদান, তাহার শুদ্ধ চিন্ময় বেশ। যখন পর্য্যন্ত আমরা অবিদ্যার সক্রিয় শক্তির মধ্যে বিচরণ করিতেছি—সে অবিদ্যা আলোকিত বা জ্যোতির্ম্ময় হইলেও—তখন আমরা অতিমানসের সে অবস্থা লাভ করিয়াছি কল্পনা করিলে হয় বিপদপূর্ণ বিপথে আমাদিগকে পরিচালিত করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে নাহয় আমাদের সত্তার ক্রমপরিণতিধারা রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কেননা এইভাবে কোন নিম্নতর অবস্থাকে যদি আমরা অতিমানস বলিয়া ভুল করিয়া গ্রহণ করি তবে শীঘ্র লাভের দাবি করিতে গিয়া ধৃষ্ট ও প্রগল্‌ভ অহং হঠকারিতাবশে দ্রুত চলিবার পথে যে সমস্ত বিপদে জড়ীভূত হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা দেখিয়াছি, আমাদিগকে তাহাদের সকলগুলির নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরা হইবে। উচ্চতর অবস্থার কোন একটিকে যদি উচ্চতম বলিয়া মানিয়া লই, তবে অনেক কিছু লাভ করিলেও আমাদের সত্তার বৃহত্তর এবং পূর্ণতর লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে রহিয়া যাইব; কেননা আমরা কাছাকাছি আসিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব এবং পরম রূপান্তর লাভ করিতে সমর্থ হইব না। এমন কি পূর্ণ আন্তর মুক্তি এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনা লাভও সেই পরম রূপান্তর নহে; কেননা যদিও আমরা সেই অবস্থা লাভ করিতে পারি যাহা মূলতঃ নিজেতে নিজে পরিপূর্ণ, তথাপি তখনও আমাদের সক্রিয় অংশসকল তাহাদের আলোকিত ও আধ্যাত্মিক ভাবাবিষ্ট মনের অধিকারে থাকিবে এবং তাহার ফলে সকল মনোময় চেতনার মত তাহাদের বৃহত্তর জ্ঞান ও শক্তি সত্ত্বেও তাহা অসম্পূর্ণ এবং চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টনকারী আদি নিশ্চেতনার আংশিক অথবা স্থানীয় অন্ধকার বা সীমার অধীন থাকিয়া যাইবে।
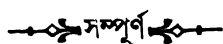
সংশোধন

নির্ভুল করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। ছাপাইবার সময় কোন কোন অক্ষরের নীচের উপরের বা পার্শ্বের চিহ্ন—যথা আকার ইকার উকার ঋকার রেফ প্রভৃতি—কখন কখন ভাঙিয়া গিয়াছে। দু'একস্থানে বানানভুলও রহিয়াছে। যেস্থানে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে না মনে করিয়াছি সেখানে ভুল সংশোধনে তাহা ধরা হয় নাই। যে কয়েকটি গুরুতর ভুল চোখে পড়িয়াছে অথবা যেখানে বুঝিতে কষ্ট হইবে মনে হইয়াছে এই সংশোধনপত্রে শুধু তাহাই দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা	ছত্র	যাহা আছে	যাহা হইবে
৩৮	১৫	অজন	অর্জন
,,	২৫	প্রদেশ কম	প্রদেশে কর্ম্ম
৪৬	১৪	কি যাহা	কি, যাহা
৫৮	২	অবেশষে	অবশেষে
৬১	২৫	যে	সে
৭৬	১৫	সর্ব্বান্তকঃরণে	সর্ব্বান্তঃকরণে
,,	১৫	প্রবত্ত	প্রবৃত্ত
১১৭	৩০	আম্না	আণ্ণা
১২৭	১০	ব্যক্ত পুরুষ	ব্যক্তিপুরুষ
১৩৬	১৪	বিশ্রপ্রাণ	বিশ্বপ্রাণ
২০৪	৫	কিন্ত্র	কিন্তু
২১৬	২৫	ব্যক্তিসসত্তার	ব্যক্তিসত্তার
২২৭	৭	যে	সে
২৩৪	৩	তাহার কর্ম্মাবলিকে	তাহার বাহ্য কর্ম্মাবলিকে
২৪৬	১২	অস্বীকারে	অস্বীকার
২৬৭	৪	পাওয়া যাহাতে	পাওয়া যায় যাহাতে
২৮৮	৬	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যে
৩১৬	২৫	মধ্যের	মধ্যে